ISSN 1813-0402

গবেষণা পত্রিকা

২৬তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০১৮

কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal

Faculty of Arts

University of Rajshahi

গবেষণা পত্রিকা ২৬তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০১৮
কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পত্রিকা

২৬তম সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ২০১৮

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 26
December 2018

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Greater Road, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 350.00 $ 6

Contact Address
Chief Editor, A Research Journal (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Md. Asaduzzaman
Chairman
Department of Philosophy

Professor Mortuza Khaled
Chairman
Department of History

Abdullah Al Mamun
Chairman
Department of English

Professor P.M. Shafiqul Islam
Chairman
Department of Bengali

Professor Md. Fazlul Haque
Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Md. Abu Bakar Siddique
Chairman
Department of Arabic

Professor Muhammad Rafiqul Islam
Chairman
Department of Islamic Studies

Dr. Podminee Dey
Chairman
Department of Music

Dr. Md. Ataur Rahman
Chairman
Department of Theater

Professor Md. Ataullah
Chairman
Department of Persian Language and Literature

Professor Md. Nasir Uddin
Chairman
Department of Urdu

Professor Bipul kumar Biswas
Chairman
Department of Sanskrit

Message from the Chief Editor

The 26th volume of the Research Journal of the Faculty of Arts is published with 24 research articles contributed by the faculty members of the Departments of Philosophy, Bengali, Islamic History & Culture, Arabic, Islamic Studies, Theater, Persian Language & Literature and Sanskrit. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the officers of the faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. মো. আলতাফ হোসেন (২)	হুর্সালের জ্ঞানতত্ত্বে কান্টের প্রাসঙ্গিকতা : একটি পর্যালোচনা	১
ড. মোছা. ফেরদৌসী বেগম	উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় রেনেসাঁসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান	১৩
Dr. Sharmin Hamid	The Moral Precepts in Hinduism : A Brief Account	২৭
ড. মো. সুজা উদ-দৌলা	সানাউল হকের প্রবন্ধ : প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিত	৪৫
ড. মোসা. ছায়িদা আকতার	ওসমানীয় সাম্রাজ্যে রুশনীতি, ১৭৭৪-১৮৫৬ খ্রি.	৫৯
মো. রবিউল ইসলাম	উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার: অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট	৭৫
ড. জিয়াউর রহমান খান	হযরত উমার (রা:)-এর কাব্যচর্চা : একটি পর্যালোচনা	৯১
ড. মো. আবু বকর	কবি সম্রাট আহমদ শাওকী'র রম্যকবিতার শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা	১০৭
ড. মো. মনিরুজ্জামান	আল কা'কা' বিন আমর আত তামীমী (রা.) ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা	১২৫
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান আশ্-শায়বানী (র) ও তাঁর আল-মুওয়াত্তা : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ান	১৩৭
Dr. Md. Rafiqul Islam	Muslim Occupation of Spain (al-Andalus) and the Policy of Islamization	১৬৫
ড. মুহা. শহীদুল্লাহ	শরী'আহ এর দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৭৯
আবুল বাশার মোহাম্মাদ সরোয়ার আলম	ইবনে সিনা : চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রদূত	১৯৫
ড. মুহা. আ. হামিদ	রাসুল (স.)-এর নবুওয়াতপূর্ব জীবনে আদর্শ ও গুণাবলী	২০৭
মো. হাফিজুর রহমান	ইসলামী শরীআহর আলোকে বীমা	২১৩
ড. মো. আতাউর রহমান	বক্তৃতা : একটি স্বতন্ত্র পরিবেশনা-শিল্প	২২৫
মুহম্মদ আলমগীর পিএইচ.ডি.	বাংলা উপন্যাসে চরদখল প্রসঙ্গ (১৯৪০-১৯৮৮)	২৩৫
ড. কৌশিক সরকার	চলচ্চিত্রে ঋতু : সত্যজিৎ রায়	২৪৭
ড. মীর মেহবুব আলম	শিক্ষায় নাট্যের ধারাপথ : প্রায়োগিক নির্মিতি	২৫৫
ড. মো. ওসমান গণী	শেখ সা'দীর কাব্যে নৈতিক উপাদান : একটি পর্যালোচনা	২৬৯
ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ	ইমাম' খোমেনীর রচিত ফারসি গ্রন্থাবলি : একটি পর্যালোচনা	২৮৩
ড. মো. নূরুল হুদা, ও ড. রিজওয়ানা ইসলাম শাম্মী	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষার প্রভাব	২৯৫
মোছা. এলিনা আখতার পলি	কালিদাসের পার্বতী	৩০৭
ড. শেখ মো. নূরুজ্জামান	ভবভূতির মালতীমাধব একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকরণ	৩১৯

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

হুর্সালের জ্ঞানতত্ত্বে কান্টের প্রাসঙ্গিকতা : একটি পর্যালোচনা

ড. মো. আলতাফ হোসেন (২)*

Abstract : Epistemology has occupied a very distinct place in the history of western philosophy. But it became the only subject of discussion in the philosophy of modern period. There were many speculative questions as to whether there is any reality at all behind the world and if there is any such reality, what the nature of this reality is, as to whether the nature of the reality is one or two or many. Before we reach any conclusion about the reality behind the world we should first know how far and how much we are able to know, which method can help us in knowing, how far the limit of knowledge is, by which means we can achieve them etc. Though this current of thought from Descartes, the father of modern philosophy, to Kant has gained perfection, yet it is continuing till today. And in its continuity Husserl is found engaged in searching the ways of attaining proper knowledge, in applying method and in making efforts to reach a certain conclusion. Of course, it is at the very outset essential to mention that Husserl's phenomenology is a method and a philosophy as well. As a method phenomenology wants to investigate how objective knowledge is possible. (Kant also wanted to investigate the same thing.) And as a philosophy, phenomenology wants to ask whether proper knowledge is possible or not. In this article an attempt has been made to present Husserl's views on his epistemology keeping Kant's context in the centre.

হুর্সালের (Edmund Gustav Albrecht Husserl, 1859-1938,Germany) দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক দিকের গুরুত্ব অপরিসীম। পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন বলা চলে। অবশ্য জ্ঞানতাত্ত্বিক অন্য সকল দার্শনিকের দর্শনকে তিনি সমালোচনা যেমন করেছেন, একই সাথে তিনি তাদের অনেককিছু গ্রহণও করেছেন। ডেকার্টের পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর উপর এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে তিনি ডেকার্টের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক "কার্টেসিয়ান মেডিটেশান' নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তারপরও তিনি ডেকার্টের শূন্য চেতনার ধারণার তীব্র সমালোচনাও করেছেন। হিউমের মতের ত্রুটি উল্লেখ করলেও (হুর্সাল হিউমের দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশকে বলেছেন, 'সংবেদনবাদ থেকে কল্পনায়িত জ্ঞানতত্ত্বে বিকাশ'।) হুর্সাল হিউমের সংশয়বাদে নির্বিচারবাদী বিষয়গত মতবাদের ভিত্তিসমূহকে সম্পূর্ণভাবে পরিহারের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছেন। তিনি মনে করেন, হিউমের সংবেদনবাদী বিষয়গত মতবাদ জ্ঞাত-জগৎকে সংবেদন এবং ধারণায় পর্যবসিত করে এক বিশুদ্ধ অন্তঃবর্তী দর্শনের পথ প্রস্তুত করেছে। তবে কোন্ প্রক্রিয়ায় জ্ঞান-ক্রিয়া-সম্পাদিত হয়- এরূপ প্রশ্নে হুর্সালের উপর সম্ভবত সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে কান্টের। কিন্তু তাই বলে হুসার্লের দর্শন তাঁদের দর্শনের চর্বিত চর্বণ না হয়ে তা হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ মৌলিক এবং পরবর্তী দার্শনিকদের অনুসরণেরঅন্যতম এক আশ্রয়স্থল। তাঁর দর্শনের সাথে অস্তিত্ববাদকে যেমন সার্ত্র সংযুক্ত করেছেন, সার্ত্র নিজে যে 'বিয়িং এণ্ড নাথিংনেস' নামক গ্রন্থটি লিখেছেন সেটি তিনি ফেনোমেনোলজির এ্যাপ্রোচেই লিখেছেন। তেমনি হাইডেগারও তাঁর তত্ত্ব দ্বারা কম প্রভাবিত হননি। হাইডেগার হুর্সালের দর্শনকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বলা যায় সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে দেরিদার পোস্টমর্ডান চিন্তা মৌলিকত্বের দাবিদার। দেরিদাও তাঁর পোস্টমডার্নিজমে হুর্সালীয় পদ্ধতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন।[১]

* প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কান্ট এবং হুর্সাল উভয়েই জ্ঞানতত্ত্বের ইতঃপূর্বেকার মতবাদ দুটিকে (বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ) প্রত্যাখ্যান করেন। তবে কান্টের ভিতর 'থিসিস' (বুদ্ধিবাদ) 'এন্টিথিসিস' (অভিজ্ঞতাবাদ) এর সমন্বয়ে 'সিনথিসিস' (বিচারবাদ) লক্ষ্য করা গেলেও হুর্সালের ভিতর তা দেখা যায় না। অবশ্য দেখা না যাওয়ার পিছনে বড় কারণ হলো তাঁর মতবাদ পূর্বস্বীকৃতিবিহীন (presuppositionless)। পূর্বস্বীকৃতিবিহীন দর্শন বলতে সেই দর্শনকে বুঝায় যা উপনীত হয় এমন বিষয়ে যা অভিজ্ঞতায় সর্বাপেক্ষা চরম, প্রাথমিক এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক। আর এরই ফলশ্রুতিতে এ দর্শন প্রচ্ছন্ন দেহ-মনের দ্বৈতবাদ, চেতনার আধার হিসেবে মন সম্পর্কীত মতবাদ এবং বর্হিজগৎ থেকে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন, সরল পারমাণবিক সংবেদনসমূহের নিষ্ক্রিয় গ্রাহক হিসেবে জ্ঞানের বিষয়ী সম্পর্কিত মতবাদকে অস্বীকার করে। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, অবভাসবিদ্যা পাশ্চাত্য দর্শনের কেন্দ্রীয় ঐতিহ্যে আদৌ অংশগ্রহণ করে না। একদিকে এ মতবাদ ইউরোপীয় দর্শনের সাধারণ আধিবিদ্যক-বৌদ্ধিক ঐতিহ্য থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়; অপরদিকে এ মতবাদ অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে আভিজ্ঞাতিক-প্রত্যক্ষবাদী প্রবণতা থেকেও নিজকে দূরে সরিয়ে রাখে।[২] তবে পূর্বস্বীকৃতিবিহিন হলেও তাঁর নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রয়োজনে কোনো কোনো পাশ্চাত্যদার্শনিকের কোনো কোনো চিন্তাধারার কিয়দংশ তিনিগ্রহণ করেছেন বটে, তাই বলে তিনি তাদের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। অবশ্য, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হুর্সালের জ্ঞানতত্ত্বে অন্যান্য দার্শনিকদের তুলনায় কান্টের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে যে সমস্ত মৌলিক শর্ত আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে তা অনুসন্ধান করতে কান্টের মত হুর্সালও সমান আগ্রহী।

কী করে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান সম্ভব হয়, এ প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে যেয়ে হুর্সাল পূর্বের কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদকে মেনে নেননি। বরং তিনি প্রথম থেকেই শুরু করেছিলেন।[৩] আর তাই ইতিপূর্বে গৃহীত একপর্যায়ী মতবাদ থেকে নিজকে বিযুক্ত করে তিনি মনে করেন, জ্ঞান দ্বিপর্যায়ী (অনেকটা কান্টের মত হলেও এক্ষেত্রে কান্টকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন)। অর্থাৎ জ্ঞান হবার জন্যে জগৎ নিজেকে যেমন চেতনার কাছে উপস্থাপন করে, তেমনি চেতনা জগতের উপর আরোপ করে অর্থ। মানে, তার মতে, জ্ঞান হলো পরস্পর সাপেক্ষ একটা বিষয়। অবশ্যই, এটি একটি নতুন কথা। কেননা, জ্ঞানতত্ত্বের অতিপরিচিত দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের একটি মনে করে, বাইরের বস্তু আনকোরা সাদা নিষ্ক্রিয় মনের উপর সরল, বিচ্ছিন্ন এবং কাটাকাটা পারমাণবিক যে ছাপসমূহ ফেলে সেগুলোর সংযোজন-বিয়োজনের ফলে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়; অপর মতটি মনে করে, (সক্রিয়) মনের পূর্বতসিদ্ধ তথা সহজাত ধারণার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয় কেবলমাত্র সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। কেননা এরূপ জ্ঞানেই রয়েছে কেবলমাত্র অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভব সত্য। মতবাদ দুটি পর্যালোচনা করলে প্রতিটি মতবাদই একদেশদর্শী অভিধায় অভিহিত হয়ে পড়ে। প্রথম মতটি মেনে নিলে মনকে নিষ্ক্রীয় রেখে শুধু মাত্র বাহ্যিক বস্তুজগতের সার্বভৌমত্বকেই মেনে নিতে হয়, এখানে বাহ্যিক বস্তুই যেন মনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই যদি হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে নিষ্ক্রীয় মন কীভাবে বাহ্যিক জগতের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানকে অবশ্যম্ভবী সত্য বলে নিশ্চয়তা পাবে? আর দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করলে একদিকে বস্তু হয়ে যায় গৌণ, অপরদিকে বাহ্যজগৎ সম্পর্কে জ্ঞাতার মনে নতুন কোনো জ্ঞানের সংযোজনও সম্ভব হয় না। ফলে বাহ্যিক বস্তুজগতের জ্ঞান হয়ে পড়ে নেহায়েত জ্ঞাতার চেতনারই এক প্রকাশ, বৈ আর কিছুই নয়। কান্ট অবশ্য এসমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মতবাদ অজ্ঞেয়বাদে পর্যবষিত হয়।

হুর্সালের মতে, আমাদের যে জ্ঞান হয় তা বস্তুর সারসত্তা বিষয়ক জ্ঞান। বিশেষ বস্তুর জ্ঞান নয়। (তাই বলে বিশেষ বস্তুকে ডেকার্টের ন্যায় তিনি অস্বীকার করেননি। শুধুমাত্র বিশেষ বস্তুকে তিনি সবরকমের বিচার বিবেচনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন মাত্র।) সাধারণ অভিজ্ঞতায় মনে করা হয়ে থাকে যে, জ্ঞান হয় বিশেষ বস্তুর। (হুর্সালের প্রশ্ন) কিন্তু বিশেষ বস্তু কি ইন্দ্রিয়ের নিকট তার সবটাই প্রদর্শন করতে পারে?

বিশেষ বস্তুর নিছক একটা পার্শ্বচিত্রকেই কেবল ইন্দ্রিয় জ্ঞাতার নিকট উপস্থাপন করতে পারে। তাহলে জ্ঞাতা কিভাবে বুঝতে পারে যে, তার অমুক বিষয়ের জ্ঞান হলো? তাছাড়া, বাইরের বিশেষ বস্তুটির প্রকৃতি হলো গৌণ, পরিবর্তনশীল বিশেষ এবং আপতিক।[৪] আর এক্ষেত্রে বলা যায় যে, বস্তুর প্রকৃতি যদি হয় গৌণ, পরিবর্তনশীল বিশেষ এবং আপতিক তাহলে উক্ত বস্তুটি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী প্রশ্ন ওঠা যেমন সম্ভব তেমনি উক্ত বস্তুটির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাও অত্যন্ত যৌক্তিক কারণে সম্ভব। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের যে অভিজ্ঞতা হয় সেই অভিজ্ঞতাকে যৌক্তিকভাবেই সন্দেহ করা যেতে পারে যা করেছিলেন হিউম। এ জন্য হুর্সালের প্রাথমিক আগ্রহ নিছক বাস্তব বস্তুর প্রকৃতি (nature) এবং প্রকার (type) বিষয়ক না হয়ে চেতনার সাথে সম্পর্কিত প্রদত্তের ধরণ (mood of givenness) বিষয়ে। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী (হুর্সালের পরিভাষায় প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি) সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, বাহ্যিক বস্তুর ছাপ ইন্দ্রিয়ের উপর পড়লে ঐ বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয়। কিন্তু হুর্সাল মনে করেন, উক্ত প্রকারে বিশুদ্ধ জ্ঞান তথা নিঁখুত জ্ঞান সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি যে অভিমত পোষণ করেন তা হলো, জ্ঞাতার কাছে সম্পূর্ণ স্বজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞেয়বস্তু উপস্থিত হয় অনুচিন্তনের নানান স্টেজ তথা ধাপ অতিক্রম করে। আর এই জ্ঞেয়বস্তুকে (object) বুঝতে হবে যতটা না দেশ-কালস্থিত বাস্তব (real) হিসাবে তার চেয়ে বরং অভিপ্রেত অর্থ (*meant*) হিসাবে। অর্থাৎ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, বাইরের একটি বস্তুর জ্ঞান হবার জন্যে যখন প্রত্যক্ষণ ক্রিয়াটি চলতে থাকে তখন উক্ত বস্তুটির কিয়দংশই মাত্র দ্রষ্টার তথা জ্ঞাতার গোচরে আসে আর এহেন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বস্তুটি প্রত্যক্ষ না করে বোঝা সম্ভব নয় যে, এটি উক্ত প্রকারের বস্তু। এজন্য হুর্সাল বলেন যে, বিশেষ বস্তটি ইন্দ্রিয়ের নিকট পৌঁছে ব্যাখ্যাত হবার পূর্বেই তার সার্বিক রূপটি অর্থাৎ তার সারার্থটি তথা বস্তুটির নির্দেশিত অর্থ স্বজ্ঞার মাধ্যমে চেতনার নিকট প্রদত্ত হয় এবং চেতনাও বর্হিমুখীন হয়ে উক্ত বিষয়ে অবগত হয়। আর এভাবে যে জ্ঞান ক্রিয়া সংগঠিত হয় তা হয় সুনিশ্চিত।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিপূর্বেকার জ্ঞান বিষয়ক সকল মতবাদে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র যে প্রভেদের কথা বলা হয়ে থাকে হুর্সাল সেগুলিকে প্রত্যখ্যান করে জ্ঞান ক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন করেন। পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদে মনে করা হয়ে থাকে যে, জ্ঞান হওয়ার জন্যে যে জ্ঞাতা (subject) এবং জ্ঞেয়র (object) একান্ত প্রয়োজন সেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন তো বটেই সেই সঙ্গে তারা পরস্পর বিরোধীও বটে। কিন্তু হুসার্ল মনে করেন, জ্ঞান প্রক্রিয়ায় জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র প্রকৃতি ভিন্ন হলে তাদের মধ্যে জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। প্রকৃত জ্ঞান হতে হলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র প্রকৃতি একই রকম হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য জ্ঞেয় হিসাবে দেশ-কালে অবস্থিত বস্তুর কথা না বলে তিনি বার বার জ্ঞেয় হিসাবে বস্তুর সারসত্তার কথা বলেছেন। অর্থাৎ তার কাছে বিশেষ বস্তু তথা বিশেষ বিড়ালের কোনো মূল্য নেই, যা আছে তাহলো বিড়ালের সার্বিক রূপ তথা বিড়ালত্বের। তারমানে, তিনি জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রথম অবস্থায় বিশেষ বিড়ালকে পাচ্ছেন না, তিনি পাচ্ছেন বিড়াল বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ বিড়ালত্বকে আর বিড়ালত্বের মধ্য দিয়ে তিনি সবশেষে পাচ্ছেন বিশেষ বিড়ালকে। এভাবেই বিড়ালত্ব, টেবিলত্ব, ফুলত্ব তথা বস্তুর সারসত্তার যে জ্ঞান তিনি পাচ্ছেন তার প্রকৃতি এমনই যে, এগুলি দেশ কালে অবস্থান করে না। অর্থাৎ এগুলি এগজিস্ট করে না, সাবসিস্ট (subsist) করে। ফলে জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতিও পাল্টে যায়। অর্থাৎ সারসত্তা হয়ে পড়ে ভাবজ। ফলে জ্ঞাতা তথা চেতনা এবং জ্ঞেয় তথা সারসত্তার প্রকৃতি হয়ে পড়ে একইরূপ। অর্থাৎ হুর্সালের জ্ঞান-ক্রিয়ায় জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র পার্থক্য বিলীন হয়ে তা এক হয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে তা হলো প্রান্তবর্তিতা। একপ্রান্তে থাকে জ্ঞাতা-রূপ চেতনা অপর প্রান্তে থাকে জ্ঞেয়-রূপ সারসত্তা।[৫]

পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মনে করা হয়ে থাকে যে, জ্ঞাতা নিষ্ক্রিয়, জ্ঞেয়বস্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞাতার নিকট উদ্দীপনা সৃষ্টি না করলে জ্ঞাতা সক্রিয় হয়ে ওঠে না ফলে জ্ঞানও সম্ভব হয়

না। হুর্সাল এ মতের সম্পূর্ণ বিপরীতে বলেন যে, চেতনা প্রথম থেকেই স্বয়ং সক্রিয় অবস্থানে থাকে। আর থাকে বলেই চেতনার মধ্যে সর্বদা আভিমুখ্যতা (intentionality) নামক একটি বিষয় সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ চেতনার ধর্মই হলো বর্হিমুখী। চেতনা মানেই কোনো কিছুর চেতনা বা কোনো কিছু সম্পর্কিত চেতনা। চেতনা আছে কিন্তু সে চেতনা কোনো কিছুর চেতনা নয় বা কোন বিষয় সম্পর্কিত চেতনা নয় তা হতে পারে না।[৬] অবশ্য হুর্সাল উক্ত মতটি গ্রহণ করেন, ব্রেনটানোর কাছ থেকে। হুর্সালও অনেকটা ব্রেনটানোর মতই মনে করেন যে, সকল চেতন ক্রিয়ার একটি মৌল লক্ষাভিমুখী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কোনো বিষয়কে নির্দেশ করে, এখন সেটি বস্তুগতভাবে বাস্তব হোক অথবা না হোক। ...স্মরণ করা মানে কোনো কিছুর স্মরণ করা, কল্পনা করা মানে কোনো কিছুর কল্পনা করা, ইচ্ছা করা মানেই কোনো কিছুর ইচ্ছা করা ...। এখানে উল্লেখ্য যে, হুর্সাল যে চেতনার কথা বলছেন সেই চেতনা কোনো মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা নয়; তিনি যে চেতনার কথা বলছেন তা বিশুদ্ধ পূর্বঃতসিদ্ধ যা সবধরণের উপলব্ধির ভাবজ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে। আর এখানেই হুর্সালের সঙ্গে ব্রেনটানোর পার্থক্য। ব্রেনটানোর কাছে আভিমুখ্যতা হচ্ছে একটি মানসিক ক্রিয়া যা ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ এবং প্রকৃতিবাদের সাথে সম্পর্কিত প্রকৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্গত। এখানে ব্রেনটানীয় চেতনা ইচ্ছাপূর্বক হোক কি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হোক তা সদা-সর্বদা কোনো বিশেষ ঘটনার অভিমুখী হয়। আর হুর্সালের চেতনা স্বয়ং মনোবৈজ্ঞানিক হস্তক্ষেপ থেকে পুরোপুরি মুক্ত এবং পূর্বতঃসিদ্ধ হিসাবে তা স্বয়ং সারসত্তার দিকে ধাবিত হয়।[৭] তার মানে, হুর্সালীয় চেতনা কোনো ক্রমেই বিশেষ-কেন্দ্রিক নয়।

হুর্সাল দর্শনকে একটি সুকঠোর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, তাঁর দর্শন হবে সুকঠোর বিজ্ঞান (rigorous science)। আর তাই বিজ্ঞান হিসাবে তিনি তাঁর দর্শনে পদ্ধতির কথা বলেন, আর সুকঠোর হিসাবে তিনি মনে করেন যে, তিনি যে জ্ঞানের কথা বলছেন সেই জ্ঞান হবে বিশুদ্ধ জ্ঞান। যে জ্ঞানে থাকবে না গৌণতা, আপতিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা নামক কোনো অভিযোগ......। এই বিশুদ্ধতম এবং সুনিশ্চিত জ্ঞানের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে হুর্সাল অবভাসবিদ্যাক যে পদ্ধতির অবতারণা করতে চান তাতে হুর্সাল মনে করেন, তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতায় উপস্থাপিত হয় এরূপ দর্শন হিসাবে অবভাসবিদ্যা প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি অথবা দর্শনের ঐ সকল যেকোনো পদ্ধতি যা প্রাকৃতিক ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট, এগুলোর কোনোটির সাথে কোনোভাবেই তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতি সম্পর্কিত নয়। এক্ষেত্রে ডেকার্ট যেমন দার্শনিকীকরণের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, হুর্সালকেও সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়। অবশ্য হুর্সাল যে ধরণের দার্শনিক ফলাফল (অধিবিদ্যামুক্ত সুনিশ্চিত জ্ঞান) পেতে আগ্রহী তাতে ডেকার্টকে অতিক্রম করে একটি গুণগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। আর হুর্সাল মনে করেন, এরূপ একটি পদক্ষেপ সম্ভব, যদি একজন অবভাসবিদ কেবলমাত্র এমন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করেন, ...যা স্বয়ং তাঁর নিকট উপস্থিত করে, স্বয়ং তার প্রত্যক্ষণের পরিপূর্ণ আওতায় থেকে, এটা যেভাবে উপস্থিত হয় ঠিক সেভাবে। আর এরূপ করার ক্ষেত্রে তিনি তার প্রেসেনটেশনকে তথা উপস্থাপনাকে বাস্তব জিনিষ অথবা সেগুলো বাস্তব ঘটনা দ্বারা সংঘটিত অথবা সেগুলো স্নায়ুঘটিত কোনো মানসিক ঘটনা অথবা সেগুলো বাস্তব জগতের কোন অংশ অথবা বহির্জগতের বাইরে তাঁর ধারণাগত বিষয় অথবা তাঁর উপস্থাপিত প্রেসেনটেশনের বিপরীতে কিছু একটা উদয় হওয়া-এগুলোর কোনোটিকেই তিনি স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। প্রদত্ততার পক্ষপাতহীনতা (neutrality of givenness) যাতে সুনিশ্চিত হয়, সেজন্য একজন অবভাসবিদ শুরু করেন বাস্তব জগতের অস্তিত্ববিষয়ে তাঁর কাণ্ডজ্ঞানপ্রসূত বিশ্বাসকে মূলতবী রাখার মাধ্যমে। হুর্সাল বলেন, যখন আমি আমার কাণ্ডজ্ঞানপ্রসূত বিশ্বাস নির্ভর বাস্তবতাকে স্থগিত করি অথবা মূলতবী করি, তখন নিছক আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এমন কোনো থিসিস বা বিষয় না ব্যবহার করার, যা সাধারণত আমাদের সমগ্র জ্ঞানগত এবং কর্মউদ্দীপনামূলক জীবনকে পরিচালিত করে; কিন্তু তাই বলে এটাকে একটি বিশ্বাস নির্ভর আপ্তবাক্য হিসাবে বুঝলে হবে না। অধিকন্তু এটি আমাদের বাস্তবতাবিষয়ক

কাণ্ডজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট অবিবৃত, উচ্চারণগত দিক থেকে উহ্য একটি ভাবনা।[৮] হুর্সাল অবভাসবিদ্যক পদ্ধতিতে "অবভাসবিদ্যক স্থগিতকরণ" এবং "কেন্দ্রীকরণ"কে অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার করেন।

অবভাসবিদ্যক স্থগিতকরণকে (phenomenological suspension) হুর্সালীয় পরিভাষায় বলা হয় *ইপোকী* (epoche)। আর এটিকে সাধারণত ইংরেজী ভাষায় বলা হয় bracketing বা বন্ধনীকরণ। এ পদ্ধতিকে সদর্থক ও নঞর্থক দুইভাবে প্রকাশ করা যায়। সদর্থকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, *ইপোকী হচ্ছে* এমনই একটি বিষয় যা বাস্তবতা সম্পর্কে সাধারণ জীবনে অসচেতনভাবে সংঘটিত প্রত্যেকটি অবধারণকে চেতনার নিকট সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে। এখানে সর্বপ্রথম যেটি সামনে আসে তাহলো স্বয়ং প্রকৃতিগত মনোভাবের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে সচেতনতা। আর নঞর্থকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাপ্ত বাহ্যিক জগতের সুনিশ্চিত বাস্তবতার যে বৈধতা যা সাধারণ অভিজ্ঞতায় লাভ করা হয় তাকে অস্বীকার করা নয়। অধিকন্তু, একজন অবভাসবিদ সাধারণ জ্ঞানে প্রাপ্ত বাহ্যিক জগতের যে সুনিশ্চিত বাস্তবতা রয়েছে তার বিশুদ্ধতা এবং মূল্যাবধারণ করার জন্য অবভাসবিদ্যক সন্দেহকে (phenomenological doubt) সংস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, এই অবভাসবিদ্যক সন্দেহ কোনো ক্রমেই মনস্তাত্তিক সন্দেহ নয়। তারমানে, 'স্থগিতকরণ' মনোযোগের ধরণের স্থানান্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রাকৃতিক মনোভাবাপন্ন জগতের মতই সারসত্তাভিত্তিক প্রকারীয় জগৎ যে একই নিশ্চয়তার সাথে বিরাজমান তা এখন অবভাসবিদ্যক মনোভাবের সাহায্যে পর্যালোচনা করা যায়। আসলে প্রকৃত জগৎ, যা সর্বদা অস্তিত্বশীল, তাকে নিছক ইপোকী দ্বারা রহস্যজনকভাবে বিলুপ্ত করে ফেলা হয় না, তাকে নিছক বিশেষ মূর্ত পদ দ্বারা চিত্রায়িত করা হয় না, এতটুকুই বলা যায়। হুর্সালের ভাষায়,

> এই সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ যা সার্বক্ষণিকভাবে "আমাদের জন্য আছে", "আমাদের হাতের নাগালে উপস্থিত" এবং সার্বক্ষণিক তথায় অবশিষ্ট থাকবে, "তা একটি বাস্তব জগৎ"– যা সম্পর্কে আমরা সব সময় সজাগ, এমনকি এটাকে বন্ধনীর মধ্যে রাখার সময়ও। যদি আমি বন্ধনীভুক্ত করতে চাই, যা আমি করতে (বন্ধনীভুক্ত) পুরাপুরি সমর্থ, তখনও আমি এই জগৎকে একজন সোফিস্টের মত অস্বীকার করব না, আমি একজন সন্দেহবাদীর মত সন্দেহ করব না; কিন্তু আমি অবভাসবিদ্যক বন্ধনীকরণ প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করছি, যা পুরাপুরিভাবে আমাকে বাধা দেবে যে-কোনো ধরণের দেশ-কালে অবস্থিত কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কে অবধারণ করতে।[৯]

মূলত ইপোকী হচ্ছে এমনই একটি আবশ্যিক শর্ত যা অবভাসবিদ্যক অন্যান্য পদ্ধতির জন্য আবশ্যক। কারণ, এটি শুরুতেই এ নিশ্চয়তা দেয় যে, সাধারণ জ্ঞানের আওতায় অবভাসবিদ্যক সারসত্তায় উপনীত হতে যেয়ে কেউ যেন অধিবিদ্যাগত বিতর্কে জড়িয়ে না পড়েন। অর্থাৎ, উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ ঘড়ির পরিবর্তে ঘড়িত্বকে পেতে যেয়ে কেউ যেন উক্ত ঘড়িত্বকে প্লেটোর ধারণার জগতের ঘড়িত্বের সাথে একাকার করে না ফেলেন।

অবভাসবিদ্যক প্রক্রিয়ায় বা কার্যক্রমে পদ্ধতিগতভাবে ইপোকী কার্যকরী হওয়ার পরবর্তী যে পদক্ষেপটি অন্তর্ভূক্ত সেটি হচ্ছে রিডাকশান (reduction) তথা সীমিতকরণ বা কেন্দ্রীকরণ।[১০] এই কেন্দ্রীকরণে দুটি বিশেষ পর্যায় রয়েছে যা গুরুত্বের দিক থেকে সর্বোচ্চ। প্রথম পর্যায়টি সত্তাগত কেন্দ্রীকরণ (eidetic reduction), আর দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতাউর্দ্ধ কেন্দ্রীকরণ (transcendental reduction)। সত্তাগত কেন্দ্রীকরণ ফ্যাক্ট তথা বিশেষ বস্তুসত্তা থেকে সারসত্তাগততায়, আভিজ্ঞাতিকতা থেকে সারসত্তাভিত্তিক সার্বিকতায় পর্যবসিত হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। ইপোকী নঞর্থক কার্যক্রমের মাধ্যমে যে একটি আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণতা বিধান করে তাহলো, এটি (ইপোকী) আমাদের প্রস্তুত করে তোলে চেতনার পরিশুদ্ধ এলাকার মূল্যায়নের জন্য; অপরদিকে, সত্তাগত কেন্দ্রীকরণের রয়েছে আরো একটি সদর্থক ভূমিকা। ইপোকীর মাধ্যমে বিশেষের স্থগিতকরণের পর যেটি অবশিষ্ট থাকে সেই অবশিষ্টাংশের সাথে সত্তাগত কেন্দ্রীকরণ সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। সত্তাগত কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে এমনই একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একজন

অবভাসবিদ যা আপতিক এবং গৌণ সেগুলিকে পাশে সরিয়ে রেখে প্রদত্তের বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগী হতে পারে, যেগুলি স্বয়ং সার্বিক হিসাবে প্রতীয়মান হয়। যদিও হুর্সাল সার্বিক তথা এসেন্স বা সারসত্তা বলতে ঠিক কি বুঝাতে চাচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবুও এক্ষেত্রে ন্যাটানসন মনে করেন, ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যাপারটির ব্যাখ্যাদান সম্ভব হতে পারে। তিনি মনে করেন, ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি যতটুকু না বিশেষের সাথে সম্পর্কিত তার চেয়ে বেশী সারসত্তার সাথে সম্পর্কিত। টোকেন এবং টাইপের মধ্যে যে পার্থক্য এখানকার কেন্দ্রীয় অর্থ সেটাই অর্থাৎ বিশেষের মধ্য দিয়ে সার্বিককে দেখা। যতই সতর্কভাবে আঁকা হোক না কেন, ত্রিভূজত্বের ধারণা কখনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে না অংকিত যে ত্রিভূজটিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে তার সাথে। দৃঢ়ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আসলে একটি ত্রিভূজ আদৌও অঙ্কিত হয় না, যা অঙ্কিত হয় তা ত্রিভূজের প্রতিনিধি মাত্র। বিশেষ ত্রিভূজের নমুনা (টোকেন) দেখতে আমি ব্লাকবোর্ডে যে ত্রিভূজটি অঙ্কন করেছি, ইডেটিক প্রবণতায়, এই মূর্ত টোকেন তথা বিশেষ ত্রিভূজটির সীমাবদ্ধতাকে হ্রাসকরণ (রিডিউস) করে *এই* বিশেষ ত্রিভূজকে নয় বরং এই বিশেষ ত্রিভূজের মধ্য দিয়ে টাইপ তথা ধরণ বা সার্বিক ত্রিভূজকে *দেখছি*। হুর্সালের মতে, ত্রিভূজের সারসত্তা দেখা মানে নিছক একটি ইউক্লিডিয়ান ত্রিভূজের সংজ্ঞা জানাকে বুঝায় না, বরং সংজ্ঞা সারসত্তাকে প্রকাশ করে। অবশ্য, নিছক গণিতের সীমানার মধ্যে সারসত্তা যে সীমাবদ্ধ তা নয়। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগতের সাথেও এটি সংশ্লিষ্ট। আর তাই একটি শিশু যখন কুকুরের ধরণ (টাইপ) সম্পর্কে শেখে তখন সে যে-কোনো প্রকারের কুকুর হোক না কেন সেটি যে কুকুর তা নির্ধারণ করতে পারে। এমনকি কোনো বিড়াল তা যদি কুকুরসদৃশও দেখতে হয় তারপরও শিশুটি যে একটি কুকুর আর একটি বিড়ালের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে তাই নয় বরং দুটি যে ভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা-ও বুঝতে পারে। আবার কোন একটি বিশেষ ঘটনা যেমন বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি যদি অপমানিত হন তাহলে তাৎক্ষনিকভাবে ঐব্যক্তির মধ্যদিয়ে ঐশ্রেণীর সকল ব্যক্তি অপমানিত হয়েছে বলে বোধ হয়। এই যে বিশেষ ঘটনার মধ্যদিয়ে সার্বিক ঘটনাকে অবলোকন তা নিছক আরোহাত্মক কোনো প্রক্রিয়ার ফল নয়। কেননা, বিষয়টি মানসিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না হয়ে স্বজ্ঞাগতভাবে সম্পন্ন হয়। অপরদিকে বিশেষ বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়ার আরোহাত্মক যে প্রবণতা সেটি মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা দ্বারা পরিপুষ্ট। প্রথমটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাপূর্ব হওয়ায় তা অনপেক্ষ কিন্তু দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতা পরবর্তী হওয়ায় তা সাপেক্ষ এবং সিদ্ধান্তটি হয় অনিশ্চিত।

সত্তাগত কেন্দ্রীকরনের পর একজন অবভাসবিদ যখন transcendental reduction বা অভিজ্ঞতাউর্দ্ধ কেন্দ্রীকরণের পর্যায়ে উপনীত হন তখন তিনি ইপোকী এবং সত্তাগত কেন্দ্রীকরণের সম্পূর্ণ অর্থটিকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এবং চেতনার আভিমুখ্যতাবাদের হুর্সালীয় পদ্ধতির যে প্রয়োগ তার যৌক্তিকতাও এ পর্যায়ে এসে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অবশ্য একই সময়ে এটিও উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, অভিজ্ঞতাউর্দ্ধ কেন্দ্রীকরণের অর্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা খুবই জটিল কারণ এটি দেখায় যে, একজন অবভাসবিজ্ঞানীর জাগতিক পর্যায় পদ্ধতিগতভাবে অতিক্রম করতে হয়। সত্তাগত কেন্দ্রীকরণের পর্যায়ে একজন অবভাসবিদের সত্তা তথা চেতনা থাকে সম্পূর্ণ জাগতিক পর্যায়ে অর্থাৎ চেতনা স্থূলরূপে বিরাজ করে। স্থুল বস্তুজগতের নানান বিষয় অবলম্বন করে চেতনা আত্মপ্রকাশ করে। রিডাকশনের এই স্তরের উদ্দেশ্য হলো চেতনাকে তার এই স্থুল তথ্যগত মূর্তরূপ থেকে আলাদা করে নেওয়া। এর ফলে স্থুল বস্তুজগতের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য চেতনার মধ্যে যে বহুত্ব ও আপেক্ষিকতা দেখা যায় তা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং একদিকে বস্তুজগৎকে যেমন আমি একদিকে সরিয়ে রেখেছি, তেমনি করে আমার জাগতিক আমিকেও সরিয়ে রেখেছি। তবু যে সম্পূর্ণ আমিবোধ বিলুপ্ত হলো তা নয়। থাকলো অন্তর্নিহিত আমির স্বরূপ বা লোকোত্তোর আমি। একদিক থেকে পাই জ্ঞাতার ঐক্যরূপ অন্য দিক থেকে পাই বস্তুজগতের ঐক্যরূপ। এখানে উল্লেখ্য যে, আভিমুখ্যতামূলক কার্যের কাঠামোর মধ্যে হুর্সাল জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র মাত্রার যে সম্পর্ক স্বীকার করেছেন তাতে দেখা যায় যে, জ্ঞান দ্বিপর্যায়ী হলেও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র প্রকৃতি ভিন্ন না হয়ে তা বরং অভিন্ন এবং

পরস্পরসাপেক্ষ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যা রয়েছে তাহলো মূলত প্রান্তবর্তিতায়। অর্থাৎ একদিকে থাকে বস্তুসমূহের শুদ্ধ রূপ আর অন্যদিকে থাকে শুদ্ধ অভিজ্ঞতা। প্রথমটিকে হুর্সাল বলেন অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ (noematic side of experience) আর দ্বিতীয়টিকে বলেন, অভিজ্ঞতার অর্থনির্ধারণকারী ক্রিয়া (noetic side of experience)। আর এই কারণে প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বুঝাতে 'সাবজেক্ট'-'অবজেক্ট' এই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, সেখানে ইপোকী এবং রিডাকশানের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে সেগুলোকে আর পূর্বের পরিভাষায় ব্যবহার না করে হুর্সাল 'নোয়েমা' (noema) এবং 'নোয়েসিস' (noesis) পরিভাষায় ব্যবহার করেছেন। কেননা, এপর্যায়ে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র পূর্বের চরিত্র আর বজায় থাকেনা। জ্ঞেয় তথা অবজেক্ট যা ইতিপূর্বে বিশেষ বস্তু ছিল বর্তমানে তা হয়ে গেছে সারসত্তা আর জ্ঞাতা তথা সাবজেক্টও হয়ে গেছে সম্পর্ণ অভিজ্ঞতাপূর্ব লোকোত্তর আমি যা পূর্বে ছিল নানান স্থূল অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ বিশেষ আমি। আর এভাবে যে জ্ঞান সম্পাদিত হয় হুর্সাল মনে করেন তা সুনিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী।

কান্টের (Immanuel Kant, 1724-1804, Königsberg, Germany) জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে বলে নেয়া প্রয়োজন যে, কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। বলা যেতে পারে, *এ ক্রিটিক অভ পিওর রিজন*-এর পুরাটাই তিনি এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছেন। জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করতে যেয়ে তিনি বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সীমাবদ্ধতা, সাংবেদনিক আকার তথা দেশ-কাল ও তাদের প্রকৃতি, বৌদ্ধিক প্রকার, তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের সাংশ্লেষণিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা, প্রকারের প্রামাণ্য, বৌদ্ধিক প্রকারগুলির সাকারায়ণ, স্বগতসত্তাক বস্তুর উপযোগিতা আছে কি নেই কিংবা তাদের কোনো অর্থ আছে কিনা, পরিশেষে সেগুলির মাধ্যমে আধিবিদ্যক জ্ঞানের সম্ভাব্যতা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। সেসব বিস্তারিত উল্লেখের এখানে কোনো সুযোগ নেই। এখানে কেবলমাত্র হুর্সালীয় জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনার প্রেক্ষিতে যতটুকু প্রয়োজন তাও অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করে হুর্সালের নির্দেশিত পন্থায় তা পর্যালোনা করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত মৌলিক শর্ত আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে তারই অনুসন্ধান করেছেন কান্ট (অবশ্য কান্টের ন্যায় হুর্সালও একই কাজ করেছেন)। আর এই কাজ করতে যেয়ে কান্ট তাঁর ইতঃপূর্বেকার জ্ঞানতাত্ত্বিক দুটি মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদকে পর্যালোচনা করে এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ মতবাদ দুটি একদেশদর্শী ও নির্বিচারী। একটি মতবাদে (বুদ্ধিবাদ) জ্ঞানের নিশ্চয়তা থাকলেও নতুন জ্ঞানের বিস্তার ঘটে না; অপর মতবাদে (অভিজ্ঞতাবাদ) নতুন জ্ঞানের বিস্তার ঘটলেও যে জ্ঞান পাওয়া যায় সেই জ্ঞানকে সার্বিক ও অবশ্যম্ভব বলা যায় না। কান্ট এক্ষেত্রে জ্ঞান-বিস্তারের বেকনিয়ান ভাবধারার সাথে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কার্টিসীয় ভাবধারাকে সমন্বয় করার প্রয়াস পান।[১১] তার মানে, কান্ট মনে করেন জ্ঞান দ্বিপর্যায়ী। আর তাই বাইরের বিষয়কে (object) যেমন বাদ দেওয়া সম্ভব নয় তেমনি বিষয়ীকে (subject) নিছক নিষ্ক্রিয় রেখে বাইরের উদ্দীপকের সাহায্যে জ্ঞানক্রিয়ার অভিজ্ঞতাবাদী যে ব্যাখ্যা তা মেনে নেওয়াও সম্ভব নয়। কেননা, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের কেবল বাইরের থেকে কিছু পাওয়া নয় (অভিজ্ঞতাবাদী মত), ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদানের উপর বুদ্ধির নিজের থেকেও কিছু দেওয়ার আছে (বুদ্ধিবাদী মত)। বাহির থেকে একান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে ইন্দ্রিয় যেটি গ্রহণ করে তাহলো জ্ঞানের উপাদান; আর এই উপাদানের উপর বুদ্ধি যা দেয় তাহলো জ্ঞানের আকার। এখন অনুভবলব্ধ পদার্থ বৌদ্ধিক প্রকারে (দ্রব্য, গুণ, কারণ, এক, বহু- এসব প্রকার) প্রকারিত হলে তবেই জ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে। যদি বৌদ্ধিক প্রকারে প্রকারিত না হয় তাহলে অনুভূত পদার্থ অনেকটা অনির্বাচ্য ও অনির্দেশ্য থেকে যায়। যেমন: 'এ পৃষ্ঠাটি সাদা'- এ বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয়েছে তা কেবলই অনুভব দিয়ে পাওয়া যায় না। সাদা পৃষ্ঠাটির দিকে তাকালে কেবল চোখ দিয়ে অর্থাৎ কেবল অনুভব দিয়ে কিছু একটা যে পাওয়া যায় তা ঠিক। আর যা পাওয়া যায় তাহলো কোনো রঙিন ছোপ এবং কোনো বিশেষ জিনিস। কিন্তু কেবল চোখ দিয়ে জানা যায় না যে, 'এটি একটি পৃষ্ঠা', 'পৃষ্ঠাটি সাদা'। কেননা পৃষ্ঠা, সাদা– এসব সামান্য ধারণা। আর কেবল ইন্দ্রিয়ের

সাহায্যে সামান্যের জ্ঞান হতে পারে না। সামান্যের জ্ঞান হতে গেলে বুদ্ধির প্রয়োজন। বুদ্ধি অনুভবলব্ধ আভাসগুলির উপর প্রযুক্ত হয়ে সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করে, বুদ্ধির ক্রিয়া ছাড়া যেহেতু অনুভব সুসংবদ্ধ হয় না ফলে তা জ্ঞানেও পরিণত হতে পারে না। কিন্তু উপাদান এবং আকারের সমন্বয়ে এই যে জ্ঞানের সৃষ্টি হয় তাহলো অবভাস। যদিও, কান্টের মতে, অবভাস বলতে অলীক পদার্থ বোঝায় না কিন্তু এ অবভাসের পারমার্থিক সত্তা নেই। কেননা, দেশ-কাল ও বুদ্ধির প্রকারসমূহ প্রাকৃত জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত, এসব বস্তুর পারমার্থিক তথা স্বগত ধর্ম নয়। স্বয়ংসৎ বস্তু, নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু, দেশকালে অবস্থান করে কিনা, এদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কিনা, তা জানা যায় না; জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এখানে কান্ট স্পষ্টতই জ্ঞানের বিষয়কে দুইভাগে বিভক্ত করে একটিকে (অবভাস) জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করে অন্যটিকে (স্বয়ংসৎ বস্তু) অজ্ঞেয় এবং অজ্ঞাত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেই সাথে তিনি এও বলেন যে, এই যে অবভাসিক বস্তুজগৎ, যাকে আমরা দেশ-কালের মধ্যে স্থাপন করে বুদ্ধির প্রকারে সংশ্লেষিত বা একত্রিত করে যেভাবে অনুভব করি তা আমাদের বর্তমান মনের গঠনেরই অনুরূপ। আমাদের মনের গঠন যদি অন্যরূপ হতো তাহলে এখন যেরূপ জ্ঞান হয় তখন সেরূপ জ্ঞান হতো না। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কান্ট জ্ঞানের প্রশ্নে বুদ্ধির যে সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলেছেন তা মূলত বিষয়ীর সক্রিয় অংশগ্রহণকেই নির্দেশ করে। যার প্রভাব হুর্সালের মধ্যে পাওয়া যায় বিশেষভাবে।[১২]

কান্ট এবং হুর্সাল উভয়ের মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, (দু'জনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল যেমন রয়েছে তেমনি পার্থক্যও রয়েছে বিস্তর।) প্রথমত, হুর্সালও কান্টের ন্যায় স্বীকার করেন যে, জ্ঞান দ্বিপর্যায়ী এবং পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু কান্ট মনে করেন, বাইরের বিশেষ উপাদানের উপর বৌদ্ধিক প্রকারগুলি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে জ্ঞান সুসংবদ্ধ হয়; আর হুর্সাল মনে করেন, একদিকে বিশেষ বস্তুর সার্বিক রূপটি চেতনার কাছে প্রদত্ত হয় আর চেতনা তার উপর প্রয়োগ করে অর্থ; ফলে জ্ঞান সম্ভব হয়। এখানে কান্ট ইন্দ্রিয়ের কাছে বিশেষ বস্তুর উদ্দীপনার উপস্থিতির কথা বললেও হুর্সাল বিশেষ বস্তুর সারার্থকে ইন্দ্রিয়ের নিকট নয়; বরং চেতনার নিকট প্রদত্তের কথা বলছেন। অর্থাৎ কান্ট বিশেষের উপর গুরুত্বারোপ করছেন যা প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই নামান্তর।[১৩] অপরদিকে হুর্সাল সারার্থের দিকে গুরুত্ব দিলেও প্লেটোর সারার্থ যেভাবে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূরক হুর্সালের সারার্থকে 'অর্থের' তথা জাত্যর্থ্যের (connotation) সঙ্গে সম্পর্কিত করায় তা অধিবিদ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত। কান্টের বুদ্ধির প্রকারগুলি পূর্বতসিদ্ধ বলে সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়োপাত্ত ইন্দ্রিয়ের উপর উদ্দীপনা সৃষ্টি করলে নিজস্ব নির্দিষ্ট নিয়মে সেগুলিকে বিন্যস্ত করাই হলো বিষয়ীর কাজ। কিন্তু হুর্সালের বিষয়ীগততা (subjectivity) ঠিক তা নয়। হুর্সালের বিষয়ীগততার মধ্যে ক্রমবিকাশ আছে, কান্টের মত তা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কালাতীত নয়; বস্তুতার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা যেন সমান্তরালভাবে তার পরিবর্তন হতে থাকে। হুর্সাল মনে করেন, জ্ঞাতা (subject) শুধুমাত্র জ্ঞাতা বলেই বস্তুতার ভিত্তি হতে পারে না। আর এই কারণেই হুর্সাল কান্টের অতিবর্তী ভাববাদকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। আবার, একই সঙ্গে কান্ট তাঁর বিষয়ীকে 'ট্রানসেনডেনটাল সাবজেক্ট' বা 'তুরীয় আত্মা' বলে আখ্যায়িত করলেও তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সদাপ্রস্তুত (ready made) সত্তার ন্যায় বিবেচনা করায় বস্তুতার নিজস্ব কোনো স্বাধীন সত্তা আর বজায় থাকেনি; সেটি কান্ট নিজেও বুঝেছিলেন; আর বুঝেছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন যে, বোধই প্রকৃতি গঠন করে। হুর্সাল মনে করেন, কান্টের এ ধরণের চিন্তা মূলত মানব প্রকৃতির সার্বিক গঠনেরই ইঙ্গিতবহ এবং একই সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে কান্টের উক্ত মতকে হুর্সাল নৃবৈজ্ঞানিকতাবাদ এবং প্রকৃতিবাদী ভাবাদর্শ বলে সমালোচনা করেছেন।[১৪] দ্বিতীয়ত কান্ট তার subject কে transcendental subject এ রূপান্তর করলেও পাশ্চাত্য ধারার ন্যায় জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র প্রকৃতিগত পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন; কিন্তু হুর্সাল জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র প্রকৃতিগত পার্থক্যকে স্বীকার করে নেননি। তিনি মনে করেন, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে না। এজন্য তিনি জ্ঞান-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্যে যে পদ্ধতির কথা বলেছেন সেখানে উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র

পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের ধারার বিপরীতে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সূচনা করে দেখান যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র প্রকৃতি অভিন্ন। জ্ঞেয়-বস্তুকে তিনি ভাবজ বলে আখ্যায়িত করায় তা অনেকটাই যেন জ্ঞাতার প্রকৃতির সাথে সমধর্মী হয়ে যায়।[১৫]

তৃতীয়ত, কান্ট সত্তাকে স্বগতসত্তাএবং অবভাসিক সত্তায় বিভক্ত করে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য তৈরী করে একদিকে দ্বৈতবাদের পথ খুলে দিয়েছেন; অপরদিকে একটিকে জ্ঞেয় এবং অপরটিকে অজ্ঞেয় বলে অভিমত ব্যক্ত করে স্ববিরোধিতার সৃষ্টি করেছেন। তিনি মনে করেন যে, অবভাসিক জগৎ স্বরূপত জগতের ফলস্বরূপ। তারমানে, স্বরূপত জগতের ফলেই অবভাসিক জগতের জ্ঞান সম্ভব হয়। অর্থাৎ তিনি স্বরূপত জগতের উপর কার্য-কারণ প্রয়োগ করে অবভাসিক জগতে উপনীত হচ্ছেন। কিন্তু স্বরূপত জগৎ যা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় তার উপর তিনি বুদ্ধির আকার-প্রকার যথা 'কার্য-কারণ'-কে কীভাবে প্রয়োগ করলেন তার কোনো সদুত্তর দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। যার কারণে তাঁর মতবাদে স্ববিরোধিতার আভাস পাওয়া যায়। কেননা, তিনি প্রথমেই বলে নিয়েছেন যে, বুদ্ধির প্রকারগুলি কেবলমাত্র অবভাসিক তথা লৌকিক জগতের উপরই প্রয়োগ করা যায়, স্বরূপত তথা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের উপর প্রয়োগ করা যায় না। হুর্সালও তাঁর মতবাদে ফেনোমেনা তথা অবভাস নামক শব্দটি প্রয়োগ করলেও তা কান্টের মতের ন্যায় নয়। হুর্সালের ফেনোমেনার অন্তরালে নুমেনা নামক অজ্ঞাত কোনো সত্তা নেই। তিনি তাঁর দর্শনে দ্বৈতবাদেরও কোনো জায়গা রাখেননি। পরিভাষাগত দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয়, অবভাসিক সত্তাকে বুঝানোর জন্য কান্ট যে ফেনোমেনার কথা বলেছেন হুসার্লের ফেনোমেনার সাথেও তার কোন মিল নেই। কান্ট ফেনোমেনা বলতে স্বগতসত্তার (noumena) বাহ্যরূপকে বোঝেন যার ব্যবহারিক দিক থেকে বাস্তবতা থাকলেও জ্ঞানের বাইরে এসব ফেনোমেনা তথা অবভাসের কোনো মূল্য নেই। অপরপক্ষে হুর্সাল ফেনোমেনা বলতে স্বয়ং সারসত্তাকে তথা ভাবজ সত্তাকে বুঝিয়েছেন যা সব রকমের পরিবর্তনশীলতা ও আপেক্ষিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।

চতুর্থত, হুর্সাল এবং কান্টের দর্শনে জ্ঞান ক্রিয়ার কর্তার অবস্থানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে শুধু তাই নয়, জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা তথা বিষয়ীকে অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবেও দেখানো হয়েছে। আর এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, বলা যেতে পারে এ দুই দর্শনের উৎপত্তিই হয়েছে মূলত জ্ঞাতাকে বাদ দেওয়া তথা জ্ঞাতাকে নিষ্ক্রিয় রাখার যে প্রবণতা বিভিন্ন দর্শনে ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। তবে কান্ট জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা তথা অহংকে মেনে নিয়ে বলেছেন যে, যে বুদ্ধি বা অহং-এর একীকরণ ক্রিয়ার ফলে কোনো কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে সেই অহং লৌকিক অহং (empirical ego) নয়, তাহলো অলৌকিক, অতিবর্তী অহং (transcendental ego)। লৌকিক অহং-কে জানা যায় কিন্তু অলৌকিক অহং-কে জানা যায় না। কেননা, বিষয়ী-অহং কখনও জ্ঞাতা-অহং হতে পারে না। স্পষ্টতই কান্ট দুই প্রকার আত্মা তথা অহং-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। যে কারণে কান্টের দর্শন অতিবর্তীভাববাদে রূপ নিয়েছে। আর হুর্সাল জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে লজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন্স-এ বার বার চেতনার কথা বলেছেন। কিন্তু কার চেতনা। সেই চেতনা আমার, তোমার না মনের চেতনা এমন কোনো ইঙ্গিতই তিনি দেননি। কেননা, এ পর্যায়ে তিনি অধিবিদ্যক সকল বিতর্কিত বিষয় থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেছে যে, হুর্সাল যেকোনো বিষয়ের অতিগভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমদিকে তিনি বার বার চেতনার কথা বললেও তিনি *আইডিয়াজ*-এ যেয়ে বিশুদ্ধ অহং-এর ধারণায় উপনীত হয়েছেন যেখান থেকে সকল আভিমূখ্য ক্রিয়া বিকিরিত হয়।[১৬] অর্থাৎ হুর্সালও শেষ পর্যন্ত অতিবর্তী অহং-এ উপনীত হয়েছেন। ফলে তার মতবাদও একধরণের অতিবর্তী ভাববাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য হুর্সাল বিশুদ্ধ অহং-এর কথা বললেও বিশুদ্ধ অহং অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় এমন কথা বলেছেন বলে মনে হয় না। ফলে তার মতবাদে দ্বৈতবাদ কোনো স্থান করে নিতে পারেনি। তবে উভয়ের মধ্যে বড় পার্থক্য হলো, কান্টের ইগো তথা অহং

একটি বিশুদ্ধ আকারগত অবধারনিক ঐক্য যা চেতনার ঐক্যের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে আমাদের সকল অবধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। আর হুর্সালের অহং প্রকৃতিগত দিক থেকে সারসত্তাভিত্তিক কেননা এটি আভিমূখ্য ক্রিয়ার উৎস হিসাবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কান্ট এবং হুর্সাল উভয়েই জ্ঞানতত্ত্বের প্রশ্নে তাদের নিজ নিজ সময়ের প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদসমূহের গভীর ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছেন। কান্ট বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে এবং উভয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের নির্বিচারবাদী আখ্যা দিয়ে জ্ঞান হবার জন্যে যে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়েরই সমন্বয় প্রয়োজন তা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। অপরদিকে হুর্সালও ইতিপূর্বেকার সকল মতবাদকে প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বলে আখ্যা দিয়ে অপ্রকৃতিবাদী স্বজ্ঞাভিত্তিক সম্পূর্ণ নতুন এক জ্ঞানতত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন। উভয় দার্শনিকেরই দর্শনগত উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হলো এই যে তাঁরা উভয়ই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন যে, জ্ঞান দ্বিপর্যায়ী হলেও অহং-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া জ্ঞানক্রিয়া সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই এ কথা বলতে হয় যে, হুর্সালের জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় কান্ট-এর জ্ঞানতত্ত্ব চলে আসে যেন অনেকটা প্রাসঙ্গিক হয়েই।

তথ্যনির্দেশ

১. Dreyfus & Wrathall, *A Companion to Phenomenology and Existentialism,* Blackwell Publishing, 2006, p.51.

২. Debabrata Sinha, *Phenomenology and Existentialism An Introduction,* Calcutta Progressive Publishers, 1974, p.14.

৩. এ পর্যায়ে ডেকার্টকে স্মরণ করা যেতে পারে। ডেকার্ট ইতঃপূর্বেকার সকল মতবাদকে সন্দেহপূর্বক বর্জন করেছিলেন। তবে হুর্সাল ডেকার্টের মত কোনো পর্যায়েই সংশয়বাদী মতকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেননি।

৪. Maurice Natanson, *Essays in Phenomenology,* Martinus Nijhoff / The Hague/1966, p.12.

৫. অবশ্য প্লেটোর সারসত্তা এবং হুর্সালের সারসত্তার মধ্যে রয়েছে যোজন যোজন পার্থক্য। প্রথমটি অধিবিদ্যক অর্থ বহন করে এবং তার অবস্থান প্লেটো কথিত অলীক ধারণার জগতে আর দ্বিতীয়টি জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থ বহন করে এবং সেটি সংখ্যার ন্যায় বৌদ্ধিক হিসাবে সাবসিস্ট করে।

৬. ডেকার্ট যেখানে শূন্য চেতনার কথা বলেছিলেন, হুর্সাল সেখানে বলেন যে, চেতনা আছে কিন্তু সেই চেতনা কোনো কিছুর চেতনা নয় এমন হতে পারে না। চেতনা আছে কিন্তু তা কোনো কিছুর চেতনা নয়- এমন ধারণা স্ববিরোধী। ডেকার্ট যদি আমি চেতনার গভীরে যেতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, সেই চেতনা নিশ্চয়ই কোনো কিছুর চেতনা। আর এর ফলও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ডেকার্ট শূন্য চেতনা থেকে সরাসরি জগতে আসতে না পেরে ঈশ্বরের সাহায্যে তাকে জগতে আসতে হয়েছিল। যা হুর্সালের জন্য আদৌও প্রয়োজন হয়নি।

৭. Natanson, *Ibid,* p. 19.

৮. *Ibid,* p.9.

৯. Natanson, *Ibid,* p. 10-11.

---

[১০]. 'রিডাকশান' শব্দটির বাংলা অনুবাদ আবার কেউ কেউ 'বিশুদ্ধকরণ' বলতে চেয়েছেন। মনে হয় বিশুদ্ধকরণ শব্দটি বেশী যৌক্তিক। কেননা, নির্যাসরূপ যে সারসত্তা পাওয়া যায় সেটিতো আসলে বিশুদ্ধই হবে। দেখুন, স্বপ্না সরকার, *অস্তিত্ববাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান*, প্রগ্রেসিভ পাভ্লিসার্স, কলিকাতা, ২০১৬, পৃ.২৯৮।

[১১]. Richard Falckenberg, *History of Modern Philosophy,* Progressive Publishers, Calcutta, 1953, p.333.

[১২]. Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason,* Translated and Edited by Paul Guyer, Cambridge University Press, 1998, pp. 201-66; রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী, *পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা*, পশ্চিমবঙ্গ নাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯২, পৃ.২৫৪-৫৫।

[১৩]. প্রয়োগবাদীগণও কান্টের এ দিকটির সমালোচনা করে বলেছেন যে, কান্ট বাইরের জগতের যে বিশেষ বস্তুর কথা বলছেন তা অসংলগ্ন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তার চিন্তার সাথে মনোবৈজ্ঞানিক পরমাণুবাদীদের চিন্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। তাঁরা এই বলে কান্টকে সমালোচনা করেন যে, মনের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে যে সংবেদনগুলি (শক্ত, চতুষ্কোণ, শীতল, বাদামী ইত্যাদি) থাকে সেগুলিকে একত্রিত করে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সামগ্রিক ঐক্যে রূপ দেওয়ার যে ক্ষমতা বা ধৃষ্টতা মনকে কান্ট দিয়েছেন তার অধিকার কান্টকে কে দিয়েছে? সংবেদনগুলির বুদ্ধির বিভিন্ন ক্যাটেগরির অনুরূপ হওয়া উচিত কেন? অর্থাৎ বুদ্ধি যেমনভাবে চাইবে সংবেদনগুলি সেভাবে সজ্জিত হবে কেন? প্রত্যেকটি সংবেদন তো ভিন্ন ভিন্ন ও পৃথক। ওরা একটি টেবিলের রূপ নেবে কেন? অন্যকিছুরও তো রূপ নিতে পারে? বাস্তবতার সম্পূর্ণ মিথ্যাকরণ সত্ত্বেও কেন গাঠনিক প্রক্রিয়া (সংবেদনগুলি) কোন একটা কিছুতে (টেবিলে) পরিণত হবে? দেখুন, C. E. M. Joad, *Introduction to Modern Philosophy,* Oxford At the Clarendon Press, 1964, p.69.

[১৪]. Edmund Husserl, *Ideas, General Introduction to Pure Phenomenology,* Trans. by W.R. Boyce Gibson, London: George Allen & Unwin Ltd.1969, p.183; Debabrata Sinha, *ibid,* p.20.

[১৫]. *Ibid,*p. 182; অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিংশশতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,কলিকাতা, ১৯৮৪; পৃ.২৩১।

[১৬]. Natanson, *Ibid,* p. 18.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় রেনেসাঁসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান

ড. মোছা. ফেরদৌসী বেগম*

Abstract : The European Renaissance started in Italy in the 14th Century and spread all over Europe into three centuries (14th to 16th). Renaissance was a humanist movement. It declared for the first time man's sovereignty from the Church. This freedom led to the society an wonderful display of geniuses in art, literature, politics, science and in other filds. The then Bengal society was polluted with religious superstitions, social injustices and vices such as idol-worships, early marriages, sati-rite and poligamy. In the 19th century, Bengal came into contact with English education and was thereby initiated to the western concept of humanism, individualism, democracy and nationality. Having influenced by western concepts, Bengal was illuminated and enlightened. Many intellectuals of Bengal reformed their own society, religion and politics in the light of European renaissance. The social reform which was initiated by Rammohun Roy was successfully carried out by Derozio and his young disciples, Keshub Chandra Sen, Iswarchandra Vidyasagar and others. Bengal not only led the talented people to bring about social changes, but it also led them to create new literature and to extended culture. In Bengali literature Michael Madhusudan Datta (1824-1873) was a wonderful genius. He was the precursor of modern Bengali drama and poetry. He infused spirit and force in Bengali language and humanised the thinking of Bengal. So the heroic ventures of Madhusudan have been written in golden letters in the annals of the renaissance of Bengal in the nineteenth century..

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি পরিচিত নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। এই স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি খুব অল্পকালই বাংলা সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত ছিলেন, তথাপি তাঁর সৃষ্টিসম্ভার সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কবি-সাহিত্যিক, লেখকদের নতুন ভাবনা ও ভাষার দিক নির্দেশনা দিয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালির চিত্তে যে রেনেসাঁসের সৃষ্টি হয় তার আলোকিত অধিবাসের পূর্ণ স্বাদ গ্রহন করেছিলেন মাইকেল। আর তাই তাঁর কাব্য, কবিতা, নাটক ও প্রহসন আলোচনায় রেনেসাঁসের ভূমিকা অনিবার্য ও অপরিহার্য।

রেনেসাঁস (Renaissance) ফরাসি শব্দ যার অর্থ নবজাগরণ। ইতালির রেনেসাঁসের লেখক জর্জিও ভাসারি (১৫১১-১৫৭৪) প্রথম নবজাগরণ বা নবজন্ম অর্থে রেনেসাঁস শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[১] সাধারণত রেনেসাঁস বলতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি সম্পর্কে জানবার এক অদম্য উৎসাহ বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে রেনেসাঁস বলতে বোঝায় ব্যক্তিত্বের মুক্তি তথা মনের স্বাধীন, অনুসন্ধিৎসু ও বলিষ্ঠ চেতনাকে। প্রাচীনকালে যেভাবে মানুষের উপর গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি ও দর্শন চর্চা শুরু হয়েছিল তা মধ্যযুগের চিন্তাবিদদের কর্মকান্ডে লোপ পায়। মধ্যযুগের আদর্শ ছিল আত্মার উন্নতির জন্য এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সুখের জন্য ইহজাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেওয়া এবং চার্চের কর্তৃত্বকে বিনা বিচারে মেনে নেওয়া। চৌদ্দ শতকে ইতালিতে রেনেসাঁসের সূচনা হয়, ক্রমে তা সমগ্র ইউরোপে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করে। রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, শিল্পে,

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্যে নতুন পথের সন্ধান পায়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত হয় ইউরোপের কাছে, নবজাগরণ ঘটে তার। তাই একে রেনেসাঁস বলা হয়। রেনেসাঁস সম্পর্কে বলা যায়:

> Renaissance is the revival of art and literature and learning in Western Europe in the 14^{th} and 15^{th} centuries which accompanied the rediscovery of the thought and work of the ancients, e.g. the works of Plato and Aristotle. Typically this has been seen not only as the rediscovery of thought and work of the ancients but as a rebirth of the human spirit, the birth of modern humanism.[2]

> Some have characterized the Renaissance as a transition period between the medieval and the modern ages in which 'old and new, religious and profance, authoritarian and individualistic principles and concepts existed side by side while at the same time certain marked transformation, and changes in ideas and ways of living took place' in different countries of Europe.[3]

ইতালিতে যখন সামন্ততান্ত্রিক গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের পরিবর্তে বানিজ্যভিত্তিক শহরকেন্দ্রিক সমাজ কাঠামো গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল, ঠিক সেই সময়ে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বুরখার্ডের মতে,

> এই আন্দোলনের মুলশক্তি ছিল শহরের বুদ্ধিজীবি, কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রমুখ। তাঁদের জ্ঞানলব্ধ চিন্তা, ভৌগলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানবতাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ নতুন সাহিত্য ও শিল্প এই আন্দোলনের প্রধান সম্পদ। এরই মধ্যে নিহিত ছিল আধুনিকতার ও মানব-নির্ভর নতুন সভ্যতার সুনিশ্চিত ইঙ্গিত।[৪]

মধ্যযুগের শিক্ষা ছিল ধর্মনির্ভর– অর্থাৎ জ্ঞান বা শিক্ষা বলতে ধর্মবিষয়ক জ্ঞানই বুঝাত। রেনেসাঁস ক্যাথলিক চার্চের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এ যুগের প্রভাবশালী চিন্তাবিদরা বিশ্বাসের পরিবর্তে প্রজ্ঞার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সময়ে একটা উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দেয় যা মানুষের স্বাধীন কর্মক্ষমতা ও মর্যাদাকে স্বীকার করে নেয়। ফলে ব্যক্তি মানুষ মধ্যযুগীয় গতানুগতিকতার সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হয়; তাদের মনে জাগে এক নতুন ধর্মনিরপেক্ষ জীবন ও সমাজের আশা। পারলৌকিক আশা-আকাঙ্খার স্থান দখল করে নেয় মানুষের ইহজাগতিক সমস্যা যেমন আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি।

প্রথমে শুধু স্বল্প সংখ্যক, যেমন পেত্রার্কের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপের সংস্কৃতিবান সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে প্রসার লাভ করে। রেবেলেইস ও ইরাসমাসের মতো রেনেসাঁস লেখকরা এই নতুন আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালীকে জোরালো কণ্ঠে সমর্থন করেছেন এবং অস্তিত্বের উচ্ছ্বাসকে অভিব্যক্তি দান করেছেন। রেনেসাঁস যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো এবং নিশিয়ানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা তাঁদের চিত্রকর্মে জাগতিক রূপ-সৌন্দর্য তথা রেনেসাঁস জীবন সম্ভোগের বিচিত্র পর্যায় ফুটে তুলেছেন। এ যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও রাজনীতিজ্ঞ ম্যাকিয়াভেলি তাঁর রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা রেনেসাঁসকে এগিয়ে নিয়ে যান। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "লিওনার্দো, মাইকেল এঞ্জেলো এবং মেকিয়াভেলির মতো বিখ্যাত ব্যক্তি রেনেসাঁসের সৃষ্টি।"[৫] সতেরো শতকে কেপলার ও গ্যালিলিওর কর্মে কোপারনিকাসের মতবাদের উন্নত ব্যাখ্যা প্রকাশ পেলে মানবতাবাদী চিন্তা আরো গতিবেগ লাভ করে। রেনেসাঁসের দার্শনিক পেট্রো পম্পোনাজী আত্মার অমরতা ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। মানুষের যা কিছু নীতিবোধ তাকে জীবন থেকেই আহরণ করতে হবে জীবনেরই প্রয়োজনে, জীবনাতিরিক্ত দায় তার নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। রেনেসাঁস মানবতাবাদীরা ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে জ্ঞানকে মুক্ত করার পক্ষপাতি ছিলেন। তাই তারা জীবনবিরোধী ধর্মীয় চিন্তার বিকাশ খুঁজেছিলেন এ জগতে ব্যক্তির সম্ভোগের ও সম্ভাবনার প্রসারমান ক্ষেত্রে।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এই রেনেসাঁসী চেতনা বা জাগৃতি ইউরোপের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনকেও নতুনভাবে গড়ে তুলবার শক্তি দিয়েছিল। তারা যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, দিব্য চেতনাই যথেষ্ট নয়, অন্তত মানবিক চেতনার কাছে। তারা অনুভব করেছিলেন যে, বস্তুজ্ঞান না হলে ধর্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তারা পরিপূর্ণ সমর্পনের বদলে সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে চাইলেন। তারা সমষ্টির চাপে নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে চান নি। কেবল সাহিত্য, শিল্প বা নৈতিক ক্ষেত্রেই নয় জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল।"এর সাথে যুক্ত ছিল স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত মন, যুক্তিবাদ, বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানার্জনের চেতনা।"[৬] মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এই নব-চেতনা বা জাগৃতি এক অবিস্মরণীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বাংলার নবজাগরণ বা বঙ্গীয় রেনেসাঁস

উনিশ শতকের সূচনায় বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তখন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষ সমাজে অন্ধভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক প্রথা মেনে চলত। হিন্দুরা দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত, বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করত, কন্যা সন্তানকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিত, কঠোরভাবে জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথা মানত, কুলীন প্রথায় একাধিক– কোন কোন সময় শতাধিক ব্রাহ্মণ কন্যাকে মৃত্যু পথযাত্রী কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জাত রক্ষা করত। অন্যদিকে সাধারণ মুসলমানরা ইসলামের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নামে মাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। উনিশ শতকে ইউরোপে উদারনৈতিক চিন্তাধারা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। বৃটিশ শাসনের প্রভাবে পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে পরিচিত হবার ফলে বাঙালির চিন্তার জগতে সৃষ্টি হয় ভাববিপ্লব। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় জীবন ও বিশ্বাসের নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে এবং প্রশ্ন তুলতে শেখে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বর্ণাশ্রম-পীড়িত, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রথা জর্জরিত হিন্দু সমাজে সংস্কারের হিড়িক লেগে যায়। ফলে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সূচিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন বা ভাববিপ্লবকে বলা হয় বাংলার নবজাগরণ। সুশোভন সরকারের মতে, "বৃটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই (অবিভক্ত ভারতের বাংলা অঞ্চলে)। এই প্রভাবের ফলে বাংলায় এক নবজাগরণের সূচনা হয় যা বাংলার রেনেসাঁস নামে পরিচিত।"[৭] অনেক আধুনিক পন্ডিতের মতে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, আবার অনেকের মতে গোটা উনিশ শতক জুড়েই বাংলায় বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ চলে যাকে যথার্থই ইউরোপীয় ধারার রেনেসাঁস বলা যায়। বিনয় ঘোষের মতে, "উনিশ শতকের গোড়ায় নতুন যুগের নির্মাণ ও নবজাগরণ অত্যন্ত মন্থরগতিতে হলেও নিশ্চিত শুরু হয়, মধ্যভাগ থেকে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার চিহ্নগুলো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।"[৮] রেনেসাঁসের দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার সমসাময়িক জীবনধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

বাংলার নবজাগরণ প্রধানত দুই ধারায় প্রসার লাভ করে– (১) ঐ সময়ে বহু সংখ্যক সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এতে বাংলা গদ্যের চর্চা প্রসারিত হয়। মুদ্রণযন্ত্র (১৭৭৮) ও মিলের কাগজ লেখার কাজকে ত্বরান্বিত করে। (২) বহু সমিতি, সমাজ, সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসবের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি (১৮১৭), ডেভিড ড্রমণ্ডর ধর্মতলা একাডেমী, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলদের একাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮), কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলার নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে নবজাগরণের সবচেয়ে দর্শনীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটে কতকগুলো ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং যুক্তিভিত্তিক মুক্তচিন্তার স্বপক্ষে পরিচালিত ধর্ম নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্য

দিয়ে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণার প্রসার ও বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানানুসন্ধানের মূলে ছিল নবজাগরণ।[৯] উল্লেখ্য যে, হিন্দু কলেজেই এ দেশীয় সন্তানরা প্রথম ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার সুযোগ পায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যেই প্রথম সামন্ততান্ত্রিক শাসনের নেতিবাচক দিকগুলো ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় স্বদেশপ্রেম, দ্রোহ, শিক্ষার দাবী, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতি বিধানের সচেতনতাবোধ। এই সচেতনতাবোধ থেকেই তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় জাতীয়তাবাদ, পরবর্তী সময়ে তারা প্রশ্ন তোলে পরাধীনতার বিষয় নিয়ে। "ইউরোপীয় রেনেসাঁর জাগরণের মতোই তারা উপলব্ধি করতে পারল যে, আর সামন্ততান্ত্রিক খোলসে নয়, নতুন ধরনের স্বাধীন সার্বভৌম ও গনতান্ত্রিক দেশ হোক তাদের মাতৃভূমি।[১০]

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ কোন একক ব্যক্তি বা সংগঠনের অবদান নয়, বরং তা বিভিন্ন মনীষীর সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা, কর্ম-প্রচেষ্টার ফসল। নবজাগরণ ভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, এইচ.এল.ভি ডিরোজিও ও তাঁর বিপ্লবী শিষ্যবৃন্দ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর অনুসারীগণ, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তারা যেসব পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন তা ছিল মূলত মানবতাবাদ, জেমস মিল (১৭৪৮-১৮৩২) ও জন স্টুয়াট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) প্রচারিত উপযোগবাদ, অগাস্ট কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) দৃষ্টবাদ, কোপারনিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের (১৬৪২-১৭২৯) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ফ্রান্সিস বেকন ও টমাস পেইনের (১৭৩৭-১৮০৯) যুক্তিবাদ, ডারউইনবাদ (১৮০৯-১৮৮২), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি। এসব পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে রেনেসাঁসের নিবেদিত মনীষীরা শত শত বছরের প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার তথা মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে এদেশে আধুনিক যুগের সূচনা করে। নবজাগরণের প্রতিফলন ঘটে বাংলার সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংবাদপত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে। অবশ্য প্রথমদিকে এ রেনেসাঁস আন্দোলন প্রধানত বাংলার হিন্দু সমাজের নব্য-শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু শেষাবধি তা মুসলিম সমাজ ও অন্যদের মাঝেও প্রসার লাভ করে। নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বাংলার নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। উনিশ শতকের শেষদিকে উপমহাদেশের অন্যসব অংশেও নবজাগরণ ছড়িয়ে পড়ে ।

ইউরোপিয় রেনেসাঁস ও বাংলার নবজাগরণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এক নয়। রেনেসাঁসের সূচনালগ্নে ইউরোপের সমাজ ছিল যাজক পীড়িত ও নিরক্ষর। শিল্প বিপ্লব ইউরোপিয় রেনেসাঁসে গতি সঞ্চার করে। তাদের জীবন ও জীবিকায় আসে ব্যাপক পরিবর্তন। আর উনিশ শতকে বাংলায় প্রবর্তিত ছিল ঔপনিবেশিক শাসন, অবাধে চলত প্রজা পীড়ন। তখনকার সমাজ ছিল অশিক্ষা, জড়তা, জাতিভেদ ও বর্ণ প্রথা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষ সমাজে অন্ধভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক প্রথা মেনে চলতো। তাদের না ছিল মনের স্বাধীনতা, না ছিল কোন উদ্যম ও উদ্ভাবনার প্রয়াস। তাই ইউরোপিয় রেনেসাঁস ও বাংলার নবজাগরণের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায়:

(১) ইউরোপিয় রেনেসাঁসের উৎস হচ্ছে সৃজনশীলতা, আর বাংলার নবজাগরণের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহনের আগ্রহ।

(২) ইউরোপিয় রেনেসাঁসের ব্যাপ্তি ছিল বিস্তৃত ভূ-ভাগে। অনেকের মতে বাংলার নবজাগরণ ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক এবং এর ব্যাপ্তিকাল প্রায় ৫০ বছর।

(৩) ইউরোপিয়দের জীবন ও জীবিকার রূপ পরিবর্তনে রেনেসাঁসের ছিল বিশাল ভূমিকা। আর বাংলার নবজাগরণের সবচেয়ে দর্শনীয় বহিপ্রকাশ ঘটে কতকগুলো ধর্মীয় ও সামজিক সংস্কার আন্দোলনে, কথায় ও লেখনীতে। কাজে তেমন কোন লক্ষণ ধরা পড়েনি।

(৪) ইউরোপিয় রেনেসাঁস সে দেশের মানুষকে এক দৈশিক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, ফলে তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় জাতীয়তাবোধ। আর বাংলার নবজাগরণ বাঙ্গালিকে দিয়েছিল স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমের চেতনা।

(৫) ইউরোপিয় রেনেসাঁস মানবতাবাদের বিকাশেও যথেষ্ট সহায়ক ছিল। বাংলার নবজাগরণ মণীষীদের স্ব-ধর্মীয় স্বার্থ চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে তা মানবতাবাদের বিকাশে ততটা সহায়ক ছিল না।

ইউরোপের রেনেসাঁস জীবনাদর্শকে বাঙালিদের মধ্যে প্রথমে গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই হিসেবে তিনি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মানবতাবাদী ও সংস্কারমুক্ত পুরুষ। তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে পৌত্তলিকতার অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজে নারীর উত্তরাধিকার আইন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সতীদাহের মত বর্বরোচিত প্রথা রোহিত হয়।

হিউম্যানিস্ট পন্ডিতরা ইউরোপের রেনেসাঁসকে যেভাবে ত্বরান্বিত করেছিলেন, ঠিক সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তদানিন্তন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তদানিন্তন ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিককুলকে তিনি ছাত্রদের কাছে আলোচনার বিষয় করে তুলেছিলেন। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গলরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

উনিশ শতকে শুদ্ধ বুদ্ধিবাদের জয় ঘোষণা করে নব্য বাঙালির মানসলোকে রেনেসাঁসের বাণী সঞ্চারিত করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তত্ত্ববোধিনী স্কুলের শিক্ষক হিসেবে তিনি সবসময় ছাত্রদের মনে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাব জাগিয়ে তুলতেন এবং তাদের মধ্যে মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচার করতেন। তাঁর যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টি, মানবতাবাদী ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনয়ন করতে সমর্থ হয়। আর এই মনোভাব থেকেই তিনি প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, প্রার্থনা নিরর্থক এবং এ থেকে কোন ফল পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকের নবজাগরণের আর এক স্থপতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কোন কোন সমালোচক তাঁকে নবযুগের বাংলার আদর্শ হিউম্যানিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 'বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল মুখ্যতঃ নারীমুক্তি আন্দোলন।'[১১] তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে তাঁর অবদান বাঙালি সমাজ চিরকাল স্মরণ রাখবে। তাঁর প্রচেষ্টাতেই সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং ঐ কলেজে সকল বর্ণ ও শ্রেণীর ছাত্রদের অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল মানবপ্রেম তথা মানবকল্যাণ। তিনি মনে করতেন ইহজীবনে মানব-কল্যাণকে অবহেলা করে পরলোকের চিন্তা করার মতো মূঢ়তা ও অধর্ম আর নেই।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসে মধুসূদন দত্তের অবদান

উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রভাবে বাংলায় যে নবজাগরণ শুরু হয় তাতে এদেশের মানুষের মন-মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলার মানুষ এক নতুন আলোর সাক্ষাৎ লাভ করে। সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন আলো দেখা যায়। এই আলোকিতকরণ প্রক্রিয়ায় ইয়ং বেঙ্গলদের গুরু ডিরোজিও-র ভাবশিষ্য মধুসূদন দত্ত সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। তিনি

মানবতাবাদের জয়গান গেয়ে বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন। সাহিত্য সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "ইউরোপীয় রেনেসাঁসের দৃষ্টি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে রামমোহন লাভ করেছিলেন-কবিদের মধ্যে মধুসূদন প্রথমে।"[১২] মধুসূদন উনিশ শতকের নবজাগরণকে সচেতনভাবে আত্মস্থ করেছেন। ফলে তাঁর কবি প্রতিভা বিকাশে নবজাগরণের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। এখন মধুসূদনের চিন্তা-চেতনার আলোকে উনিশ শতকের নবজাগরণে তাঁর অবদান আলোচনা করা হবে।

মানবতাবাদী চিন্তার বিকাশে মধুসূদনের অবদান

"রেনেসাঁর প্রথম এবং সবচেয়ে বড় শর্ত হলো ধর্মীয় বৃত্তের বাইরে এসে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানব মহিমার উদার জয় ঘোষনা"[১৩]। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের এই শর্ত মধুসূদন পূরণ করেছেন। তাঁর কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য মানবতাবাদ। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। তাই হাজার বছরের বাংলা কাব্যের ধর্ম-নির্ভর ধারায় তিনিই প্রথম সরবে ঘোষণা করেন মানুষের অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার কথা। রামায়ণ-নির্ভর কাহিনী হলেও তাঁর *মেঘনাদবধ* কাব্যে মানুষরূপী রাবণই প্রাধান্য পায়, দেবতুল্য রামচন্দ্র নয়– এক্ষেত্রে কবি ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। নবজাগরণের চেতনায় তিনি রাক্ষস রাবণের অন্তরে মহামানবের গুণাবলী সঞ্চারিত করে মহামানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট রাবণ বীর, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী শহীদ। মেঘনাদবধের রাবণ উনিশ শতকের নবজাগ্রত জীবন-চেতনার মূর্ত প্রতীক।

কেবল *মেঘনাদবধ* কাব্যেই নয় মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য, নাটকেও মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। *তিলোত্তমাসম্ভব* কাব্যে কবি তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বদৌলতে মানুষের হাতে দেবতাদের পরাজিত করে মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন। এটা উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু সমাজ ও পরিপ্রেক্ষিতে একান্তরূপে দুঃসাহসিক। *ব্রজাঙ্গনা* কাব্যে পদাবলীর রাধাকে মধুসূদন মর্ত্যলোকের মানবী রাধায় রূপান্তরিত করেছেন। শুধু তাই নয়, রাধাকে মিসেস রাধা হিসেবে সম্বোধন করে এক সাধারণ নারী হিসেবে তুলে ধরেছেন। *বীরাঙ্গনা* কাব্যেও মধুসূদন প্রকৃত অর্থেই মানবতাবাদী। এখানে এগারো জন পৌরানিক নারীকে তিনি মানবতাবাদী চেতনা দিয়ে নির্মাণ করেছেন।

মধুসূদনের প্রথম নাটক *শর্মিষ্ঠা*। এখানে মহাভারতের দুটি নারী-চরিত্র— শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে তিনি আধুনিক মানবতাবাদী চেতনা দিয়ে নির্মাণ করেছেন। তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বদৌলতে *পদ্মাবতী* নাটকের পৌরাণিক দেব-দেবী মর্তের জীবন্ত মানব-মানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মর্তের মানুষের মতোই তাদের হৃদয় দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, হিংসা-দ্বেষ, স্নেহ-প্রেম, মাধুর্যে পরিপূর্ণ। মধুসূদনের *কৃষ্ণকুমারী* নাটকে কৃষ্ণকুমারী, বিলাসবতী ও মদনিকা চরিত্রে যে মননশীলতা, স্বেচ্ছা-প্রণোদনা, মানবতাবোধ ও ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, তা পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক নারীর সমপর্যায়ের। *একেই কি বলে সভ্যতা* ও *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসন দুটিতে মধুসূদন কলকাতার সমাজ, ব্যক্তি, তাদের কদর্য চরিত্র ও নীতিভ্রষ্টতা তুলে ধরে পরোক্ষভাবে একজন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মধুসূদনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল বিদ্যাসাগরের উদার মানবপ্রেম। মধুসূদন আকণ্ঠ সেই মানবতাকেই পান করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন রক্ষণশীল ধর্মপ্রাণের আঘাতে আহত নারী হৃদয়ের যন্ত্রণাকে। তিনি হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামিকেও সহ্য করতে পারেননি। তিনি ছিলেন মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী।

জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম প্রচারে মধুসূদন

'রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ হলো জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশানুরাগ'।[১৪] মধুসূদনের সাহিত্যে উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও পরাধীনতার বেদনাবোধ স্বার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে

মেঘনাদবধ কাব্যে। এখানে কবি দেখাতে চেয়েছেন যে, একজন বিদেশী অর্থাৎ রাম সসৈন্যে এসে অন্যের দেশ লঙ্কা আক্রমণ করেছে, লঙ্কার স্বাধীনতা বিপন্ন। তিনি পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ এই জাতির শৃঙ্খল মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। আক্রান্ত রাজা রাবণ স্বদেশ ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পুত্র ও অন্যান্য প্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়েও অদম্য তেজে যুদ্ধ করছে। সে স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।মৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে সে বলেছে,

"জন্মভূমি রক্ষাহেতু, কে ডরে, মরিতে
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে ॥"
(প্রথম সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য)

স্বর্ণলঙ্কার পতনে রাবণ যে ব্যথিত হয়েছে, তা কবি হৃদয়ের গোপন ব্যথার রূপক ভাষ্য। মেঘনাদবধ কাব্যের স্বর্ণলঙ্কা কবির কল্পিত ভারতবর্ষ। লঙ্কার পরতে পরতে লেগে আছে যেন প্রাচীন ভারতের সম্পদ, সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য। সেই ভারতবর্ষ আজ ইংরেজ শাসন ও শোষণের কেন্দ্রবিন্দু। দেশপ্রেমিক কবিকে স্বদেশ ও স্বজাতির এই দৈন্যদশা ব্যথিত করে। সাত সমুদ্র, তেরো নদী পাড়ি দিয়ে ইংরেজরা দখল করেছিল ভারতবর্ষ; আর রাম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দখল করেছে লঙ্কা নগরী। এই দুই ঘটনার মধ্যে সহজেই একটি রূপক সাদৃশ্য আবিষ্কার করা সম্ভব।

মেঘনাদ মধুসূদনের মানস-সন্তান। এ চরিত্র রূপায়ণে কবি অভাবনীয় দেশাত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের শুরুতে প্রমোদকাননে পরাধীন লঙ্কার অপবাদ ঘুচানোর অঙ্গীকারের মধ্যে মেঘনাদ চরিত্রে উজ্জ্বল দেশপ্রেমের সমাবেশ ঘটেছে। তারপর সৈনাপত্য গ্রহনের পর যুদ্ধে যাবার সময় মাতা মন্দোদরীর নিকট বিদায় নেবার প্রাক্কালে তার কণ্ঠে যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বীরযোদ্ধা ও দেশ-প্রেমিক সৈনিকের বাণী। পুত্রের কল্যাণ চিন্তায় মা মন্দোদরীর আক্ষেপের উত্তরে মেঘনাদ হাসিমুখে বলেছে–

কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষণে
রক্ষৈবৈরী? দুইবার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শরজালে। ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী, দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস।
(পঞ্চম সর্গ/৪৭৯-৪৮৪, মেঘনাদবধ কাব্য)

চতুর্থ সর্গে অশোক বনে সীতা ও সরমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সীতা হরণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানেও কবি কৌশলে দেশমুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ যেভাবে বীরবাহু মাতা চিত্রাঙ্গদার কাছে স্বীয় মনের অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বণা দিয়েছে, তাতে রাবণের স্বজাতি ও দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচয় মেলে। রাবণ চিত্রাঙ্গকে বলেছে–

এ বিলাপ কভু দেবী সাজে কি তোমারে?
দেশ বৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে বীর মাতা তুমি;
বীর কর্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে।
(১ম সর্গ/৩৭৯-৩৮৪, মেঘনাদ বধ)

এছাড়া শৃঙ্খলাবদ্ধ সমুদ্রকে রাবণ যেভাবে ধিক্কার দিয়েছে এবং নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ যে ভাবে পিতৃব্য বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছে, তাতে মধুসূদনের পরাধীনতার গ্লানি ও স্বদেশপ্রেম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে আর্য রাম অনার্য রাবণের প্রতি অত্যাচার করবে– এটা মধুসূদন সহ্য করতে পারেননি। তাই শৃঙ্খলাবদ্ধ সাগরকে রাবণ ধিক্কার দিয়ে বলেছে–

> কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
> প্রচেতঃ হা ধিক্ ওহে জল দলপতি;
> এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
> তুমি?
> (১ম সর্গ/২৯৭-৩০০, মেঘনাদ বধ)

চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদনের জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশপ্রেম আরো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এদেশের প্রাচীন কবি ও কাব্য থেকে শুরু করে এর প্রকৃতি পরিবেশ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সব কিছুই যেন বিপুল, বৈচিত্র্যে ধরা দিয়েছে কবির নিকট। তিনি গর্ববোধ করেন তাঁর মাতৃভূমির জন্য।

স্বদেশের অতীত গৌরবের জন্য হাহাকার বাঙালির চিত্তে দেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চারে যে সহায়তা করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই পথটি যাকে প্রথম আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তিনি হলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও। তিনি *ফকির অফ ঝঙ্গিরা* কাব্যের সূচনায় ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে *'To India My Native Land'* নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা নিঃসন্দেহে স্বদেশপ্রেমের প্রথম কবিতা।[১৫]

মধুসূদন ছিলেন ডিরোজিওর ভাবশিষ্য। কারণ হিন্দু কলেজে মধুসূদনের আগমন ১৮৩৭ সালে। ডিরোজিও সে সময় পরলোকগত (১৮৩১)। তবু তখনও তাঁর প্রভাব শুধু হিন্দু কলেজে নয়, সমগ্র নগর কলকাতায় সংক্রমিত, যা প্রাচীন হিন্দু সংস্কার ও সমাজে প্রচন্ড আঘাত হানে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও স্বদেশপ্রেমের চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল। মধুসূদন ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কবিতায় ডিরোজিওর পরোক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। 'আমরা' নামক সনেটে মধুসূদন এক কালের গৌরবোজ্জল কিন্তু বর্তমানে পরাধীন ভারতবর্ষের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জাতীয় জীবনের দুর্বলতার জন্য তিনি জাতির হয়ে আত্মধিক্কার ও আত্মগ্লানির সুর জাগিয়েছেন, জাতিকে পুনরায় জাগ্রত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। তিনি ভারতভূমি নামক সনেটে ভারতের পরাধীন দশার জন্য আক্ষেপ করেছেন এবং বঙ্গভূমি-তে বঙ্গকে ভারত রত্নে জ্যোর্তিময় করার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

এছাড়া কৃষ্ণকুমারী নাটকেও মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, স্বদেশের অতীত গৌরবের স্মৃতি ও বর্তমান দুর্দশা ভীমসিংহের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। দেশ ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে একমাত্র আদরের কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে বিসর্জন দিয়েছে, তাকে হত্যার নির্দেশ দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি। অন্যদিকে কৃষ্ণকুমারীও পিতা-মাতা, রাজ পরিবার ও সর্বোপরি মাতৃভূমি রক্ষার জন্য হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। এভাবেই মধুসূদনের কাব্য, নাটকে স্বদেশ প্রেমের চেতনা মহিমান্বিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র-চেতনা প্রতিষ্ঠায় মধুসূদন

"রেনেসাঁসের আদি মন্ত্র ব্যক্তিত্বের মুক্তি, ব্যক্তি-চিত্তের স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতার পূর্ণ স্বীকৃতি।"[১৬] রেনেসাঁসের মানসপুত্র মধুসূদনের কবি প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনা। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেভাবে মুক্তচিন্তা ও মুক্ত মনের প্রকাশ ঘটেছে, বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের কাব্যেই প্রথম সেই ধারার চরিত্র চিত্রণের আভাস পাওয়া যায়, পাওয়া যায় সেই চিন্তা ও মননের ছাপ। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের

রাবণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বেঁচে থেকেই জীবনের সকল দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছে। রাবণের নিজের প্রতি ছিল সীমাহীন বিশ্বাস। তাই সে আত্মশক্তিতে নির্ভর করতে চেয়েছে। সে ষড়যন্ত্র করে বা অন্য কোন উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করতে চায়নি। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও সে স্বীয় শক্তি বলে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ও পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। রাবণের এই স্বাতন্ত্র্য-চেতনা যেন উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে উদ্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য-চেতনারই ভাষ্য।

শুধু কাব্যেই নয়, মধুসূদনের নাটকের চরিত্রগুলোতেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পদ্মাবতী নাটকে ইন্দ্রনীল নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত পছন্দকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অর্থ ও প্রতিপত্তির বদলে প্রেমের দেবী রতিকে, প্রেমকে বেছে নিয়েছে। ইন্দ্রনীলের এই নির্বাচনের মধ্যে মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস ধরা পড়ে, সেই সঙ্গে ধরা পড়ে উনিশ শতকের নব-জাগ্রত চেতনার দৃষ্টিভঙ্গি। মাইকেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই হিন্দু-কলেজের ছাত্রাবস্থায় পিতামাতার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে সম্মত হননি। শুধু তাই নয়, এ বিয়ের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, পিতা রাজনারায়নের বিপুল সম্পত্তি ত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীতে মধুসূদন তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার প্রাধান্য দিতে গিয়ে পরপর দুই বিদেশী মহিলার পানি গ্রহন করেন এবং ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন।

নারী জাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত মধুসূদন

উনিশ শতকেই এদেশে সর্ব প্রথম নারীমুক্তির বাণী এসে পৌছে।[১৭] বৃটিশ উপযোগবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর *The Subjection of Woman* নামক গ্রন্থে পুরুষ ও নারীর সম-অধিকারের কথা বলেন। রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র নারীমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা বিলোপ ও নারীর উত্তরাধিকার আইন প্রতিষ্ঠার মূলে এবং ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ নিরোধ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে যুগগত আকাঙ্খাই প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা স্ত্রী জাতির প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। নারীমুক্তির এই যুগগত আকাঙ্খা মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যেও রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ১৮৪২ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় মধুসূদন স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে এক প্রবন্ধে লিখেছেন, “The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete" তাঁর এই উক্তির মধ্যে উনিশ শতকের শিক্ষিত সচেতন বাঙালির নারী সম্পর্কিত সামগ্রিক ধারণাই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নির্যাতিত নারীর প্রতি মধুসূদনের ছিল অকৃত্রিম সহানুভূতি। এ নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন রামমোহন, বিদ্যাসাগরকে সমাজের বহুযুগসঞ্চিত অন্ধ কুসংস্কার দূরীভূত করে একটা নতুন সমাজ গড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল, আর সেই একই প্রেরণা মধুসূদনকে অনুপ্রানিত করেছিল নতুন সাহিত্য নির্মাণে। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তির বন্ধন মুক্তি কামনায় মধুসূদন এখানে অনুসরণ করেছেন ইউরোপীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, মনীষীদের। সাহিত্য সমালোচক প্রমথনাথ বিশী সুস্পষ্টভাবে মধুসূদন প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনঃ

> মধুসূদনের প্রায় সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ চরিত্র নারী এবং সে নারী বন্দিনী নারী। শর্মিষ্ঠা দাসত্বে বন্দিনী; কৃষ্ণকুমারী রাজকন্যা, কিন্তু সে রাজনীতি পাশে বন্দিনী, পদ্মাবতী শচী ও মুরজার ঈর্ষ্যাচক্রে বন্দিনী; ইন্দুমতি সর্বনাশা প্রেমের বন্ধনে বন্দিনী; সীতা অশোকবনে বন্দিনী; প্রমীলা বীরবালা হইয়াও সে কুলাচারে বন্দিনী। ... মধুসূদনের সময় হইতে সাহিত্যে এই ব্যক্তিত্বের বন্ধন মোচনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল।[১৮]

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা মধুসূদন দত্তের এক অপূর্ব সৃষ্টি। প্রমীলা নারী স্বাতন্ত্র্য-চেতনায় সম্পূর্ন আধুনিক মানুষ। তার চরিত্রে পাশ্চাত্য নারীসুলভ বীরত্ব, সাহস ও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হয়। তাই রামের শত্রু বাহিনীকে ভয় না পেয়ে সে সগর্বে বলেছে:

> "রাবন শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
> আমি কি ডরাই, সখি। ভিখারী রাঘবে!"
> (তৃতীয় সর্গ/মেঘনাদবধ কাব্য)

প্রমিলার সাথে ইন্দ্রজিতের সম্পর্ক সামন্তযুগের স্বামী-স্ত্রীর মত নয়। প্রমিলা শুধু ইন্দ্রজিতের সহধর্মিনী নয়, সহকর্মিনীও। "দাম্পত্য জীবনে নারী যে পুরুষের সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, দাম্পত্য-জীবন ও প্রেমের এই ধারণা এ দেশে সম্পূর্ণ নতুন এবং মধুসূদনের কাব্যেই তা প্রথম রূপায়িত হয়েছে।"[১৯] মেঘনাদবধ কাব্যের চিত্রাঙ্গদা এক বিদ্রোহী নারীর প্রতীক। সে প্রকাশ্য রাজ সভায় স্বামী রাবণের অন্যায় আচরনের প্রতিবাদ করেছে এবং তাকে পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত করেছে। এ কাব্যের সীতার মধ্যেও রোমান্টিক বিষাদে বিপন্ন আধুনিক নারীর পরিচয় পাওয়া যায়।

মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় নারী-জাগরণ ও নারীর স্বতন্ত্র মূল্য নির্ধারণ। তাঁর আধুনিক নারী ভাবনার স্পর্শে বীরাঙ্গনার পৌরানিক নারীরা নবজন্ম লাভ করেছে। এ কাব্যেই নারীরা প্রথম স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। মোবাশ্বের আলী যথার্থই বলেছেন,

> "বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রতিটি নারী চরিত্রে মধুসূদন ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। বিরহাতুরা শকুন্তলা, কামাতুরা তারা, প্রনয় অভিলাষিনী রুক্মিনী, স্বার্থতুরা কৈকেরী, প্রেমভিখারিণী সূর্পনখা, বিরহক্ষিণ্না দ্রৌপদী, পতিপ্রাণা ভানুমতী, ভীত-বিহবলা দুঃশলা, প্রেমময়ী উর্ব্বশী, প্রতিহিংসাপরায়না জনা, এই সকল নারী-চরিত্র স্বীয় অস্তিত্বকে বিশেষভাবে অনুভব করেছে। ফলে এরা আত্মপ্রকাশে মুখরিত হয়ে উঠেছে।"[২০]

এ কাব্যের নারীরা স্বামী বা প্রনয়ীর কাছে শুধু বেঁচে থাকা নয় সসম্মানে বেঁচে থাকার দাবি জানিয়েছে।

মধুসূদন তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। বাস্তবে যা তখনও অসম্ভব, সেই নারীর ছবি তিনি এঁকেছেন তাঁর সাহিত্যে। সে যুগের বহুপত্নিক পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর কোন স্বতন্ত্র মূল্য ছিল না। মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটকে দেবযানী চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের আত্মসচেতন, ব্যক্তিত্বময়ী নারী পুরুষের অন্যায় আচরণ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে নারাজ। স্বামীর বহুবিবাহের প্রতিবাদে দেবযানী গৃহত্যাগ করেছে, বহুপত্নী প্রথার প্রাচীন ধারনার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন বিলাসবতীর দাসী মদনিকাকে অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সচেতন ও ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে অঙ্কন করেছেন। সে বিলাসবতীকে সতীনের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার উদ্দেশ্যে এক দিকে যেমন পুরুষের ছদ্মবেশে ধনদাসকে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে, অন্যদিকে সে কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্রে রেখে জগৎসিংহ ও মানসিংহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করেছে। মদনিকা নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ বা যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তার স্বগতোক্তি-

> যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বলে ঘৃণা করে, তারা এটা জানে না যে, স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম। যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়! হায়! স্ত্রীলোকের যুক্তির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? (দ্বিতীয়াঙ্ক, তৃতীয় গভাঙ্ক, কৃষ্ণকুমারী)।

স্ত্রী-জাতির স্বপক্ষে মদনিকার এই আত্মস্বীকৃতি প্রমান করে, নারীর যে করুণাময়ী মূর্তি দেখতে আমরা অভ্যস্ত, মদনিকা তাদের থেকে আলাদা। মায়াকানন নাটকে গান্ধারের রাজকন্যা ইন্দুমতী চরিত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবি মধুসূদন দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার, অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন। কোনরূপ ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাঁর কবি-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাই তিনি ভারত সম্রাজ্ঞী রিজিয়াকে নিয়ে নাটক রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বাংলা নাটকে মুসলমানী নাম ভাল নাও শোনাতে পারে-এই যুক্তিতে সেটি বাতিল হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে মধুসূদন মুসলমান চাষী হানিফ গাজীর স্ত্রী ফতেমাকে এক অসাধারন নারীরূপে চিত্রিত করেছেন। ফতেমা গরীব হলেও সৎ এবং স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। সে অর্থের লোভে লম্পট জমিদারকে শারীরিক সঙ্গদানের কথা ভাবতেও পারেনি। তার এই সততার পরিচয় দানে মধুসূদন নবজাগরণের নারী চরিত্রের বিকাশের সাফল্যে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। শুধু তাই নয় মধুসূদন এখানে হিন্দু জমিদারের লাম্পট্য দেখাবার পাশাপাশি তার হাতে মুসলমান দম্পতির নিগৃহীত হওয়ার চিত্র এঁকেছেন, যা সে যুগের প্রেক্ষিতে একান্তই সাহসী পদক্ষেপ।

নবজাগরণের একটি শর্ত ছিল ভোগাসক্তি বা সম্ভোগ। সম্ভবতঃ সেই রন্ধ্রপথেই বাঙালিদের ভিতর প্রবেশ করে পানাসক্তি ও গনিকাচর্চা। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে মদের পাশাপাশি নারীও পুরুষের আকর্ষণ ও নেশার উপকরণে পরিনত হয়। বাবুগিরি দেখাতে গিয়ে অনেকে প্রকাশ্যে গনিকা রাখত। তবে গনিকাদের অধিকাংশই অভাবের তাড়নায় বা নিয়তির নির্মম বিধানে এই ঘৃণ্য পেশায় আসে ও সমাজের চোখে কলঙ্কিনী হয়ে ওঠে। এক শ্রেনীর পুরুষরাই তাদেরকে এ পথে আসতে প্ররোচিত করে। এই অসম্মানিত নারীত্বের বিদ্রোহী উচ্চারণে পতিতাবৃত্তির উৎস সন্ধানী মধুসূদন ছিলেন একক বিপ্লবী। কৃষ্ণকুমারী নাটকে ধনদাস ও বিলাসবতীর কথোপকথন সূত্রে তিনি জানিয়েছেন যে, বিলাসবতী ছিল গরীব ঘরের মেয়ে। ধনদাস মহারাজ জগৎসিংহের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করতে বিলাসবতীর সঙ্গে প্রতারণা করে তাকে বারবনিতায় পরিনত করেছে।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-তেও মধুসূদন দেখিয়েছেন যে, ভক্তপ্রসাদের মতো লম্পট জমিদারের ভোগের পর সেসব নারীদের আশ্রয় নিতে হয়েছে পতিতালয়ে। এখানে পুঁটি চরিত্রে তার বিগত যৌবনের জন্য হাহাকার ধ্বনির উচ্চারণ মধুসূদন যেভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁর সমাজ মানস সম্পর্কে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুঁটির স্বগতোক্তি "হায়, আমার কি আর সে কাল আছে। তালশাস পেকে শক্ত হলে আর তাকে কে খেতে চায়?" (দ্বিতীয়াঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ)

রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারক হিসেবে নারীর দুঃখ মোচনে মধুসূদন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি। কিন্তু তিনি তাঁর কাব্য-নাটকে বৈচিত্র্যময়ী নারী চরিত্র নির্মানে যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তির রূপকার হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। মধুসূদনের চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, জনা, কৈকেয়ী, মদনিকা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বময়ী নারী। "নারী ও পুরুষকে প্রতিস্বিক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেই মধুসূদন বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ এনেছেন।"[২১]

মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও তার যথার্থ অনুশীলনে মধুসূদনের ভূমিকা

'ইউরোপীয় রেনেসাঁর বিশ্বস্ত গবেষক ও ইতিহাসবেত্তা J.A. Simsons রেনেসাঁ প্রসঙ্গে বলেছেন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেনেসাঁর একটি বড় শর্ত।'[২২] বাংলাদেশে মধুসূদন এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। মাতৃভাষার প্রতি মধুসূদনের ছিল প্রবল ভালবাসা। তাই তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করলেও অতি দ্রুত বাংলা ভাষায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বাংলা ভাষার অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনার কথা। তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে নানা উপাদান ও উপকরণ

সংগ্রহ করে বাংলা ভাষাকে গাম্ভীর্য ও ভাববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তিনিই প্রথম অলীক কুনাট্যের হাত থেকে বাংলা সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্য এবং প্রকৃত স্বার্থক নাটক দিয়ে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার সুকঠিন দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা। শুধু নাটকই নয়, পাশ্চাত্য ধারায় স্বার্থক ট্রাজেডি নাটকেরও তিনিই শ্রষ্টা। তিনি প্রচলিত ব্যঙ্গ-নকশার পরিবর্তে অভিনয়যোগ্য প্রহসন রচনা করেও একক ও অভূতপূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেন। বিনয় ঘোষ বলেছেন,

> মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা' শ্রেষ্ঠ প্রহসন হিসাবে উল্লেখ্য। একটি প্রাচীনদের ভন্ডামীর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ, আর একটি মধুসূদনেরই সহযোগীদের বিদ্রোহ-বিকৃতির ব্যঙ্গচিত্র। রিনাইসেন্সি চেতনা কোন অনাচারকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না।[২৩]

নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁর আগমন তিনিই পরবর্তীকালে নিজ প্রতিভা ও অন্বেষার ফলে অনেক বড় মাপের কবি হয়ে উঠলেন। সত্যিকার অর্থে মধুসূদনই আধুনিক বাংলা কবিতার জনক। তাঁর কাব্যেই প্রথম দেবতা নির্ভর স্তুতি-স্তাবকতার স্থলে নবোত্থিত মানুষের জয়গান শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য কেবল কাব্য-বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়, একথা আঙিকের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তিনিই আমাদের প্রথম মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য, সনেট, খন্ড কবিতা ইত্যাদি নতুন নতুন কাব্য আঙিকের সন্ধান দিয়েছেন। ভাষা ব্যবহারে, অলংকার নির্মাণে এবং ছন্দ-প্রকরনেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষনীয়। মধুসূদনের আগে বাংলা কবিতায় পয়ার ও পাঁচালির প্রাধান্য ছিল। তিনি পয়ারের বৃত্ত ভেঙ্গে ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের 'ব্ল্যাঙ্কভার্স' রীতি অনুসরণে বাংলায় যতিস্বাধীন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন। ফলে বাংলা কাব্য হাজার বছরের বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়। মধুসূদন বিদেশে থেকেও মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে বিরত হননি। পেত্রার্কের সনেট পড়তে পড়তে তাঁর মনে হয়েছে, এ বস্তুটি তাঁর ভাষায় থাকলে ভালো হতো। তিনি সনেটের জনক প্রেত্রাক থেকে অকৃপণ হাতে সনেটের কলাকৌশল গ্রহন করে বাংলা ভাষায় স্বার্থকভাবে সৃষ্টি করলেন সনেট, যার বাংলা চতুর্দশপদী কবিতা। মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক। মধুসূদন মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় বারোটি ভাষা অনুশীলন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে বাংলা এক চমৎকার ভাষা। যারা এ ভাষাকে চর্চা করেনা, অথচ নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে দাবী করে, তাদের তিনি ঘৃণা করেন।

মধুসূদন ১৮৬৫ সালে ২৬ জানুয়ারী ভারসেল্‌স থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে এক চিঠিতে লেখেন:

> ভাই, সত্যিই বলিতেছি আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর। কেবল, প্রতিভাশালী লোকেদের হাতে ইহা মার্জিত হওয়া চাই মাত্র। আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের অসম্পূর্ন শিক্ষার দোষে, এই ভাষা প্রায় জানেন না বলিলেই হয়, অথচ উহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা অতি শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। ইহাকে মহাভাষা অথবা মহাভাষার উপকরণগুলি এই ভাষায় বিদ্যমান, একথা বলা যাইতে পারে। এই ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিতে আমার ইচ্ছা হয়।[২৪]

এ থেকে বুঝা যায় মধুসূদন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কতটা অনুরাগী ছিলেন।

বাংলা ভাষায় মধুসূদনের সাহিত্য সাধনা দীর্ঘ সময়ের ছিল না। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি নতুন নতুন সাহিত্য ধারা আবিষ্কারে বাংলা ভাষাকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্য প্রথম স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদার্পন করে।

মন্তব্য

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ইউরোপিয় রেনেসাঁসকে আত্মস্থ করে যারা জাতীয়তা ও মানবতাবাদের জয় ঘোষণা করেছিলেন, মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাদের অন্যতম। নবজাগরণের প্রভাবে যে নবজাগ্রত-চেতনার বিকাশ ঘটে, তাঁর প্রথম সাহিত্যিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় মধুসূদনের কাব্যে, নাটকে ও প্রহসনে। তাঁর সাহিত্যে যা পাওয়া যায় তা হলো– স্বাধীন চিত্তস্ফুর্তি, মানুষের জয়গান, প্রবল জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার

গ্লানি, ধর্মদ্রোহ, ভোগবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চেতনা, নারীমুক্তি ও পাশ্চাত্য রীতির নতুন জীবনধারা। তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর কাছেই আমরা পেয়েছি নতুন ছন্দ, নতুন কাব্যভাষা, সনেট, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য, আধুনিক পাশ্চাত্য ধারার নাটক ও নতুন আঙ্গিকের মহাকাব্য। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যে নারী-মুক্তি ও মর্যাদার কথা যেভাবে ঘোষিত হয়েছে, তার ফলেই আমাদের জীবন ও সাহিত্যে নবজাগরণের বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে আত্মস্থ করে উপহার দিয়েছেন আমাদের। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন বাঙালির সমাজ জীবনে যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল তাতে বেশি আলোকিত হয় বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়। শুধু সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেই নয় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নারীমুক্তি, জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম প্রচারের যে প্রচেষ্টা তা মধুসূদনের পর দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিং, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের এই নব চেতনা মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) পূর্বে কোন মুসলিম লেখককে উজ্জীবিত করেনি। মধুসূদনের ছত্রছায়ায় মশাররফ হোসেন প্রথম তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাংলার মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অর্ধশতকের জড়তা দূরীভূত করে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটান। তাঁর *বসন্তকুমারী*, *জমিদার দর্পণ*, *বিষাদসিন্ধু* প্রভৃতি গ্রন্থে মধুসূদনের সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী নজরুল ইসলাম, আব্দুল করিম, কবি হামিদ আলী, কায়কোবাদ প্রমুখের সাহিত্যে মধুসূদনের কাব্য, নাটকের প্রভাব দেখা যায়। সুতরাং উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে মধুসূদনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১. Giorgio Vasari, Lives of Italian Painters Sculptors and Architects. গৃহীত, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক (কলিকাতা: বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৬), পৃ. ১১।

২. David Jary and Julia Jary, *Collins Dictionary of Sociology*, 2nd ed. (Glasgow: Harper Collins Publishers, 1995), p. 553.

৩. B. Groethuysen, 'Renaissance' in the *Encyclopaedia of the Social Sciences*, Edwin R.A. Seligman (ed.), (New York: Macmillan Co. 1934). Quoted in: David Kope and Safiuddin Joarder (ed), *Reflections On The Bengal Renaissance*, (Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, May 1977), Introduction, pp. 18-19.

৪. গৃহীত, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, *মধুসূদনের ভাবনাবলয়ঃ প্রসঙ্গ নাটক* (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ২০০৭), পৃ. ২২-২৩।

৫. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, (London, George Allen Runwin Ltd. New edition 1961. Eighth impression 1962). p. 490.

৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার রেনেসাঁস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: গতিধারা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৪) পৃ. ১২।

৭. সুশোভন সরকার, *বাংলার রেনেসাঁস* (কলিকাতা: দীপায়ন, কার্তিক ১৩৯৭), পৃ. ১০।

৮. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৯১) পৃ. ২৬।

৯. দ্রষ্টব্য: বাংলার নবজাগরণ, https://bn.wikidedia.org/wiki/

১০. দ্রষ্টব্য: ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকের রেনেসাঁ* (ঢাকা: কলি প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১১) পৃ. ২২।

১১. সুনিল কুমার মুখোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর: সংস্কারক এবং শিল্পী', গোলাম মুরশিদ (সম.) *বিদ্যাসাগর সার্ধ-শত বর্ষপুর্তি স্মারক গ্রন্থ*, পৃ. ৪৩।

[১২]. প্রমথনাথ বিশী, *মাইকেল মধুসূদন জীবনভাষ্য* (কোলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪০৮), পৃ. ৫৫।

[১৩]. ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকের রেনেসাঁ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

[১৪]. বৈদনাথ মুখোপাধ্যায়, *নবজাগরণ ও মানবিকতার ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬০।

[১৫]. রাজনারায়ন বসু, *হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত*, গৃহীত, অমর দত্ত, ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, মার্চ, ১৯৯৬). পৃ.১৫।

[১৬]. ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, *মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা.লি., দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৯), পৃ. ১০।

[১৭]. মোবাশ্বের আলী, *মধুসূদন ও নবজাগৃতি* (ঢাকা: মুক্তধারা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ.৫১।

[১৮]. প্রমথনাথ বিশী, *মাইকেল মধুসূদন-জীবনভাষ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

[১৯]. মোবাশ্বের আলী, *মধুসূদন ও নবজাগৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

[২০]. মোবাশ্বের আলী, *মধুসূদনের বিশ্ব* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা: প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৭), পৃ. ৮।

[২১]. প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

[২২]. গৃহীত, ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকের রেনেসাঁ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

[২৩]. বিনয় ঘোষ, *বিদ্রোহী ডিরোজিও*, পৃ. ৩০-৩১। গৃহীত, ড. সফিউদ্দিন আহমদ, *উনিশ শতকের রেনেসাঁ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

[২৪]. উদ্ধৃত, নগেন্দ্রনাথ সোম, *মধুস্মৃতি* (কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২য় সংস্করণ, ১৩৬১), পৃ. ২৭৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

The Moral Precepts in Hinduism: A Brief Account

Dr. Sharmin Hamid*

Abstract: Hinduism as a non revealed religion is a source of morality and ethical knowledge. Differences of beliefs and practices can also be found in this religion. In spite of the differences of beliefs and practices, there are certain beliefs which a good majority of Hindus seem to hold and also there are some particular practices which are more or less common amongst the Hindus. Such beliefs and practices form the moral precepts of Hinduism. The Holy Books of Hinduism such as the Vedas, the Upanishadas, the Bhagavad Gita and some other books written on Hinduism i. e., Manu Samhita are considered as the sources of Hindu moral precepts. The paper aims at exploring the authentic sources of moral precepts as depicted in such sacred scriptures as the Vedas, the Upanishads, the Itihaas, the Bhagavad Gita, the Puranas and the Dharma Shastras. While dwelling on the sources of morality as explicated in these scriptures, an attempt has also been made to delineate some other aspects of Hindu ethics which also play an important role to build up the Hindu view of morality.

Introduction

Religion may broadly be divided into two groups– revealed and non-revealed. Among the non-revealed religions, Hinduism takes an important place among the other religious. It believes in Brahma as Supreme Authority and all other 'Deities' are His off-springs. Hinduism not only gives absolute liberty in the world for thought, but also it enjoins a strict code of practice. The theist and the atheist, the sceptic and the agnostic may all be Hindus if they accept the Hindu system of culture and life. Hinduism is more a way of life than a form of thought. It insists not only on religious conformity to but also on spiritual and ethical outlooks in life.[1] Like all other religions, the foremost aim of Hinduism is to guide its followers towards a right way. Moral teachings or ethical knowledge of Hinduism can play a vital role in this regard and without the moral teachings it is impossible for a Hindu to lead a desirable life. In this article, an attempt has been made to dwell on only some aspects of Hindu ethics which is very important to build up the Hindu view of morality. In order to discuss the moral precepts in Hinduism, it is necessary to depict a brief outline of Hindu Ethics which runs as follows:

1. Hindu Ethics

Hindu religion is one of the most ancient religions. Hinduism deals with many ethical virtues and duties as well as regards ethical life as a means to liberation.[2] It is also a guideline for Hindu people. This is because it shows the Hindus the right path of living. It suggests them: 'What is right'?, 'What is wrong'?, 'What is good'?, 'What is evil'?, and 'What ought to do'?. Therefore, it can be said that Hindu ethics is an integral part of Hindu religion. The ethics of Hinduism is an attempt to explain the ethical norms and values concerning with the human life in the light of Hinduism i.e., the Vedas, the Upanisads, the Purans, the Ramayana, the Mahabharata, the Bhagavad

* Associate Professor, Department of Philosophy, University of Rajshahi.

Gita and the other religious texts of Hinduism. It is an attempt to understand and justify the moral obligations that guide human behavior in relation to the will of God. Hindu ethics lays a great importance on a practical way of life according to the will of God rather than a theoretical norms and values. This is because it is a guideline for the Hindus as to how a good Hindu ought to live.

The ethics of Hinduism aims at unity of whole human world and worship of God. It ultimately calls upon its followers to practise in life all human values. The ethical principles of Hinduism prescribe that one should consider one's interest akin to other's interest. One should not aspire to do to others what he does not cherish for himself. The Mahabharata clearly states in this context that what you do not cherish for yourself, you never want that unto others. What you wish for yourself for a long time, you wish that for others also.[3] Thus, Hindu ethics plays a significant role in our lives. This is because Hinduism regards ethical life as a means to liberation. The ethics of Hinduism is very much essential for progress, prosperity, pleasure and peace.

1.1. Sources of Hindu Ethics

The best and the most appropriate method of understanding Hindu ethics is to know the authentic sources i.e. the sacred scriptures of Hinduism. The sacred scriptures of the Hindus are many. The Vedas, the Upanishads, the Itihaas, the Bhagavad Gita and the Puranas are generally accepted as the sources of Hindu teachings as well as the sources of Hindu ethics.

1.1.1. The Vedas

The most important source of Hindu ethics is the Vedas. The word Vedas is derived from 'vid' which means to know, knowledge par excellence or sacred wisdom. Therefore, the Vedas are the books of wisdom. The subject matter of the Vedas is hymns, addressed to Hindu deities. The Vedas, the most sacred books of Hinduism, comprise four principal divisions i. e., the Rig-Veda, the Yajur-Veda, the Sama-Veda and the Atharva-Veda. The Vedas amount to 1131 hymns out of which about a dozen are available. According to Maha Bhasya of Patanjali, there are 21 versions of the Rig Veda, 9 types of Atharva-Veda, 101 branches of Yajur-Veda and 1000 of Sam Veda.[4] Krishnadaipayan, who is a famous sage, collected the Vedas and gave a proper shape as well as divided the Vedas into four sections. Thus, he became known as Vedavayas. The Rig-Veda, the Yajur-Veda and the Sama-Veda are considered to be more ancient books and are known as *'Trai Viddya'* or the 'Triple Sciences'.

The Rig-Veda is the oldest and has been compiled in three long and different periods of time. It is a collection of many hymns which were used when the Aryan sacrifices were offered. J. E. Gense provides the following view in this connection:

> The Rig-Veda is the most important of the four collections of books of wisdom of Ancient India. Its essential, and fundamental part is a Samhita, or collection of 1028 hymns addressed to various Indian deities. The hymns are of different authorship, and, according to the generally accepted view, the oldest of them date back to 1500 B. C. ...therefore, ...the Rig-Veda was composed during the Vedic period, which is

> generally believed to have extended from 2000 B. C. to 1400 B. C. But it is not likely that the collection of hymns was completed by that time.[5]

Hindu morality has its roots in the Rig-Veda. This is because the concept of '*Rta'* which is the central notion of Hindu morality is derived from the Rig-Veda itself.[6]

Besides the Rig-Veda, another, among the various sources of Hindu ethics, is the Sama-Veda. It is a rearranged version of some of the hymns of the Rig-Veda. The Sama-Veda is regarded as a text-book for the priests who attend the soma sacrifice as well as contains a detailed account of the rites connected with this function.[7]

The Yajur-Veda is also considered as an important source of Hindu teachings. It consists of formula for use by the priest who performed the sacrificial actions. The Yajur-Veda is also considered for practical purposes but did not confine itself to the soma sacrifice; it comprised the whole sacrificial rite in its entirety.[8]

Another significant source of Hindu ethics is the Atharva-Veda. It has a large number of magic formulas. It is made up of verses, spells and incantations meant to bring down either a blessing or a curse. It contains charms against every kind of evils that may threaten man against enemies, demons and wizards, against harmful animals like snakes; against sickness and diseases. Other charms contained in it are supposed to obtain benefits, to ensure love and a happy family life, health, longevity as well as protection on journeys and even luck in gambling.[9] Thus, it can be said that Hindu morality has its roots in the Vedas, because the Vedas are a treatise of rituals. The virtues like truth, charity, liberality and so on are very much emphasized in the Vedas. Therefore, the teachings of the Vedas influence human beings to lead a moral life.

1.1.2. The Upanishadas

One of the most important sources of Hindu teachings is the Upanishadas. The Upanishadas are the outcome of the new enquiries after the truth made by the *kshatriyas* who made these efforts in an attempt to prove their equality with the *Brahmins* in learning and religious culture. These sacred books speak of the Supreme Being, the all pervading soul, the Universal self from whom all the manifested universe has come forth.[10] Regarding the teachings of the Upanishads, Khitimohan Sen explains as follows:

> The Upanishadic teaching centres round the doctrine of the Brahman and the Atman. The meaning of Brahman is not easy to grasp. He is described as the one Divine Being 'hidden in all beings, watching over all works, dwelling in all beings, the witness, the perceiver, the only one, free from qualities. He is the one ruler of many who (seem to act, but really) do not act; he makes the one seed manifold'. The main message of the Upanishads is the identity of the Atman with the Brahman. The Supreme has manifested itself in every soul. Through the cycle of births man approaches his final end– the realization of his self.[11]

The Upanishad is generally regarded as a treatise of *Janna*. The virtues like modesty, humility etc. are very much emphasized in the Upanishads. In this context, Kedar Nath Tiwari says: "In the Upanishads, several references can be found, where the

teacher after giving the lesson of *Janna* to his pupil instructs him to practise virtue, to speak the truth, to cultivate modesty, humility etc.,....”[12] Thus, Hindu morality has its roots in the Upanishads.

1.1.3. The Itihaas

The two Itihaas or epics of Hinduism are the Ramayana and the Mahabharata. The Ramayana is an epic, which deals with the life story of Rama, who was born in Ayodhya. Once Rama was exiled by his father Dasaratha. In the forest, Sita, the wife of Rama, was kidnapped by Ravana who was the demon king of Lanka. After a battle, Rama killed Ravana and was reunited with Sita. They came back to Ayodhya and were crowned as well as Rama was held to be an ideal king. The above mentioned story influences the Hindus a lot. This is because Sita voluntarily went to captivity and yielded suffering in order to rescue other human beings and the world from evil.[13] Tahira Basharat says as follows: “All versions of the Ramayana are unanimous in reiterating her fidelity and devotion towards Rama even in times of extreme adversity.”[14] Thus, the epic Ramayana helps the Hindus to teach faithfulness and adoration even in times of extreme adversity. Therefore, the teachings of the Ramayana influence them to lead a moral life.

In addition to this, another important source of Hindu ethics is the Mahabharata. It is considered to be the world’s longest poem and has about one hundred thousand verses. The main part of this epic deals with a feud between two families— the Pandavas and the Kauravas. The Kauravas wanted to cheat the Pandavas regarding their share of the kingdom and finally the Pandavas won the battle. It also contains the life story of Krishna. The Mahabharata is considered to be deeply infused with religious implications because it contains many passages in which religion is systematically treated. Therefore, the Mahabharata is considered as one of the sacred books.[15] The two *smriti* epics, the Ramayana and the Mahabharata are the best known works of the Hindu tradition. The contents of these epics are ethical, spiritual, narrative, philosophic and cosmogony. Therefore, the teachings of the epics help them to develop our worldly and spiritual lives. Thus, it can be said that the Ramayana and the Mahabharata are the great sources of Hindu ethics.

1.1.4. The Bhagavad Gita

The foremost important source of Hindu ethics is the Bhagavad Gita. It is the Holiest book in the Hindu tradition. This book is also known as the Bible of modern Hinduism. P. B. Chatterji holds that the Gita constitutes one of the sacred scriptures of the Hindus. It is monotheistic in character and teaches a liberal code of ethics and religion.[16] The Bhagavad Gita is not a full text but a part of the Mahabharata. It is the advice given by Krishna to Arjuna on the battlefield of kurkshetra. Arjuna, one of the sons of Pandu, asks his cousin Krishna whether it is correct to fight a war in which many lives, especially of one’s own kin, are to be lost. Krishna, the eighth incarnation of Vishnu and the god-philosopher, advises him by saying that it is correct if one fights for *dharma* i.e., righteousness.[17] The conversation in the field of battle between Krishna and Arjuna takes up about eighteen chapters and seven hundred verses and

constitutes the great Bhagavad Gita.[18] Therefore, it can be said that the Bhagavad Gita is in the form of a long dialogue between Arjun and Krishna, his chariot-driver, friend and adviser and through this dialogue, Arjuna's doubts were resolved by Krishna's teachings.

The Bhagavad Gita is the essence of the Vedas and a summation of the Upanishad. It has an answer to every problem a man may face in his life.[19] For this reason, the Gita is the most popular of all the Hindu scriptures. It is one of the most widely read and revered works sacred to the Hindus. It is their devotional book and has been for centuries the principal source of religious inspiration for many thousands of Hindus. The main message of the Bhagavad Gita is that there are many ways to salvation of which all are valid and salvation is possible by following any kind of path. Krishna says in this connection: "As men approach me so do I accept them: men on all sides follow my path, O Partha (Arjuna)."[20] Furthermore, most of the Hindus think that the Bhagavad Gita represents the essence of Hinduism and its ethics is regarded as very sublime. It is considered as the spiritual reference book. According to the Bhagavad Gita, one may reach Vishnu or Krishna or God through devotion, knowledge or selfless action. Some interpreters think of these as three paths, which others consider them to be three aspects of the one path of the Supreme Being. In the Bhagavad Gita, Krishna also instructs Arjuna on the nature of the soul, God as well as how one can reach liberation. These are the main teachings of the Holiest book. Therefore, it can be said that the Bhagavad Gita is to be considered to the Hindus as the most important source of Hindu ethics.

1.1.5. The Puranas

The Puranas are also regarded as one of the most valuable sources of Hindu ethics. The word 'Puranas' means 'ancient'. The Puranas are the most widely read scripture of Hinduism. These books are revealed books like the Vedas. The date of these books could not be determined but it is believed that none of them is older than the 8th century C. E. although some of the legends incorporated in them may have come from much earlier times.[21] The Puranas continued to be written up to the Mughal period.

The Puranas contain the history of the creation of the universe, history of the early Aryan Tribes and life stories of the divines and deities of the Hindus.[22] These books were written in praise of the three great Hindu gods i.e., Brahma, Vishnu and Siva. However, it is believed that when the Hindu conquest extended over the sub-continent, the writers extolled their favorite local deities at the expense of the others. It is therefore no surprise that in the Puranas, the status of some Vedic gods has been lowered and that of some later gods elevated.[23] There is no racial discrimination to read or listen to the Puranas. Murtahin Billah Fazlie says in this connection: "Unlike the Vedas, which are the preserve of the *Brahmans*, the *Puranas* are available even to the so-called low-castes (non-Aryan) Hindus and also to the women."[24] Therefore, these books are the most popular Hindu literatures to the Hindus. Moreover, the Hindus want to guide their lives following the life styles of the different deities. As

the Puranas tell the stories of the different deities, so these books help us to a large extent in this context. Therefore, it can be said that the Puranas are also regarded as the foremost source of Hindu ethics.

1.1.6. The *Dharma-Sastras*

Another important source of Hindu moral teachings is the *Dharma-Sastra*. Among all the *Dharma-Sastras*, Manu-*Smriti* is the most influential as well as valuable. It is also known as Manava *Dharma-Sastra* or Manu's Law.[25] It is consulted by orthodox Hindus when they are in doubt as to correct procedure. The main objective of this text is to codify Hindu religious laws in all aspects of daily life.[26] It has twelve chapters which deal with creation, the sources of *Dharma* and the duties of a *Brahmacari*, the duties of a householder, the duties of women and dietary regulations, the duties of Kings, civil and criminal laws, domestic laws, the origin, development and rules of castes, general laws of morality, sins and expiation of sins, consequences of good and bad actions, nature of the soul and transmigration as well as the way to release. Hence, Manu-*Smriti* is regarded as the most precious source of Hindu teachings.

From the above discussions, it can be said that the Vedas, the Upanishads, the Mahabharata, the Ramayana, the Bhagavad Gita and the Puranas help the Hindus to live peacefully and morally. The purpose of these books is to guide humanity to the straight path. These books are the great sources of moral guidelines. This is because many stories regarding the life style of the different divines and deities like Brahma, Vishnu, Siva etc. are to be found in these sacred books. Moreover, the Hindus like to follow the life styles of the divines and the deities. In addition to this, the Bhagavad Gita is in the form of a dialogue between Arjuna and Rama. The Hindu people are also influenced by the advices of the Arjuna. Arjuna and Rama are the role models to the Hindus. The other books like the Veads, the Upanishads and so on also provide for all areas of life, whether spiritual, intellectual, social and economical. A Hindu can make his life easy and comfortable by following the advices given by the various sacred books. Henceforth, the Vedas, the Upanishads, the Mahabharata, the Ramayana, the Bhagavad Gita and the Puranas are the great sources of the Hindu ethics. In the present discussion while giving an outline of the moral precepts in Hinduism, I will endeavor to focus more on the Bhagavad Gita as well as on some *Dharma-Sastras* like Manu-*Smriti*.

2. Basic Teachings of Hindu Ethics

All religions prescribe some moral teachings for their adherents. Hinduism also does so. Most of the basic principles of Hindu ethics have been expressed in the Bhagavad Gita and the quintessence of Gita lies in the very part of *Niskama Karma*. To understand the ethics of Hindu religion, an attempt has been made to analyze Hindu ethical principles under the following heads:

2. 1. The Four Supreme Ends of Life (*Purusartha*)

The four supreme ends of life take an important place in Hindu ethics. The ancient Hindus recognized four supreme ends: *Dharma* (Virtue), *Artha* (Wealth), *kama* (Happiness) and *Moksya* (Liberation).[27] Every man ought to pursue them in order to

attain to his complete well-being. Virtue satisfies his rational, social and moral needs as well as consists in living on accord, appetites, impulses, desires and emotions by reason. Virtue is higher than happiness. Wealth satisfies his material, biological and economic needs. It arises from the gratification of desires. Moreover, selfless action or actions done for the benefit of others lead the way to liberation. According to Hindu teachings, there are three paths for liberation or *moksha*– the way of knowledge i.e., *Jnana Marga*, the way of action which means *Karma Marga* and the way of devotion i.e., *Bhakti Marga*. These paths are dependent on one another and one implies the other. Nevertheless, the adoption of any one of these with sincerity and earnestly leads to his or her spiritual goal of liberation i.e., these three paths are the means to God-realization.[28] According to the Bhagavad Gita, a Hindu can attain liberation by following any of these three paths, i.e., (i) the way of knowledge, (ii) the way of selfless actions and (iii) the way of devotion to God.[29] The Bhagavad Gita clearly envisages as follows:

> The path of knowledge is the path of inner realization, the realization of the immortality of the soul and of the identity of one's own inner being with all others; the path of action is the path of performing selfless, non-attached actions (*Niskama Karma*) and the path of devotion is the path of sincere worship and prayer of God.[30]

Thus, the Gita looks upon liberation as the highest goal of life.

2.2. Various Forms of *Yoga*

Hinduism also prescribes the various forms of *yoga*[31] for the attainment of the inner realization of truth. *Yoga* is a Sanskrit word which literally means union i.e. union with god. It also means a path to union with the Godhead and applies to the different disciplines. According to Swami Probhavananda, the Bhagavad Gita considered a hand book of practical living as well as a guide to spiritual attainment. The practical life follows one of the paths towards the spiritual goal and these paths are known as yoga.[32] The *yoga* refers to the practice of various disciplines. Bhagavad Gita says: "He who does the work which he ought to do without seeking its fruit, he is the *samnyasin*, he is the yogin, not he who does not height the scared fire, and performs no rites."[33] The Gita further states: "He, O Arjuna, who sees with equality everything, in the image of his own self, whether in pleasure or in pain, he is considered a perfect yogi."[34] Moreover, man's union with God is possible through the methods of *yoga*. Hinduism recognizes four main methods i.e., *yogas* to attainment. They are (i) *jnana yoga*, or the path of union through knowledge, (ii) *raja* yoga, or the path of realization through meditation and psychic control, (iii) *bhakti* *yoga*, or the path of realization through love and devotion; and (iv) *karma yoga*, or the path of union through work.[35] The *raja yoga* involves moral, mental and physical disciplines and meditations. It suggests us restraint from violence, falsehood and other negative practices. It also advises to abstain from positive practices like equanimity and asceticism. It also prescribes bodily postures for meditation and the practice of breath control as well as mental detachment from external stimuli.[36]

Each of these *yogas* is an independent path to God and when the end is attained; all four seem to join together in one. According to Swami Probhavananda, supreme love,

divine knowledge, true meditation as well as true and divine actions are at last identical and cannot be differentiated from one another. All the paths of *yoga* stand reconciled, blended and harmonized.[37] The Bhagavad Gita recommends that they must all be practised. It advises moderation in eating, drinking, sleeping and recreation. However, extremes must be avoided. The Bhagavad Gita always counsels us to be perfect *yogi*. It says in this connection: "The yogin is greater than the ascetic; he is considered to be greater than the man of knowledge, greater than the man of ritual works, therefore do thou become a yogin, O Arjuna."[38] Thus, the paths of *yoga* help us to a large extent to develop our worldly life as well as spiritual life. For this reasons, the *yoga* is emphasized in the Bhagavad Gita.

2.3. *Niskama Karma*

Hinduism also advises human beings to take the path of *niskama karma* which is really the path of morality. The Bhagavad Gita gives immense importance upon this path of *niskama karma* as a means to liberation.[39] According to Hinduism, *karma* means the process whereby good and bad deeds performed by human beings in the present situation determine the quality of their lives both now and in future births.[40] The Hindus determine right or wrong, good or bad, justice or injustice of a work by this moral standard of *niskama karma*. In Hindu ethics, *karma* is such a power of morality which restrains man's activities in order to determine the lower place or the higher place in the life after death. The Bhagavad Gita says in this regard: "He who restrains his organs of action but continues in his mind to brood over the objects of sense, whose nature is deluded is to be a hypocrite (a man of false conduct)."[41] The Gita further says: "But he who controls the sense by the mind, O Arjuna, and without attachment engages the organs of action in the path of work, he is superior."[42] According to the *niskama karma,* actions should be completed without expecting any kind of fruit. In Hindu ethics, human being has the right to choose and complete the action according to his or her will. Therefore, it can be said that Hindu ethics supports the self-restrainism.

2.4. Four Classes of Hindu Society

Hindu society is divided into four broad classes− the *Brahmin*, the *Kshatriya*, the *Vaisya* and the *Sudra*. The morality of Hinduism also depends on this caste system. The Bhagavad Gita does not repudiate caste system, but it lays great stress on qualities (*Guna*) and acts (*Karma*). Lord Krishna says in this regard: "The fourfold order was created by Me according to the divisions of quality and work….."[43] The status of a Hindu in the society is determined by the caste in which he is born. According to Swami Dharma Theertha, a person born in a caste carries the name of that caste as part of his surname.[44] Duties of each class are different as described by the Holy Book Bhagavad Gita. The *Brahmin*'s duties are purely religious. He is busy in spiritual discovery. R. C. Zaehner who is a Spalding Professor of Eastern Religions and Ethics in the University of Oxford holds that a *Brahmin* must study and teach the Veda and the S*mritis* as well as he must sacrifice both for himself and for others.[45] From the Vedic period until today, the pure Hindu *Brahmin* never earned any money. His only occupation is teaching. His house is a simple house and his wife is a humble

woman. A *Brahmin's* wife never wares ornament except her wedding bracelet made of conch-shell. Her only duty is to serve her husband and the students who surround him.[46] According to the Bhagavad Gita, the *Brahmin* has the only right to become a priest. The Gita univocally says that the *Brahmin* bounds in the qualities of self-control, austerity, purity, sacrifice, forbearance, uprightness, wisdom, knowledge and faith in religion. He teaches his students the spiritual truths. The *Brahmin* is respected by all, not because he is called *Brahmin*, but because of the renunciation and sacrifice. When a *Brahmin* comes to any social function, he comes bare-footed and simple in dress but all the assembled guests show respect to him by standing. He does not seek honors but honors seek him. In a word, the duty of a *Brahmin* is to learn and teach the Vedas, meditate on God and look after the spiritual welfare of the community.

The second class of the people of Hindu community is the *kshatriya*. The essential qualities of a *kshatiya* as described by the Bhagavad Gita are heroism, vigour, steadiness, resourcefulness, not fleeing from the battle ground, generosity, leadership and so on.[47] The duty of an ordinary *kshatriya* is to take part in war, to kill or to be killed while facing the enemy. In Hindu social system, the third position belongs to the *Vaisya*. The *Vaisya* comprises the merchants, the agriculturists and the keepers of cattle. Moreover, at the bottom of the Hindu social system is the *Sudra*. The foremost duty of a *Sudra* is to serve the other three castes.[48] Therefore, the caste system insists that the law of social life should not be cold and cruel competition, but harmony and cooperation. According to Hinduism, society is not bent of rivalry among human beings. The castes are not allowed to compete with one another.[49] For this reason, the moral teachings of Hinduism are hidden in the caste system of Hindu social system.

2.5. Four Stages of Life

The foremost characteristic of Hindu ethics is the four stages of life. In Hinduism, life of each individual has been divided into four gradual stages (i) the stage of *Brahmacarya*, (ii) the stage of *Garhastha* (iii) the stage of *Vanaprastha* and the stage of *Sannyasa*.[50] These four stages of life are also called the four *Ashramas*. At the stage of *Brahmacharya*, an individual is to lead strictly the life of a student keeping completely apart from sensuous enjoyments.[51] At the age of eight, the boy enters the house of his *Guru*. In *ashrama* house there is observed no caste. According to Harendranath Maitra, 'all the children live together with the children of the *Guru* himself on absolute equality, whatever the rank of caste of their parents'.[52] In this *Ashrama*, the *Guru* teaches the disciples the knowledge of God, which is the first and foremost knowledge. The disciples also study grammar, rhetoric, history, philosophy, law and literature. At this stage, the vow of poverty, chastity and obedience is taken. However, the one fundamental note is that the *Guru* tries to establish harmony in all functions of life. At this stage, the students get this training for the next stage of life. They learn to love his other caste- fellows, to share joy and sorrow with others. Therefore, it helps the Hindus very largely to lead great communistic life.

At the age of twenty-five or thirty, the disciple comes back home. This is the second stage of his life, in which he is called the *Garhasthya* or householder. In this *Ashrama*, he is to lead the life of a household by marrying and producing children.[53] He performs his household duties not for himself, but for others. He goes to the daily business of his life, but he knows that his business and every function of this life are for the glorification of God. At the stage of *Vanaprastha*, an individual goes out from his house in order to get the spiritual light through meditation. He begins his life when he enters into the house of his teacher and in meditation, stage after stage, he comes to the highest stage of life. The Hindu realizes his God and humanity through meditation. The fourth stage of life is the stage of *Sanyas* which means renunciation. This is his highest ideal. The three former stages are only the preliminaries. In this *Ashrama*, an individual renounces the world but enters into an order of divine service. He does not live for his own family and home. He does not believe in any race or nation. He is beyond caste. He begins to realize himself as part and parcel of Humanity. He thinks that the world is his kin. At this stage, he has been able to kill his lower self. Regarding the *Vanaprastha* stage and the *Sanyas* stage, Kedar Nath Tiwari says that these are the stages of gradually renouncing the world completely and becoming a creature of a different world even in spite of living in this world.[54] Therefore, Hindu morality has its roots in the four *Ashramas*.

2.6. Rebirth

Transmigration of souls or rebirth is a distinguished feature of Hinduism in which Hindu morality depends on. R. C. Zaehner says in this connection: “What most sharply distinguishes Hinduism, like its offshoot Buddhism, from the religions of Semitic origin, is its unquestioning acceptance of the doctrine of rebirth, reincarnation, or the transmigration of souls.”[55] According to Hindu ethics, the life of an individual does not end with his physical death. The life of a man begins after his or her death. The soul, after the death of the present body, should enter into some other new body in accordance with its past deeds. The Bhagavad Gita says in this connection: “Just as a person casts off worn-out garments and puts on others that are new, even so does the embodied soul cast off worn- out bodies and take on others that are new.”[56] The idea of reincarnation in Hinduism is closely related to the idea of *karma*. Belief in *karma* indicates that a human being should essentially undergo the consequences of whatever actions he or she performs and as one sows, so he reaps i.e., some people will be born as *Brahmins* and other will be born as *kshatriyas*. Moreover, some will even be born as dog, cat or snake. All actions done with attachment cause the soul to migrate from one body to another. This is called *samskaras*. Only action done without attachment i.e., *niskama karma*, does not generate any *samskaras* and in his case, no rebirth is possible.[57] S. Radhakrishnan expresses his view regarding this matter in the following way: “The law of *Karma* tells us that the individual life is not a term, but a series. Fresh opportunities will be opened to us until we reach the end of journey.”[58] Therefore, reincarnation in Hindu faith is essentially found up with the moral teachings of Hinduism.

2.7. Major Moral Virtues Concerning Individuals according to the Teachings of Hinduism

Virtue takes a significant place in Hinduism. According to Hindu morality, there are many virtues like truthfulness, faithfulness, brotherhood, tolerance, humanity, hospitality, charity, honesty, politeness, purity, swearing etc. which help mankind to be a good mankind and are observed in the texts of Hinduism like the Vedas, the Upanishads and the Bhagavad Gita. The virtues like truth, charity, liberality etc. are very much emphasized in the Vedas. Moreover, the Upanishads also instruct us to practise virtue i. e., to speak the truth, to cultivate modesty, humility and so on. Besides, the Bhagavad Gita describes twenty seven virtues. The Blessed Lord said:

> Fearlessness, purity of mind, wise, apportionment of knowledge and concentration, charity, self-control and sacrifice, study of the scriptures, austerity and uprightness. Non-violence, truth, freedom from anger, renunciation, tranquillity, aversion to fault finding, compassion to living beings, freedom from covetousness, gentleness, modesty and steadiness (absence of fickleness). Vigour, forgiveness, fortitude, purity, freedom from malice and excessive pride– these, O Pandava (Arjuna), are the endowments of him who is born with the divine nature.[59]

The Gita advises us that the practice of these moral virtues accords pleasure and peace to mankind not only in this world but also in hereafter. In addition to this, Hindu ethics also depends on the general duties of the Hindus. Hindu philosopher, Manu named such ten good conducts or qualities as *'Dashkam Dharmalakshanam'*. These ten good conducts or qualities are the following: steadfastness (*Dhrti*), forgiveness (*Kshama*), application (*Dama*), non-stealing (*Asteya*), cleanliness (*Saucha*), restraint on the sense-organs (*Indriya-Nigraha),* learning (*Vidya*), wisdom (*Dhi*), truth (*Satya*) and freedom from anger (*Akrodha*). Thus, the above mentioned list is a combination of both virtues and duties both. Later on, these ten virtues as well as duties were abbreviated into the following five only by Manu himself– Nonviolence (*Ahimsa*), Truth, Non-stealing, Cleanliness and Restraint of senses.[60] In Hindu morality, virtues like *Ahimsa*, *Satya*, *Asteya*, *Brahmacharya* and *Aparigraha* are recognized to be the most basic virtues or duties. This is because *Ahimsa* refers to the positive virtues like love, kindness and compassion towards all beings as well as to *satya* which implies absence from telling a lie or speaking rough and unpalatable language. In addition to this, *Asteya* refers to reject of taking away any property without the consent of the owner. Moreover, *Brahmacharya* implies a life of purity, celibacy, non-adultery etc. and *Aparigraha* is a general attitude of non-attachment towards worldly objects. The Hindus should inculcate these virtues in all dealings of his life and these qualities really develop humanity gradually. The following list is given by Prashastapada which includes the above five and many more. They are moral earnestness or regard for *Dharma*, non-violence, seeking good of creatures, veracity, non-stealing, celibacy, purity of motive, restraint of anger, personal cleanliness, non-catering of impure food, devotion to the recognized daily fasting, and moral alertness.[61] Kedar Nath Tiwari expresses his views regarding moral precepts in Hinduism in the following way: "In Vatsyayan's list certain more philanthropic qualities are added which make Hindu ethics more socially oriented. These qualities

are *Paritrana* (Saving or defending the distressed), *Dana* (Charity), *Paricharar* (Social service), *Daya* (Benevolence) etc."[62] Thus, Hinduism emphasizes the virtues of love, kindness, honesty, charity, compassion, truth, liberality, celibacy, purity, self-restraint, non attachment etc. It also teaches mankind to cultivate these virtues in life.

2.8. Major Moral Vices Concerning Individuals according to the Teachings of Hinduism

Hindu morality not only prescribes beliefs, virtues and the rules of social behavior, but also advises us to refrain from all kinds of vices. The teachings of Hinduism also exhort mankind to avoid vices like aggressiveness, falsehood[63], Hypocrisy[64], gambling[65], stealing, fraud, violence, deception, backbiting etc. Moreover, Hindu morality does not support attachment towards worldly objects. This is because attachment towards worldly objects is the root cause of all vices. The Bhagavad Gita says in this connection: "Ostentation, arrogance, excessive pride, anger, as also harshness and ignorance, these, O Partha (Arjuna), are the endowments, of him who is born with the demoniac nature."[66] Thus, it is essential for a Hindu to abstain himself or herself from all these vices in order to be a good and perfect Hindu.

2.9. Moral Teachings in Indian Philosophy

Hindu religion is not simply a faith; rather it is mixed with philosophy in which Hindu morality depends on. In Hinduism, there are six systems of philosophy. These six principal systems are *Sankhya*, *Yoya*, *Ngaya*, *Vaisesika*, *Mimamsa* and *Vedanta*. In the opinion of Pritibhushan Chatterji, monism, dualism, pantheism and even agnosticism are noticed in these philosophical doctrines. As K. M. Sen points out:

> Some claim that the world was created by God out of nothing. Others maintain that substances existed always and God only refashioned them to make an ordered universe. Others find the development of the world and of life as a process of evolution of nature under the influence of Purusa (selves) without any necessary presence of God. Still others find that the world is not quite real, being only an aspect of God, and there is no real creation at all.[67]

Nevertheless, moral teachings are also presented in these philosophical schools. According to *Vaisheshik*, peace is the foremost aim of human beings and there should be pleasure of all on equality basis. The *Vaisheshik* takes peace as the basis of religion. Moreover, the *Yoga* is a branch of *Samkhya*. It is said in the Gita that *Samkhya* and *Yoga* are one. Whatever may be the meanings of the terms *Samkhya* and *Yoga*, intended in the Bhagavad Gita, it holds good to stand for the two disciplines.[68] In the philosophy of *Yoga* various courses of meditation are prescribed for the realization of the nature of the pure self.[69] There are various intellectual, moral and quasi-physical disciplines in this philosophy. According to the philosophy of *Yoya*, virtues like love and friendly attitude should be cultivated towards those who are in happiness. Compassion for the distressed, feeling of happiness at the spiritual exaltation of the pious men and indifference towards sinners are also some principal virtues. Apart from these, virtues like non-injury, truthfulness, non-stealing, sexual continence and non appropriation etc. are very much emphasized in this philosophy.[70] Among these, non-injury is the most important and essential. All these disciplines are

prescribed for the achievement of the control of the mind and the body. Furthermore, the *Mimamsa* is a philosophical justification of the *karmakanda* of the Vedas, i.e., of Vedic rituals and sacrifices but it is atheistic.[71] It is rightly called *dharma-mimamsa*. It gives importance on moral duties of man that he owes to himself, to his family and relatives as well as to his community and nation. It is a system of philosophy investigating into the nature of dharma by enunciating several rules of interpretation of Vedic passages of doubt or ambiguity. In addition to this, according to the philosophy of *Vedanta*, human beings have to suppress their egotistic tendencies and perform their duties in a disciplined and disinterested way in order to gain enlightenment. This philosophy also gives emphasis on the moral virtues like attainment of calmness, temperance, renunciation, fortitude, the power of concentration of mind and faith etc.[72] According to Samkara, ethical activity does not directly contribute to spiritual freedom. It creates in us the desire to know. It is the indirect preparation for *moksa* i.e., liberation. Thus, moral virtues prepare mankind for the apprehension of truth by purifying affections and cleansing egoism. The teachings of these schools prescribed all these ethical virtues which would lead to perfection not only in this worldly life but also in life after death. It is noted here that there are some differences between the moral standard of the normative ethics and that of Hindu ethics described in the Bhagavad Gita. These differences are as follows:

i) The concept of the doctrine of *niskama k*arma of the Gita does not support the egoistic hedonism of the ancient Cyrenaics and Epicureans. According to these theories, what each man seeks, or ought to seek, is his own greatest pleasure.[73] However, this view of egoistic hedonism is explicitly against the Hindu teachings. This is because the Bhagavad Gita lays special importance to the performance of sacrifices, devotional acts as well as acts of prayer and worship.[74] In addition to this, the concept of the theory of *niskama karma* does not patronize hedonism too. The chief exponents of this theory are Jeremy Bentham, J. S. Mill and Henry Sidgwick. According to them, the ultimate aim of our lives is pleasure. Man should do that kinds of works by which he or she gets pleasure. On the other hand, works which do not give pleasure to man should be avoided. However, this view is completely different from that of the teachings of the Bhagavad Gita. The Gita holds that it is our moral standard to perform our duties without expecting any kind of its fruits or consequences. Moreover, he who holds that worldly pleasure is the only 'summum bonum' will get reward as hell. The pleasure described in the Gita is the spiritual pleasure and it is possible only by abstaining from the worldly pleasure. Therefore, hedonism is opposed to the theory of *niskama karma*.

ii) There are dissimilarities between the doctrine of *karma* and the theory of Kant's rationalism.[75] According to the Bhagavad Gita, the ultimate aim of an individual is not the worldly pleasure but the spiritual pleasure which can be achieved only through disinterested actions. Furthermore, some virtues like forgiveness, sacrifice, modesty, non-violence, love etc. are very much

emphasized in the Gita. However, Kant's rationalism does not support this view. According to Kant, as man is a rational animal, so he has emotions like pleasure and pain but man should not give priority to this emotion. Man should abstain from this emotion and has to lead a life guided by the pure reason. He further said: "we must do our duty out of pure respect for the law of reason, and not from any anticipation of pleasure…."[76] Thus, Kant's rationalism is opposed to the theory of *karma*.

Nevertheless, similarities are also observed in these theories. The Gita teaches us that everyone should perform his duties and social obligations without any consideration for its fruits or consequences. It is remarked in the Gita: "To action alone hast thou a right and never at all to its fruits; let not the fruits of action be they motive; …."[77] The Gita further exhorts to perform actions in a disinterested fashion without being swayed by considerations of pleasure and pain. This is the ideal of *niskama karma* and this ideal is comparable to the Kantian ideal of 'duty for duty's sake'. According to Kant, action which is done only for duty's sake has the moral value. Therefore, there is no conflict between these two theories.

iii) There are similarities between the doctrine of *karma* and the perfectionism of Hegel. This is because the teachings of the Bhagavad Gita ordain mankind that action should be done only for the welfare of others and it is possible only through self-realization or perfection. Thus, according to the Gita, self-realization is the ultimate good. Similarly, this view is very much supported by the theory of perfection of Hegel. According to him, the highest good is self-realization or perfection. Self-realization means the full development of personality by regulating all feelings, impulses and desires by reasons.[78] Hence perfectionism of Hegel is very much related to the moral standard of Hinduism described by the Bhagavad Gita.

By criticizing the theory of *Karma* it can be said that it is impossible for general people to do works without any expectation of fruits or consequences. This is because when we perform any kind of work, we perform it to get result, and the expectation of the consequences of any work inspires us to do work. However in the Gita, action which is done for consequences is the bad action. Nevertheless, the moral teaching of Hinduism is valuable.

Concluding Remarks

The sacred text, Bhagavad Gita, is the great source of guidance for the Hindus. It calls upon its followers to practise in life all the moral values. The inculcation of virtues and practice of ethical duties have a definite contribution towards the attainment of *Moksha*. The teachings of Hinduism remind people of duties through non-violence. Hindu ethics is also dedicated to equality and to spirit of cooperation at the same time. More than that, it encourages human beings to exercise all those eternal human values which are essential to gain peace in world. Hindu morality imparts a remarkable message of world peace. It accepts all human beings as members of one

family i.e., its principle is *Vasudhaiva Kutumbakam.* The teachings of Hinduism help us to a large extent to lead perfect life. It also helps to bring the Hindus all over the world close to one another.

Notes and References:

[1]. For details please see, S. Radhakrishnan, *The Hindu View of Life* (New Delhi: Harper Collins Publishers India Pvt. Ltd., 1993), p.58.

[2]. Vide, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1992), p. 31.

[3]. See, Dr. Ravindra Kumar, *Religion & World Peace* (Meerut, India: Sara publications, 1998), p. 34.

[4]. http:///www.islamandhinduism.com, Retrieved on- 28, September 2017.

[5]. J. E. Gense, *A History of India* (New York: Macmillan and Co., 1944), p. 5; also see, F. M. Sandeela, *Islam, Christianity, Hinduism: A Comparative Study* (Karachi: Ashraf Publications, undated), p. 5.

[6]. See, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., p. 32.

[7]. Vide, F. M. Sandeela, *Islam, Christianity, Hinduism: A Comparative Study*, *op. cit*., p. 5.

[8]. See, *loc. cit*.

[9]. Vide, *ibid*., pp. 5-6.

[10]. See, Murtahin Billah Fazlie, *Hinduism and Islam: A Comparative Study* (Saudi Arabia: Abdul Qasim Publishing House, 1997), p. 51.

[11]. K. M. Sen, *Hinduism* (London: Penguin Books, 1961), p. 53; also see, P. B. Chatterji, *Studies in Comparative Religion* (Calcutta: Das Gupta & Co. Pvt. Ltd. 1971), p. 350.

[12]. Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., p. 32.

[13]. See, Vasudha Narayanan, *Understanding Hinduism* (London: Duncan Baird Publishers Ltd., 2004), p. 40.

[14]. Tahira Basharat, “Sita, Mary and Khadija: Their Status in Hinduism, Christianity and Islam”, *Aligarh Journal of Islamic philosophy* (Aligarh, India: Department of Philosophy, Aligarh Muslim University, 2008), No. 14, p. 37.

[15]. For an account of these see, Murtahin Billah Fazlie, *Hinduism and Islam : A Comparative Study*, *op. cit*., p. 53.

[16]. See, P. B. Chatterji, *Studies in Comparative Study*, *op. cit*., p. 352.

[17]. For details please see, Vashudha Narayanan, *Understanding Hinduism*, *op. cit*., p.42.

[18]. See, *loc. cit*.

[19]. Vide, Ed. Viswanathan, *Am I a Hindu?* (New Delhi: Rupa. Co, 2005), p. 87.

[20]. The Bhagavadgita, iv:11 (All quotations from the Bhagavadgita (Sanskrit Text with Eiglish translation) have been taken in this work from S. Radhakrishnan (translator), *The Bhagavadgita*, Bombay, India: Blackie and Son Ltd., 1974).

[21]. See, Murtatin Billah Fazlie, *Hinduism and Islam: A Comparative Study*, *op. cit*., pp. 57-58.

[22]. http:///www.islamandhinduism.com, Retrieved on- 28, September 201.

[23]. Vide, Murtahin Billah Fazlie, *Hinduism and Islam: A Comparative Study*, *op. cit*., p. 58.

[24]. *Loc. cit*.

[25]. For details please see, Klaus K. Klostermaier, *A Concise Encyclopedia of Hinduism* (Oxford: One world Publications, 2006), p. 114.

[26]. Vide, Serinity Young (ed.), *An Anthology of Sacred Texts By And About Women* (London: An Imprint of Harper Collins Publishers, 1993), p. 277.

[27]. See, Gavin Flood, *An Introduction to Hinduism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p.17.

[28]. Surama Dasgupta, *Development of Moral Philosophy* (New Delhi: Munshiram Manohar Publishers Pvt. Ltd., 1994), pp. 110-111.

[29]. Vide, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., p. 31.

[30]. *Loc. cit.*

[31]. See, Dr. Shivendra Kumar Sinha, *Basics of Hinduism* (New Delhi: Unicorn Books, 2008), PP. 35-40.

[32]. Vide, Swami Prabhavananda, *The Spiritual Heritage of India* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1962), p. 123.

[33]. The Bhagavadgita, vi: 1.

[34]. *Ibid.*, vi: 32.

[35]. See, Swami Prabhavananda, *The Spiritual Heritage of India* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1962), p. 98.

[36]. For further details see, Vasudha Narayanan, *Understanding Hinduism*, *op. cit*., p. 61.

[37]. Vide, Swami Prabhavananda, *The Spiritual Heritage of India*, *op. cit*., pp. 98-124.

[38]. Bhagavadgita, vi: 46.

[39]. See, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., pp. 31-32.

[40]. See, Vasudha Narayanan, *Understanding Hinduism*, *op. cit*., p. 57.

[41]. The Bhagavadgita, iii: 6.

[42]. *Ibid.*, iii: 7.

[43]. *Ibid.*, iv: 13.

[44]. Vide, Murtahin Billah Fazlie, *Hinduism and Islam: A Comparative Study*, *op. cit*. p. 157.

[45]. Vide, R. C. Zaehner, *Hinduism* (London: Oxford University Press, 1962), p. 144

[46]. See, Harendranath Maitra, *Hinduism: The World-Ideal* (New York: Dodd, Mead and Company, 1916), pp. 58-59.

[47]. Vide, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., 9. 32.

[48]. See, Mark Juergensmeyer, *The Oxford Handbook of Global Religions* (Oxford: Oxford Handbook in Religion and Theology, 2006), p. 54.

[49]. For details see, S. Radhakrishnan, *The Hindu View of Life*, *op. cit*., p. 88.

[50]. Vide, Shivendra Kumar Sinha, *Basics of Hinduism*, *op. cit*., pp. 45-46.

[51]. For details see, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., p. 33.

[52]. See, Harendranath Maitra, *Hinduism: The World-Ideal* (New York: Dodd, Mead and Company, 1916), p. 75.

[53]. Vide, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., p. 33.

[54]. See, *loc. cit.*

[55]. R. C. Zaehner, *Hinduism*, *op. cit*., p. 75.

[56]. The Bhagavadgita, ii: 22.

[57]. Vide, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., pp. 25-26.

[58]. Sarvepalli Radhakrishnan, *The Hindu View of Life, op. cit.,* p. 102; also see, Pritibhushan Chatterji, *Studies in Comparative Religion, op. cit*., p. 381.

[59]. The Bhagavadgita, xvi: 1-3.

[60]. See, Kedar Nath Tiwari, *Comparative Religion*, *op. cit*., p. 33.

[61]. Vide, *ibid*., p. 34.

[62]. *Loc. cit*.

[63]. See, Rig-Veda, vii. 60.12, ix.105.6, x. 87. 12(All quotations from the Rig-Veda have been taken in this work from Ramesh Chandra Datta (translator), *Rigveda Samhita* (in Bengali), (Calcutta: Haraf Prakashani, 1993, Vols. 1 & 2); also see, Manu, 8:98-99.

[64]. Vide, Manu, 4: 195-197; 199-200.

[65]. Please see, Rig-Veda, x. 34.13.

[66]. The Bhagavadgita, xvi: 4.

[67]. K. M. Sen, *Hinduism*, *op. cit*., p. 84-85; also see, Pritibhushan Chatterji, *Studies in Comparative Religion*, *op. cit*., p. 356.

[68]. Vide, Sarvepalli Radhakrishnan, *History of Philosophy Eastern and Western* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1957), Vol. 1, p. 256.

[69]. Vide, *loc. cit*.

[70]. See, *ibid*., p. 257.

[71]. For further details see, Prithibhusan Chatterji, *Studies in Comparative Religion*, *op. cit*., p. 356.

[72]. Vide, S. Radhakrishnan, *History of Philosophy Eastern & Western*, *op. cit*., Vol. 1, p. 283.

[73]. Vide, John S. Mackenzie, *A Manual of Ethics* (London: University Tutorial Press Ltd. 1961), p. 167.

[74]. For an account of these see, Prithibhusan Chartterji, *Studies in Comparative Religion*, *op. cit*., p. 353.

[75]. See, Dr. Jadunath Sinha, *A Manual of Ethics* (Calcutta: The Central Book Agency, 1957), pp. 142-150.

[76]. J. S. Mackenzie, *A Manual of Ethics*, *op. cit*., p. 190.

[77]. The Bhagavadgita, ii: 47.

[78]. For details see, Dr. Jadunath Sinha, *A Manual of Ethics*, *op. cit*., p. 158.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

সানাউল হকের প্রবন্ধ : প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিত

ড. মো. সুজা উদ-দৌলা*

Abstract : In the history of literature in Bangladesh Sanaul Haque (1924-1993) importent and representative figure. Surprising and wonderful devolop inserted the character of Sanaul Haque. Many intelectual and meritorious poetic figure can be seen in the development of literature in Bangladesh. Sanaul Haque comes late of the list. But as a writer he is brilliant and very much radiant of his own fame and the area of fame is distinct to another. One of he is a poet and substitute of his time other hand he is a semblance-maker of surrounding area. Besides poet and creative work of literature he is an essay writer. The list of the work is very short but there Sanaul Haque sign is highly competent and satisfactory. As a social-consious experienced essays writer Sanaul Haque represent himself newly in the literarary world.

বাংলাদেশের সামাজিক- সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে গত শতকে অনেক কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সূত্রপাত হয়। সে সব ঘটনা মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে বিশ শতকের সূচনালগ্নে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা অনেকটাই বদলে দেয়। তাছাড়া ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশরা এ অঞ্চলে শাসনকাজ শুরু করলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হতে থাকে। 'এরূপ প্রতিবেশ পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) যোগ্য নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে ঘটে অসহযোগ আন্দোলন। গান্ধী মোহভ্রষ্ট অপমানিত জাতিকে অসহযোগের পথ দেখালেন।'[১] তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কর্তৃক ব্রিটিশদের দেয়া নাইট উপাধি ত্যাগ, সুভাষ বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫) ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে ইস্তফা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ও মতিলাল নেহেরুর (১৮৬১-১৯৩১) 'স্বরাজ দল' গঠন গণমানুষকে করে তোলে আত্মচেতন। অন্যদিকে আর একটি মহাযুদ্ধের পট রচিত হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের আবরণ মুক্ত হওয়ার স্বপ্নভূমিতে পরিণত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ। এ রকম এক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবেশ পরিস্থিতিতে ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কৃতী লেখক সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩)।'তাঁর প্রকৃত নাম আল মামুন সানাউল হক।'[২]

শৈশব ও কৈশোর উত্তীর্ণকাল থেকে সানাউল হকের জীবনে নানা অভিজ্ঞতার সম্মিলন ঘটতে থাকে। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকালীন সময়ে সানাউল হকের জীবন আরো বেশি বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। তিনি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেন। 'এ সময় তিনি মুনীর চৌধুরী, রবি গুহ, সৈয়দ নূরুদ্দিন, সরদার ফজলুল করিম, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রনেশ দাশগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।'[৩] রাজনীতির পাশাপাশি লেখক প্রগতির চর্চা করেন। ১৯৪১ সাল থেকে তিনি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই সংগঠনই লেখকের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার সূচনাভূমি হিসেবে কাজ করে। সানাউল হকের সাহিত্যসম্ভারে প্রগতি চেতনার যে প্রয়াস লক্ষ করা যায় তার উৎসস্থল প্রগতিপন্থী মানুষদের নিকট-সান্নিধ্য। মূলত চল্লিশের দশকের ঢাকা শহর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেখানে মানুষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চিন্তা চেতনায় উত্তীর্ণ হতে থাকে। সানাউল হক এই সময় পরিধির একজন সচেতন লেখক হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দেশ-সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে যেমন অসামান্য অবদান রেখেছেন তেমনি সাহিত্যের ভুবনে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। কর্মব্যস্ত সময়

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অতিবাহিত করলেও তিনি সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই ব্যস্ততার ন্যূনতম প্রভাব পড়তে দেননি। তাছাড়া সানাউল হক যে সব গদ্যরচনা সৃষ্টি করেছেন সেখানে উঠে এসেছে সাহিত্যের বিচিত্র সব বিষয়-আশয়। একজন নিষ্ঠাবান কর্মী মানুষ হিসেবে সানাউল হক অনেকের কাছে সম্মানিত ব্যক্তির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

সানাউল হক প্রায় সত্তর বছরের জীবনে শিক্ষকতা, সমাজসেবা, রাষ্ট্র-প্রশাসনের নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়ে আর একটি বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল, তা তাঁর সাহিত্যবোধ। জীবনের বর্ণবহুল কর্মযজ্ঞের মধ্যেও তিনি তাঁর সাহিত্যবোধের অমিয়ধারা সর্বদা ক্রিয়াশীল রেখেছেন। ফলে আজকের বাংলাদেশে তিনি শিক্ষক হয়েও কবি, প্রশাসক হয়েও সাহিত্যিক পদবাচ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সাহিত্যে বহুমুখী ভাব-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সানাউল হকের এই সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পেছনে পারিবারিক পরিবেশ অনেক বেশি প্রেরণা যুগিয়েছে। লেখকের পরিবারে সাহিত্য সচেতন আবহ যে বিরাজমান ছিল, তার প্রমাণ মেলে সমালোচকের মন্তব্যে :

১. কৈশোরকাল থেকেই সানাউল হকের চিত্তলোকে সাহিত্যপ্রীতি ও কবিতা-অনুরাগের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক পরিমণ্ডলে পিতা, মাতা, পিতামহ, খালাম্মা এবং ছোটমামা- এই পাঁচ জন মানুষের কাছ থেকে তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হওয়ার অনুকূল প্রতিবেশ লাভ করেন।[৪]

২. সাহিত্যপ্রীতি তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। আই. এ. পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে ছাত্রাবস্থায়। পরবর্তীকালে ছড়া, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, অনুবাদ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন।[৫]

সুদীর্ঘ সময়ের সাহিত্যচর্চাকালে সানাউল হক পঁচিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার কাল প্রায় ত্রিশ বছর। ত্রিশ বছরে রচিত তাঁর পঁচিশটি গ্রন্থের মধ্যে ১৩টি কাব্যগ্রন্থ। সানাউল হক কবিতার মধ্যে দিয়েই তাঁর চিন্তা-চেতনাকে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ করেছেন। ফলে কবি হিসেবেই তাঁর পরিচয়টা গড়ে ওঠে। কাব্যগ্রন্থের বাইরে লেখকের আর যে সব গদ্য রচনা আছে তা হলো– শিশুসাহিত্য, অনুবাদমূলক রচনা, ব্যক্তিগত রচনা, ভ্রমণকাহিনী, গবেষণাগ্রন্থ ও স্মৃতিকথা। গবেষণা বা প্রবন্ধধর্মী রচনায় তাঁর বুদ্ধি ও কল্পনার সবচেয়ে যথোপযুক্ত প্রকাশ ঘটেছে। বিশ শতকের প্রথম পর্বে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেশ কিছু মেধাবী মুসলমান প্রাবন্ধিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁরা চেয়েছিলেন সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা সমাজের কাছে তুলে ধরতে।'[৬] তাঁদের লেখায় মুসলিম মধ্যবিত্ত মানসের কথা ও প্রগতির চেতনা ফুটে ওঠে। এরপর অনেক সাহিত্যিক ও সমাজচিন্তাবিদকে প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করতে দেখা যায়। সাহিত্যিক সানাউল হক ছিলেন তাঁদের উত্তরসূরি প্রাবন্ধিক। সানাউল হকের প্রবন্ধের মধ্যে জীবনের বহুবিধ ভাব-চেতনার বিকাশ ঘটেছে। 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' (১৯৭০), 'খাদ্যভুবন' (১৯৮৫) এবং 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য' (১৯৯০) নামে তাঁর তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ রয়েছে। এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে দিয়ে লেখকের সুদীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতা-অর্জন সাহিত্যিক ভাব-পরিমণ্ডলে উপস্থাপিত হয়েছে। জীবন-সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-ভূগোল, স্বদেশ-ভাষা, খাদ্য-আহার কোন কিছুই তাঁর প্রবন্ধ থেকে বাদ পড়েনি।

১. সময় ও প্রকাশকালের দিক থেকে সানাউল হকের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ'। গ্রন্থটির মধ্যে সানাউল হক যে সব লেখা সংযুক্ত করেছেন তাতে সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকলেও এগুলো মূলত প্রবন্ধ। 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' গ্রন্থ পাঠে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক নিজে গ্রন্থটিকে ব্যক্তিগত রচনা বলে স্বীকৃতি দিতে চান। 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয় লেখকের অন্তর্গত সত্তার নিবিড় স্পর্শে অপরূপ সৌন্দর্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। লেখকের মনে ও প্রাণে যত প্রকার ভাব উদয় হয় তাকে আশ্রয় করে এ জাতীয় প্রবন্ধ গড়ে ওঠে।'[৭] তবে এ প্রসঙ্গে 'সানাউল হক রচনাবলী'র সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষের অভিমত :

> এসব রচনার মধ্যে আছে ছোটগল্পের হাতছানি, বৈঠকের মেজাজ, প্রবন্ধের মননিষ্ঠা, কখনো-বা আত্মস্মৃতির ব্যঞ্জনা। সবকিছু মিলে অধিকাংশ রচনাই হয়ে উঠেছে এক ধরনের শঙ্কর সৃষ্টি।[৮]

'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' গ্রন্থে লেখক মোট ৩১টি রচনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সমাজ-সংসার, ব্যক্তি-পরিবার ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানাবিধ বিষয় উঠে এসেছে সানাউল হকের 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' গ্রন্থে। ফলে লেখক হিসেবে সানাউল হক প্রবন্ধ সাহিত্যের যে সার্থক স্রষ্টা তা তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটির নাম "সেতার"। প্রবন্ধটির নামকরণ একটি বাদ্যযন্ত্রের নামে হলেও এর ভিত্তিভূমি ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। চিন্তাশীল লেখক হিসেবে সানাউল হক "সেতার" প্রবন্ধের মাধ্যমে আমাদের সামাজিক জীবনব্যবস্থার বিশেষ এক সত্যরূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। ফলে প্রবন্ধের নাম "সেতার" হলেও লেখকের সমাজচেতনাই এখানকার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। পারিবারিক জীবনের ঘরোয়া পরিবেশে মানুষের রুচিবোধ ও আধুনিক জীবনাগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে প্রবন্ধটিতে। আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার মানুষের অভাব নেই। ফলে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-বিভেদের কষাঘাতে অনেক ইচ্ছায় অনেক সময় জলাঞ্জলি দিতে হয়। যা মানবিক মূল্যবোধের অভাবের ফল। সানাউল হক "সেতার" প্রবন্ধের মাধ্যমে মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশের কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন প্রগতির চেতনাকে। সানাউল হক লিখেছেন :

> মর্যাদার মোহান্ধতা আপনি কাটেনা, তীক্ষ্ণ সূর্যালোকে ছাড়া কুজঝটিকার ঘোর লোপ পায় না। যদ্দিন ঘোর না কাটে দৃষ্টিপাত বারবার ফসকে যাবে ভুল পথে। চিরদিন অভিমানী সেজে বেখেয়ালী হয়ে থাকতে হবে সুরযন্ত্রটির উপর। সুরসৃষ্টির আবেদন থাকবে চাপা পড়ে। তাই জোর করে দৃষ্টিভঙ্গি না বদলিয়ে উপায় নেই। একচক্ষু ধারাবাহিকতার পথ ধরে এগোলে তা বদলানো সম্ভবপর নয়। এগোতে হবে মানবেতিহাসের প্রগতির ধারা বজায় রেখে, বাতিল করে, কখনো বা বদলিয়ে তার উত্তরণ ঘটানোর অভিরুচি নিয়ে। শ্যাওলা-পড়া নিষেধের পাথর জোর করে না সরালে সুরের কালি চোখ মেলবে কি করে।[৯]

সানাউল হক সমাজ সমকাল ও রাজনীতি সচেতন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লেখক। "আত্ম-পর" তাঁর সমাজ সচেতনতায় জাগর একটি প্রবন্ধ। সমাজে বসবাসকারী বহুরূপী মানুষ সম্পর্কে লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে এ প্রবন্ধে। মানুষ সবার আগে আত্মরক্ষা করতে চায়, নিজের মঙ্গল খোঁজে। সানাউল হকের মতে, আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা প্রয়োজনের তাগিদে অন্যের কাছাকাছি আসে, আবার প্রয়োজন শেষ হলে তাদের অনেককেই খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজের এই স্বার্থপর শ্রেণির মানুষের কথা বলতে গিয়ে সানাউল হক "আত্ম-পর" প্রবন্ধে লিখেছেন :

> আত্ম-পর যাদের জপ মন্ত্র তারা অনভিসারী। এক ধাপ যদি এগোয় দু'কদম পিছোয়। কখনো হয়তো আত্ম-প্রয়োজনে ঘুর ঘুর কাছ-ঘেঁষা; আত্ম-অপ্রয়োজনে তেমনি গা-ঢাকা। অসুস্থ মন আসলে স্বার্থপর, গোত্র নির্ভর।[১০]

প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে সানাউল হকের ভাবনা সবচেয়ে বেশি সমাজসংলগ্ন হয়ে উঠেছে। সমাজবোধ ও মানুষের চারিত্র্য ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে লেখকের 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ' গ্রন্থটির নাম প্রবন্ধে। লেখক এখানে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপন ভাবনার প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে চোখ দিয়ে মানুষ দেখলেও চোখ শুধু দেখার যন্ত্র নয়, এটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশেরও মাধ্যম। আর সে কারণেই একই বিষয় বা বস্তুকে একই সমাজ ও পরিবেশের বিভিন্ন মানুষ ভিন্নভাবে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন:

> যা বলতে চাই দৃষ্টি কেবল দৃশ্য দর্শনের যন্ত্র নয়, তা দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিপাতের মন্ত্রও। আপনি বাঁকা চোখে চাইলে যা দেখেন, সহাস্য চোখে তাকালে একই দৃশ্য দেখেন না। আপনার কড়া নজরে যা বরদাস্তহীন, জলভরা চোখে তা মমতা উদ্দীপক। ক্রূর দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি না হয় থাক, মাইওপিক ও ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখার ফলে কত অমঙ্গল যে ঘটে।[১১]

সমাজে বসবাসকারী মানুষের প্রতি লেখকের গভীর মনযোগ প্রকাশিত হয়েছে "টান ও টানাটানি" প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে সানাউল হক সমাজ অধ্যুষিত মানুষের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর আগ্রহী ও অনাগ্রহী মানসিক অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধটির নামকরণের মধ্যেই সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিশেষ কিছুর টানে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু অপরের প্রয়োজন মেটানোর টান সে সব মানুষের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না। এমনকি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে টেনে তোলার আগ্রহও লেখক অনেকের মধ্যে দেখতে পান না। এই সংকটাপন্ন দৃশ্য দেখে সানাউল হকের ভাবনা :

> লোভ ও লাভের টান-তার প্রভাব ও আকর্ষণ আরো মারাত্মক। সেখানে সুড়সুড়ি দেয় লালার তারল্য কি ট্যাকের লিপ্সা। কিন্তু যখন কারো ঘরের আগুন নেভানোর জন্য বালতি টেনে কুয়োর পানি তুলতে হয়, তখন বড় কেউ কাছে ধারে আসে না। 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমাকে টানিছে পশ্চাতে' কবির উক্তিতে তেমন কেউ সায় দেয় না, এবং যারা নীচের তলায় রয়েছে তাদের টেনে উপরে উঠানোর কথা বেশী লোকে ভাবে না। আত্মগরজি লোক গরজের টানে কী মধুর ব্যবহারটাই না করে, গরজ ফুরালে এক লহমায় পিঠটান দিতে দেরী করে না।[১২]

পারিবারিক জীবনভাবনার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে সানাউল হকের "স্ত্রী" নামক প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক, রসালাপ, টানাপোড়েন প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। সানাউল হক প্রবন্ধটির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যিনি কারো স্ত্রী সেই নারীর সঙ্গে সময়ের বিবর্তনে বহু মানুষের বহুরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু স্বামীর কাছে তিনি জীবনভর স্ত্রী থেকে যান। সানাউল হক মনে করেন স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্ক মানুষের জীবনের অন্য সব সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। লেখকের মতে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বের। আর তা না হলে এ সম্পর্কের মহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। এ প্রসঙ্গে সানাউল হকের ভাবনা :

> মেকানিক্যাল যন্ত্রচালিত নিষ্ঠায় ফ্যাক্টরী চালানো যায়, দুটি মানুষের আনন্দময় সহ-অবস্থান সম্ভব হয় না। সহধর্মিণী যদি সহমর্মিণী না হন, স্বীকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা না আসুক মানসনিবিড়ে আস্তে-আস্তে ঘুন ধরে। তাই বলি, স্ত্রীরা যতদিন না প্রেয়সী হতে পারছেন, নিদেন পক্ষে বান্ধবী, তাঁরা গিন্নী হয়েই থাকবেন। এবং গিন্নীর মুখ যে কখনো-সখনো বৈরী মেজাজে চিমনির কালি বলে ভ্রম হয়, একথা কে না জানে।[১৩]

নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ প্রকাশে সানাউল হক ছিলেন অধিকতর সচেতন। নারী সমাজের প্রতি সব সময়েই লেখকের সহৃদয়তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সানাউল হকের অনেক কবিতার মধ্যেও তাঁর নারী প্রীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রবন্ধে সে ভাবনা আরো বেশি গাঢ় হয়ে উঠেছে। লেখকের নারী-ভাবনার আন্তরিক অভিব্যক্তিমিশ্রিত একটি প্রবন্ধ "নবজাতক"। প্রবন্ধের নাম "নবজাতক" হলেও এটি মূলত লেখকের নারী-প্রীতির প্রকাশ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখকের মন্তব্য :

> মেয়ে বলেই আমার এতো ভালো লাগে। বংশ মুখোজ্জ্বল করা পুত্র কি সম্পদ সম্পত্তির ভাগিদারী ছেলে সহস্রের কাম্য হোক, আমরা দু'জন কিন্তু মেয়ে প্রত্যাশী। শ্রেণী বিভাগে মেয়েরা দ্বিতীয় পর্যায়ের হোক আমাদের কিছু যায় আসে না। আসল কথা কান্তি ও শান্তি। দুটোরই মেয়েতে আধিক্য, ছেলেতে বিরল। কলরোল কাকলি শুনবেন, সে মেয়েদের, লঘু আনন্দে উত্তরোল হতে দেখবেন কিশোরীদের। স্নেহ, শুশ্রুষা, সোহাগ, অভিমান মাতা-বোন-মেয়েতেই মেলে।[১৪]

সানাউল হকের চিন্তা চেতনার কেন্দ্রস্থলে ছিল সাহিত্যভাবনা। তাঁর প্রবন্ধের বড় একটি অংশ জুড়ে সে ভাবনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সাহিত্য বিচারের বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি প্রবন্ধ "শর্ট-কাট"। এ প্রবন্ধে লেখক সাহিত্য, সাহিত্যের বিষয়-আশয়, সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াসহ নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যের বিষয় কোন নির্দিষ্ট ছঁকে বাধা যায় না। এটি মানুষের মন ও চেতনানির্ভর বিষয়। সানাউল হক মনে করেন সাহিত্যের মূল্যায়নও একটি আপেক্ষিক বিষয়। এর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম

নেই। তাঁর মতে সাহিত্য বিচারের শেষ কথা বলে কিছু নেই। তিনি মনে করেন আর সব বিষয়ের মত শিল্প-সাহিত্যও নতুন নতুন পন্থায় পর্যালোচিত হতে পারে। কেননা এর বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> কাব্যের তথা শিল্পের বিষয়বস্তু অনির্ধারিত, ইনএকজ্যাক্ট, খেয়ালী মনের মতো এলোমেলো। কাজেই সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে তার মূল্য যাচাইয়ের চেষ্টা এমন অচল। সাহিত্য মূল্যায়নের এমন কোন গ্রাহ্য মানদণ্ড নেই যা সবক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। এই বিশ শতকেও যে কবিতার ছন্দ ও কাব্যধর্ম নিয়ে কোন গ্রাহ্য ও বিশ্বস্ত থিওরী বা সংজ্ঞা উদ্ভাবন হয়নি তার জন্য কিন্তু বিষয়টির অনির্দিষ্টতাই দায়ী নয়। এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের কতকগুলো অস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা। অনেকে মনে করে শিল্প সাহিত্য মানুষের উৎকর্ষের শেষ স্তরে এসে ঠেকেছে। কাজেই কাব্যসাহিত্য বিচারে তাঁরা বিনা-দ্বিধায় লাস্ট ওয়ার্ড, শেষ কথাটি বলে ফেলেন। ভুল ধারণা পুষ্ট অভিমত নির্ভুল হবে কি করে। আসলে কিন্তু নব-নব আবিস্কারের মতো শিল্প সাহিত্যও নব নব পরীক্ষার, প্রতিভা-আকস্মিকতার অপেক্ষা রাখে। অসীমিত তার ব্যাপ্তি ও স্কোপ।[১৫]

সানাউল হকের অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম আগ্রহের জায়গা মানুষের মন। সমাজের চারপাশে নানান মানসিকতার মানুষকে আনা-গোনা করতে দেখেছেন সানাউল হক। সে সব মানুষের মধ্যে এক শ্রেণির মানুষ রয়েছেন যারা অন্যের সমালোচনা করতেই বেশি পছন্দ করেন। আমরা তাদের পরচর্চাকারী বলে থাকি। সানাউল হক মনে করেন এসব পরচর্চাকারীদের মতোই আর এক শ্রেণির পরচর্চাকারী রয়েছে সাহিত্যভুবনে। তাঁর মতে সাধারণ অর্থে যাদের আমরা পরচর্চাকারী বলে থাকি তাদের চেয়ে কোন অংশেই কম পরচর্চা করেন না সাহিত্য সমালোচকরা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> সাহিত্যচর্চা বস্তুটা কি? হয়তো আহাম্মকী প্রশ্ন, কিন্তু বুজরুকি দেখিয়ে আপনি এড়িয়ে যাবেন, অসম্ভব। দেশে-দেশে যুগে-যুগে উপন্যাস যাঁরা লিখেছেন, ছোটগল্প ফেঁদেছেন কিংবা মঞ্চাভিনেতার মুখে কথা জুগিয়েছেন, ছড়া কবিতায় বর্ণনামুখর হয়েছে, তাঁরা শেক্সপীয়র, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, লরেন্স যিনিই হোন একনিষ্ঠ পরচর্চা বিশারদ। টলস্টয় হয়তো কথা বলেছেন, বাণী দিয়েছেন-আসলে এঁরা এবং এঁদের সগোত্র সবাই পরচর্চাকে আমল দিয়েছেন।[১৬]

সুদীর্ঘ জীবনে নানান পেশায় নিয়োজিত থাকলেও সানাউল হকের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে কোন বিরতি পড়েনি। অবসর পেলেই সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে তিনি যা ভেবেছেন, সে ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন সাহিত্যের নানা মাধ্যমে। সানাউল হক সব সময় মনে করতেন পাঠ্যপুস্তক বা বই হচ্ছে মানুষের জ্ঞানার্জন ও বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। বই-ই হতে পারে মানুষের জীবন ও সমাজ পরিবর্তনের উৎকৃষ্ট উপায়। তাই জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে আর পাঠককে উপহার দিতে হবে ভালো মানের বই। তবেই দেশ সমৃদ্ধি ও মর্যাদার জায়গায় আসীন হবে। তাই সানাউল হক "সমঝদার" প্রবন্ধে বলেন :

> উইলস কোম্পানীর ভাষায় বলতে গেলে 'আপনি কী হারাইতেছেন জানেন না।' এবার হাতে উঠুক বই-মাসিক, ঘরে ঘরে বসুক পড়ার আসর। কেবল লেখককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নয়, দেশের মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক মান বাড়াতে হলেও পাঠক চাই। চাই রস-রুচি অভিজ্ঞানের উৎসুকী এবং উৎসাহী সমঝদার।[১৭]

২. বেঁচে থাকার জন্য মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে অথবা খাওয়ার জন্যই মানুষ বেঁচে থাকে এরকম কথা বহুকাল ধরেই প্রচলিত। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মানুষ খাবার খায়। একথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই যে খাদ্য খায় বলেই মানুষ বেঁচে আছে। 'সাধারণত কোন অঞ্চলের মানুষ সে সব খাদ্যই খেয়ে থাকে যা ঐ অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং যা খেতে তারা অভ্যস্ত।'[১৮] প্রকাশকাল বিবেচনায় সানাউল হকের দ্বিতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ 'খাদ্যভুবন'। জানা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অজানা অনেক খাবার সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। এটি মূলত খাদ্য নিয়ে সানাউল হকের চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা-অভিমত ও খাদ্যগুণ বিচার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থ।

পৃথিবীর নানা প্রান্তের খাদ্য নিয়ে সানাউল হক গ্রন্থটি মলাটবন্দী করেছেন। এ গ্রন্থে সানাউল হক মোট পাঁচটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করেছেন। এ পাঁচটি প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের খাদ্য, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যরুচি তুলে ধরেছেন। 'খাদ্যভুবন' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো হলো- "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা", "খাদ্যগুণ ও প্রকরণ", "ভারতীয় খাদ্য", "বাঙালি খাদ্যের আদিসূচি", এবং "বাঙালির খাদ্যরুচি"। সানাউল হকের পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে একমাত্র "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা" প্রবন্ধে বেশ কয়েকটি উপ-শিরোনামা রয়েছে। "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা" প্রবন্ধের উপ-শিরোনামাগুলো হচ্ছে- "প্রাচীন গ্রীস ও রোম", "মধ্যযুগ", "ইতালীয় রেনেসাঁ", "ফরাসী খাদ্যশিল্প", "চৈনিক খাদ্য ও আহার: উপকরণ প্রাচুর্য", "চীন ভূ-খণ্ডে চৈনিক খাদ্য", "জাপান: সামুদ্রিক খাবার ও খাদ্যোপহার", "প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া: আদা মরিচ", "ইন্দোনেশিয়ার খাবার: নারকেল", "ফিলিপাইন খাদ্য: মাছের ভর্তা", "ভিয়েতনাম: লবণাক্ত মাছ", "শ্যামদেশ: থাইল্যান্ড যেমন খুশি খাও", "মধ্যপ্রাচ্য: জলপাই ও দই", "স্পেন ও পর্তুগাল: জলপাই ও কড মাছ", "ইতালীর খাবার: স্পেগটি ও এসপ্রেসো কফি", "অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় খাদ্য সমাহার: গুলাস ও চকোলেট", "শ্লাভিক ও রুশীয় খাদ্য: সুপ, টক দই ও গোমাংস", "জার্মানী: প্রাণপূর্ণতা", "স্ক্যান্ডিনেভিয়া: মীনখাদ্য সংস্কৃতি", "বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ: মাছ ও আলু", "লাতিন আমেরিকা: "ভুট্টা ও লাল লঙ্কা", "উত্তর আমেরিকা: খাদ্যে আন্তর্জাতিকতা"।

"রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা" প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যগ্রন্থ লেখকদের স্মরণ করেছেন। তাঁদের গ্রন্থের কোনটিতে খানাপিনার দর্শন ও খাদ্যশিল্পের আঙ্গিক, আবার কোনটিতে খাদ্য নিয়ে নিয়ম-নীতির কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সময়, সুযোগ পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং রুচির পরিবর্তনগত কারণে যুগে যুগে মানুষের খাবার তালিকায় নানাবিধ পরিবর্তন এসেছে। মানুষের জীবন ধারণের পরিবেশ ও সংস্কৃতির প্রভাব এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভূমিকা রাখে। মূলত পরিবেশ ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের খাদ্যরুচি ও খাদ্যতালিকা পৃথক হয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের খাদ্যরুচির স্বাতন্ত্র্য সে সব দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশভাগ। দেশভেদে নানান দেশের মানুষের খাদ্যরুচি পৃথক হলেও অনেক দেশের মধ্যে আবার একই রকমের খাবারের প্রচলনও দেখা যায়। তবে তা ভিন্ন ভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ভাষাগত কারণে ভিন্ন নামে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে। সানাউল হক 'খাদ্যভুবন' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> যা বাংলাদেশে আলু ভর্তা, ইয়োরোপে বা ইংল্যান্ডে তা-ই Mashed potato, ঢাকায় যা ফিরনি লন্ডনে তা-ই রাইস-পুডিং। আমাদের যা পিঁয়াজ-পাকোরা আমেরিকায় তা Fried onion rings I okra creoie ক্যারবীয়তে যা বিলেতী বেগুন ও ঢেঁড়স মিশ্রিত একটি টক জাতীয় খাদ্য, তা অনেকটা আমাদের খাট্টার মতো। গ্রীসীয় খাদ্য Lamb Gyros- pita bread with grilled lamb আসলে তা আমাদের পরোটা কাবাব বা তন্দুরী রুটিগোস্ত।[১৯]

সানাউল হকের 'খাদ্যভুবন' গ্রন্থের "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা" প্রবন্ধে মধ্যযুগের খাবার সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। মধ্যযুগের মানুষের খাবার ছিল বহুমুখী আয়োজনে সমৃদ্ধ। লেখক এখানে গল পরিবারের খাবার পদ্ধতি ও ভোজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। তখনকার দিনে বন-জঙ্গল-বিল থেকে পাখি সংগ্রহ করে ভোজন পিয়াসীরা ভোজনকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করতেন। প্রাবন্ধিক এখানে ফরাসি সম্রাট শার্ল লো মাইনের খাদ্য রুচিবোধের কথা বলেছেন। তাছাড়া লো মাইনের খাবার ঘরের সাজসজ্জার বর্ণনা পাওয়া যায় সানাউল হকের "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা" প্রবন্ধে। দীপিত অংশ হতে :

> ফরাসী সম্রাট শার্ল লো মাইন খাদ্যে মার্জিত রুচির প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর খাবার ঘরকে আইভি লতায় সাজিয়েছিলেন। ফুল ছড়ানো ছিলো গৃহের চত্বরে। টেবিল ভর্তি ছিলো সোনা রূপোর বাসনপত্র। কিন্তু খাবার ছিলো সাদামাটা, খাদ্যতালিকা স্বল্পবিন্যাসী।[২০]

সানাউল হক ফরাসি দেশের খাদ্যশিল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়েছেন। খাদ্যরুচিতে ফরাসিরা অভিজাত শ্রেণির মানুষ। এখানকার মানুষেরা রুচির পরিবর্তন ঘটানোর জন্য মাঝে মাঝে খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন নিয়ে আসেন। ফ্রান্সের খাদ্যশিল্পের যে বর্ণনা সানাউল হকের প্রবন্ধে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সারা বিশ্বের অন্যতম যে সব খাদ্য রয়েছে তার ব্যবহার হয় ফ্রান্সে। ফ্রান্সের পাশাপাশি প্রাবন্ধিক চীন দেশের মানুষের খাদ্যাভাস ও তাঁদের নানা রকম খাদ্য নিয়ে কথা বলেছেন। 'চীন দেশের একটি মূল্যবান প্রবাদ রান্নাঘরে পাচক ডাক্তারখানায় ডাক্তারের চেয়েও দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি।'[২১] চীনের যে রন্ধনশিল্প তার প্রসিদ্ধি পৃথিবীজোড়া। বলা যেতে পারে ফ্রান্সের পরই সে প্রসিদ্ধির স্থান। এ দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় যে সব খাবার রয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে অন্য কোন দেশের সঙ্গে সাজুয্য রক্ষা করলেও কিছু খাদ্য একেবারেই ভিন্ন। এমনকি শুধু চীনদেশের খাদ্যরুচি-ই পাঁচটি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত। সানাউল হক চীনা জনগোষ্ঠীর খাদ্য সম্পর্কে লিখেছেন :

> কিছু কিছু খাবার এবং খাদ্যশিল্পের ঐতিহ্য আবহমানকাল ধরে চালু থাকে। উত্তর চীন বাদে যেখানে গমের প্রচলন, সারাদেশে চাউল প্রধান খাদ্য। মাছ সকল অঞ্চলে অতি গুরুত্বপূর্ণ। শূকর মুর্গি এবং হাঁস প্রচুরভাবে খাওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে নানা ধরনের সবজি যেমন ব্যঙছাতা, বংশাঙ্কুর, পানিফল, এবং সীমমঞ্জরী। চীনারা তাদের খাবার সয়াবিন সস্ দিয়ে রসাপ্লুত করে। চৈনিক খাদ্যের একটি বৈশিষ্ট্য তাদের উদ্ভাবনী বুদ্ধিপ্রসূত চর্বি ব্যবহার যা নানাভাবে তৈরী হয় এবং সেয়ানা বাবুর্চির হাতে প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করে। খাবারের সঙ্গে চা পান চীনদের অভ্যেস। সবুজ চা, জেসমিন চা ফুল পাতা সহযোগে হাতলের পাত্রে পরিবেশিত হয়।[২২]

সানাউল হক প্রবন্ধে জাপানিদের খাদ্য নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। জাপানের মানুষ অত্যন্ত পরিপাটি। তাদের সেই পরিপাট্য বাইরে যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি খাবার টেবিলেও। তবে মজার বিষয় এ দেশের মানুষের খাদ্য-উপহার প্রদান পদ্ধতি। 'একজন জাপানী নববধূ বিয়ের উপহার হিসেবে পঞ্চাশোর্ধ খাবার সামগ্রী পেয়ে থাকে।'[২৩] লেখক প্রবন্ধের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার মানুষের খাদ্য নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ দেশের মানুষের মধ্যে যে খাবারটি ঐক্যের সাধন করেছে তা হচ্ছে নারিকেল। অর্থাৎ নারিকেল এখানকার মানুষজনের অন্যতম সাধারণ খাদ্য। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলোর নারিকেল ব্যবহারের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার নারিকেল ব্যবহারের মিল রয়েছে। নানা দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বিচিত্র খাদ্য সম্পর্কে লেখক ধারণা লাভ করেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতামিশ্রিত খাদ্যভাবনা তালিকায় আর যে সব দেশের খাদ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সে সব দেশের মধ্যে আছে- ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, আফ্রিকা, রাশিয়া, জার্মানি, বৃটেন, লাতিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি। প্রায় ২০০ বছর এ অঞ্চলকে শাসন করার কারণে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও খাদ্যরুচির উপর বৃটিশদের একটা বড় প্রভাব রয়েছে। তবে একথা সত্য যে জীবনে তারা যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল খাদ্যে ততটা পারে নি। সানাউল হক তাঁর "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা" প্রবন্ধের সবশেষে লাতিন আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকার খাদ্য নিয়ে আপন অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকা বিভিন্ন দেশের মানুষের আগ্রহের আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানকার খাদ্যশিল্পে বিভিন্ন দেশের খাদ্যসম্ভারের দেখা মেলে। এ প্রসঙ্গে সানাউল হক লিখেছেন :

> আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেণী ভিন্নতার মতো খাদ্যশিল্পও বহুমিশ্রণের আবাসভূমি। এখানে খাদ্যে ইয়োরোপীয়, আফ্রিকান, মধ্যপূর্বীয় ও প্রাচ্যের প্রভাব লক্ষণীয়। নিয়ুয়র্কে যেমন দুনিয়ার সব দেশের খানা খেতে পাওয়া যায়, ফ্লোরিডাতে গ্রীক ও কিউবান খাদ্যও তেমনি সাধারণ ব্যাপার। মধ্য পশ্চিমের শহরগুলোতে জার্মানি এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় চীনা খাদ্যের প্রচলন। দক্ষিণাঞ্চল এবং দেশের অন্যত্র আফ্রিকী খাবার চালু। মেক্সিকো ও স্পেনের খাদ্য দক্ষিণ পশ্চিমের রেস্তোরায় ভর্তি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের এইসব খাদ্যবস্তু অবশ্য স্থানীয় রুচি মোতাবেক পরিবর্তিত ও গ্রহণোপযোগী করা হয়েছে।[২৪]

'খাদ্যভুবন' গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ "খাদ্যগুণ ও প্রকরণ"। এ প্রবন্ধের সূচনাতে সানাউল হক বাঙালির খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। এখানে লেখক দেখিয়েছেন ভৌগোলিক অবস্থানভেদে মানুষের খাদ্য তালিকা ভিন্নতর হয়। তবে তিনি মনে করেন এই খাদ্য ভিন্নতার মূল কারণ অর্থনৈতিক বিভেদ। সানাউল হকের মতে, খাদ্যের এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তিনি বলেন :

> রুচি ও ভূগোলের মানুষের ব্যবহারিক খাদ্যোপকরণ বৈষম্যের প্রকৃষ্ট কারণ অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য। উন্নতিশীল দেশ ও উন্নয়নশীল দেশ, পশ্চিমী দুনিয়া ও তৃতীয় বিশ্ব- নর্থসাউথ দেশ বিদেশের খাদ্যাচার অসঙ্গতির মৌল কারণ ওখানেই। এমন কি যেটা সত্যিই দুঃখজনক, একই দেশে অর্থনৈতিক স্বরভেদে খাওয়াদাওয়ার রূপ প্রকৃতি ও পরিমাণে ভিন্নতরভাবে দেখা দেয়।[২৫]

খাদ্য প্রকরণের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন সানাউল হক। লেখক মনে করেন পৃথিবীর মানুষের খাদ্যরুচি যেভাবেই বিকশিত হোক এবং তিনি পৃথিবীর যে প্রান্তেরই মানুষ হোন না কেন তা এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন একটি খাদ্য একজনের কাছে অরুচিকর মনে হতে পারে তবে সে খাদ্য আবার কারো না কারো দেহে পুষ্টি জোগান দেয়। লেখকের মতে মানবদেহ আসলে একটা তপ্ত ইঞ্জিন। তিনি মানুষের দেহোপযোগী বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বিস্তর ব্যাখ্যা করেছেন। সানাউল হক মনে করেন খাদ্য খেয়ে যেমন মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে ওঠে তেমনি খাদ্য-গ্রহণের সুষ্ঠু প্রক্রিয়াও হতে পারে জীবন রক্ষার মহৌষধ। তাই তিনি এ প্রবন্ধের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লঞ্জিভিটি রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক নেইথন প্রিটিকিনের প্রদত্ত খাদ্য তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।

"ভারতীয় খাদ্য" সানাউল হকের 'খাদ্যভুবন' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির মধ্যে সানাউল হক ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক এখানে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ও ঢাকার মানুষের খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন প্রক্রিয়াকে আলোচনার পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ভারতের বড় একটি জনগোষ্ঠীর খাবারে শস্য নির্ভরতা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসব ও পূজা পার্বণের সময় নানা পদের খাদ্যসম্ভারের মাধ্যমে নৈবেদ্য নিবেদন প্রথার উল্লেখ করেছেন সানাউল হক। লেখকের মতে এ অঞ্চলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর শাসন; বিশেষত মোঘলদের প্রভাবে খাদ্য তালিকায় অনেক নতুন নতুন খাবারের সন্নিবেশ ঘটে।

"বাঙালি খাদ্যের আদি সূচি" প্রবন্ধে সানাউল হক বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ সময়ের খাদ্য তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'বহুকাল ধরেই আমাদের রান্না ও খাওয়ার নিয়মনীতি প্রায় একই রকমে আবর্তিত, প্রবর্তিত হয়ে চলেছে।'[২৬] বিভিন্ন সময়ে রচিত সাহিত্যে খাদ্য সংক্রান্ত যে সব তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়, লেখক তা এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' থেকে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', কবি শঙ্করের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যসহ অনেক কিছুই এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় এসেছে, যার মধ্যে বাঙালি জাতির খাদ্যের নানা পরিচয় নিহিত রয়েছে। তাছাড়া 'ময়মনসিংহ গীতিকায়' ও 'পদ্মপুরাণে' বাঙালির খাদ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন। এ অঞ্চলে অসংখ্য ছোট বড় খাল বিল, নদ নদী থাকার কারণে খাদ্য হিসেবে মাছের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সানাউল হক দেখিয়েছেন অনেক আগের দিনেও মাছের ব্যবহার ছিল যে কোন খাবারের তুলনায় বেশি। তাছাড়া লেখক বাঙালির খাদ্যসূচিতে ভাত, মাংস, ডাল, শবজি, ফল, দুধ, নারিকেল, পিঠা-পুলি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। খাদ্যে সবজির ব্যবহার সম্পর্কে লেখক বলেন :

> নানা প্রকারের শাক খাওয়ার অভ্যেস বাঙালির সুপ্রাচীন। কিন্তু ভেবে অবাক হই, উদ্ভিজ যে সব সবজি-তরকারী আমরা আজকাল খেয়ে থাকি তাদের অধিকাংশই যেমন বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, কাকরুল, কচু

> প্রভৃতি আসলে আদি অস্ট্রেলীয় অষ্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এসব তরকারি অবশ্য বাঙালি প্রাচীনকাল থেকেই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।[২৭]

সানাউল হকের 'খাদ্যভুবন' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধের নাম "বাঙালির খাদ্যরুচি"। প্রবন্ধটিতে লেখক বাঙালির খাদ্যরুচি নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করেছেন। এখানে প্রসঙ্গ হিসেবে লেখক অনেক প্রকার খাদ্য ও অনেক জায়গার খাদ্যের কথা বললেও বাঙালির খাদ্যরুচি সম্পর্কে তাঁর আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে বাঙালির ঘরোয়া খাদ্য। আর এসব খাদ্যের নির্মাতা বাঙালি গৃহলক্ষ্মীরা। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। তাছাড়া খিঁচুরির ঘ্রাণ বাঙালিকে সব সময়ে বিমোহিত করে বলে সানাউল হক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে সময়ের ব্যবধানে বিদেশের প্রভাবে বাঙালির জীবনধারার মতো খাদ্যরুচিতেও প্রতিনিয়ত একটা পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

৩. সানাউল হকের তৃতীয় প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য'। গ্রন্থটির মধ্যে সানাউল হক ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার নানা প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেখানে তাঁর নিজের জীবন-কথার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে সময়-সমাজ, ঐতিহ্য-ইতিহাস, দেশাত্মবোধ, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির কথা। লেখকের এ গ্রন্থ সম্পর্কে সানাউল হক রচনাবলীর সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন :

> তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে মোট ষোলটি রচনা। এ গ্রন্থের অধিকাংশ লেখাই ব্যক্তিগত রচনার পরিচয় অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রবন্ধের সীমানায়। গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত কোন রচনায় আছে সানাউল হকের প্রগত সমাজচেতনার পরিচয়, কোনটিতে আছে তাঁর মাতৃভাষা প্রীতির কথা, কোনটিতে আছে ঐতিহ্যস্মরণ, কোথাও বা বন্ধুস্মৃতি কিংবা আত্মকথা।[২৮]

'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য' গ্রন্থের ষোলটি প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধের নাম ''তারুণ্যের দিনলিপি''। এখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতার একটি দীর্ঘ ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করেছেন। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ থেকে শুরু করে ১৩৫১ বঙ্গাব্দ এই তিন বছরের অনেক খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা অখণ্ড রূপে প্রকাশ পেয়েছে "তারুণ্যের দিনলিপি" প্রবন্ধে। এখানে লেখকের সমাজবোধ ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ সহমর্মিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ প্রবন্ধের একেবারে সূচনাতে লেখক বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীর আবহকে ঘিরে আপন হৃদয়ে সংগুপ্ত অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> তেরোশ' উনপঞ্চাশের বিদায় মুহূর্তে আজ বারবার মনে পড়ছে কয়েকটি দিনকে। যে দিনগুলো আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বিস্ময়ের জগতে এনেছিলো নতুন রূপ আর নব নব অভিব্যক্তি। দেহ ও মনের নাড়ীতে বিপ্লব বাঁধানোর অপরিমেয় রুদ্র সমারোহ- মনে পড়ে সে কটি লাল দিনকে।[২৯]

ফ্যাসিবাদ ও বুর্জোয়াবাদের বিরুদ্ধে মানুষের জেগে ওঠার কথা আছে "তারুণ্যের দিনলিপি" প্রবন্ধে। লেখক নিজেও অনেকের মতো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। ফ্যাসিস্টদের অনেক কর্মকাণ্ড সানাউল হকের মানসচেতনাকে আহত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি ফ্যাসিস্টদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। সানাউল হক এ সময় মানবতাবোধের যে বিপর্যয় দেখেছেন প্রবন্ধে তা তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ধর্মের নাম ভাঙিয়ে মানুষের অধর্মাচার দেখে ব্যথিত হয়ে তিনি বলেন :

> মানুষের, তথা মানবতার উন্মেষের জন্য, তার কল্যাণের জন্য যার আবির্ভাব, নিত্য অমঙ্গল ঘটানোই যদি তার প্রকৃত কাজ হয়ে দাঁড়ায়, এমন ধর্মকে রেখে লাভ কী? ইঁদুর বধের জন্য যে বিড়ালকে ঘরে আশ্রয় দেয়া হলো, সে বিড়াল যদি নিজেই ইঁদুরের চেয়ে অধিক নষ্টামিতে মত্ত হয়, তবে গৃহস্তের কাজ তাকে ঘর ছাড়া করা। ভারতে ধর্মের বেলায়ও এ কথাটি খাটে।[৩০]

তরুণ বয়সের বর্ণবহুল দিনের কথা সানাউল হক "তারুণ্যের দিনলিপি" প্রবন্ধে অভিব্যঞ্জিত করলেও এখানকার অধিকাংশ জায়গায় তাঁর বেদনাহত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সহপাঠী কিংবা শিক্ষকের মৃত্যু, বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, ভ্রাতৃবিয়োগ, মানুষের নিষ্ঠুরতা, মন্বন্তর ইত্যাদি বিষয়ের কারণে তাঁর কোমল মনের

অভিঘাত ফুটে উঠেছে "তারুণ্যের দিনলিপি" প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে সানাউল হক ঘুরে ফিরে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের স্মরণ করেছেন। তিনি কমরেড আবদুল মোমেন, কমরেড নেপাল নাগ, কমরেড জ্যোতি বসু, কমরেড রণেশ দাশগুপ্ত, কমরেড প্রত্যক্ষ দত্ত, কমরেড সোমেন চন্দ প্রমুখ মহৎ ব্যক্তির কথা স্মরণ করেছেন। এ সকল কম্যুনিস্ট নেতাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সানাউল হকের এক ধরনের সমর্থন স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রবন্ধের ভাষায় :

> আমি একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এঁরা সবাই অসাধারণ বক্তা, এঁদের মনে জ্বলছে আগুন, জনসাধারণ, বিশেষ করে শ্রমিকদের নাড়ির সাথে জোর সম্বন্ধ এঁদের। প্রত্যেকটি কথা বলতে পারেন চমৎকার যুক্তি ও অপরিমেয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। এঁরা যে হঠাৎ রাতারাতি হয়ে ওঠা লিডার নন, এঁরা যে শুধু বিদ্যা-বুদ্ধির বলে নেতা নন, এঁরা শুধু জন্মভাগ্য দ্বারাই নেতৃত্ব পাননি তা স্পষ্ট বোঝা যায় এঁদের প্রতিটি কাজে ও বীর্যবান কথায়। কমিউনিস্ট পতাকা কেনো লাল এঁদের বক্তৃতা শুনে এ কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি; শত শ্রমিক মজুরের বুকের রক্ত আর এই সব বীরের মনের আগুন একত্র হয়ে রক্তপতাকা এতো রক্তিম করে তুলেছে। আমারো বলতে ইচ্ছে হয়: 'লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ।'[৩১]

"যুদ্ধ নয় শান্তি" সানাউল হকের লেখা ইতিহাস ও সমাজবোধে জারিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে সানাউল হক ইতিহাসের ভয়াবহতম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) ভয়াল দিনগুলোর ছবি এঁকেছেন। দীর্ঘ ছয় বছরের এ যুদ্ধে পৃথিবীর মানুষকে যত ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে হয়েছে পূর্বাপর সময়ে আর তা দেখতে হয়নি। সত্তরটির বেশি দেশ এবং এগার কোটির বেশি লোকের অংশ নেয়া এ যুদ্ধে কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। আহত হয় তিন কোটিরও বেশি লোক। বিশ্বযুদ্ধের এই ভয়াবহতা লেখকের মনে যে অভিঘাত তৈরি করে "যুদ্ধ নয় শান্তি" প্রবন্ধটি তার-ই প্রতিফলিত রূপ। তবে সানাউল হক এ প্রবন্ধের শেষ প্রান্তে এসে আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, 'উজ্জ্বলতর যুগ এক আসবে, আমাদের পৃথিবীতে শান্তিকপোত উড়বে।'[৩২]

বিশ্ব সাহিত্যে রুশ কবিদের অবস্থান ও তাঁদের কাব্য-কবিতার বিষয়-আশয়কে উপজীব্য করে সানাউল হক "আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা" নামক প্রবন্ধ লিখেছেন। ২২ জন রুশ কবি সম্পর্কে লেখক এ প্রবন্ধে আলোকপাত করেছেন। আন্না আখমাতোভা (১৮৮৯-১৯৬৬) থেকে শুরু করে বরিস পাস্তারনক (১৮৯০-১৯৬০), রাসুল গামজাতোভ (১৯২৩-২০০৩), বেলা আখমাদুলিনা (১৯৩৭-২০১০) ও অন্যান্য অনেক খ্যাতিমান কবির সম্পর্কে সংক্ষেপে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন প্রাবন্ধিক সানাউল হক। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত 'শ্বেততুষার রক্তজবা' শীর্ষক গ্রন্থে সানাউল হক রুশ কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ভূমিকাংশই বর্তমান গ্রন্থে 'আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা' শিরোনামে পত্রস্থ হয়েছে।'[৩৩] এ সম্পর্কে সানাউল হকের অভিব্যক্তি :

> অনূদিত কবিতাবলীর কবি যাঁরা তাঁদের ক্ষুদ্র পরিচিতি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কবিতা, কাব্যকারুশিল্পতা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় নি। নেপথ্যকারী কবি যারা সুদূর দেশের মানুষ ভিন্ন ভাষার কবিতা যা শ্রুতি শ্রবণ ও বোধির অন্তরাল, নিশ্চিত কিছু ভাষ্যকারিতার দাবি রাখে। হয়তো তারো বেশী দাবি, এই কাব্য-সংগ্রহের পাঠক-পাঠিকাদের। টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত আলোচনা-যেমন বুদ্ধদের বসু করেছেন তাঁর অনূদিত বোদলেয়ার কাব্যগ্রন্থে-আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু প্রসঙ্গত গুটিকয় কথা বলার চেষ্টা করবো।[৩৪]

বিশ্বসাহিত্য নিয়ে সানাউল হকের ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে তাঁর "আধুনিক রুশ কবি কবিতা" প্রবন্ধে। আর "আমার কথা" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন তাঁর নিজের সাহিত্য নিয়ে তেমন কোন সমালোচনা না হওয়া প্রসঙ্গে। সানাউল হক তাঁর নিজের সাহিত্যকে ঘিরে সমকালে বা জীবদ্দশায় তেমন কোন সমালোচনা দেখতে পান নি। তিনি মনে করেন পেশাগত কারণে জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অবস্থান এবং সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামজিক সম্পর্ক গড়ে না ওঠার কারণেই এমনটি ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সানাউল হক বলেন :

ক.

> সাহিত্যাসরে যাকে আলাপ আলোচনা বলা হয়, এবং যা যথারীতি সাংবাদিক রিপোর্টারের মাধ্যমে পত্র-পত্রিকায় কালকালির কাল অক্ষরে ছাপা হয়, আমাকে নিয়ে সে ধরনের আলাপ আলোচনা মন্তব্য দেখা যায়নি।[৩৫]
>
> খ.
>
> পেশাগত কারণে আমি ছিলাম কিছুটা বিচ্ছিন্ন নিজে ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে, নিজ কাব্য বাসভূমিতে। তবু স্ব-সংসারে সৎ ও মূল্যবোধে অকৃত্রিম। কিন্তু সত্যার্থে হৃদয় যোগাযোগ, অনুভূতি গাঢ়তায় এবং গণ মানুষের আত্মীয় নেশায় আমি ছিলাম বিশ্বচারী ক্ষুদ্রতন্ত্র বেরী সমাজ সচেতনতার উন্মুখ পায়চারী।[৩৬]

মানুষের জীবন যাপনের সকল উপকরণ-উপাদান, এমনকি চিন্তা-চেতনা তার সংস্কৃতির অন্তর্গত।'[৩৭] সানাউল হক ছিলেন দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সচেতনতায় অঙ্গীকারবদ্ধ লেখক। "নববর্ষের মেলায়" সানাউল হকের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চেতনামিশ্রিত অসাধারণ একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে লেখক বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের উৎসব বর্ষবরণের উৎসবমুখর দিনের কথা স্মরণ করেছেন। নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসব। সুদীর্ঘকাল থেকে এ অঞ্চলের মানুষ পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে আনন্দ-উৎসবে নতুন বছরকে গ্রহণ করে। এ সময় মানুষ মানুষের মঙ্গল কামনা করে, শুভ ও সুন্দরের প্রত্যাশা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ বিভিন্ন সময় নববর্ষ পালন করলেও বাঙালির এ উৎসবের দিন পহেলা বৈশাখ। চৈত্রের খরতাপ মাথায় নিয়েই বাঙালি বর্ষবরণ উৎসবে মত্ত হয়। বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে নববর্ষ উদযাপনের একটা সম্পর্কের কথা সানাউল হক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে এ উৎসব পালনে কারো কারো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কথাও লেখক স্বীকার করেছেন। তবে যার যা ভাবনা-মতবাদ থাকুক না কেন সানাউল হক নববর্ষকে বাঙালির প্রাচীনতম উৎসব হিসেবে সমর্থন যুগিয়েছেন এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলাকে তিনি আনন্দ লাভের উপযোগ মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি :

> বাংলা নববর্ষের সার্বজনীন অনুষ্ঠানমালার মধ্যে বার্ষিক মেলার আয়োজনও একটি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সারা বৈশাখ মাস ধরে, সবিশেষ পয়লা বৈশাখেরও বড় ছোট নানা মেলা বসে। স্থানীয় লোকেরাই এসব মেলার আয়োজন করে থাকেন। জনসাধারণের আনন্দদানের উপযোগী আয়োজনও এসব মেলায় অনেক থাকে।[৩৮]

সানাউল হক আজীবন মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেছেন। সমসাময়িক ব্যক্তি-মানুষের স্মৃতিচারণা প্রাসঙ্গিকভাবে লেখকের প্রবন্ধের অংশ হয়ে উঠেছে। আত্মিক সম্পর্কের প্রিয়জন হারানোর ব্যথায় লেখক কখনো কখনো ব্যথিত হয়েছেন। সানাউল হকের প্রিয়জন হারানোর বিষণ্ন হৃদয়ের কথা উঠে এসেছে "বয়ানে জহুর", "সৈয়দ নুরুদ্দিন" ও "আমার বন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ" নামক প্রবন্ধের মধ্যে। এ তিনটি প্রবন্ধে তিনজন ব্যক্তির সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক ও তাঁদের মৃত্যুর পর নিজের মানসিক অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রশিল্পী জহুর হোসেন চৌধুরী সম্পর্কে সানাউল হক লিখেছেন 'উৎকৃষ্ট-আত্মীয়জনের সাক্ষাত লাভ করেছি।'[৩৯] সৈয়দ নুরুদ্দিন ছিলেন সানাউল হকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন, চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সম্পর্ক জড়ানো বন্ধু। "সৈয়দ নুরুদ্দিন" প্রবন্ধে সানাউল হক নুরুদ্দিনের বিদায়বেলার স্মৃতিময়তা প্রকাশ করেছেন। আর "আমার বন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন দৃষ্টির অতীত দৃষ্টির মানুষ, অগোচর ঘটনা-সন্ধানী সৃষ্টির নির্মাতা। কৌতুক প্রিয়, সুখময় আনন্দলোকের যাত্রী। স্বলিখনে অপরান্মুখ, স্বকথনে বলীয়ান, মিতকণ্ঠ, কিন্তু ক্ষুরধার স্বর, ভাষাও কাহিনীর একজন সমর্থ শ্রমিক, হয়তো প্রেমিক।[৪০]

ভাষা আন্দোলনের চেতনা, দেশাত্মবোধ ও শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় সানাউল হকের প্রবন্ধে। ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষা বাঙালির অফুরন্ত আবেগের বিষয়। 'এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না

যে আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্ভুবনে ভাষা আন্দোলনের মতো প্রভাবসঞ্চারী কোন অনুষঙ্গ নেই। উনিশশ' বায়ান্ন সালে বাঙ্গালি জাতির রক্তাক্ত উজ্জীবনের অব্যবহিত পরেই আমাদের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে।'[৪১] 'তারুণ্যের দিনলিপি' গ্রন্থে সানাউল হক এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ভাষা আন্দোলন ও দেশাত্মবোধমিশ্রিত লেখকের প্রবন্ধগুলো হচ্ছে- "জয় অমর একুশে: কিছু কথা", "শহীদ দিবস", "কবিতায় একুশের চেতনা", "আ-মরি বাংলা ভাষা", "একুশ আমাদের পরিচয়", "সংস্কৃতি জীবনে একুশের চেতনা" এবং "সৎ ও সত্যের স্বপক্ষে"। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার দাবিতে এদেশের অনেক মানুষ আন্দোলন করে জীবন উৎসর্গ করেন। সানাউল হক সে সকল ভাষা-শহীদদের আত্মদান ও মহত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন "জয় অমর একুশ : কিছু কথা" প্রবন্ধে। এ দেশের সাহসী ও সংগ্রামী তরুণরা ভাষাপ্রেমে বুলেটের সামনে বুক পেতে দেওয়ার মাধ্যমে সমগ্র বাঙালিকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলো। সানাউল হক মনে করেন এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে জাগরণ তার সূচনা ভাষা আন্দোলন থেকে। লেখক এ জন্য নিজেদের গর্বিত জাতি মনে করেন। তবে প্রবন্ধে সানাউল হকের বিষাদের সুর ধ্বনিত হয় ১৯৭৫ সালে জাতির জনকের হত্যাকাণ্ড ও তৎপরবর্তী সময়ের দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট পরিস্থিতি ভাবনায়। কিন্তু লেখক আশাবাদী মানুষ হওয়ায় এ প্রবন্ধের শেষে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'গণসংহতি, ঐক্য ও গণতন্ত্র আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী হোক, একুশে ফেব্রুয়ারির ঔজ্জ্বল্যে, সততা ও নিষ্ঠা আমাদের জীবন পুনরুজ্জীবিত হোক। জয় অমর একুশ।'[৪২]

একুশ বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচক। 'একুশের ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। কিন্তু কালক্রমে এটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।'[৪৩] এ দেশের মানুষের জীবনধারায় একটি নতুন পথ-নির্দেশক হয়ে ওঠে একুশ। ফলে শিল্প-সাহিত্য সবকিছুতেই একুশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একুশের আত্মত্যাগের মহত্বের কথা উঠে আসে কাব্য-কবিতার শব্দের বুননে। সানাউল হক নিজেও সময়ের একজন খ্যাতিমান কবি। কবিতার মধ্যে একুশের চেতনা তাই তিনি ভালোভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর মতে মায়ের-ভায়ের-বোনের মুখের ভাষা ছিনিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একুশ নিয়ে একুশ পরবর্তী কাব্য-কবিতা প্রকৃত অর্থে বাঙালির প্রেরণার প্রতীক। তাই "কবিতায় একুশের চেতনা" প্রবন্ধে সানাউল হকের উচ্চারণ :

> একুশ সত্যার্থে আমাদের জীবন বিকাশের দ্বারোদ্ঘাটক। বিস্তীর্ণ প্রসারী অথচ নির্মল সুস্থ জীবনধারার পথ নির্দেশক। থমকে থাকা পথের বাঁকে আমরা যেন চমকে উঠলাম। সচকিত যাত্রাপথে একুশোত্তর আমাদের কর্মকাণ্ড-রাজনীতি, সামাজিকতা এবং কাব্যসাহিত্য ভিন্নধর্মী এক বিপুল প্রেরণার স্বাক্ষরবহ।[৪৪]

জীবন ও জীবনের চারপাশের পরিবেশের খণ্ড খণ্ড বিষয়কে স্পর্শ করে প্রবন্ধ লিখেছেন সানাউল হক। 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', 'খাদ্যভুবন' এবং 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য' তিনটি গ্রন্থের মাধ্যমে লেখক নতুন একটি পথরেখা সৃষ্টি করেছেন। একজন সাহিত্যিক হিসেবে সানাউল হকের বড় পরিচয় তিনি কবি। চল্লিশের দশকের কবিতাভুবনে তাঁকে অন্যতম কবির মর্যাদায় বিবেচনা করা হয়। তবে কবিতার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমেও তাঁর অবদান যে কোন অংশেই কম নয় সে সাক্ষ্য দেয় লেখকের এ তিনটি রচনা। এসব গ্রন্থে সানাউল হক জীবনের বহুবিধ বিষয়-আশয়কে সরল ভাষায়, সহজ গদ্যে পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। শিল্প-সাহিত্য, স্বদেশ-ভাষা, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ এমন কোন বিষয় নেই যা তাঁর প্রবন্ধে উঠে আসে নি। ফলে বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় সানাউল হককে একজন নিষ্ঠাবান প্রাবন্ধিক হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন হবে।

তথ্যনির্দেশ

[১]. দিপ্তী ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্য-পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৫৮, পৃ. ১০

[২]. বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত 'জীবনী গ্রন্থমালা-সানাউল হক', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১১

[৩]. তদেব, পৃ. ২৯

[৪]. তদেব, পৃ. ৩৫

[৫]. দিলারা হাফিজ, 'বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৩

[৬]. খোন্দকার সিরাজুল হক, 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ : সমাজচিন্তা ও সমাজকর্ম', কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৬৭

[৭]. অধীর দে, 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯

[৮]. বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, 'জীবনী গ্রন্থমালা: সানাউল হক', পূর্বোক্ত পৃ. ৬৯

[৯]. সানাউল হক, "সেতার", 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৬

[১০]. ঐ, "আত্ম-পর", "ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৩

[১১]. ঐ, "ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ", 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮০

[১২]. ঐ, "টান ও টানাটানি", 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৮

[১৩]. ঐ, "স্ত্রী", 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭

[১৪]. ঐ, "নবজাতক", 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯

[১৫]. ঐ, "শর্ট-কাট", 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৩

[১৬]. ঐ, "পরচর্চা", 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৬

[১৭]. ঐ, "সমঝদার", 'ইচ্ছা ব্যাপ্তি আনন্দ', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯

[১৮]. মোহাম্মদ নুরুল হক অনূদিত, 'খাদ্য বনাম জনসংখ্যা', নয়া দুনিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ২৫

[১৯]. সানাউল হক, "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা", 'খাদ্যভুবন', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

[২০]. ঐ, "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা", 'খাদ্যভুবন', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬

[২১]. তৈয়বা হক, 'স্বাস্থ্য খাদ্য ও রান্না', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ১০

[২২]. সানাউল হক, "রন্ধনশিল্প ও সভ্যতা", 'খাদ্যভুবন', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬

[২৩]. তদেব পৃ. ৩৬২

[২৪]. তদেব পৃ. ৩৬৫

[২৫]. ঐ, "খাদ্যগুণ ও প্রকরণ", 'খাদ্যভুবন', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭

[২৬]. তৈয়বা হক, 'স্বাস্থ্য খাদ্য ও রান্না', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

[২৭]. সানাউল হক, "ভারতীয় খাদ্য", 'খাদ্যভুবন', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত,পৃ. ৩৮৯

[২৮]. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৪৭

[২৯]. সানাউল হক, "তারুণ্যের দিনলিপি", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত,পৃ. ১৪৫

[৩০]. তদেব, পৃ. ১৪৬

[৩১]. তদেব, পৃ. ১৫৬

[৩২]. ঐ, "যুদ্ধ নয় শান্তি", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২১

[৩৩]. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৮

[৩৪]. সানাউল হক, "আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭২

[৩৫]. ঐ, "আমার কথা", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৪

[৩৬]. তদেব, পৃ. ২১৬

[৩৭]. মাহবুব হাসান, 'বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদান', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩

[৩৮]. সানাউল হক, "নববর্ষের মেলা", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২১১

[৩৯]. ঐ, "বয়ানে জহুর", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৪

[৪০]. ঐ, "আমার বন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩১

[৪১]. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের সাহিত্য', আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩১৪

[৪২]. সানাউল হক, "জয় অমর একুশ: কিছু কথা", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৬

[৪৩]. মাহবুবর রহমান, 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১', সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১০১

[৪৪]. সানাউল হক, "কবিতায় একুশের চেতনা", 'তারুণ্যের দিনলিপি ও অন্যান্য', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, সানাউল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

ওসমানীয় সাম্রাজ্যে রুশনীতি, ১৭৭৪-১৮৫৬ খ্রি.

ড. মোসা. ছায়িদা আকতার*

Abstract : European desires for material wealth, resources and culture of the East led them to undertake military exploits for centuries together under the garb of crusades. Being failed to establish Christian Kingdoms in the East and also being aware of the rich complexity of Muslim culture, the Christian nations embarked on an era of commercial relations with their Muslim counterparts. In addition, they also succeeded in their missionary ativities in the east which gave them a position of importance in the Middle East. Being a European power, Russia was not an exception to this. With the passage of time, Russian success in becoming a major European power was partly of the expense of the declining Iranian and Ottoman Empires. The tsars were determined to establish themselves on the Black Sea and to dominate access to the rivers that flowed into it. Since then till the end of the seventh decade of the nineteenth century Russian endeavours to topple the Ottomans were a dominant concern of European diplomacy. A landmark along the road to Russian mastaery of the region was the 1774 treaty of Kuchuk Kainarji, which became the basis of Russo-Ottoman relations until the World War I, and this document no doubt ended the Ottoman's exclusive domination of the Black Sea. Since then Russia looked for an unequivocal entrance into the Mediterranean. This was taken by England as a warning of gaining Russian might in the Middle East. Henceforth, the Western diplomacy centered around the Ottoman Empire with the avowed aim of checking the Russian domination in the area. The present paper is a humble attempt to highlight the Russian policy towards the Ottoman Empire since its origin in the late eighteenth century till the mid fifties of the nineteenth century and also to evaluate the attitude of the Western European powers towards it.

ওসমানী সাম্রাজ্য

ওসমানীয় সাম্রাজ্য মধ্যযুগের ইতিহাসে বৃহত্তম সাম্রাজ্য। এর পরিধি উত্তর-পশ্চিমে হাফসবার্গ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ভিয়েনা, উত্তর পূর্বে তুর্কী গোল্ডেন হোর্ড খানেট, দক্ষিণে আরব ভূখণ্ড হয়ে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে এমন বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রাচীন রোমান আমল বা প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় আরব সময়েও ছিল না। অটোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এত বিস্তৃত এ সাম্রাজ্য কোন সময়েই দ্বিধা-বিভক্ত হয়নি। আরব সাম্রাজ্য দশম শতকে তিনটি খিলাফতে বিভক্ত হলেও ওসমানীয় সাম্রাজ্য একই খিলাফতের অধীনে দীর্ঘ চারশ বছরের অধিক সময় ধরে বিরাজমান ছিল। অধিকন্তু মুসলমানদের পবিত্র স্থান মক্কা-মদীনা অটোমানদের হাতে থাকায় তারা শুধু জাগতিক রাষ্ট্রেরই কর্ণধার ছিল না, তারা ধর্মীয় দিক থেকেও মুসলমানদের দিক নির্দেশক ছিল। অটোমান বা তুর্কীদের ভাষায় ওসমানীয় রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই একটি গাযী রাষ্ট্র ছিল যা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসর পল উইটেক (Paul Wittek) তার *The Rise of the Ottoman Empire* গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। গাযী অর্থ যারা গাযওয়া বা ধর্মযুদ্ধ করে।[১] এ গাযী রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয় ১০৭১ সালে সেলজুক সুলতান আলপ আরসলান-এর সময় থেকে। তিনি ভ্যান হ্রদের তীরে সুবিখ্যাত মানজিকার্দের যুদ্ধে বাইজানটাইন সম্রাট রোমেনাস ডিওজেনিসকে পরাজিত করে গাযীদের আনাতোলিয়ায় প্রবেশের সুযোগ করে দেন। মানজিকার্দের যুদ্ধ মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর অন্যতম।[২] এ সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উসমান বিন তুগরল (১২৯৯-১৩২৬)। তার নামানুসারে তাঁর

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বংশধরদের 'ওসমানলী' বা 'ওসমানীয়' বলা হয়।[৩] ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে অবিরাম গতিতে চলে, বলা যায় ১৬৯৯ সালে কার্লোভিজ-এর সন্ধি পর্যন্ত তার কোন ভাটা পড়েনি। এ বিস্তৃতির সময়কাল ওসমানের পুত্র ওরখান থেকে আরম্ভ করে তদীয় বংশীয় দ্বিতীয় মুস্তফা (১৬৯৫-১৭০৩) পর্যন্ত। সুলতান ওরখানের সময়ে (১৩২৬-১৩৬২) তুর্কীরা ইউরোপে তাদের ক্ষমতা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ওসমানীয়দের বিজয় এবং বিস্তৃতির কারণ অনুসন্ধানে দু'টো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে- একটি তাঁদের গাযী চেতনা, অন্যটি এ চেতনার ধারাবাহিকতায় জেনিসারী বাহিনী গঠন। গাযী চেতনার কারণে বিজয়ের ইচ্ছা অটোমান সুলতানদের মধ্যে যে জাগরুক ছিল তা উত্তর-পশ্চিমে খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় এবং তাদের দেশের বিরুদ্ধে অগ্রযাত্রা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ১৪০২ সালে তৈমুরের তুর্কী বাহিনীর সাথে আঙ্গোরায় তাদের যে যুদ্ধ হয়েছিল তা সম্পূর্ণই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যুদ্ধ। পারস্যের বিরুদ্ধে সুলতান প্রথম সেলিমের অভিযানও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যে করেছিলেন তা ১৫১৪ সালে কালদিরানের যুদ্ধে শাহকে পরাজিত করে রাজধানী তাব্রিজ দখল করে নিজ দেশে ফিরে আসাই তার প্রমাণ।[৪] সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদের কনস্টান্টিনোপল জয় অটোমানদের শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ। এ বিজয় শুধু একটি শহরের বিজয় নয়- এটি একটি সভ্যতারও বিজয়। সুলতান সুলায়মানের আমল (১৫২০-১৫৬৬) অটোমান সাম্রাজ্য বিজয় এবং অন্যান্য উন্নতির চরম বহিঃপ্রকাশ।

পাশ্চাত্য বিশ্ব/পশ্চিম ইউরোপ ও ওসমানীয় সাম্রাজ্য

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় শক্তিবর্গের দুরভিসন্ধির ফলে তুরস্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলার গুটিতে পরিণত হয়। ১৬৯৯ সালে স্বাক্ষরিত Carlowtiz চুক্তি (কার্লোভিজ) অটোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। এ চুক্তির ফলে বলকান ও উত্তর আফ্রিকা হতে অটোমান সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। ১৫৬৬ সালে অটোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান সুলায়মানের মৃত্যুর ফলে তার নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে যে বিপর্যয় আসন্ন তার প্রথম লক্ষণ ১৫৭১ সালে ভূমধ্যসাগরে লিপান্টোর নৌ যুদ্ধে অটোমানদের পরাজয়। সুলায়মান স্থলযুদ্ধে এত বেশী জড়িত ছিল যে নৌবাহিনী শক্তিশালী করার পূর্বেই তিনি মারা যান। পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় সেলিম প্রধানমন্ত্রী সুকোল্লীকে নৌবাহিনীর পুনর্গঠনের ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছিলেন তখন অপরিনামদর্শী ও বাকপটু সুকোল্লী গর্বিতভাবে বলেছিলেন যে, যুদ্ধ জাহাজের সমস্ত নোঙ্গর এবং রশি যদি রূপা দিয়ে মোড়ান হয় এবং যদি তাদের পাল সিল্কের কাপড়েও তৈরি হয় তাহলেও সাম্রাজ্যের রাজস্বে ঘাটতি পড়বে না।[৫] ইতিহাসের সাক্ষ্যমতে এটি অন্তঃসারশূন্য একটি দাম্ভিক এবং গর্বিত উক্তি ব্যতীত যে আর কিছুই নয় তা পর্তুগিজ, স্পেনীয় এবং পরবর্তীতে ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী নৌবাহিনীর মহাসমুদ্র কার্যক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজের দাপটে অতি অল্প সময়েই অটোমান বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। লিপান্টোর যুদ্ধের সফলতা সমগ্র ইউরোপীয় রাজধানীতেই ক্রুসেডীয় অভিব্যক্তিতে বিজয় উৎসব হিসেবে পালিত হয়েছিল। ১৬৮২ সালে ভিয়েনা অবরোধের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় এবং মোহ্যাকস এর যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনমুখীতা সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়। এই অধোগামিতার দলিল ১৬৯৯ সালের কার্লোভিজ এর সন্ধি।[৬] দীর্ঘদিন ধরে বিবদমান তুর্কী সাম্রাজ্য ও ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে এ সন্ধি নিঃসন্দেহে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের মধ্যস্থতায় তুরস্ক, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, পোলান্ড ও ভেনিসের মধ্যে এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধিতে তুর্কী সুলতানের সাথে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা সৃষ্টি হয়। সন্ধিতে তুরস্কের সামরিক গুরুত্ব না থাকলেও কূটনৈতিক গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। জার্মান ঐতিহাসিক ভন হ্যামার কার্লোভিজের সন্ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম তুরস্ক ও রাশিয়াকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সাধারণ ইউরোপীয় সম্মেলনে যোগদান করতে দেখা যায়। এছাড়া বিবদমান রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত না হয়েও ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডকে মধ্যস্থতা করার সুযোগ দিয়ে তুর্কী সুলতান

ও রাশিয়ার জার তাদের মধ্যকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ নীতিকে মেনে নেন। এ নীতিই ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন বিবদমান শক্তির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছিল। সন্ধির ফলে তুর্কীরা আর ইউরোপের সামরিক ভীতির কারণ রইল না, বরং ইউরোপীয় শক্তিবর্গই অটোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ সকল শক্তিবর্গের মধ্যে রাশিয়াই তুরস্কের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হিসেবে দেখা দেয়। বস্তুত রাশিয়াকেই তুর্কী বিরোধী নীতি এবং তুর্কীদের পক্ষ অবলম্বন করে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের কূটনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপই পরবর্তী দেড়শত বৎসর ধরে এ অঞ্চলের ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৭]

অধঃপতনের সময়কালে প্রাচ্য সমস্যা

কার্লোভিজের চুক্তি ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করে। এটা অনেকগুলো আদেশকৃত শান্তি চুক্তির মধ্যে একটি যা তুর্কিগণ স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয় কূটনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন যে এর পর থেকে তুর্কীরা ইউরোপের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না। অপরদিকে ওসমানীয়গণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে, তাদের সাম্রাজ্য ইউরোপীয় দেশগুলোর কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদুপরি ওসমানীয়গণ উপলব্ধি করতে বাধ্য হয় যে, ইউরোপীয়গণ মনে করেন, সুলতান খলিফা এমন একটি সাম্রাজ্য শাসন করেন যেখানে খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের সংখ্যা মুসলিম সংখ্যাগুরুর চেয়ে অনেক বেশি এবং এ ব্যতিক্রম তারা আর চলতে দিতে রাজী নয়।[৮] চতুর্থ মুরাদ (১৬২৩) এবং আলবেনীয় প্রধানমন্ত্রী মুহম্মদ কুপ্রিলী এবং পুত্র আহমদ কুপ্রিলী (১৬৫৬-৭৪) এবং আহমদের ভগ্নিপতি কারা মোস্তফার দক্ষতায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত অটোমান সাম্রাজ্য মোটামুটি এবং স্থিতিশীল পর্যায়ে উপনীত হলেও ১৬৮২ সালে ভিয়েনা অবরোধের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় এবং মোহ্যাকস এর যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনুখীতা সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়। তাছাড়া বিপর্যস্ত অটোমানদের ভাগ্য নির্ধারিত কার্লোভিজের সন্ধি পরবর্তী তিনশত বছরের ইতিহাসে ইউরোপে পশ্চাদপসরণের যে ধারার সৃষ্টি করে তা আর কোনদিন সম্মুখে অগ্রসর হয়নি। দুর্বলতার উপসমে অটোমান প্রশাসন পরবর্তীতে হাফসবার্গ ও রুশদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বিশেষ করে ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ডের দ্বারস্থ হলে ইউরোপীয় কূটনৈতিক বৃত্তে যে নতুন ভারসাম্য সমস্যার সৃষ্টি হয় তাই ইতিহাসে প্রাচ্য সমস্যা বলে চিহ্নিত।[৯] স্বাধীনতা লাভের জন্য বলকান উপদ্বীপের বিভিন্ন পরাধীন জাতির প্রচেষ্টা এবং অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি অনুসৃত নীতিই উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য সমস্যার মূল। প্রাচ্য সমস্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিক মিলার বলেন যে, 'ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমবিলুপ্তির ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করার জন্য যে সমস্যা দেখা দেয় তাই প্রাচ্য সমস্যা।' লর্ড মর্লের মতে, প্রাচ্য সমস্যাকে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের সংঘাতে ক্রমপরিবর্তনশীল এক জটিল সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করা যায়। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উনবিংশ শতাব্দিতে রাশিয়া অটোমান সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অঞ্চলগুলো গ্রাস করে সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়িত করতে তৎপর হন। ১৭৭৪ সালে স্বাক্ষরিত কুচুক কাইনারজির সন্ধিতে রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।[১০]

অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাদের স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় অগ্রবর্তী হয়ে অটোমান দখলীকৃত এলাকা পুনর্দখল করে নিতে পারে বা জাতিগত সত্তাকে পুঁজি করে তাদেরকে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে- এ ভয় রাশিয়ার ছিল। তাই রাশিয়া অটোমান সাম্রাজ্যকে একা দখলের চেয়ে পশ্চিমা শক্তি ব্রিটেন বা ফ্রান্সের সাথে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়াই শ্রেয় মনে করে। এ প্রেক্ষাপটে ১৮৫৩ সালে জার নিকোলাস ইংল্যান্ডের দূত স্যার হ্যামিলটন সেইমোরের (Seymour) নিকট প্রস্তাব করে যে তুরস্ক বর্তমানে রুগ্ন মানব এবং তার দুর্বলতার কারণে ইউরোপে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সে জন্য তার সাম্রাজ্যকে দু'শক্তির মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়াই শ্রেয়। কিন্তু এ প্রস্তাবে ইংল্যান্ড রাজী হয়নি।[১১]

ওসমানীয় সাম্রাজ্য ও রাশিয়া

রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট ক্ষমতায় এসে কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলে তুরস্ক ও রাশিয়ার সম্পর্ক ঘোলাটে হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, ওসমানীয়গণ শুধু মানত যে, রুশরা তুর্কীদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় তাতারদের দাস। রুশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল বাইজানটাইন প্রতিষ্ঠান ও নৈতিকতার উপর রচিত। মস্কোর রাজা তৃতীয় আইভান (১৪৬২-১৫০৫) শেষ বাইজানটাইন সম্রাটের এতিম ভাতুষ্পুত্রী সোফিয়াপ্যালিওলোগাসকে বিয়ে করলে তিনি অনুভব করেন যে, সোফিয়ার সঙ্গে তিনি বাইজানটিয়ামের ধর্মীয় ও আর্থিক ক্ষমতাকেও বিয়ে করেছেন। সোভিয়ার পৌত্র আইভান নিজেকে বাইজানটাইন সম্রাটদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন এবং সমস্ত রুশদের জার বলে নিজেকে অভিহিত করেন। রাশিয়ার গীর্জার নেতৃবৃন্দ এ নীতি উপস্থাপিত করেন যে, ধর্মের বিরুদ্ধাচারণের দ্বারা রোমের পতন এবং তুর্কীদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপলের (২য় রোম) পতনের ফলে (তৃতীয় রোম) মস্কো অতঃপর খ্রিস্টান ধর্মের রাজধানী হয় এবং সমস্ত খ্রিস্টান বিশেষত অর্থোডক্সদের অভিভাবক হয়। রুশদের নিকট কনস্টান্টিনোপল ছিল সর্বদা 'জারগ্রাদ'।[১২] তাই এটি উদ্ধারের জন্য রুশরা সংকল্পবদ্ধ হয়। তাছাড়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রজাদের এক বিরাট অংশ ছিল স্লাভ। রুশরা শক্তিশালী হবার সাথে সাথে বিদেশী স্লাভদের প্রতি 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা' সুলভ আচরণ করতে থাকে। উনিশ শতকে স্লাভ রাশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী মতবাদে পরিণত হয় এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।। তাই উদ্দেশ্য হিসেবে অর্থোডক্স মতবাদ ও স্লাভবাদ এবং উষ্ণ জলের বন্দরের আগ্রহ ও আকাঙ্খা নিয়ে পিটার থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক রুশ জার বা রাষ্টপ্রধান, পুঁজিবাদী বা কমিউনিস্ট, কূটনীতি বা যুদ্ধের দ্বারা প্রণালী ও কনস্টান্টিনোপলের উপর আধিক্য লাভ করতে চেষ্টা করে।[১৩] ১৬৬৯ সালে পিটার আজভ দুর্গ দখল করেন। হাঙ্গেরীর কিয়দংশ ও সার্বিয়া, ওয়ালাচিয়া সুলতানের হস্তচ্যুত হয়। এমনকি পারস্যের অধিকৃত অঞ্চল ভাগ-বাটোয়ারা করার জন্য রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে গোপন সমঝোতা হয়। ১৭০২ সালে এক চুক্তিতে তুরস্ক আজভ দুর্গটি রাশিয়াকে সমর্পন করে। ১৭১১ সালে জার পিটার ক্রিমিয়া দখলের জন্য সমর প্রস্তুতি নেন। সুলতান আহমদ (১৭০৩-১৭৩০) প্রধান উজির বালতাদজীর (Baltadji) নেতৃত্বে প্রুথ নদীর অপর পারে মোলদাভিয়াতে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পিটার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে প্রুথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।[১৪] যাহোক, অকৃতজ্ঞ পিটার মুক্তি পাবার পর তুরস্কের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয়ে তুরস্কের পতনকে তরান্বিত করে। এদিকে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু রাশিয়াকে নাজুক অবস্থায় পেয়েও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সাধারণ কতগুলো শর্তের মাধ্যমে মুক্তি দেয়ায় তুরস্কে রাশিয়া বিরোধী গণ উত্তেজনা দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে সুলতান তৃতীয় আহমদ দ্বিতীয়বার রাশিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নেন কিন্তু ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের হস্তক্ষেপের ফলে সুলতান যুদ্ধ স্থগিত রাখেন। এভাবে ১৭১২ ও ১৭১৩ সালে আয়োজিত অভিযানও ব্যর্থ হয়। ১৭১৪ সালে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদী এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।[১৫] এ সন্ধির মাধ্যমে কার্লোভিজের সন্ধিতে তুরস্ক যা রাশিয়ার নিকট হারিয়েছিল তা ফিরে পায়।

সুলতান আহমদের রাজত্বের শেষ ভাগে তুরস্কের সাথে পারস্যের সংঘর্ষ বাধে। পারস্যের সাফাভী নরপতি শাহ তাহমাসপ আফগান শাসক মাহমুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারায় পরিস্থিতি চরমে পৌঁছে। পারস্যের এ দুরাবস্থার সুযোগে ১৭২৩ সালে তুর্কীরা পারস্য আক্রমণ করে তিফলিস অধিকার করে। রাশিয়াও পারস্যের নিকট থেকে দারবান্দ ও বাকু ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ১৭২৪ সালে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্যের বিজয়লব্ধ অঞ্চলসমূহের বণ্টন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য কনস্টান্টিনোপল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১৬] সন্ধির শর্তানুযায়ী দারবান্দ, বাকু ও গিলান রাশিয়ার জার পিটারের অধিকারভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে জর্জিয়া, ইরিওয়ান, শিরওয়ান ও আজারবাইজান তুর্কী সুলতানের হস্তগত হয়। শাহ তাহমাস্প এ সন্ধির শর্তাবলী অনুমোদন করে পিতৃরাজ্যের বাকী অংশটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। পরবর্তীতে পারস্যের শাসক নাদির শাহর সাথে এক চুক্তিতে রাশিয়া পারস্যের অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

তুরস্কের সুলতান প্রথম মাহমুদের সময় আবার রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ বাঁধে। প্রুথের অপমান রাশিয়া ভুলতে পারেনি। রাশিয়ার শাসক জারিনা এ্যান্নি তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে নিজেকে নিয়োজিত করে। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে বিখ্যাত সেনাপতি মার্শাল মিউনিক (Munich)। মিউনিক তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে ঘোষণা না করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে ১৭৩৬ সালে আজভ ও পেরেকোপ অধিকার করে। তারপর কিলবুরুন, কোসলোফ ও বাকুশিসারাই দখল করে।[১৭] ক্রিমিয়া অভিযানে তার সৈন্যরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে, শত শত গ্রাম ও নগর জ্বালিয়ে দেয়। এমনকি গ্রন্থাগার, বিদ্যানিকেতন ধর্মীয় উপাসনালয় পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।[১৮] অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস রাশিয়ার সাথে যৌথভাবে তুরস্ক আক্রমণের উদ্দেশ্যে এক সামরিক চুক্তি করতে আগ্রহী হলে তুরস্ক ইংল্যান্ডের প্রচেষ্টায় রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে নতুন সন্ধি করতে রাজী হয়। কিন্তু তুর্কীদের ওপর রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কঠোর ও অবাস্তব শর্ত আরোপ করতে চাইলে সন্ধির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কারণ ভূমধ্যসাগরে রুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাহত হবে। এ কারণে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড রুশ বিরোধী নীতি অবলম্বন করে তুরস্ককে সমর্থন করে। ১৭৩৭ ও ১৭৩৮ সালে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কৃষ্ণসাগর এলাকায়, ক্রিমিয়া, বসনিয়া ও সার্বিয়াতে যে হামলা চালায় এর পরিণাম সুবিধাজনক হয়নি। যুদ্ধে অস্ট্রিয়া তুর্কী বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়। এভারসলীর মতে, অস্ট্রিয়ার সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫৬০০০ এবং তুরস্কের দুই লক্ষ।[১৯] ১৭৩৯ সালে ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় তুরস্ক, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে এক ত্রিপক্ষীয় শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি ইতিহাসে বেলগ্রেডের সন্ধি বলে পরিচিত। সন্ধির শর্তানুযায়ী বেলগ্রেডসহ বসনিয়া, সার্বিয়া এবং ওয়ালাচিয়ায় অস্ট্রিয়ার দখলকৃত সকল অঞ্চল তুর্কীদের হস্তগত হয়। রাশিয়ার গড়া আজভ শহর ভেঙে দিতে হয়। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে নতুন করে সীমান্তরেখা নির্ধারিত হয়। আজভ সাগর ও কৃষ্ণ সাগরে কোন নৌবহর রাখতে অথবা রণতরী নির্মাণ করতে পারবে না।[২০] বেলগ্রেডের সন্ধি তুরস্কের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। একদিকে এ শর্তাবলী যেমন তুর্কীদের অনুকূলে এসেছিল, তেমনি অন্যদিকে পরবর্তী ত্রিশ বছরের জন্য তুরস্ক ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহের হাত থেকে অবকাশ পায়। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাথে তুরস্কের সম্পূর্ণ যুদ্ধ বিরতি তাদের শান্তিপ্রীতির জন্য নয়; বরং অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের প্রশ্নে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে সংঘর্ষ (১৭৪০-১৭৪৮) এবং ইতিহাস বিখ্যাত সাত বছর স্থায়ী যুদ্ধই (১৭৫৬-১৭৬৩) এর মূল কারণ ছিল।[২১]

অটোমান সুলতান তৃতীয় মোস্তফার শাসনামলে (১৭৫৭-১৭৭৪) রাশিয়ার জারিনা ক্যাথেরিন প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করে তুরস্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নীতি চরিতার্থ করার প্রয়াস পায়। বেলগ্রেড চুক্তি লংঘন করে রাশিয়া পোল্যান্ড আক্রমণ করলে তুরস্ক ১৭৬৮ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অবশেষে ১৭৭৪ সালের ২১ জুলাই কুচুক কাইনারজির সন্ধি অনুযায়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। কুচুক কাইনারজির সন্ধি অটোমান ইতিহাসে কার্লোভিজের পরে দ্বিতীয় অসম্মানজনক মীমাংসা। এ চুক্তি শুধু রাশিয়া নয়, সমগ্র ইউরোপীয়দের জন্যই একটি আগ্রাসনের দ্বার খুলে দেয়। জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের ভাষায় 'এমন সফলতা রুশ ইতিহাসে পূর্বে কখনো আসেনি।'[২২] কুচুক কাইনারজির সন্ধি অন্ততঃপক্ষে চারটি দিকে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রথমতঃ রাশিয়া ক্রিমিয়া উপদ্বীপের পূর্বদিকে কারত্স এবং ইয়েনিকালে'র দুটি বন্দর দখল করে। দ্বিতীয়তঃ এ সন্ধির ফলে কৃষ্ণসাগর থেকে বসফোরাস এবং দার্দানেলিস-এর মাধ্যমে রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশাধিকার পায় এবং এতদাঞ্চলে শুধু রাশিয়াই নয়, সমগ্র ইউরোপীয় বাণিজ্যেও তার সম্প্রসারণ ঘটায়। তৃতীয়তঃ এ সন্ধিতে অটোমান প্রদেশ মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়ায় (বর্তমান রুমানিয়া) রাশিয়ার বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে এ প্রদেশ দু'টি অটোমানদের অধিনস্থ থাকলেও কার্যতঃ রুশ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। চতুর্থতঃ রাশিয়া তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন অটোমান শহরে তাদের কনসুলেট প্রতিষ্ঠা করার এবং রাজধানী ইস্তাম্বুলে রুশ গির্জা নির্মাণের স্বীকৃতি পায়। এ স্বীকৃতি একদিকে যেমন অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে তেমনি অটোমানরা

রাশিয়ার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষার নিমিত্তে পশ্চিম ইউরোপের সহায়তার দিকে হাত বাড়ায়। পরিণামে একদিকে জটিল প্রাচ্য সমস্যার সৃষ্টি আর অন্যদিকে ইউরোপীয় প্রভাবের দ্বার উন্মোচিত হয়।[২৩]

পরবর্তীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাশিয়ার বিদেশ নীতিকে প্রভাবান্বিত করে। ক্যাথেরিনের সর্বশেষ প্রেমিক পটেমকিন 'গ্রীক পরিকল্পনা' নামে একটি কুখ্যাত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এ পরিকল্পনা অনুসারে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করার প্রস্তাব হাতে নেয়া হয়।[২৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ ক্যাথেরিনকে 'গ্রীক পরিকল্পনা' ত্যাগ করতে বাধ্য করে। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের মৃত্যু (১৭৯০) আঁতাতকে দুর্বল করে। ইংল্যান্ড, প্রাশিয়া ও হল্যান্ডের চাপে অস্ট্রিয়ার নতুন সম্রাট লিউপোল্ডকে কোন লাভ ছাড়াই ১৭৯১ সালে ৪ আগস্ট সুলতানের সঙ্গে সিস্টভার সন্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৭৯২ সালে জাসির সন্ধি অনুযায়ী কৃষ্ণসাগর এলাকায় বাগ ও নীসটার নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ রাশিয়াকে দান করা হয় এবং রাশিয়ার ক্রিমিয়া অধিকারের দাবিও মেনে নেয়া হয়। কৃষ্ণসাগর এলাকায় রাশিয়ার অপ্রতিহত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেভাসতোপল ও ওডেসায় রাশিয়া নৌঘাটি ও দুর্গ গড়ে তোলে, যার ফলে কৃষ্ণসাগরে তার পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হয়।[২৫]

বিভিন্ন সমস্যায় রুশনীতি

রাশিয়া ক্রমশ স্বীয় আধিপত্য বলকান উপদ্বীপে সম্প্রসারিত করে অটোমান সাম্রাজ্যের গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের রক্ষক এবং গ্রীক গির্জা ও স্লাভ জাতির গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, বলকান উপদ্বীপের অধিবাসী গ্রীক, স্লাভ, রুমানিয়া, আলেবেনিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া তুরস্ক অধিকৃত ইউরোপে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও তুর্কীরা এ অঞ্চলে খ্রিস্টানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড চালায় এবং বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত অধিবাসীদের সংঘবদ্ধ হবার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের সাথে বলকান উপদ্বীপের অধিবাসীর গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় জার তুরস্কের অত্যাচার এবং নৃশংসতার হাত থেকে তাদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সার্বিয়ার স্বাধীনতা

দ্বিতীয় মুহম্মদের সময় সার্বিয়া অধিকৃত হয় এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে। সার্বিয়ার অঞ্চলসমূহ শাসনের জন্য সিপাহীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়, কিন্তু সার্বিয়ার কৃষকগণই জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করে। তারা ভূমি রাজস্ব ছাড়া কিছুই রাষ্ট্রকে দিত না। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করেনি কিন্তু পরে তারা নীতির পরিবর্তন করে। কারণ অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে সার্বিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার এজেন্টগণ সার্বিয়াবাসীদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিছু সংখ্যক সার্বিয়াবাসী অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সৈন্য বাহিনীতেও যোগদান করে। তাদেরকে দমন করার মত অবস্থা অটোমান সাম্রাজ্যের ছিল না। তাছাড়া অটোমান জেনিসারী বাহিনী সেখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলে একটি সার্বিয়ান প্রতিনিধিদল তাঁদের অভিযোগসমূহ সুলতানকে জানালে সুলতান তা প্রতিকারের নিশ্চয়তা দেন। সার্বিয়াতে অবস্থানরত জেনিসারী প্রধানগণ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিনিধিদের বেশ কিছু হত্যা করলে সার্বিয়াবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৮০৪ সালে)। তারা অস্ট্রিয় সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত প্রভাবশালী কারাজর্জকে[২৬] তাঁদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। কারাজর্জের নেতৃত্বে জেনিসারী বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তিনি সার্বিয়ার কৃষকদেরকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। বিদ্রোহীরা জেনিসারী বাহিনীকে পরাজিত করে বেলগ্রেড দখল করে ও সার্বিয়া থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়।[২৭] এ সময় রাশিয়া ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়াতে প্রবেশ করে এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে কারাজর্জকে প্রস্তাব দেয়। রাশিয়ার সমর্থন পেয়ে কারাজর্জ নিজেকে সার্বিয়ার নেতা বলে ঘোষণা দিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রসঙ্গে মেটারনিক (অস্ট্রিয়ান রাজনীতিবিদ) মন্তব্য করেছেন যে, নব সার্বিয়া রাশিয়ার ও অস্ট্রিয়ার মধ্যকার খোলস ছাড়া আর কিছু নয়।

এরূপ হওয়ার চাইতে সার্বিয়ার তুর্কীদের অধীনে থাকা অনেক ভাল।[২৮] রাশিয়া বুখারেস্ট সন্ধি পর্যন্ত (১৮১২) সার্বিয়ার সাথে সহযোগিতা করে। পরবর্তীতে খোরশেদ পাশার নেতৃত্বে ওসমানীয় বাহিনী কারাজর্জকে পরাজিত করে বেলগ্রেড দখল করে। কারাজর্জ অস্ট্রিয়ায় আশ্রয় নিলে সার্বিয়ায় তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে সার্বিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করে সাহায্যের আহ্বান জানান। কংগ্রেস মেটারনিকের প্রভাবে উক্ত প্রস্তাব নাকচ করে দিলে সার্বিয়াবাসীগণ আবারও বিদ্রোহ শুরু করে। মিলোচ ওব্রেনোভিচ নামে জনৈক শুকুর ব্যবসায়ীকে তারা নেতা নির্বাচন করে গণআন্দোলন শুরু করে। এ সময় রাশিয়া নেপোলিয়ন ভীতি থেকে রক্ষা পেয়ে পুনরায় সার্বিয়াতে সাহায্য বৃদ্ধি করে। ফলে সুলতান ওব্রেনোভিচকে 'সার্বিয়ার যুবরাজ' বলে স্বীকার করে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। এরপর থেকে সার্বিয়ার তত্ত্বাবধানের ভার রাশিয়ার উপর ন্যস্ত হয়।

গ্রীকদের স্বাধীনতা

ঊনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে গ্রীক স্বাধীনতা আন্দোলন[২৯] একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ওসমানীয় সাম্রাজ্যে গ্রীকদের জীবন, ধন, মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না বলে এভারসলী যে মন্তব্য করেছেন[৩০] প্রকৃতপক্ষে এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বিষয়টি অস্বীকার করে ঐতিহাসিক লিপসন বলেন, তুরস্কের খ্রিস্টান নাগরিকরা আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক ও অস্ট্রিয়ার প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত অবস্থায় বাস করত। তুরস্কের খ্রিস্টান নাগরিকরা স্বাধীনভাবে বিদ্যা অর্জন, ধনদৌলত সঞ্চয় এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে উচ্চপদেও চাকুরী লাভ করতে পারত।[৩১] বরং মুসলমানদের প্রতি গ্রীক দুর্ব্যবহারের কথা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে পিকথল (Pictho) বলেন যে, ১৮২১ সালের মহাবিদ্রোহের পর গ্রীসে একটি মুসলমানকেও জীবিত রাখা হয়নি এবং একটি মসজিদকেও অক্ষত রাখা হয়নি।[৩২]

গ্রীক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের মূলে প্রকৃত কারণ ছিল গ্রীকদের জাতীয়তাবোধের ও স্বাধীনতা স্পৃহার উন্মেষ। দ্বিতীয় কারণ ছিল, তাদের মধ্যে নতুন চেতনাবোধ ও জাগরণের সঞ্চার। ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীগণ আধুনিক যুগের সূচনাতে রেনেসাঁ আন্দোলনের ফলে পুরাতন গ্রীক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। এ সংযোগের ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রীক বন্ধুত্ব আরম্ভ হয়। আঠারো শতকে এ বন্ধুত্ব এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভল্টেয়ার ও আঁদ্রে চেনার (Andre Chenier) এবং ইংরেজ কবি বায়রন গ্রীক সাহিত্যের সমজদার ছিলেন। তাঁরা গ্রীকদের পক্ষে এবং ওসমানীয়দের বিপক্ষে লেখনী পরিচালনা করে জনগণকে গ্রীকদের প্রতি আকৃষ্ট করে। এ সময়ে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দুই প্রধান শত্রু ছিল রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া। এ দুই রাষ্ট্র পৃথকভাবে বা যুগ্মভাবে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে চায় এবং গ্রীকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করে। সমস্ত বলকান রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলে তুরস্কের অবস্থা শোচনীয় করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। ফলে ইউরোপীয় জনগণ গ্রীকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে গ্রীক কবি, লেখক ও ঐতিহাসিকগণ গ্রীসের স্বাধীনতা ও পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখতে থাকে। লেখক এ্যাডমানটিয়স কোরাস (১৭৪৮-১৮৩৩) এবং কবি রিগাস (১৭৫৩-১৭৯৮) একদিকে গ্রীকদের স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ও অন্যদিকে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানায়। ফলে গ্রীকদের মধ্যে সমিতি প্রতিষ্ঠা, স্কুল স্থাপন এবং পত্রিকার প্রকাশনা আরম্ভ হয়।

গ্রীকরা ফরাসী বিপ্লবের মূলসূত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত হন এবং এ অবস্থাকে সুলতানের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য স্কুপাস (Skouphas) নামক জনৈক গ্রীক ব্যবসায়ী ১৮১৪ সালে কৃষ্ণসাগর উপকূলস্থিত ওডেসা শহরে ফিলিকে হেটারিয়া (Philike Hetairia) নামে একটি গোপন সংস্থা গঠন করে।[৩৩] জারের ভাতিজা আলেকজান্দার ইপ্সিলান্টি (Alexander Ipsilanti) সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৮১৫ সাল থেকেই রাশিয়া গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করছিল। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি রাশিয়ার এ বৈরী মনোভাব ইংল্যান্ডের দৃষ্টি এড়ায়নি। এজন্য ব্রিটেন মিত্রশক্তির সাথে সন্ধির মাধ্যমে

আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখে। এটা বলকান উপদ্বীপে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা লাভ গ্রীকদের জন্য নূতন উদাহরণ স্থাপন করে। গ্রীক বিদ্রোহ সর্বপ্রথম মোলদাভিয়াতে শুরু হয়।[৩৪] কারণ এটি রাশিয়ার সীমানার নিকটবর্তী ছিল এবং রাশিয়া থেকে সহজেই সাহায্য পাবার আশা ছিল। এ বিদ্রোহে গ্রীকদের নেতৃত্ব দেন ফিলিকে হিটারিয়া সমিতির প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ইন্সিলান্টি। কিন্তু রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার গ্রীক স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতবদ্ধ থাকলেও ইউরোপীয় কনসার্টের অগ্রদূত মেটারনিকের বিরোধিতায় সাহায্য ও উৎসাহ দানে বিরত থাকে। ফলে ইন্সিলান্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওসমানীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে তিনি পালিয়ে অস্ট্রিয়ায় আশ্রয় নেন। মেটারনিক তাকে জেলে প্রেরণ করেন। ১৮২৮ সালে তার মৃত্যু হয়।

মোলদাভিয়াতে আন্দোলন ব্যর্থ হলে গ্রীকরা মোরিয়াতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কৃষকশ্রেণী ও জনসাধারণ এ বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজান্ডার ইন্সিলান্টির ভাই ডিমিট্রিয়াস ইন্সিলান্টি ১৮২১ সালের জুন মাসে মোরিয়াতে এসে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ সমস্ত অঞ্চলে তুর্কীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হলে প্রতিশোধ স্বরূপ সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ইস্তাম্বুলের পেটিয়ার্ক গ্রেগরিয়াসকে ফাঁসি দেন।[৩৫] মেসিডোনিয়া ও এশিয়া মাইনরের খ্রিস্টানদেরকেও নিধন করা হয়। গ্রীক ধর্মযাজকের ফাঁসিতে খ্রিস্টান জগত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাশিয়া এক চরম পত্রের মাধ্যমে ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়া থেকে ওসমানীয় সৈন্য প্রত্যাহারের এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান প্রজাদের জন্য নির্দিষ্ট নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দাবি করে। অন্যদিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে, ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার প্রস্তাব করে। রাশিয়ার এ কঠোর মনোভাব ইউরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক সমাদৃত হয়নি। ফলে ওসমানীয় রাষ্ট্র রাশিয়ার দাবিসমূহ নাকচ করে দেয় এবং রাশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে রুশ ওসমানীয় সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করে। এমতাবস্থায় ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া শংকিত হয়ে ওঠে। এ সময় ইউরোপে উদারনৈতিক আন্দোলনের ফলে মেটারনিকের সমস্ত মনোযোগ ইউরোপীয় সমস্যাবলীর প্রতি নিবদ্ধ হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে সাহায্য করার অবস্থা অস্ট্রিয়ার ছিল না। তথাপি মেটারনিক ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং মিশরের গভর্নর মুহম্মদ আলী পাশার নিকট থেকে সাহায্য নেয়ার উপদেশ দেন। সুলতান এ উপদেশ গ্রহণ করে এবং মুহম্মদ আলীকে ক্রীটসহ সিরিয়ার শাসনভার দেবার প্রতিশ্রুতিতে সাহায্যের আবেদন করেন। মুহম্মদ আলী পাশার নির্দেশে পুত্র ইব্রাহীম বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে গ্রীক বিদ্রোহ দমনে ব্রতী হন[৩৬] এবং ক্রীট দ্বীপ দখল করেন। ১৮২৫ সালে মোরিয়ার বিদ্রোহ দমন করা হয়। একের পর এক গ্রীকদের বিভিন্ন ঘাটির পতন ঘটে। ১৮২৬ সালে মিসোলঙ্গী পতনের পর ১৮২৭ সালে জুন মাসে এথেন্স-এর পুনঃদখল করা হয়। বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র নুপপ্লিয়া এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ব্যতীত গ্রীসের সর্বত্র সুলতানের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতে অসন্তুষ্ট হয় ব্রিটেন ও রাশিয়া। তারা ১৮২৬ সালের ৪ জুলাই সেন্ট পিটার্সবার্গে মিলিত হয়ে একটি প্রটোকলে স্বাক্ষর করে যা 'সেন্ট পিটার্সবার্গ প্রটোকল' নামে পরিচিত।[৩৭] এই প্রটোকল অন্যান্য রাষ্ট্রকে জানান হলে অস্ট্রিয়া তা মানতে অস্বীকার করে। ওসমানীয় সাম্রাজ্য গ্রীক সমস্যাকে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে তা মানতে অস্বীকার করে। ফলে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স ১৮২৭ সালের জুলাই মাসে লন্ডন চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুসারে গ্রীসের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া প্রয়োজনে যৌথ-শক্তি প্রয়োগ করে এ চুক্তি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৮] উল্লেখ্য যে, ব্রিটেনের জনসমর্থন ধর্মীয় কারণে গ্রীকদের পক্ষে হওয়ায় এবং রাশিয়া কুচুক কাইনারজির সন্ধি অনুসারে গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের পক্ষে কথা বলার অধিকারে গ্রীকদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। উভয় শক্তি প্রাচ্য সমস্যার কূটনীতিতে ফ্রান্সকে সঙ্গে নেয় এবং অটোমান মিশরীয় বাহিনীর সঙ্গে ১৮২৭ সালের ২০ অক্টোবর নাভারিনো উপসাগরে নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।[৩৯] যুদ্ধে ওসমানীয় মিশরীয় নৌবাহিনী ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে চুক্তি স্বীকারে বাধ্য করা।

উনিশ শতকের এ মহা নৌযুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। কিন্তু সুলতান মাহমুদ গ্রীসকে স্বাধীনতা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রাশিয়া পরবর্তী বছরে অটোমানদের ইউরোপীয় অঞ্চলের রাজধানী আদ্রিয়ানোপল দখল করে। কিন্তু ইংল্যান্ড এ দখল মেনে না নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে অটোমানদের সহায়তায় ইস্তাম্বুলে তাদের নৌবাহিনী প্রেরণের উদ্যোগ নেয়। রাশিয়া ইংল্যান্ডের এ উদ্যোগে আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহার করে অটোমানদের সাথে আদ্রিয়ানোপলের সন্ধিতে (১৮২৯) উক্ত শহর থেকে সরে আসে।[৪০] সন্ধির ফলে কূটনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে রাশিয়া প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা সমাধানে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ১৮৩২ সালে অনুষ্ঠিত লন্ডন কনভেনশনে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া গ্রীক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান করে। আদ্রিয়ানোপলের সন্ধি রাশিয়ার ক্ষমতা এবং প্রভাব সম্প্রসারিত করে এবং নিকট প্রাচ্যে রাশিয়া একটি ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যাহোক, গ্রীসের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে প্রাচ্য সমস্যার প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

ওসমানীয় সাম্রাজ্য গ্রীস হারাবার সাথে সাথে মিশরের গভর্নর মুহম্মদ আলী পাশার বিদ্রোহের দরুণ সঙ্কটের মধ্যে পতিত হয়। সুলতান গ্রীক বিদ্রোহে সাহায্য করার পরিবর্তে মুহম্মদ আলীকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সিরিয়ার গভর্নরশীপ না দিয়ে কেবলমাত্র ক্রীটের গভর্নর পদ দান করলে ১৮৩১ সালের নভেম্বরে মুহম্মদ আলী তার পুত্র ইব্রাহীমকে বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। ১৮৩২ সালের মার্চে এ্যাকার এর পতন ঘটায় এবং পরে সমগ্র সিরিয়া দখল করে কন্সটান্টিনোপল অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে রাশিয়ার দ্বারস্থ হন।[৪১] অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বার্থরক্ষার্থে রাশিয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসফরাসে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠান। তুরস্কের ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য সুলতানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু মুহম্মদ আলী তুরাস পর্বতমালা পরিত্যাগ না করলে রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্নই ওঠে না বলে রাশিয়া জানিয়ে দেয়। অন্যদিকে মুহম্মদ আলী পাশা ঘোষণা করেন যে, সিরিয়া এবং আদানার উপর তাঁর কর্তৃত্ব সুলতান স্বীকার না করলে তুরস্ক হতে মিশরীয় সৈন্য প্রত্যাহার অসম্ভব। ইংল্যান্ড তুরস্কের অখন্ডত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল, অপরদিকে ফ্রান্স মুহম্মদ আলীকে 'আশ্রিত ব্যক্তি' বলে মনে করত। রাশিয়ার প্রাচ্য পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য ১৮৩৩ সালের মে মাসে কুতাহিয়া সন্ধি অনুসারে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া তুর্কী সুলতানকে সিরিয়া এবং আদানা মিশরের পাশাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।[৪২] ফলে কূটনৈতিক কৌশলে একটি মারাত্মক সংঘর্ষ থেকে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ রক্ষা পায়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের চাপে ১৮৩৩ সালে ১০ জুলাই উনকেয়ার স্কেলেসীর সন্ধি অনুসারে রাশিয়া ইস্তাম্বুল থেকে সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করে। সন্ধিটি ৬টি খোলা ও একটি গোপন শর্ত সম্বলিত ৮ বছরের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি ছিল। এর ফলে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে বিশেষ করে ইস্তাম্বুলে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পায়।[৪৩] সন্ধির ফলে তুরস্ক রাশিয়ার প্রটেকটরেটে পরিণত হয়। তুরস্কের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ১৮৩৯ সালে তুরস্কের সুলতান মিশরের পাশার নিকট থেকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তুর্কী সুলতানের সাথে মুহম্মদ আলীর সমস্যা নিরসনের জন্য রাশিয়া, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করে।[৪৪] মুহম্মদ আলীকে মিশরের পাশা বলে ঘোষণা করা হয় কিন্তু প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তিনি সিরিয়ার অংশ বিশেষ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলে ইংল্যান্ড আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌবহর প্রেরণ করে। ফলে মুহম্মদ আলী ইউরোপীয় শক্তির নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। সিরিয়া সমস্যা সমাধানে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ১৮৪১ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে একটি প্রটোকলে স্বাক্ষর দান করে মিশর সমস্যার সমাপ্তি ঘোষণা করে।[৪৫]

১৮৪১ সালের ১৩ জুলাই ইউরোপীয় শক্তিবর্গ লন্ডনে এক প্রণালী সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর দান করে। এ শর্তানুসারে একদিকে ওসমানীয় সাম্রাজ্য শান্তির সময় বিদেশী যুদ্ধ জাহাজসমূহের দার্দানেলিস প্রণালী

দ্বারা কৃষ্ণসাগরে যেতে পারবে না বলে প্রচলিত পুরাতন নীতি পুনর্বহাল ঘোষণা ও নিশ্চয়তা দান করে। অন্যদিকে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্যের এ সিদ্ধান্তের প্রতি যুক্তভাবে সম্মান প্রদর্শন করার নিশ্চয়তা প্রদান করে।[৪৬] লন্ডন কনভেনশন উনকিয়ার স্কেলেসী সন্ধিকে বাতিল করে রাশিয়ার প্রভুত্বকে খর্ব করে; এ চুক্তি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারস্টোনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় বলে স্বীকৃত হয়। তুরস্কে রাশিয়ার প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে ইংল্যান্ডের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ প্রাচ্য সমস্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৪১ সালে প্রাচ্য সমস্যার সমাধান ব্রিটেন ও রাশিয়ার নিকট প্রাচ্য নীতির পার্থক্য দূর করতে সমর্থ হয় নি। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদগণ নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও রাশিয়া এর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করত। ১৮৪৮ সালে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত হাঙ্গেরী ও পোলদের বিপ্লব ব্যর্থ হলে বহু বিপ্লবী তুরস্কে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রুদ্ধ রুশ সরকার বিপ্লবী পোলান্ডের এবং অস্ট্রীয় সরকার হাঙ্গেরীয়দের প্রত্যার্পণের দাবি করলে ওসমানীয় সরকার তা অগ্রাহ্য করে। ফলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া তুরস্কের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারস্টোন ওসমানীয় সরকারকে সমর্থন করায় রুশ-ব্রিটিশ সম্পর্কের অবনতি হয়। ধর্মীয় কলহ, স্বার্থান্বেষী মনোভাব, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১. জারের আক্রমণাত্মক নীতি: রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস (১৮২৫-৫৫) ক্ষমতায় এসে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রবর্তন করে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদের সমস্ত উৎসের মূলোৎপাটন করেন এবং দুর্বল তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। জার নিকোলাস প্রধানত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রাচ্যদেশীয় সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন। উল্লেখ্য যে, ১৮২৯ সালে স্বাক্ষরিত আড্রিয়ানোপলের সন্ধি অনুযায়ী বলকান উপদ্বীপে রাশিয়ার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৩ সালের উনকিয়ার স্কেলেসীর সন্ধিতে তা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৮৪১ সালে উনকিয়ার কেলেসির সন্ধি বাতিল করা হয়। জার ইংল্যান্ডে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাবারডীনের কাছে ইউরোপের 'রুগ্ন ব্যক্তি'র[৪৭] সাম্রাজ্যকে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ব্রিটেন প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য নিকোলাস ১৮৫৩ সালে পুনরায় তুরস্ক ধ্বংসে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হ্যামিলটন সেইমুরের সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। কারণ ব্রিটেন ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার আধিপত্য সহ্য করতে পারত না। জার নিকোলাস তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য ১৮৪৩ সালে ভিয়েনা ও বার্লিন যান। রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূমধ্যসাগরের একটি প্রবেশপথ উন্মুক্ত করা।

ধর্মীয় কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৭৪ সালে স্বাক্ষরিত কুচুক কাইনারজির সন্ধি অনুযায়ী গ্রীক ও ল্যাটিন খ্রিস্টান বিরোধের সময় জার তুরস্ক অধিকৃত বলকান উপদ্বীপের গ্রীক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ফ্রান্স ল্যাটিন ধর্মযাজকদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া তুরস্কের সুলতানকে তাদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের বৈরী মনোভাব এবং ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নীতিতে শঙ্কিত হয়ে ১৮৫৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী বেসারেভিয়ায় অবস্থিত পঞ্চম রুশ বাহিনীর প্রধান এবং কৃষ্ণসাগরে রুশ রণতরী বহরের জনৈক উর্ধ্বতন অফিসার মেনশিকভ (Mensechikoff) কন্সটান্টিনোপলে উপস্থিত হয়ে কতগুলো দাবি পেশ করেন।[৪৮] সুলতান সব দাবির সাথে একমত পোষণ না করলে ক্রুদ্ধ রুশ সরকার সামরিক চাপ প্রয়োগ করে ওসমানীয় সরকারকে নতি স্বীকারের পরিকল্পনা করেন এবং ১৮৫৩ সালে মোলদাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়ায় রুশ সৈন্য প্রেরণ করে এর অংশ বিশেষ দখল করে।[৪৯] বৃহত্তর সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য অস্ট্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট বিউয়ল ভিয়েনায় ব্রিটিশ, ফরাসী ও প্রাশীয় রাষ্ট্রদূতদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এতে স্থির হয় যে, সুলতান ১৭৭৪ এবং ১৮২৯ সালে

স্বাক্ষরিত রুশ-তুর্কী চুক্তি পূর্ণভাবে কার্যকরী করবেন। অন্যান্য খ্রিস্টানদের সুযোগ সুবিধার ন্যায় গ্রীক খ্রিস্টানদেরও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।[৫০] কিন্তু ওসমানীয় সরকার ভিয়েনা প্রস্তাবাবলী মানতে অস্বীকার করে।

ইতোমধ্যে তুরস্কে রুশ বিরোধী মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু ওসমানীয় মন্ত্রীসভা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সুলতান তা অনুমোদন করেন। রাশিয়ার জার নিকোলাস ও প্রধানমন্ত্রী নেসেলরোড ১৮৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফান্সিস যোসেফের সাথে 'আলমুজ' নামক স্থানে মিলিত হয়ে যুদ্ধ প্রতিরোধকল্পে 'ভিয়েনা প্রস্তাবের' সামান্য রদবদলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিকোলাস অস্ট্রিয়াকে নিজ পাশে যুদ্ধে যোগদানের জন্য, ওসমানীয় সাম্রাজ্য বিভক্ত হলে বসনিয়া হারজেগোভিনা ও আলবেনিয়ার অংশ বিশেষ প্রদানের প্রস্তাব করে কিন্তু অস্ট্রিয়া তা প্রত্যাখ্যান করে।[৫১] রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার আলোচনা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে ভীত করে তোলে। ফলে ১৮৫৩ সালের অক্টোবরে দার্দানেলিস থেকে ইঙ্গ-ফ্রান্স নৌবাহিনী ইস্তাম্বুলের সামনে নোঙ্গর করে ইস্তাম্বুল ও প্রণালীসমূহ রক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় ওসমানীয় সাম্রাজ্য সরকারীভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[৫২] ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে অস্ট্রিয়াকে চাপ দিয়ে নিজেদের দলে নিতে চায় কিন্তু কোন পক্ষের চাপের নিকট নতি স্বীকার না করে অস্ট্রিয়া যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকে। এমতাবস্থায় ১৮৫৪ সালের ২৮ মার্চ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতোপূর্বে ১২ মার্চ তারা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়।[৫৩] যুদ্ধের শুরু থেকেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স বিরুদ্ধে থাকায় রাশিয়া ইচ্ছামত নৌবাহিনী ব্যবহার করতে পারেনি। তাছাড়া অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিউয়ল ৩ জুন মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ছেড়ে দেবার জন্য রাশিয়াকে অনুরোধ করে, কারণ রাশিয়া কর্তৃক এ অঞ্চল দখলের ফলে দানিয়ুব নদী দিয়ে অস্ট্রিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৪ জুন অস্ট্রিয়া ওসমানীয় সরকারের সাথে এক চুক্তি করে। চুক্তিতে শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার উপর অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়। প্রাশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়ামের পরামর্শে জার স্থান দুটি ছেড়ে দিতে সম্মত হন। জুলাই মাসের শেষে মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া থেকে রুশবাহিনী প্রত্যাহার শুরু হয়। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ক্রিমিয়া উপদ্বীপ আক্রমণ করে কৃষ্ণসাগরে অবস্থিত রুশ নৌবাহিনী ধ্বংস করার নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কারণ ক্রিমিয়াতে সেবাসতোপল নামে রাশিয়ার বিশাল নৌ ও সামরিক ঘাঁটি ছিল। সিবাসতোপল ধ্বংস করে রাশিয়াকে দুর্বল করাই ছিল মিত্রশক্তিবর্গের প্রধান লক্ষ্য। রাশিয়ার সামরিক শক্তি নির্ভর করতো সেবাসতোপলের ওপর।[৫৪]

১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে আলমা নদীর তীরে মিত্রবাহিনী একটি অগ্রসরমান রুশ বাহিনীকে পরাজিত করে সেবাসতোপোল অবরোধ করে এবং ব্যালাক্লেভা (Balaclava) এবং ইনকারমান (Inkermani) এর পরপর দু'টি যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করে। কিন্তু প্রবল শীত ও চরম অব্যবস্থার ফলে মিত্রবাহিনীর বহু সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। ফ্লোরেন্স নাইটেংগেলের প্রচেষ্টায় যুদ্ধের শেষের দিকে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়।[৫৫] ইতোমধ্যে অস্ট্রিয়া ২ ডিসেম্বর (১৯৫৪) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। তাছাড়া ইতালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাহায্য সহানুভূতি লাভের আশায় ১৮৫৫ সালে ২৬ জানুয়ারী পিডমন্ট সার্ডিনিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিত্র পক্ষে যোগদান করে।[৫৬] মন্ত্রী ক্যাভুর পনের হাজার ইতালীয় সৈন্য ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করে ইতালীর সমস্যায় মিত্রবাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যাহোক, মিত্র বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ১৮৫৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রুশবাহিনী সেবাসতোপল পরিত্যাগ করে। ১ নভেম্বর সুইডেন মিত্রপক্ষে যোগদান করে এবং ২৮ ডিসেম্বর অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে চরমপত্র প্রেরণ করে ভিয়েনাতে মিত্রপক্ষ কর্তৃক পেশকৃত শান্তি প্রস্তাব

গ্রহণের উপদেশ দেয়। রাজনৈতিক সামরিক পরিস্থিতি বিপক্ষে মনে করে রাশিয়া ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভিয়েনা শর্তাবলীর ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়।

১৮৫৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী প্যারিস কংগ্রেসে এক শান্তি সম্মেলন বসে এবং ৩০ মার্চ ৩৪টি শর্ত সম্বলিত একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৫৭] ব্রিটেনের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্লারেনডন এবং প্যারিসে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড কাওলী (Cowley), অস্ট্রিয়ার পক্ষে বিউয়ল এবং হিবনার (Hibner), রাশিয়ার পক্ষে অরলভ (Orlov) এবং ব্রুনো (Burnnow), তুরস্কের পক্ষে ক্যাভুর এ সম্মেলনে যোগদান করে। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালেউস্কী (Walewski) সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।[৫৮] শান্তি চুক্তি রচনার ব্যাপারে কোনরূপ বিতর্কের উদ্ভব ঘটেনি। কারণ গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী আগেই স্থিরকৃত হয় এবং অস্ট্রিয়ার চরমপত্রের দরুণ রাশিয়া শর্তাবলী মেনে নেয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী কৃষ্ণসাগরকে নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয় এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, রাশিয়া অথবা অপর কোন দেশ এর তীরবর্তী স্থানে অস্ত্রাগার নির্মাণ কিংবা এর জলপথে যুদ্ধ জাহাজ চলাচল করতে পারবে না। ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তুরস্কের সার্বভৌমত্ব ও স্থায়িত্বকে স্বীকৃতি দান করে এবং এর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়। তুরস্কের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি লাভ করে সুলতান ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের সদস্য হবার মর্যাদা পান। সুলতান তুরস্ক সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং সকল প্রকার ধর্মীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করার অঙ্গীকার করেন। তুরস্কের গ্রীক-খ্রিস্টানদের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার থেকে রাশিয়াকে বঞ্চিত করা হয়। উপরন্তু রাশিয়া মোলদাভিয়াকে বেসারাবিয়া প্রদান করতে বাধ্য হয়। ফলে দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে রাশিয়ার সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। রাশিয়া ওয়ালাচিয়ার উপর প্রোটেকটরেট এবং অধিকার প্রত্যাহার করলে তুরস্কের অধীনে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়।[৫৯] কোন রাষ্ট্র মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার উপর কর্তৃত্ব দাবি করতে পারবে না বা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এদের নিজস্ব শাসনযন্ত্র ও সেনাবাহিনী গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয় এবং একটি ইউরোপীয় পরিষদ শাসনযন্ত্রের রূপরেখা নির্ধারণ করবে বলা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৫৯ সালে আলেকজান্দার কুজা মোলদাভিয়ার শাসনকর্তা নির্বাচিত হন। ওয়ালাচিয়ার দিওয়ান তাকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করে। প্রদেশ দু'টির ঐক্য স্বীয় অভিসন্ধি চরিতার্থ করার পথে বাধা বিবেচনা করে অস্ট্রিয়া এর বিরোধিতা করলেও ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স এর সমর্থক ছিল। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওসমানীয় সরকার ১৮৫৯ সালের ৩১ মে কুজাকে দু'প্রদেশের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। ১৮৬১ সালে একক মন্ত্রীসভা ও পরিষদ গঠিত হয়। প্যারিসে শান্তি সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের ফলশ্রুতিতে এভাবেই বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে রুমানিয়া রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৬০]

কিছুদিন আগ পর্যন্ত ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে একটি অর্থহীন রক্তপাত বলে মনে করা হতো। ওসমানীয় সাম্রাজ্যে রাশিয়ার শক্তি প্রয়োগ করে সুবিধা আদায়ের নীতি সাময়িকভাবে স্তব্ধ করে দিলে এ যুদ্ধ ও প্যারিস চুক্তি এই সাম্রাজ্যকে নবজীবন দান করে। এক ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে এ নবজীবনকে অর্থবহ করে তোলার প্রয়াসও এ যুদ্ধের ফলশ্রুতি। কৃষ্ণসাগরের উপর হতে রুশ সামরিক আধিপত্য বিলোপ এবং বিক্ষুব্ধ রাশিয়ায় ইউরোপীয় রাজনীতির প্রতি নিস্পৃহতার ফলে প্রাশিয়ার অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধেরই ফল।

স্বনামধন্য ওসমানীয় সুলতানদের রাজত্বকালে অব্যাহত বিজয়ের মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর অংশই ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে আসে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ও দুর্বলতার যুগে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে স্ব স্ব প্রভাব বলয় ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাশিয়াও এ প্রয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ওসমানীয় সাম্রাজ্যে উদ্ভূত নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহে বা সমস্যায় ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গ সময় সময় একত্রে কাজ করলেও প্রধানত প্রতিটি শক্তি নিজেদের জাতীয় স্বার্থেই তাদের মধ্যপ্রাচ্য তথা ওসমানীয় সাম্রাজ্য কেন্দ্রীক নীতি নির্ধারণ

করে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার্থে ব্রিটেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য যেমন তৎপর ছিল তেমনি আঠার শতকের শেষ ভাগে ও উনিশ শতকের শুরুতে নেপোলিয়নের সম্ভাব্য ভারত অভিযানের প্রতি-ব্যবস্থা হিসেবে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার শেখ শাসিত অঞ্চলসমূহের সহিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পাশাপাশি তৃতীয় ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে রাশিয়াও নেপোলিয়ন পূর্ব যুগে এবং পরে ওসমানীয় সাম্রাজ্য তথা মধ্যপ্রাচ্যে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দাবি দাওয়া নিয়ে অগ্রসর হয়। পারস্য ও ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সময়কালে বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেয়। স্থলবেষ্টিত দেশ হিসেবে রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর এবং দার্দেনেলিস ও বসফরাস প্রণালীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে বিশ্ব রাজনীতিতে ভূমিকা রাখা। এজন্য রাশিয়া পারস্যের শাহ এবং ওসমানীয় সুলতানের উপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগের নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রাচ্য সমস্যায় নিজেকে বিজড়িত করেছিল। এ ধরনের বিজড়িতকরণের ব্যপ্তি ১৭৭৪ সনে কুচুক কাইনারজির সন্ধি থেকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-৫৬) পর্যন্ত। এ সময়কালে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে তার অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়। এমনকি উনিশ শতকের মধ্যভাগে ওসমানীয় সাম্রাজ্য ভাগবাটোয়ারার প্রস্তাবও করে। কিন্তু ওসমানীয় সাম্রাজ্য তথা মধ্যপ্রাচ্যে রুশ আধিপত্য খর্ব করার জন্য পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বিশেষতঃ ব্রিটেন সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। ফলে রুশ উদ্দেশ্য পুরোপুরি না হলে কিছুটা সফল হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে উত্তর পারস্যে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্য রুশ প্রভাব বলয় থেকে বর্ণিত সময়কালে মুক্ত থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য: Paul Wittek, *The Rise of the Ottoman Empire* (London: Royal Asiatic Society, 1938); এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২০১১), পৃ. ১৩-১৪।

২. মানজিকার্দের যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে দেখুন, সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ২৫।

৩. ওসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান সম্পর্কে দেখুন, Paul Wittek, *op.cit*; সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩-২৮।

৪. পারস্যের শাহ ছিলেন শিয়া, আর অটোমানগণ সুন্নী, শিয়া সুন্নী এ দ্বন্দ্বে অটোমান সুন্নী মতবাদকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই সুলতান সেলিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিস্তারিত দেখুন, এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।

৫. *উদ্ধৃত*, *তদেব*, পৃ. ৬৫।

৬. কার্লোভিজ বেলগ্রেডের উত্তরে এবং দানিউব নদীর ডান তীরে অবস্থিত একটি শহর। বর্তমানে শহরটি যুগোশ্লোভিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

৭. কার্লোভিজের সন্ধি বিস্তারিত দেখুন, Edward S. Creasy, *History of the Ottoman Turks* (Beirut, Khayats, 1961), pp. 319-322.

৮. দেখুন, ইয়াহ্‌হিয়া আরমাজানী (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত), *মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৬), পৃ. ২০৫-২০৬।

৯. প্রাচ্য সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, J. A. R Marriot, *The Eastern Question* (Oxford: At the Clarendon and Press, 1917) বইটি।

---

[১০]. তুরস্কের সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ ও রাশিয়ার জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের মধ্যে এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির ফলে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত পূর্ববর্তী সকল সন্ধি বাতিল বলে ঘোষিত হয়। সন্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Edward, S. Creasy, *op.cit.*, pp. 409-414; আরও দেখুন, J.C. Hurewitz, *Diplomacy in the Near and Middle East,* Vol. I (Princeton: D. Van Nostrand Company, INC, 1956), pp. 54-61.

[১১]. এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১-৭২।

[১২]. বিস্তারিত দেখুন, ইয়াহ্‌ইয়া আরমাজানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬-২০৭।

[১৩]. *তদেব*।

[১৪]. যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তুর্কী বাহিনীর হাতে পিটার বন্দী হন। রাণী ক্যাথেরিন কয়েক সহস্র রুবল ক্ষতিপূরণ দিয়ে তুর্কী প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পিটারকে উদ্ধার করেন। বিস্তারিত দেখুন, আশরাফ উদ্দীন আহমদ, *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ. ৩৮৭-৩৮৯।

[১৫]. দেখুন, *তদেব*, পৃ. ৩৮৯-৩৯০; আরও দেখুন, Edward S. Creasy, *op.cit*., pp. 337-338.

[১৬]. আশরাফ উদ্দীন আহমদ, *তদেব*, পৃ. ৩৯৫।

[১৭]. কোসলোফ ও বাকশিসারাই শহর দু'টি ছিল যথাক্রমে সম্পদশালী বন্দর এবং ক্রিমিয়ার খানদের প্রাক্তন রাজধানী।

[১৮]. দেখুন, Lord Eversley, *The Turkish Empire* (London: Unwin Ltd., 1917), p. 207.

[১৯]. *Ibid*, pp. 207-208।

[২০]. বেলগ্রেডের সন্ধি বিস্তারিত দেখুন, Lord Eversley, *Ibid*, pp. 207-210.

[২১]. দেখুন, *Ibid*.

[২২]. দেখুন, *Ibid*, pp. 219-220; J.C. Hurewitz, *op.cit.*, pp. 54-61.

[২৩]. কুচুক কাইনারজির সন্ধি সম্বন্ধে দেখুন, Eversley, *Ibid*. pp. 219-222; J.C. Hurewitz, *Ibid*.

[২৪]. প্রস্তাব অনুযায়ী এর এক অংশকে বলা হবে ড্যাসিয়ার রাজ্য এবং এর রাজা হবেন পটেমকিন, আর প্রধান অংশ কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী রেখে ক্যাথেরিনের নবজাত কনিষ্ঠ পৌত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। পৌত্রের নাম কনস্টান্টিনোপল রাখার জন্য তিনি আদেশ দেন। বিস্তারিত দেখুন, ইয়াহ্‌ইয়া আরমাজানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০-১১।

[২৫]. জাসির সন্ধি বিস্তারিত দেখুন, George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1962), p. 11; আরও দেখুন, Lord Eversley, *op.cit.*, pp. 235-237.

[২৬]. Petrowni-র ছেলে কারা জর্জ সার্বিয়ান কৃষক। তিনি ১৭৬০-১৭৭০ এর মধ্যে Lischessi-তে জন্মগ্রহণ করেন। দেখুন, E. S, Creasy, *op.cit.*, p. 470.

[২৭]. বেলগ্রেড দখলের পর কারা জর্জ ঘোষণা করেন যে, বেলগ্রেড দূর্গ রক্ষার জন্য ১৫০০ সার্বিয় সৈন্য রাখতে হবে এবং সার্বিয়ার শাসনভার সার্বিয়াবাসী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে দিতে হবে। তিনি সার্বিয়ার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। উক্ত পরিষদ কারাজর্জকে নেতা নির্বাচন করে স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দেখুন, মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২৫৮।

[২৮]. দেখুন, *তদেব*।

[২৯]. গ্রীক স্বাধীনতা আন্দোলন বিস্তারিত দেখুন, William L. Cleveland and Martin Bunton, *A History of the Modern Middle East*, 4th Edition (United States of America; Westview Press, 2009), pp. 74-77.

[৩০]. Lord Eversley, *op.cit.*, p. 277.

[৩১]. ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ২১৫।

[৩২]. উদ্ধৃত, *ঐ*, পৃ. ২১৫-২১৬; আরও দেখুন, সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০।

---

৩৩. দেখুন, William L. Cleveland and Martin Bunton, *op.cit.*, pp. 75-76; ২ লক্ষ সদস্য নিয়ে গঠিত এ সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রীস থেকে তুরস্কের আধিপত্য বিনষ্ট করে ইউরোপ থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করা, কনস্টান্টিনোপলে প্রাচ্যের প্রাক্তন গ্রীক সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামের প্রভাব খর্ব করে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে গ্রীক খ্রিস্টান ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা। বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১-২৬৩।

৩৪. জেনিনার তুর্কী গভর্নর আলী পাশা তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে এ সুযোগে ১৮২১ সালে গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় এবং দশ বছর ব্যাপী চলে। দেখুন, মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *তদেব*, পৃ. ২৬৩-২৬৯।

৩৫. *তদেব*, পৃ. ২৬৪; আরও দেখুন, এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

৩৬. দেখুন, William L. Cleveland and Martin Bunton, *op.cit.*, pp. 71-72; P.J. Vatikiotis, *The Modern History of Egypt* (London: Weidenfeld and Nicholson, 1969), p. 67.

৩৭. এই প্রটোকল অনুসারে ইংল্যান্ড ও রাশিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্য ও গ্রীসের মধ্যে মধ্যস্থতা করবে এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে করের মাধ্যমে সম্পর্কিত স্বায়ত্তশাসিত গ্রীস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। দেখুন, মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭-২৬৮।

৩৮. *তদেব*, পৃ. ২৬৮।

৩৯. William L. Cleveland and Martin Bunton, *op.cit.*, p. 76.

৪০. আদ্রিয়ানোপলের সন্ধি সম্পর্কে দেখুন, Sydney Nettleton Fisher, *The Middle East: A History* (London: Routledge and Kegan Paul, 1960), pp. 272-73; আরও দেখুন, William L. Cleveland and Martin Bunton, *Ibid.*, p. 77; George Lenczowski, *op.cit.*, p. 15.

৪১. ইংল্যান্ড এ সময় বেলজিয়াম ও পর্তুগীজ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লিবারেল পার্টি নির্বাচনে ব্যস্ত ছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮-২৮০।

৪২. দেখুন, *ঐ*, পৃ. ২৮০।

৪৩. উনকেয়ার স্কেলেসী চুক্তি সম্পর্কে দেখুন, *ঐ*, পৃ. ২৮১; আরও দেখুন, Rifaat Bey, *The Awakening of Modern Egypt* (Lahore: London, Longmans, 1947), p. 51; আরও দেখুন, William L. Cleveland and Martin Bunton, *op.cit*, p. 73.

৪৪. William L. Cleveland and Martin Bunton, *Ibid.*

৪৫. *Ibid*, p. 74।

৪৬. প্রণালী সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি, বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মদ আলী আসগর গান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫-২৮৬।

৪৭. রাশিয়ার জার নিকোলাস তুরস্ক সাম্রাজ্যের নাম দিয়েছিলেন Sick Man of Europe (ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি)।

৪৮. উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো হলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুয়াদ পাশার পদত্যাগ, পবিত্র স্থানসমূহে গ্রীক খ্রিস্টানদের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত রুশ-তুর্কী চুক্তি, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি রুশ-তুর্কী আত্মরক্ষামূলক সামরিক চুক্তি এবং সাম্রাজ্যের গ্রীক খ্রিস্টানদের উপর রুশ কর্তৃত্বের স্বীকৃতি। দেখুন, সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

৪৯. *তদেব*, পৃ. ১৩২-১৩৩।

৫০. সম্মেলনে গৃহীত আরও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দেখুন, *তদেব*, পৃ. ১৩৩।

৫১. দেখুন, মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।

৫২. বিস্তারিত দেখুন, *তদেব*, পৃ. ২৯৩-২৯৪।

৫৩. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫; মুহাম্মদ আলী আসগর খান, *তদেব*, পৃ. ২৯৪।

৫৪. বিস্তারিত দেখুন, সফিউদ্দীন জেয়ারদার, *তদেব*, পৃ. ১৩৫-১৩৭।

[৫৫]. বিস্তারিত দেখুন, *তদেব*, পৃ. ১৩৬-১৩৭; ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল নামে এক ইংরেজ তরুণী আর্তের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে আহত ও পীড়িত সৈনিকদের সুস্থ করার চেষ্টা করেন। প্রদীপবাহী মহিলা (The Lady with the Lamp) আখ্যায়িত এই প্রখ্যাত সেবিকা সর্বপ্রথম একটি বিখ্যাত স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠন করেন। ফলে আহত ব্রিটিশ সৈন্যদের মৃত্যুর হার শতকরা ৪৪ থেকে ২ জনে হ্রাস পায়।

[৫৬]. দেখুন, *তদেব*, পৃ. ১৩৭।

[৫৭]. H. Temperly, 'The Treaty of Paris of 1856 and Its Execution', *Journal of Modern History*, 4 (1932), pp. 387-414, 523-543; J.C. Hurewitz, *op.cit*, pp. 153-156.

[৫৮]. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৩৮; আরও দেখুন, J. C. Hurewitz, *Ibid*.

[৫৯]. প্যারিস শান্তিচুক্তি সম্পর্কে দেখুন, সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮-১৪০; আরও দেখুন, J. C. Hurewitz, *Ibid*.

[৬০]. দেখুন, সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার: অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

মো. রবিউল ইসলাম*

Abstract : Nationalism began to spread in North Africa during the first decades of the 20th century. The colonial policies led to the growth of African nationalism in North Africa. Evils of colonialism such as foreced labor, over taxation, land alienation, racial discrimination and forced growing of cash crops etc. made the people of North Africa hate the colonial masters. The unity of the people is the major constituent of the concept of nationality. Nationalism can be defined as the desires for North Africans to end all forms of foreign control and influence so as to be able to take Charge of their political, social and economic affairs. Before 1960 most of Africa was still under colonial control. However, by 1970 most of Africa was independent of European colonialism. Several factors contributed to the rise of North African nationalism. The main focus of this paper is to examine how internal and external factors influenced the people to organize resistance movement after the establishment of the European colonies in North Africa.

ভূমিকা

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত দেশ বা অঞ্চল এ মহাদেশের সর্বউত্তরে অবস্থিত সাধারণভাবে সে সমস্ত দেশ বা অঞ্চল উত্তর আফ্রিকা নামে পরিচিত। এটি স্পষ্টভাবে বলা যায়, সাহারা মরুভূমি এবং আফ্রিকা সাব-সাহারার কিছু অংশ এর সাথে যুক্ত। আরব ঐতিহাসিকদের কাছে এই অঞ্চলটি “আল-মাগরিব” নামে পরিচিত হলেও, ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিগণ একে ‘বারবারী’ (Barbary) বা ক্ষুদ্রতর আফ্রিকা এবং পরবর্তীতে উত্তর আফ্রিকা (North Africa) নামে অভিহিত করে। ত্রিপোলিতানিয়া (লিবিয়া), তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কো এর অর্ন্তভুক্ত।

ভৌগোলিকভাবে ‘মাগরিব’ উত্তরদিকে ভূ-মধ্যসাগর পর্যন্ত সীমিত। পশ্চিম দিকে এটি আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তানজিয়ার হতে লামতুনার মরুভূমির নিকটবর্তী (আবুল ফিদার মতে) অথবা ইবনে খালদুনের মতে, এটি সাফি ও দেরেন পর্যন্ত। দক্ষিণ দিকে এটি বিস্তীর্ণ বালুকাময় তট পর্যন্ত প্রসারিত যা নিগ্রোদের আবাসস্থল হতে বারবারদের দেশকে পৃথক করেছে (ইবনে খালদুদের মতে)। এ সীমার বাইরে অবস্থিত কিছু অঞ্চল, যেমন- বৃদা, তামেনতীত, গুদারা, গাদামেস, ফেযযান ও ওয়াদ্যানকেও মাগরিবের অর্ন্তভূক্ত বলে ধরা হয়। পূর্বদিকে সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট মতৈক্যে পৌঁছাতে না পারলেও কতিপয় ঐতিহাসিক একে কুলযুম সাগর (লোহিত সাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত বলে ধরে নিয়েছেন এবং এরূপ মিশর ও বারকা’র দেশকে মাগরিবের অর্ন্তভূক্ত বলে ধরে নিয়েছেন। জাতিসংঘ উত্তর আফ্রিকার যে সংজ্ঞা বা বর্ণনা দিয়েছে তাতে ৭টি দেশ বা অঞ্চল অর্ন্তভূক্ত। এই সাতটি দেশ বা অঞ্চল হলো- আলজিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, মরক্কো, সুদান, তিউনিসিয়া এবং সাহারার পশ্চিমাঞ্চল। কিন্তু মাগরিবের অধিবাসীগণ মিশর ও সুদানকে উত্তর আফ্রিকার অংশ বলে গণ্য করেন না। তারা কেবল ত্রিপোলী হতে আরম্ভ এবং পূর্বকালে বারবারদের অঞ্চল সমূহকে এর অর্ন্তভূক্ত বলে মনে করেন। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের বর্ণনা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বর্তমান উত্তর আফ্রিকা বলতে আরব রাষ্ট্র লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কো এ চারটি দেশকে বোঝায়।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক কারণে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি এর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলও রয়েছে প্রচুর। আফ্রিকা মহাদেশের অর্ন্তভুক্ত হলেও এই দেশগুলোর সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য তা মধ্যপ্রাচ্যের আরব এলাকার সাথেই বেশি সংশ্লিষ্ট।[১]

আদিকাল থেকে শুরু করে স্বাধীন হওয়া অবধি উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো রোমান, বাইজান্টাইন, ফোনেসিয়, আরব, স্পেনিয়, নরম্যান, ওসমানিয় ও ইউরোপীয়দের দ্বারা আক্রান্ত ও শাসিত হয়। সাত ও আট শতকে আরবরা উত্তর আফ্রিকা আগমন এবং এই অঞ্চলে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর এখানকার বিপুল জনগোষ্ঠী আরবি ভাষা, সংস্কৃতি ও ইসলামী মূল্যবোধকে ধারণ করে।[২] ঠিক তেমনি ইউরোপের নিকটবর্তী হওয়ায় এ অঞ্চলগুলি ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসতেও সক্ষম হয়। সে মতে উত্তর-আফ্রিকার উপর এশিয়ার প্রভাব যেমন রয়েছে, অন্য অর্থে ইউরোপের প্রভাবও কম নয়।

দীর্ঘ সময় ধরে আফ্রিকার এই অঞ্চলটি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা শাসিত হলেও এখানে ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় উনিশ শতকে। এই ধারাবাহিকতায় ১৮৩০ সালে ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়া দখল, ১৮৮১ সালে তিউনিসিয়ায় আশ্রিত শাসন প্রতিষ্ঠা, ১৯০৭ সালে ফ্রান্স ও স্পেনের যৌথভাবে মরক্কো দখল এবং ১৯১১ সালে লিবিয়াতে ইতালির কর্তৃত্ববাদী প্রভাব প্রতিষ্ঠত হয়। ১৮৩০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের যে বৈশিষ্ট্য তাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত ক্ষয়িষ্ণু ওসমানিয় প্রদেশ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের দখলদারিত্বে আশ্রিত রাজ্য এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর পরিচিতি লাভ। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি অর্জন করার জন্য মাগরেব রাষ্ট্রগুলিকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় এবং এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। একথা অনস্বীকার্য যে, ঔপনিবেশিক শক্তির দখলের সময়কালে এ অঞ্চলে প্রকৃত তুর্কী শাসন বলে কিছুই ছিলনা। উসমানিয়দের নামমাত্র শাসনাধীনে সামরিক প্রধানগণ প্রায়শই নিজেদেরকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করার পর বিভিন্ন অঞ্চলে স্বজাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে। যার ফলে ইউরোপীয়দের সামরিক অভিযানের সময় ওসমানিয় সেনাবাহিনী যেমন তাদের প্রতিরোধ করতে পারেনি ঠিক তেমনি স্থানীয় শাসকগণও ইউরোপীয়দের কাছে পরাজিত হয়। কিন্তু আরব-বার্বার[৩] জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিকদের এরকম অনাহুত-প্রবেশ দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করে। তাদের প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, অসংগঠিত ও বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠা এ সংগ্রাম ভবিষ্যত সংগ্রামের ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে। শাসনের পরিবর্তে শোষণ, বৈষম্য ও ঔদ্ধত্য, দমননীতি ইত্যাদি হল সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন দিক। ইউরোপীয়দের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলেই ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠে এ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী মনোভাব। জাতীয়তাবোধ বিকাশের অনিবার্য ফল হলো রাজনৈতিক সচেতনতা। এই সচেতনতা এক সময়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উন্নীত হয় এবং মানুষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন রোধ করার জন্য এবং স্বাধিকার ও নিজেদেরকে নিজেরা শাসন করার অধিকার আদায়ের জন্য এ অঞ্চলের নাগরিকরা যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং জাতীয় মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করেছে। এর পাশাপাশি উত্তর আফ্রিকার জনগণ সব সময়েই ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর অভ্যন্তরে অবস্থান করে শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াধীন একটি সম্মানজনক অংশীদারিত্ব অর্জন করার জন্যে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং তারা নিয়োজিত হয়েছিল স্বায়ত্তশাসন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে।

এ অঞ্চলের স্বাধীনতার পেছনে ছিল স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য আন্দোলনের এক ধারাবাহিক ইতিহাস। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানকার গণমানুষের যে সংগ্রাম তা কখনো হয়েছে বেগবান আবার কখনো স্তিমিত। কিন্তু স্বাধীনতার ধারনা থেকে কখনই তারা বিচ্যুত হয়নি। তবে এ অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রসমূহে জাতীয়তার যে চেতনা তা একই সময়ে বিকশিত হয়নি। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এ চেতনার উন্মেষ ঘটে। এ চেতনাকে

এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তা চেতনার ভিন্নতা থাকলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে এ অঞ্চলকে মুক্ত করা বা স্বাধীন করা। বিদেশীদের কাছ থেকে এ অঞ্চলকে মুক্ত করার জন্য স্থানীয়দের প্রতিরোধের মাধ্যমে যে আন্দোলনের সূচনা, জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং সর্বশেষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে এর সফল সমাপ্তি ঘটে। বলার অপেক্ষা রাখেনা উত্তর আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তার সমাপ্তি ঘটেছে তাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং নতুন জাতি রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে। আর এ কথা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, উত্তর আফ্রিকার জাতিয়তাবাদী চেতনা বিকাশে স্থানীয় বা অভ্যন্তরীন উপাদান এবং বহিঃস্থ উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে অভ্যন্তরীন ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

আধুনিক যুগে জাতীয় রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও এই বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করে। ফরাসি বা ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে উত্তর আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেনি। জাতীয়তাবাদের ভিত্তি এবং লক্ষণ সমন্ধে পন্ডিত মহলে মতভেদ আছে। বিখ্যাত দার্শণিক জন স্টুয়ার্ট মিল এ সম্পর্কে বলেছেন, “একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় সহ-অবস্থান, এক রাজার শাসনে বাস এবং ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয়তার মূল ভিত্তি। পরাধীণ হলে তার পরিবর্তে স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্খা এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও ঐক্য থাকা চাই।” এই উপাদানগুলি জাতীয়তাবাদ বিকাশের সহায়ক, কিন্তু জাতীয় চেতনার জন্য একান্ত অপরিহার্য নয়। বলা বাহুল্য উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেরণার প্রত্যক্ষ ফল উপনিবেশিক শিক্ষার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, স্থানীয় শাসন প্রবর্তণ এবং একই প্রকার শাসন প্রণালী ও আইন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ক্রমশ উত্তর আফ্রিকিয়দের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শগত পরিবর্তণ হতে থাকে এবং তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে। এই রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক ঐক্যবোধের ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক দল গঠনে প্রেরণা যোগায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার দরুন উত্তর আফ্রিকার জনমানসে এক নব চেতনার জাগরণ ঘটে। উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশবাদীদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রথমদিকে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। বৈদেশিক প্রভাবের তাৎপর্য ও এর ধ্বংসাত্মক দিকগুলো সম্পর্কে কোন ধারনাই এদেশের মানুষের মধ্যে ছিলনা। পর্যায়ক্রমে এ অঞ্চলের জনগণ বিদেশীদের প্রভাবের বিষয়গুলো অনুধাবন করতে থাকে। এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিকদের দোষত্রুটিসমূহ তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে সেখানে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। এই নবজাগরণকে কেন্দ্র করেই এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ উপাদানের পাশাপাশি বহিঃস্থ বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শানিত করার প্রয়াস চালায়। অভ্যন্তরীণ উপাদান সমূহকে সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত করণে বহিঃস্থ ঘটনাবলী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে বৈশ্বিক যে ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ফরাসি বিপ্লব, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, মিশনারী শিক্ষা ইত্যাদি ছিল অন্যতম।

অভ্যন্তরীণ উপাদান

ইউরোপিয় শিক্ষার বিস্তার

ইউরোপিয় শিক্ষার বিস্তার উত্তর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ বিকাশের অন্যতম উপাদান বলা যেতে পারে। ইউরোপিয় বণিকদের আগেই খ্রিষ্টান মিশনারীরা আফ্রিকায় পা দেয়। খ্রিষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপক প্রচলণ ঘটতে থাকে। মিশনারীদের কাছ থেকে এখানকার জনগোষ্ঠী আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকে এবং শিখতে থাকে কিভাবে বহু সমস্যা কাটিয়ে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে

চলা যায়।[৪] দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক সরকার, বিশেষ করে ব্রিটিশ ও ফরাসি ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরের দশকে যেসব আফ্রিকান আরো বেশী শিক্ষা নেয়ার জন্য প্রত্যয়ী হয় তারা বিদেশে পাড়ি জমায়। ফরাসি ভাষাভাষী আফ্রিকানরা ফ্রান্সে, অন্যদিকে ইংরেজী ভাষাভাষী আফ্রিকানরা প্রধাণত: ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা লাভ করতে যায়। উত্তর-আফ্রিকায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এরকম একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন হাবিব বরগুইবা। তিনি ১৯২৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।[৫]

ইতালী কর্তৃক লিবিয়া বিজিত হবার পর সেখানে বেশ কিছু আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ফলে লিবিয়দের মানসিকতা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং একদিকে তারা আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়, অন্যদিকে ইতালিয়দের উপর ক্ষোভ বাড়তে থাকে।[৬] তিউনিসিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ফ্রান্সসহ অন্যান্য ইউরোপিয় দেশে গমন করে এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দেশ সেবায় বিশেষ করে দেশকে স্বাধীন করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। জয়তুনাহ বিশ্ববিদ্যালয় ও আল সাদিক ইনস্টিটিউট তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে।[৭] আলজিরিয়গণও ঔপনিবেশিক ফরাসিদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। অনেক আলজিরিয় ছাত্র ফ্রান্সে পড়ালেখা করতে গিয়ে ফরাসিদের জীবন ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা দেশে ফিরে ফ্রান্সে বিরাজমান আধুনিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। এদিক দিয়ে বলা যায় দখলদার ফরাসিদের কাছ থেকে আলজিরিয়ার জনগণ আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদের ধারণা লাভ করেছিল।[৮]

১৯২৬ সালে আব্দুল করিমকে বন্দী করার পর ফরাসিরা মরক্কোকে সত্যিকার উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। তারা সমগ্র মরক্কোর প্রত্যেকটি অঞ্চলে ফরাসি শাসক নিয়োগ দিয়ে জনমনে ভীতি সৃষ্টি এবং বার্বারদেরকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদাণ করে আরব ও বার্বারদের মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।[৯] ফলে শিক্ষিত মরক্কোবাসীদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্ররা পড়ালেখা শেষে দেশে ফিরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবি উত্থাপন করে। এ ধরনের দুজন ছাত্র আলাল আল ফাসি (Allal al Fasi) ও হাজি আহমদ বালাফরেজ (Haji Ahmed Balafrej) মরক্কোর জনগণকে সংগঠিত করার জন্য ফেজ এবং রাবাতে গোপনে কার্যক্রম শুরু করেন।[১০] ক্রমান্বয়ে শিক্ষিত আফ্রিকানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের অনুসন্ধিৎসু মনে জাতীয়তাবোধের জন্ম দেয়। এভাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটি শিক্ষিত মহলের সৃষ্টি হয়। এরা ইউরোপের যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বতন্ত্র ও উদারবাদী আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে স্বাধীকার আন্দোলনে আসে। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীইছিল উত্তর আফ্রিকার সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী।

ধর্মীয় চেতনা

উত্তর আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে ধর্ম যে ভূমিকা পালন করে লিবিয়া তথা উত্তর আফ্রিকায় তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। উত্তর আফ্রিকায় ইউরোপীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সময়উসমানিয় সেনাবাহিনী বা স্থানীয় শাসকগণ ইউরোপিয়দের কাছে পরাজিত হলেও বা বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে তাদের আধিপত্য মেনে নিলেও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বার্বার ও আরব জনগণ তা মেনে নিতে পারেনি। আক্রান্ত প্রতিটি দেশের জনগণই আক্রমণকারীদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে এবং স্বল্পকালের জন্য হলেও তা সফল হয়। অসংগঠিত ও বিক্ষিপ্ত এসব প্রতিরোধ সংগ্রামের পেছনে তেমন কোন জাতীয়তাবাদী চেতনা কাজ করেনি। ধর্মই এসব প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের মূল প্রেরণা ছিল।

১৯১১ সালে সানুসীরাই লিবিয়া রক্ষা করার জন্য ইতালীর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়েছিল। উসমানিয় সুলতানও ইতালির এই আক্রমণকে ইউরোপিয় আগ্রাসন হিসেবে না দেখে খ্রিষ্টান আগ্রাসন হিসেবেই দেখে। সানুসীদের ধর্মযুদ্ধের ডাক লিবিয়ার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ইতালি বিরোধী ঐকমত্য গড়ে তোলে এবং তারা ইতালিকে প্রতিরোধে অংশ নেয়। সাইরেনিকা ও ত্রিপোলিতানিয়া এলাকা অতিক্রম করে সানুসীদের এই আন্দোলন এক পর্যায়ে ফেজ্জান[১১] এ পৌছায়।[১২] ১৯১৪ সালে রমাজান আল-সুহাইলি (Ramadan al-Suwayhili) নামক ফেজ্জান এর একজন নেতা ইতালির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাকে সহায়তা করার জন্য সানুসী নেতা সৈয়দ শফি আল দীন সাইরেনিকা থেকে ফেজ্জান গমন করেছিলেন।[১৩] এভাবে ক্রমান্বয়ে সানুসী আন্দোলন সমগ্র লিবিয়ায় এমনকি তিউনিসিয়াতেও বিস্তৃত হয়। ১৯১২ সালের চুক্তির[১৪] মাধ্যমে উসমানিয় সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ লিবিয়াকে ইতালির হাতে ছেড়ে দিলেও সানুসীদের আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ধর্মীয় অনুভূতির মাধ্যমে সৃষ্ট এসব প্রতিরোধ সংগ্রামই পরবর্তীকালে লিবিয়ায় জাতীয়াতাবাদী আন্দোলনে রূপায়িত হয়।

লিবিয়ার মত তিউনিসিয়াতেও ফরাসি বিরোধী মনোভাব তৈরীতে ধর্মীয় চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফরাসিরা তিউনিসিয়া দখলের পর স্থানীয় জনগনের পক্ষে এখানে সশস্ত্র বিদ্রোহ গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য ছিল। এজন্য ধর্মীয় নেতারা সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রিষ্টান বিরোধী ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি করে। লিবিয়ার সানুসী আন্দোলনের প্রভাব পড়ে তিউনিসিয়াতেও। শেখ মোহাম্মদ আল সানুসী ফরাসিদের অত্যাচার ও নির্মমতার বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পান। পরবর্তীতে শেখ আল মাক্কী ইবনে আজিজ নামক একজন আলিম তিউনিসিয়ার মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। বশির সফর নামক অপর একজন আলিম এ আন্দোলনে শামিল হন।[১৫] মুসলিম সমাজে উদারনীতি গড়ে তুলে ফরাসিদের শোষণকে হৃদয়াঙ্গম করানোই ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

১৮৩০ সালে আলজিরিয়া ফরাসিদের দখলে চলে যায় এবং আলজিরিয়ার বে[১৬] একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যাতে জনগণ মুক্ত ভাবে ধর্ম পালন করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এ চুক্তি লংঘিত হওয়ায় উত্তর আফ্রিকায় আরও একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। ফরাসিরা বেশ কিছু মসজিদকে গীর্জায় রূপান্তরিত করার পাশাপাশি ধর্মীয় আইনের পরিবর্তে ফরাসিদের সিভিল আইন গ্রহণকারী জনগণকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। এতে করে স্থানীয় অন্যান্য জনগণ অধিকার বঞ্চিত সাধারণ প্রজায় পরিণত হয়। আলজিরিয়ায় ফরাসি দখলের এবং ফরাসিদের মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকান্ডে প্রথম সোচ্চার হন আব্দুল কাদির (Abd-el-Qadir)। মুসলমানদেরকে ফরাসিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত করে এবং অনেক যুদ্ধে পরাজিত করে ১৮৩০ থেকে ১৮৪৭ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি অকুতোভয় নেতার পরিচয় দেন। তার অনুসারীদের কাছে তিনি একজন কর্মবীর ছাড়াও আধ্যাত্মিক ধর্ম গুরুর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি বাস্তবতার সাথে অলৌকিক দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে জনগণকে উজ্জীবিত করার পন্থা অবলম্বন করেন।[১৭] তাঁর ফরাসি বিরোধী কর্মকান্ডে জাতীয়তার চেতনার চেয়ে ধর্মীয় চেতনা বেশি প্রাধান্য পায়। তাঁর নেতৃত্বে আলজেরিয়ার ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ফরাসিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

১৯০৬ সালে আলজেসিরাস কনভেনশনের[১৮] মাধ্যমে মরক্কোর সার্বভৌমত্ব হরণ করা হয়। মরক্কোর সুলতান আব্দুল আজিজ কর্তৃক আলজেসিরাস কনভেনশনে স্বাক্ষর করাকে জনগণ মরক্কো ও ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বলে মনে করে। ১৯০৭ সালে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি সম্পাদনের পরই ফ্রান্স মরক্কোর দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর উজদাহ (ujdah) এবং কাসাব্লাংকা (Casablanca) দখল করে। এর পর ফ্রান্স মরক্কোর আরো কিছু এলাকা দখল করলে উলেমা সম্প্রদায় ১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে আব্দুল আজিজকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাই আব্দুল হাফিজকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু আব্দুল হাফিজের সময়েও বিদেশী প্রভাব হ্রাস পায়নি বরং ১৯১২ সালের মার্চ মাসে ফরাসিদের চাপে তিনি

প্রটেক্টরেট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর বিরুদ্ধে মরক্কোবাসি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও আলজিরিয়ার ন্যায় মরক্কোতেও এ পর্যায়ে সনাতন ধারার আন্দোলন শুরু হয়। এ সংগ্রামকে ধর্মযুদ্ধ বলেই আখ্যায়িত করা যায়। কারণ ইসলামের নামেই ফরাসিদের বিরুদ্ধে এ পর্যায়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল।[১৯] এ প্রতিরোধ সংগ্রামে মরক্কোর মুরাবিত সম্প্রদায়, তরীকাপন্থী ও আলিমগণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মরক্কোর বার্বার বংশোদ্ভুত এ সম্প্রদায়গুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ফরাসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেয়।[২০]

পত্র-পত্রিকার ভূমিকা

উত্তর আফ্রিকার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংগঠনিকভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া ছাড়াও লেখনির মাধ্যমে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করার উদ্যোগ নেয়া হয়। আর এই লেখনির কাজটি করার জন্য পত্রিকাই ছিল সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম। এ সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও মুক্তচিন্তাবাদী বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯১৯ সালে ন্যাশনাল রিফর্ম পার্টির (National Reform Party) মুখপাত্র হিসেবে লিবিয়ায় আল লিউয়া আল তারাবালসি (Al-Liwa al-Turabalsi-The Tripoli Standard) নামে একটি পত্রিকা বের করা হয়। খালিদ আল কুরকানী ও উসমান আল খারিয়াদি এ প্রত্রিকা বের করেন।[২১] ১৯৩১ সালে জেনেভা থেকে আমীর সাকিব লা ন্যাশন অ্যারাবে (La Nation Arabe) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে ইতালিকে লিবিয়ায় কঠোর নীতি পরিহারের আবেদন জানানো হয়।১৯৪২ সালে মিসরে অবস্থানরত কিছু লিবিয় সানুসী আসাদ বিন উরমানের নেতৃত্বে 'উমর আল মুখতার ক্রীড়াচক্র' (Umar al-Mukhtar Sporting Society) গঠন করে।[২২] ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে এ ক্লাবের পক্ষ থেকে মাসিক ক্রীড়া বিষয়ক ম্যাগাজিন বারাকা আল রিয়াদিয়া (Baraga al Riydiya) এবং আগষ্ট মাসে আর একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা মাজাল্লাত, উমর আল মুখতার (Majallat, Umar al Mukhtar) প্রকাশ করে।[২৩] ক্রীড়া ও সাহিত্য বিষয়ে এ পত্রিকা দুটো প্রকাশিত হলেও জনগণকে সংঘবদ্ধ করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য এবং এক্ষেত্রে তারা অনেকখানি সফলতা লাভ করে।

তিউনিসিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা আলী বাশ হাম্বা 'যুব তিউনিসিয় পার্টির' পাশাপাশি 'উলেমা' নামেও একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের মুখপত্র হিসেবে পরবর্তীতে ৩টি খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত আল মুসতাকবাল আল-তিউনিস (Al-Mustaqbal al Tunis-The Tunision future) এবং আরবী ভাষায় প্রকাশিত সাবিল-আল-রশিদ (Sabil al Rashid-The raod to truth) এবং হাবিব আল-উম্মাহ (Habib al Ummah-The Nations Beloved) জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৪]

১৯১৮ সালে আলজিরিয় জাতীয়তাবাদী নেতা আমীর খালিদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্যারিসগমন করে গিয়ে প্রেসিডেন্ট উইলসনের সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়।[২৫] সেখান থেকে ফিরেই আমির খালিদ আলজিরিয়ান মুসলিম ব্লক নামে একটি সমিতি গঠন করেন। আলজিরিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উষালগ্নে এ সংগঠনের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। এ সংগঠনের ও তার চিন্তা ভাবনার প্রতিফলনের নিমিত্তে তিনি আল ইকদাম (Al-Iqdam) নামে আরবি ও ফরাসি ভাষায় একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করেন।[২৬] ফরাসি শাসনে আলজিরিয়ার জনগণ বিশেষ করে মুসলমানরা কিভাবে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, তা এ পত্রিকায় তুলে ধরা হয়। ফরাসি শাসনের ও

নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আল ইকদাম পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মরক্কোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উষালগ্নে লিসান আল মাগরিব (Lisan al Maghrib) নামক প্রথম একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফরাসি আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং জাতীয়তাবাদী কর্মকান্ডের উলেখ করে এ পত্রিকায় বিভিন্ন খবর ও নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। সুলতান মাওলে হাফিজের সময়ে যেসব উলেমা সংবিধানের খসড়া তৈরি করেছিলেন, তাদের উদ্যোগেই তাঞ্জিয়ার থেকে এ সাপ্তাহিক কাগজটি প্রকাশিত হতো।[২৭] ফরাসি-স্পেনিয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধেমরক্কোতে আর একটি সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। El Telegrama del Rif নামক এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন রিফ যুদ্ধের মহানায়ক আবদুল করিম। El Telegrama রিফ এর জনগণকে অধিকার আদায়ে যে উজ্জীবিত করেছিল তা আব্দুল করিমের কর্মকান্ড পর্যালোচনায় অনুধাবন করা যায়। মরক্কোর প্রথম রাজনৈতিক দল al Islah পার্টির মুখপত্র হিসেবে দলের প্রতিষ্ঠাতা খালিদ টোরসের সম্পাদনায় আল হুররিয়াহ (al Hurriyah) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। আবদুল খালিক টোরসের অপর সহযোগী মাক্কী আল নাসিরী আল ওয়াহ্‌দা আল মাগরিবিয়াহ্ (al wahda al Maghribiyah) নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।[২৮] এ পত্রিকা দুটিই জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৭ সালের পর আলাল আল ফাসি, আল নাক্‌দ আল ধতি (al-Naqd al Dhati-Autocriticism) নামে একটি পত্রিকা বের করেন। এ পত্রিকাটি মরক্কোতে ফরাসি শাসনের তীব্র প্রতিবাদ করে এবং জনগণকে সংগঠিত করে।[২৯] ১৯৫১ সালে তিনি মিশর থেকে মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করে al Ummah নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকা ফরাসি ও স্পেনিয়দের নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক কর্মকান্ড জনগণের সামনে তুলে ধরে। উল্লেখিত পত্রিকাগুলো উত্তর আফ্রিকায়জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপনিবেশিক শাসনের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য

ইউরোপীয় শাসকবর্গ উপনিবেশিক শাসনকে সুসংঘত করার লক্ষ্যে উত্তর আফ্রিকায় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজী ও আধুনিকায়ন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালত প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন কৌশল এগুলোর অন্যতম।[৩০] উত্তর আফ্রিকার অর্থনীতির উপর উপনিবেশিক শাসন প্রভূত প্রভাব ফেলে। কৃষিতে অপরিসীম পরিবর্তন সাধিত হয়। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ প্রভৃতি কাজে উপনিবেশিকরা কৃষকদের সহায়তা করে। ইতালীর শাসক মুসোলিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে লিবীয়দের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালান।[৩১]

উন্নয়নের ছোয়ায় উত্তর-আফ্রিকার জনগণ আত্ম উপলব্ধির সুযোগ পায়। যা তাদের জাতীযতাবাদী হতে অনেকাংশেই সহায়তা করেছিল। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সেখানকার চিরায়িত সমাজ ব্যবস্থারপরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেদের বন্ধনকে শক্তিশালী করে।

রাজনৈতিক সংগঠন

জাতীয়তাবোধ বিকাশের অনিবার্য ফল রাজনৈতিক সচেতনতা। রাজনৈতিক সচেতনা সৃষ্টিতে উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র সচেতনা সৃষ্টিতে নয় আধুনিক বিশ্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উত্তর আফ্রিকাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর আফ্রিকায় অসংখ্য রাজনৈতিক দল/সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালির ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সিরিয়ার দামেস্কে “ত্রিপোলিতানিয়া সাইরেনিকা প্রতিরক্ষা কমিটি” (TCDC Tripolitania Cyrenaica defense

committee) নামকএকটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মিশরের কায়রোতে নির্বাসিত সাইয়েদ ইদ্রিস আল সানুসী এবং দামেস্কে আশ্রয় নেয়া বাশির আল সাদাবি (Bashir al Shadowy) ও উমর শিনির (Unar Shinib) এর নেতৃত্বে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় টি.সি.ডিসি. এর কার্যক্রম শুধুমাত্র দামেস্কে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর কার্যক্রম মিশর, সৌদি আরব, সিরিয়া এবং তিউনিসিয়াতেও বিস্তার লাভ করে।[৩২]

১৯০৭ সালে আলী বাস হাম্বার নেতৃত্বে যুব তিউনিসিয় দল (Young Tunisian Party) এবং ১৯২০ সালের ৪ জুন শাইখ তালিবির (Shaykh Thalibi) নেতৃত্বে দস্তুর পার্টি (Dastur party)[৩৩] নামক দু'টি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো অধিকার আদায়ের প্রতিক হিসেবে জনগণের মাঝে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার এম, টি. এল.ডি (Movement for the triomphe dee liberates Demo critiques or MTLD) ওইউ.এম.এ (Uniordee Manifeste Algerian or UMA) মরক্কোর পি.ডি.এল (Parti Demo crate de L Independence or PDL), প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলো উত্তর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনায় বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

উপনিবেশিক শাসন-শোষনের চূড়ান্ত পরিনতি সামাজিক বৈষম্য। উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহও সামাজিক বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। উপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহে শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়ন সাধন করা হলেও তা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহের জনগোষ্ঠীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে। আশ্রিত রাষ্ট্রের নাগরকি হিসেবে স্থানীয় জনগণের সর্বত্র প্রবেশাধিকার ছিল না। উপনিবেশিক শাসনকে পাকাপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তারা সেখানকার মাতৃভাষা পরিবর্তন করারও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। যার চূড়ান্ত পরিনতি জনগণের আত্ম উপলব্ধি তথা জাতীয়তাবোধ বিকাশ।

নব্যতুর্কী আন্দোলন

তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের দমননীতি বন্ধ, তুরস্ককে ইউরোপের ন্যায় একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিনত করার লক্ষ্যে যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তা ইতিহাসে নব্যতুর্কী আন্দোলন নামে পরিচিত। ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত এনভের বে, তালাত বে ও জামাল বে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। নিয়মতান্ত্রিক ও শক্তিশালী আন্দোলন পরিচালনার জন্য তারা ঐক্য ও প্রগতি নামক একটি সমিতি গঠন করে। তুরস্কের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও সুসংহত করার লক্ষ্যে সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হলেও এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ে উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহে। যেখানকার অবহেলিত ও শোষিত জনগোষ্ঠী এই সমিতির কার্যক্রম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। যা তাদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতে সহায়তা করেছিল।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

উত্তর আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদ বিকাশে বহিঃস্থ ঘটনাবলীরঅবদান কম নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন বহিঃস্থ উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, উত্তর আফ্রিকাতেও এর ব্যতয় হয়নি। এই চেতনার বিকাশ ঘটে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমে। উত্তর আফ্রিকাতে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠার ক্ষেত্রে নিম্নে আলোচিত বিষয়গুলো গভীর প্রভাব রাখে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার স্বাধনীতা যুদ্ধ

গ্রেট ব্রিটেনের কাছ থেকে আটলান্টিক উপকূলের ১৩টি উপনিবেশ বা কলোনির স্বাধিকার আদায়ের জন্য সংঘটিত যুদ্ধই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেন এই নতুন মহাদেশের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের দখল নেয়। অপর দিকে এই মহাদেশের উত্তরভাগে অর্থাৎ আটলান্টিক উপকূলবর্তী এলাকায় ইংরেজদের ১৩টি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ সরকার আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপনিবেশগুলোর সকল দলিলপত্রে সরকারি স্ট্যাম্প লাগানোর আইন জারি করে। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশ স্বার্থের সংঘাত বাধে। জনসাধারনের প্রবল আপত্তির মুখেও ইংরেজ সরকার বাণিজ্য ও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উপর নতুন নতুন শুল্ক আরোপ করতে থাকে। এর প্রতিবাদে ১৭৭৩ সালে একদল লোক বোস্টন বন্দরে অবস্থানরতজাহাজ থেকে চায়ের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দেয়। এই অবাধ্যতা দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেয় এবং সেখানে ইংরেজ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। এভাবে ১৭৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল লিক্সিংটন কংকর্ড[৩৪] এ সরাসরি সংঘর্ষ বাধে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম সফল বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে উত্তর আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলে, ব্রিটিশ সরকার তা দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু আমেরিকানদের মুক্তিকামী মনোভাব, জর্জ ওয়াশিংটনের যোগ্য নেতৃত্ব একই সাথে ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্যে আমেরিকা ১৭৮১ সালে ব্রিটিশদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। ১৭৮৩ সালে প্যারিস সন্ধির মাধ্যমে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়। আমেরিকার এই বিজয় পরবর্তী সময়ে মুক্তিকামী আফ্রিকানদেরঅনুপ্রাণিত করে।[৩৫]

ফরাসি বিপ্লব

আঠারো শতকের শেষদিকে যে রাজনৈতিক ঘটনা ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপের ইতিহাসের ধারাকে পাল্টে দেয়, তার নাম ফরাসি বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল- সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা (Liberty, Equality and Fraternity)। এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ফরাসি জনগণ তাদের স্বৈরাচারী, রাজতান্ত্রিক ও বহু বছরের ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। ফরাসি বিপ্লব শুধু ফ্রান্সের ইতিহাসকেই প্রভাবিত করেনি, এর সুদূর প্রসারী ফলাফল পড়েছিল পৃথিবীর ছোট বড় সবধরনের রাষ্ট্রের উপর। পরিনামে ইউরোপের দেশে দেশে স্বৈরশাসকের উৎখাত এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জাতীয় আন্দোলন উনিশ শতকের ইতিহাসের মূল ঘটনা প্রবাহ ছিল আত্ন অধিকার প্রতিষ্ঠা। "ফরাসি বিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রচেতনা, ব্যক্তি ও বাক-স্বাধীনতা, জনগণের মৌলিক অধিকারের বাণী"।[৩৬] এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে সামন্ত যুগের পুরনো বিধি-বিধান পরিবর্তন হয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সম্মিলিত সামাজিক আধিপত্যের অবসান ঘটে। বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদের ধারনা পূর্ণতা লাভ করে। জাতীয়তাবাদ একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। Hans Kohn এর মতে, ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণার ফলেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উর্ধ্বে জাতি তথা জাতীয়তাবাদের ধারনা বিকশিত হয়। ক্রমে এ জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।[৩৭] ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন রায় ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।[৩৮] ফ্রান্সে লেখাপড়া করার সুবাধে তিউনিসিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হাবিব বরগুইবা ফরাসি বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। পরবর্তীতে তার কার্যক্রম সেই চেতনারই অংশ।

ঐতিহ্যবাহী ফরাসি বিপ্লব ছিল সার্বজনীন। প্রকৃত পক্ষে, এ বিপ্লবের বড় অবদান বিশ্বব্যাপি বিপ্লবী চেতনা সঞ্চার। ফরাসি বিপ্লবই সত্যিকার অর্থে ইউরোপের সর্বত্র স্বাধীনতার বীজ ছড়িয়ে দেয়। কেননা বিপ্লবী

ফ্রান্সের প্রধান প্রধান শ্রেণী ও দলসমূহ এই বার্তা পৌছে দেয় যে, সমগ্র মানব জাতির কল্যানার্থে তারা বিপ্লব পরিচালনা করেছে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগন ফরাসি বিপ্লবকে মডেলরূপে গ্রহণ করে। ফরাসি বিপ্লব এভাবে উনিশ শতকে গণতান্ত্রিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পথ সুগম করে। এই বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনা নিদারুনভাবে আন্দোলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ফরাসি বিপ্লবকাল থেকে একটি সর্বব্যাপী সন্নিবেশিত চেতনা হিসেবে জাতীয়তাবাদী আদর্শের উন্মেষ ঘটে।[৩৯]ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী সময়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব ইউরোপ এবং শেষাবধি পৃথিবীর সকল দেশে তিনটি আদর্শ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের নিয়ামক হয়ে ওঠে। (১) জাতীযতাবাদ, (২) গণতন্ত্র ও (৩) সমাজতন্ত্র।[৪০]

ফরাসি বিপ্লবের মধ্যদিয়ে জাতীয়তাবাদ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উসমানিয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশে অতি অল্প সময়েই এই দর্শনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ইউরোপীয় শক্তিবর্গের প্রচ্ছন্ন ইংগিতে সেখানকার জনগণ স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়।[৪১] পরবর্তী সময়ে উত্তর আফ্রিকানরা এই বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে এবং জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের শৃংঙ্খল ভাঙ্গতে শুরু করে। মানব মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য, দেশাত্ববোধের- বিশ্বজনীন আদর্শ ফরাসি বিপ্লবের ফলে মুক্তিলাভ করে, অনুপ্রাণিত করে প্রগতিবাদী ও পরিবর্তনকামী জনমানুষকে।[৪২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় শক্তিগুলো প্রধানত দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার নেতৃত্বে গড়ে উঠে ত্রিপক্ষীয় আঁতাত। অন্যদিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালির নেতৃত্বে গড়ে উঠে ত্রিপক্ষীয় জোট। জার্মানি ও ফ্রান্সের পারস্পরিক সন্দেহ ও ঈর্ষা, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার তীব্র সংঘর্ষ, বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধিতে অস্ট্রিয়ার ক্ষোভ, প্রধান শক্তিবর্গকে দুটি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত করে ফেলে। ইঙ্গ-জার্মান নৌ প্রতিযোগিতার তীব্রতার জন্য উত্তেজনা বৃদ্ধি, অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি বহু কারণের সম্মিলিত ফল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।[৪৩] এই যুদ্ধ শুধু দুটি শক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা।পৃথিবীব্যাপি বিস্তৃতি ঘটে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালে জার্মানির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে। ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের পক্ষে বহু আফ্রিকান কখনো সেনাসদস্য আবার কখনো সাহায্যকারী হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করে। যুদ্ধ শেষে অনেক আফ্রিকান দেশে ফেরত আসে এবং স্বীয় দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে।[৪৪] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অংশেস্বাধীকার আন্দোলন সূচিত হলে তিউনিসিয়াতেও এর প্রভাব পড়ে। তিউনিসিয়ার ফ্রেঞ্চ শিক্ষিতরা সরকার পরিচালনায় তাদের অধিকতর ভূমিকার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।[৪৫] কৃষাঙ্গরা, শ্বেতাঙ্গদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করলেও যুদ্ধ শেষে তারা তাদের অধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার প্রাক্কালে আফ্রিকানদের সেখানে উপস্থিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হলেও সেখানে তাদেরকে উপস্থিত হবার অনুমতি দেয়া হয়নি। অন্যদিকে, বিজয়ী শক্তিসমূহ কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই পরাজিত জার্মানির উপনিবেশসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। মিত্র শক্তির এরূপ কার্যক্রম আফ্রিকানদের হতাশ করে তোলে এবং এই হতাশা থেকেই তাদের মধ্যে জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদী চেতনা।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন ও লীগ অব নেশনস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) ভয়াবহতা ও ব্যাপকতায় বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মানুষের এই উদ্বিগ্নতা থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় লীগ অব নেশনস্ বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক আন্তর্জাতিক সংগঠন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন ১৯১৮

সালে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৪ দফা দাবি[৪৬] পেশ করেন। ঘোষিত ১৪ দফার ১৪ নম্বর ধারাটি ছিল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা। যুদ্ধ শেষে প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২০ সালে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য প্রধানত জার্মানিকে দায়ী করে তার সমস্ত উপনিবেশ মিত্র শক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে উপনিবেশগুলো আরো বেশি শোষণের শিকার হতে থাকে। প্যারিস শান্তি চুক্তি বা জাতিপুঞ্জ আফ্রিকানদের দুঃখ লাঘবে তেমন কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেনি। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে যে ইউরোপীয় শক্তি অপরাজেয় নয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে বা স্বেচ্ছায় তারা উপনিবেশ ত্যাগ করবে না।[৪৭] এই মানসিকতাই তাদেরকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করে।

বলশেভিক বিপ্লব

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা রাশিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এতে করে দীর্ঘদিনের পুঁজিবাদ ও জারতন্ত্রের অবসান ঘটে। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ একে মোটেই সুনজরে দেখেনি। বরং রাশিয়ায় নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক সরকারকে ধ্বংস করতে সবরকম প্রচেষ্টা চালায়। সমাজতন্ত্রকে টিকে রাখার স্বার্থে বলশেভিক নেতা লেনিন সমাজতন্ত্রকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার ঘোষনা দেন। তারা শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি গ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক জনগণের সহানুভূতি অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। তাছাড়া বিশ্বব্যাপি শান্তি স্থাপনের বিষয়টি বলশেভিকদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ভুক্ত ছিল।[৪৮]

এই সূত্র ধরেই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর কমিউনিস্টরা ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তি স্থাপনের জন্য এক সনদ ঘোষনা করে। তাদের এই ঘোষণার মূলমত্র ছিল এমন এক আশু শান্তি যাতে কোন রকম শর্ত কিংবা ক্ষতিপূরনের বালাই থাকবেনা। তাছাড়া ইতিপূর্বে জার সরকারের আমলে যে সব গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, সেগুলোও তারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করে। বলশেভিকদের এই ঘোষনা রুশ জনগনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। বিশ্বব্যাপি এর প্রভাব পড়ে। উত্তর আফ্রিকার জনগণও এর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।[৪৯] অন্যদিকে ক্ষমতায় আসার বহু আগে থেকেই বিশ্ব জনগোষ্ঠীর আত্ম অধিকারের প্রতি লেলিনের[৫০] আকুণ্ঠ সমর্থন ছিল।

বলশেভিক বিপ্লব বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত ও ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের মনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। রাশিয়ানদের স্বশাসনের অধিকার প্রদান গোটা জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যের অবসান প্রভৃতি মহৎ আদর্শের বাস্তবায়নে সোভিয়েত রাষ্ট্র সচেষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরাও এই নবীন রাষ্ট্রের সমর্থনে এগিয়ে আসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর আয় উপলব্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়নি। যুদ্ধ পরবর্তী স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহে অনেক বিষয় অমীমাংসিত থেকে যায়। ভার্সাই চুক্তি অধিকাংশ জার্মানবাসীকে অসন্তুষ্ট করে। জার্মানির প্রতি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া সহ তার সামরিক শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধের জন্য বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রতিকার কল্পে ১৯৩২-৩৩ সাল নাগাদ জার্মানি এডলফ হিটলারের (Adolf Hitler) নেতৃত্বে একত্রিত হতে থাকে। হিটলার ফ্রান্স, ব্রিটেন ও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে জার্মানিকে পুণরায় মহাযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে। এ সময়েই জার্মানির মিত্র ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকার মুসোলিনীর নেতৃত্বে আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে (১৯৪০ সালে) ফ্রান্স জার্মানিরনিকট পরাজিত হয় এবং ব্রিটেনও প্রবল চাপের মুখে পড়ে। ১৯৪১ সালে সোভিয়েত

ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মিত্র শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধের গতি মিত্র পক্ষের অনুকূলে আসে। ১৯৪১ সালেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এফ.ডি. রুজভেল্ট 'আটলান্টিক চার্টার' ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উপনিবেশিক অঞ্চলে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। যুদ্ধ শেষে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ও অঙ্গীকার করা হয়। এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার যোদ্ধা মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে।[৫১] ১৯৪৫ সালের মে মাসে জার্মানির পতন এবং আগস্টে জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে আফ্রিকানদের মাঝে আত্ন উপলব্ধির সুযোগ ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত ফরহাত আব্বাস ফরাসি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৪২ সালে সুযোগ বুঝে তিনি আলজিরিয়ার স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন।[৫২] অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আহমেদ বেন বেল্লাহ যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আলজিরিয়ার স্বাধীনতার জন্য একটি গোপন সংগঠন গঠন করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।[৫৩]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাব

যুগে যুগে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তিভারতবর্ষকে শোষন ও শাসন করেছে। আফগান, তুর্কী, মুঘল এবং সর্বশেষ ইংরেজরা ভারতবর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে ভারতের শোষিত শ্রেণী নিজেদের আত্নমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের লিপ্ত ছিল। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ এগুলোর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাঁচশালা, দশশালা এবং শেষমেশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত করা হলে ভারতীয় সমাজ উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকে ভারতে নবগঠিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত হয় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন ধরনের সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মধ্যে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুই দশকে ভারতে রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু সমগ্র ভারতে নবগঠিত মধ্য শ্রেণীর মধ্যে যে ধারা ক্রমশ বিকাশ লাভ করতে থাকে তা ১৮৭০-এর দশকে একটি নির্দিষ্ট পরিনতি লাভ করে। শিক্ষিত সমাজের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন পেশায় নিয়োগ লাভের ফলে সমাজে, তাদের প্রভূত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। আর তাদের প্রতিনিধিগণই ১৮৭০ ও ১৮৮০ এর দশকে রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেন। উন্মেষ ঘটে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও চেতনার।[৫৪]

ভারতীয় জনগনের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশের ফলেই দুই মহাযুদ্ধের মাঝে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী জাতীয়বাদী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করলেও তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙ্গে যায়। এমতাবস্থায় ব্রিটেনে লেবার সরকার এটলি'র নেতৃত্বে উপনিবেশ ত্যাগ করার নীতি গ্রহণ করে। অবশেষে অনেকটা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে। ভারতীয়দের সফলতা আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরও বেশি উজ্জীবিত করতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া পরবর্তী সময়ে আইরিশ জাতীয়তাবাদ ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আফ্রিকানদের প্রভাবিত করে।[৫৫]

জাতিসংঘের ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘ হলো একটি ঐতিহাসিক সংগঠন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই এ ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর

শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে রদ ও রহিত করে ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তিকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৎকালীন বিশ্বনেতৃবৃন্দ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা করেন। এ লক্ষ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ভার্সাই চুক্তির একটি অংশ হিসেবে জাতিপুঞ্জ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং এর ভিত্তিতে ১৯১৯ সালের ২৮ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিপুঞ্জ (League of Nations) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে জাতিপুঞ্জের প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিপুঞ্জ গঠিত হলেও এ সংস্থার সাফল্য ও স্থায়িত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বরং জাতিপুঞ্জ গঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই এ সংস্থাটির উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। যার পলশ্রুতিতে ১৯৩৯ সালে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্যভাবে সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শেষে লীগ অব নেশনসের ধ্বংসস্তুপের ওপর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১ টি দেশের সমন্বয়ে জাতিসংঘ (United Nations) গঠিত হয়। জাতিসংঘ সনদের ৭৩ ও ৭৬ (খ) ধারায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি আফ্রিকান জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করে।

উপসংহার

উত্তর-আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের উপনিবেশিক শাসনে অভিশাপ ও আর্শিবাদ দু'টিই ছিল। এই প্রেক্ষাপটে উত্তর আফ্রিকার প্রতিটি রাষ্ট্রের জনগণ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে বিভাজনকে আরোও পাকাপোক্ত করেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে শক্তিশালী উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ও সুবিধা ভোগীদের বিপরীতে জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা ছিল সত্যিই কঠিন। উত্তর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সেই কঠিন কাজটি অত্যন্ত সফলতার সাথে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এ কাজে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সহায়তা লাভ করেছিলেন। একটি দেশের জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে আবদ্ধ করতে পারলে কোন পরাশক্তিকে পরাজিত করা কোন কঠিন কাজ নয়। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের জাতীয়তাবাদ আন্দোলন।

তথ্যনির্দেশ

১. S.M. Imamuddin, *A Modern History of the Middle East and North Africa, Vol. I* (Dhaka: Najmahsons, 1970), p. 281

২. *Ibid*, p. 281

৩. বার্বেরিয়ানদের রাজ্য। এই শব্দটি গ্রিকরা ব্যবহার করে তাদের বোঝাতো যারা গ্রীক সভ্যতার বাইরের বাসিন্দা। রোমানরা 'বারবারি' বলতে বোঝাতো মিশর এর পশ্চিমাঞ্চলকে।

৪. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও অন্যান্য, *আফ্রিকার ইতিহাস* (ঢাকাঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ১১১।

৫. হাবিব বিন আলী বরগুইবা ১৯০৩ সালের ৩ আগস্ট তিউনিসিয়ার মোনাসতিতে (Monastir) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য তিনি রাজধানী তিউনিসে আসেন। ১৯২৪ সালে তিনি সাদিক কলেজ থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৭ সালে বরগুইবা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনরায় গ্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। তিউনিসিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন অকুতোভয় নেতা ছিলেন হাবিব বরগুইবা। তিউনিসিয়ার স্বাধীনতার পর ১৯৫৯ সালের ৮ নভেম্বর তিনি প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিস্তারিত দেখুন, https:// en. m. wikipedia.org/wiki/habib_E

৬. মোঃ ফায়েক উজ্জামান, "উত্তর আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার: পত্র-পত্রিকার ভূমিকা" *Rajshahi University Journal of Arts & Law*, Vol-35, 2007, পৃ. ১০৫।

৭. S.M. Imamuddin, *Op.Cit.*, p. 305.

৮. ফায়েকউজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১

৯. Robin Bidwell, *Morocco Under Colonial Rule* (London: Frank Cass, 1973), p. 38

১০. Nevill Barbour, *Morocco (*London, Thamed and Hudson, 1956), pp. 161-162

১১. ফেজ্জান লিবিয়ার একটি প্রদেশ। এর অবস্থান লিবিয়ার দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে। এখানে বিশাল মরুভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

১২. মো.ফায়েক উজ্জামান, "উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের ধর্মীয় চেতনাঃ প্রসঙ্গ উত্তর আফ্রিকা", *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রা:বি: ১২ তম সংখ্যা ২০০৬-২০০৭* পৃ. ১১৫।

১৩. Majid Khadduri, *Modern Libya: A Study in political Development* (Baltimore: The John Hopkins press, 1968), p. 13.

১৪. এটি Ouchy-র সন্ধি নামে পরিচিত। Ouchy নামক স্থানটি সুইজারল্যান্ড লুসান এ অবস্থিত বলে একে প্রথম লুসান এর সন্ধি নামেও অভিহিত করা হয়। বিস্তারিত দেখুনঃ *https://enwikipedia. org/wiki/Treatyoflausanne*.

১৫. তিউনিসিয়ায় এ আন্দোলন Salafiyah আন্দোলন নামে পরিচিত। Zaytunah Mosque (পরবর্তীতে Zaytunah University) থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারপন্থী উলেমারা এ আন্দোলন গড়ে তোলেন। সালাফিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সাথে আধুনিকতার মিশ্রন ঘটিয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং ফরাসিদের সরাসরি বিরোধীতা না করা। এ মতবাদের অনুসারীরা তিউনিসিয়ার সংস্কারক খায়ের আলাদীন পাশার অনুসারী ছিলেন। *S.M. Imamuddin, op.cit;* p. 304.

১৬. উসমানিয় প্রশাসনে 'বে' বলতে সাধারণতঃ আনাতোলিয়া, রুমেলিয়া ও সিরিয়ার কম গুরুত্বপূর্ণ এবং ছোট প্রদেশসমূহের শাসনকর্তাকে বুঝাত। পরে অবশ্য নানা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে উপরিউক্ত অঞ্চলসমূহের বাইরেও অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে এই পদবী দেয়া হয়।

১৭. Roy Devereux, *Aspects of Algeria* (London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1912), p. 128.

১৮. S.M. Imamuddin, *Op.Cit.*, p. 319.

১৯. Nevill Barbour, *Op.Cit.*,p. 157.

২০. Robin Bidwell, *Op.Cit.*, p. 129.

২১. Jamil M. Abun Nasr, *A History of the Maghrib* (Cambridge: Cambridge University Press, first published 1971, reprint 175), p. 380.

২২. Majid khadduri, *Op.Cit.*, p.63

২৩. *Ibid*, p. 64.

২৪. S.M. Imamuddin, *Op.Cit.*, vol. 11, p. 304.

২৫. আলজেরিয়ার সচেতন জনগোষ্ঠীও উইলসনের ১৪ দফায় আকৃষ্ট হয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। S.M. Imamuddin, *Op.Cit.*, vol. 1, p. 342.

২৬. *Ibid*, p. 342

২৭. S.M. Imamuddin, *Op.Cit.*, vol. 11, p. 320.

২৮. S.M. Imamuddin, *Op.Cit.*, vol. 11, p. 280.

২৯. Nevill Barbour, Morocco *Op.Cit.*, p. 177.

৩০. ড. মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি তত্ত্বও বাস্তবতা* (ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৮), পৃ. ১৫৬।

৩১. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১।

৩২. Ronald Bruce St. John, *Libya: From Colony to Independence* (UK: Oneworld Publication, 2008), p. 67.

৩৩. Dastur Means *"Constitution"*.

[৩৪]. আমেরিকার বস্টনের উত্তর-পশ্চিমের ছোট শহর লেক্সিংটন। ১৭৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল এখানে ব্রিটিস সৈন্যের সঙ্গে আমেরিকার সৈন্যদের যে যুদ্ধ হয় তা এই স্থানটিকে বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। লেক্সিংটনের ১০-১২ মাইল পশ্চিমের কংকর্ড শহরে আমেরিকার সৈন্যবাহিনী যে গোলাবারুদের ঘাঁটি তৈরী করেছিল তা ভেঙ্গে ফেলার জন্য একটি ব্রিটিশ বাহিনী ১৯ এপ্রিল কংকডে অভিযান করে। যেখানে যাবার পথে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে লিক্সিংটনে একটি আমেরিকান বাহিনীর সম্মূখীন হয়। এই লিক্সিংটনের যুদ্ধের মাধ্যমেই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

[৩৫]. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও অন্যান্য, *আফ্রিকার ইতিহাস* (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ১০৭।

[৩৬]. নূরুন নাহার বেগম, *মানুষের ইতিহাস আধুনিক যুগ* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ. ৩৫।

[৩৭]. দিলীপ কুমার সাহা, *দক্ষিন এশিয়ার জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)* (খুলনা: সৌরভ প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ১০.

[৩৮]. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪।

[৩৯]. আবুল কালাম, *ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃ. ১৩৪।

[৪০]. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বায়ন ও ভবিষ্যত* (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ৩৮।

[৪১]. এ.বি.এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১), পৃ. ১৩০।

[৪২]. Carlton J.H. Hayes, *Modern Europe to 1870* (New Yourk: The Macmillan and Company, 1967), pp.532-533.

[৪৩]. সুভাষ ভট্টাচার্য, *বিশ্ব ইতিহাস অভিধান* (১৭৮৯-১৯৫০) (কলকাতা: কে.পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯২), পৃ. ২২০।

[৪৪]. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮।

[৪৫]. এ.বি.এম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৮।

[৪৬]. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯।

[৪৭]. উইলসনের ১৪ দফা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, David Thompson, *Europe Since Napoleon* (Londen: Longmans, 1962), pp. 534-536.

[৪৮]. আলভিন জেড, রুবিনস্টেইন, অনুবাদ আখতারউল আলম, *রাশিয়ার ইতিহা*স (ভার্জিনিয়া: ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ, ১৯৮৩), পৃ. ৫।

[৪৯]. *পুর্বোক্ত*, পৃ. ৬।

[৫০]. ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ রাশিয়ায় সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লব বা রুশ বিল্পবের নেতা ভ্লাদিমির এলিচ লেলিন। তিনি *The State and Revolution, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism* গ্রন্থ রচনা করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস উনিশ শতকে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে যে বিপ্লবী তত্ত্বের সৃষ্টি করেন বিশ শতকে তার সার্থক বিকাশ ঘটান ও বাস্তব রূপায়ন করেন ভি.আই.লেলিন। রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের নায়ক লেলিন মার্কসবাদের যে সার্থক সৃজনশীল উত্তরন ঘটান সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসে সেটি লেনিনবাদ নামে খ্যাত। বিস্তারিত দেখুন, *https: ///en. m. wikipedia. org/ wiki/ vladimir_Leni.com*

[৫১]. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০।

[৫২]. এ.বি.এম হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৯।

[৫৩]. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯০।

[৫৪]. ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভুঁইয়া, *দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ১৯৯৭), পৃ. ৭৪।

[৫৫]. ড. আবু মোঃ দেলোোর হোসেন ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

হযরত উমার (রা:)-এর কাব্যচর্চা: একটি পর্যালোচনা

ড. জিয়াউর রহমান খান*

Abstract : Hazrat Umar was one of the most powerful and influential Caliphs in Islamic history. He was the second Caliph after Hazrat Abu Bakr (R.) and senior companion of Prophet Muhammad (SAW). He was awarded the title of *Faruque* for his distinguish knowledge between right and wrong. He was one of the educated people in *Quraish* in that period, when only a few people were literate. He had also vast knowledge in Arabic poetry and he has shown a great skill as a poetry critic. A lot of eagerness to knowledge made him interested toward the Arabic poetry. Not only he read Arabic poetry, but also he understood the main objective of the poetry. Arabic poetry is a part of Islamic knowledge. So he used to encourage people to learn and memorize it. He also memorized almost all the famous poetry of *Jahili* period. He has also composed some poetries in his life, which encouraged all the Muslim people towards Islamic knowledge, ideology and consciousness. The main objective of this article is a discussion on the poetry of Hazrat Umar about various topics and evaluate his poetic genius.

ভূমিকা

হযরত উমার (রা:) ইসলামের ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। তাঁর উপনাম আবূ হাফস্।[১] তিনি ছিলেন সত্য-নিষ্ঠ, আত্মত্যাগী ও নিবেদিত প্রাণ এক মহান ব্যক্তিত্ব। যাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল বিজয় সদৃশ, যাঁর হিজরত ছিল সাহায্য সদৃশ, আর যাঁর খেলাফত ছিল রহমত সদৃশ।[২] রাসূল (সা:) এর উম্মতের মাঝে হযরত আবূ বাকর (রা:) এর পরই তাঁর স্থান।[৩] স্বয়ং রাসূল (সা:) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর উম্মতের মধ্যে আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে হযরত উমার (রা:) সবচেয়ে কঠোর এমনকি শয়তানও তাঁকে ভয় পায়।[৪] রাসূল (সা:) এর ইন্তিকালের পর খিলাফতের জটিলতার সময় তিনিই প্রথম আবূ বাকর (রা:) এর হাতে বায়আত নিয়েছিলেন।[৫] পবিত্র কুরআন একত্রিতকরণে তিনি ছিলেন আবূ বাকর (রা:) এর প্রথম পরামর্শক।[৬] আরবী কাব্য সমালোচক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কবিতাকে ভালবাসতেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়: হযরত উমার (রা:) হিজরতের চল্লিশ বছর পূর্বে ৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৭] তিনি ছিলেন বিখ্যাত কুরাইশ বংশের লোক।[৮] তাঁর বাবার নাম ছিল 'খাত্তাব' এবং মাতার নাম 'হানতামাহ'।[৯] হানতামাহ্ বিনতে হিসাম বিন মুগীরাহ ছিলেন বনী মাখযুম গোত্রের।[১০] তাঁর বংশকুলজি হল, উমার বিন খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল ওজ্জা বিন রিয়াহ্ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরত্ বিন রিযাহ বিন আদী বিন কা'ব বিন লুআই।[১১] জাহেলী যুগে আল-আকিব পাহাড়ের পাদদেশে ছিল তাঁর বাসস্থান। আজকের দিনে যাকে জাবালে উমার বলা হয়ে থাকে।[১২]

ইসলাম গ্রহণ: হযরত উমার ছিলেন ইসলামের ঘোর শত্রু। তাঁর শত্রুতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে বলা হয়ে থাকে, তিনি রাসূল (সা:) কে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন,[১৩] কিন্তু কুরআন শুনে তিনি ইসলামে প্রবেশ করেন। উনচল্লিশ জন নর-নারী ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের সংখ্যা হয় চল্লিশজন। তখন অল্লাহর বানী حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ নিয়ে হযরত জীবরাইল অবতরণ করেন।[১৪] তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ এতটাই শক্তিশালী হয়েছিলেন যে, তাঁরা তখন প্রকাশ্যে মসজিদে আযান ও নামাজ আদায় করেছিলেন।[১৫] মূলত হযরত উমার (রা:) এর

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম গ্রহণের ফলে সাহাবাদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়েছিল। তাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের দ্বারা মুসলমানদের আকাশবাসীর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তখন জীবরাইল নাবী (সা:) কে যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– [১৬]

لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ (ص) لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ

হিজরত: হযরত উমার (রা:) প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের হিজরতকারীদের অন্যতম। মক্কায় কাফেরদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে রাসূল (সা:) সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। তখন সর্ব প্রথম আবূ সালাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে আশহাল অতপর হযরত বেলাল ও আম্মার এরপর হযরত উমার বিশজন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবসহ মদীনাতে হিজরত করেন।[১৭] হযরত উমার ও আব্বাস বিন আবূ রবিআ'হ এক সাথে মদীনাতে হিজরত করেন এবং তিনি মদীনায় হিজরতকারীদের প্রথম কয়েক জনের একজন।[১৮] তবে অন্যান্য সাহাবীদের থেকে হযরত উমার (রা:) এর হিজরতের পার্থক্য হলো অন্যরা হিজরত করেছেন গোপনে আর হযরত উমার হিজরত করেছেন একেবারে প্রকাশ্যে।[১৯]

রাসূল (সা:) এর সাহচর্য: হযরত উমার (রা:) রাসূল (সা:) কে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। রাসূল (সা:) এর জীবনে এমন কোন ঘটনা ছিলনা যাতে উমারের কোন অংশ গ্রহণ নাই। [২০] অনেক কাজের ব্যাপারে রাসূল (সা:) উমারের রায়ের দ্বারা সাহায্যে নিয়েছেন।[২১] ইসলামের প্রথম জিহাদ বদর বা উহুদ বা খন্দক যে জেহাদের কথাই বলা হোক, সকল জিহাদেই তিনি রাসূল (সা:) এর সঙ্গী হয়েছিলেন।[২২] রাসূল ও ইসলামের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। রাসূল (সা:) তাঁর সাহাবাদের উত্তম গুণের দ্বারা নামকরণ করেছিলেন। যেমন তিনি হযরত আবূ বাকর (রা:) কে ছিদ্দীক ও আতীক, খালেদকে ছাইফুল্লাহ আর উমার (রা:)কে তিনি আল-ফারুক অভিধায় অভিহিত করেছিলেন।[২৩] হযরত উমার (রা:) এর মেয়ে হযরত হাফসার প্রথম বিবাহ হয়েছিল শুনাইস ইবনে হুযাফার সাথে। তার মৃত্যুর পর উমার (রা:) তাকে আবূ বাকর (রা:) এর সাথে বিবাহ দিতে চান। তিনি সম্মত না হওয়ায় হযরত উসমানের সাথে বিবাহ দিতে চান। তিনি রাজী না হলে উমার রাসূল (সা:) এর নিকট উসমানের ব্যাপারে অভিযোগ দান করেন। রাসূল (সা:) উমারকে বলেন, উসমানের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি আল্লাহ তাঁকে দান করবেন। অতঃপর হিজরী তৃতীয় সনে রাসূল (সা:) হাফসা (রা:) কে বিবাহ করেন।[২৪]

খেলাফত লাভ: রাসূল (সা:) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বাকর (রা:) সোয়া দুই বৎসর খেলাফত পরিচলানা করেন। অতপর তাঁর ইন্তিকাল হলে হযরত উমার খেলাফতে সমাসীন হন। হযরত আবূ বাকর (রা:) হযরত উমারের খলীফা হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের অসিয়ত করে যান।[২৫] খেলাফত লাভ করে তিনি আল্লাহর নির্দেশনা এবং রাসূল (সা:) ও খলিফা আবূ বাকর (রা:) এর চমৎকার অনুসরণ করেন। [২৬] ব্যক্তি জীবন থেকে কোন ক্ষেত্রেই তার বত্যয় ঘটেনি। এমন কি তিনি খলিফা হওয়ার পর নিজের জন্য দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম বাইতুল মাল থেকে গ্রহণ করতেন। [২৭] হযরত উমার সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁকে প্রথম امير المؤمنين। উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[২৮] কেননা তিনি জন সাধারণ এর জন্য নিবেদিত প্রাণ সেবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বাজারে ঘুরে বেড়াতেন আর আল কুরআন পাঠ করতেন। আর মানুষ যখন ঝগড়া করত তখন তার মীমাংসা করতেন।[২৯] খেলাফতে সমাসীন হয়ে তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার করেন। তাঁর খেলাফত কালেই আরব, ইরাক, পারস্য, সিরিয়া, মিসর মুসলমানদের অধীনে আসে।[৩০] প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন সফল বিজেতা। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও ব্যক্তিত্ব তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইতুল মোকাদ্দাস অধিকারে তাঁর সাধারণ বেশ ভূষা এবং উট থেকে নেমে হেটে পথ চেলা তার উৎকৃষ্ট নমূনা।[৩১] সাম্রাজ্য বিস্তারে তিনি জনবল বা সৈন্যবলের উপর নির্ভর করতেন না। আর তাই অপ্রতিরোধ্য বিজেতা খালেদ বিন ওয়ালীদ এর মত সেনাপতিকে প্রয়োজনে তিনি

বরখাস্ত করেন এবং সেনাপতি আবূ ওবায়দাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[৩২] প্রকৃতপক্ষে তিনি সত্যের ব্যাপারে নিন্দা ও সমালোচনার ভয় করতেন না।[৩৩] তাই দেখা যায় তিনি আম্মার বিন ইয়াসার (রা:) কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং সেখানকার সেনাবাহিনীর দায়িত্বও তাঁকে দেয়া হয় এবং উসমান বিন হুনাইফকে কুফার ভূমি জরিপের দায়িত্ব অর্পন করেন। যদিও কিছু লোক একে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছে।[৩৪] প্রশাসনিক ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।[৩৫] তিনি রাতের আঁধারে জনগণের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতেন।[৩৬] তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম জেলখানার আবিষ্কার করেন।[৩৭] তিনিই মদ পানের শাস্তিস্বরূপ ৮০ দোররার ব্যবস্থা করেন।[৩৮] তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন এবং আল্লাহর নিকট জনগণের জন্য জিজ্ঞাসিত হওয়ার ভয় পেতেন। তাই তাঁর বিখ্যাত উক্তি[৩৯] أنا المسئول عنهم في الآخرة প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষণতার প্রমাণ এটাই যে, تدوين الدواوين এর আবিস্কারক তিনিই।[৪০] তাঁর খেলাফত শূরাদের সাথে পরামর্শ করে পরিচালিত হত। তাঁর শূরার সদস্যরা হলেন, আলী, উসমান, তলহা, যুবাইর, সা'দ বিন আবি ওক্কাস, আব্দুর রহমান বিন আওফ।[৪১]

হযরত উমার (রা:) ছিলেন, দৃঢ় সংকল্প, প্রত্যয়ী, ন্যায়পরায়ণ, তাই তাঁকে ফারুক নামে অভিহিত করা হয়।[৪২] তাঁর সময়ই ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয়। কেননা তিনিই জাজিরাতুল আরব থেকে ইহুদীদের বের করে দেন।[৪৩] তাঁর নির্দেশেই রাসূল (সা:) এর হিজরতকে কেন্দ্র করে হিজরী সনের প্রবর্তন করা হয়।[৪৪] তিনিই তারাবির নামাজের জন্য মানুষকে একত্রিত করেন।[৪৫] তিনিই যাকাতের খাতসমূহের মধ্যে مؤلفة القلوب কে রহিত করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল পূর্বে ইসলাম দুর্বল ছিল তখন এ বিধান ছিল কিন্তু ইসলাম এখন শক্তিশালী এখন আর এটার প্রয়োজন নেই। তাই তিনি বলেন-[৪৬] فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر তিনি সেই ব্যক্তি যিনি রাসূল (সা:) এর পর প্রথম মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে নববীর সংস্কার করেন।[৪৭] তিনি তাঁর খেলাফতকালে অসংখ্য কালজয়ী কাজ সম্পন্ন করেন, যা ইসলাম, মুসলমান ও দ্বীনের জন্য সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর খেলাফতকাল ছিল ১০ বছর।[৪৮]

শাহাদাৎবরণ: হযরত উমার ন্যায়পরায়ণ ছিলেন অন্যায়ের সাথে তিনি কখনও আপোষ করতেন না। ন্যায় বিচারে উমারের তুলনা শুধু তিনি নিজেই। সেই উমারের নিকট মুগিরা বিন শোবার এক গোলাম ফিরোজ, যাকে আবূ লুলু বলা হত, সে এসে একটা বিষয়ে নালিশ জানাল। কারণ তার মনিব তার উপর দৈনিক দুই দিরহাম কর ধার্য করেছিল। হযরত উমার তাকে বললেন এটা ঠিক আছে। কিন্তু সে এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে চলে গেল।[৪৯] পরদিন ফজরের নামাযে সে হযরত উমার (রা:) কে নামাজের ইমামতি করার সময় উপর্যুপরি কয়েকটা ছুরিকাঘাত করে।[৫০] উমার নামাজের মধ্যেই পড়ে যান। সবাই তাঁকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে যায়। আহত হওয়ার তিন দিন পরেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।[৫১] তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে এবং পরে হযরত আয়েশা (রা:) এর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁকে রাসূল (সা:) এর পাশে সমাহিত করা হয়। কারণ তাঁর বক্তব্য ছিল যদি হযরত আয়েশা অনুমতি না দেন তবে তাঁকে যেন মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা হয়। আর যদি তিনি অনুমতি দেন তবে যেন তাঁকে রাসূল (সা:) এর পাশে সমাহিত করা হয়।[৫২]

হযরত উমার (রা:) এর কবিতা

কবিতা ছাড়া আরবদের জীবন কল্পনা করা যায় না। কবিতাই ছিল তাদের প্রাণ। সাহাবাদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যিনি কবিতা বলেন নি।[৫৩] কেননা তাঁরা ছিলেন এমন সময়কার মানুষ যারা জন্মগত ভাবেই ছিলেন স্বভাব কবি। উত্তম ও সুন্দর কবিতার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল। খোলাফায়ে রাশেদাও এ ধরনের সুন্দর করিবতার দ্বারা সিক্ত হয়েছেন।[৫৪] হযরত উমার (রা:)ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন কবিতায় বিদগ্ধ এক মহান ব্যক্তি।[৫৫] হযরত উমারের যুগে তাঁর চাইতে কাব্য বিচারক আর কেহ

ছিলেন না।[৫৬] তিনি একজন ভাল কবিও ছিলেন।[৫৭] মুসলমানদের উত্তম কবিতা মুখস্থ করতে তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন।[৫৮] যেমন তিনি বলেন-[৫৯]

رووا اولادكم ماسار من المثل وحسن من الشعر

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাছাল ও উত্তম কবিতায় সিক্ত কর।"

তবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যায় এমন কবিতার প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।[৬০] একারণে তিনি কবি হুতাইয়ার নিকট থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করেছিলেন, যেন তিনি কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা না করেন।[৬১] তিনি চাইতেন কবিরা উত্তম কবিতায় সিক্ত হোক। তাই তিনি বলেন-[৬২]

رووا من الشعر اعفه

সুস্থধারার কবিতার প্রতি তাঁর প্রাগঢ়তাই কবিতার প্রতি তাঁর দুর্বলতা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে কবিতার নামে নিন্দাবাদকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। এ জাতীয় কবিতাকে তিনি কঠোরতা আরোপের পাশাপাশি প্রয়োজন বোধে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। যেমন নাজাশী নামক এক কবি তামীম ইবনে মুকবিল খন্দানের নিন্দা করে কবিতা লিখলে তারা উমারের নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। তিনি কবি হাস্সানকে বিচারের দায়িত্ব দেন।[৬৩] অতপর তার বিচার নিশ্চিত করা হয়। উমদার ভাষায়-[৬৪]

استعداه رهط تميم بن ابى مقبل على النجاشى لما هجاهم فاسلم النظر فى امرهم الى حسان بن ثابت

যেহেতু তিনি নিন্দামূলক কবিতা নিষিদ্ধ করেন,[৬৫] তাই কবি হুতাইয়া যিবরিকান ইবনে বদর (রা:) এর কুৎসা রচনা করে কবিতা রচনা করলে উমার (রা:) হাসসান (রা:) এর মাধ্যমে তার বিচার করে হুতাইয়াকে জেলে দেন।[৬৬]

হযরত উমার কবিতাকে ভালবাসতেন। হযরত হাসসান (রা:) উমারের উপস্থিতিতে নাবী (সা:) এর মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।[৬৭] কবিতাই ছিল তৎকালীন সমাজে জ্ঞানের ভান্ডার। তাইতো উমার (রা) বলেন-[৬৮] الشعر علم قوم لم يكن لهم اعلم منه "কবিতা হল কোন জাতির এমনই এক জ্ঞান ভান্ডার যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন জ্ঞান নাই।"

এই কবিতার মাঝেই বিরাজ করত চারিত্রিক মধুরতা, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা এবং একটা বংশের সামগ্রিক পরিচয়। হযরত উমার তাঁর বিচক্ষণতার দ্বারা তা ভাল ভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই দেখা যায় তিনি তাঁর খেলাফাতকালে আবূ মুসা আল আশআরির প্রতি নির্দেশনা দান করেন যেন এ ব্যাপারে কেউ গাফেল না থাকে। উমদাহ এর গ্রন্থাকার বলেন-[৬৯]

وكتب عمر الى ابى موسى الأشعرى: مر من قبلك بتعلم الشعر، فانه يدل على معالى الاخلاق، وصواب الرأى، ومعرفة الأنساب

"হযরত উমার (রা:) আবূ মূসা আশআরী (রা:) এর নিকট লিখলেন, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের কবিতা শিক্ষা করার নির্দেশ দাও, কারণ এটা উন্নত চরিত্র, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ তালিকা সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচায়ক।"

কাব্য বিগন্ধ এক মহান ব্যক্তিত্ব হযরত উমার (রা:)।[৭০] বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। কখনো বিজয়ের আনন্দে, কখনো মহান আল্লাহর প্রশংসায়, কখনো উপদেশের নিমিত্তে বা রাসূল (সা:) এর বিরহে, যা যুগ যুগ ধরে আরবী কাব্য প্রেমিকদের আলোড়িত করে চলেছে।

ইসলাম গ্রহণের দিন রচিত তাঁর কবিতা

ইসলামকে শক্তিশালী করতে উমার এবং আবুল হাকাম এই দু'জনের যে কোন একজনের জন্য রাসূল (সা:) আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন।[৭১] তারা উভয়ই ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা উমারকে ইসলামের জন্য কবুল করেছিলেন। তিনি রাসূল (সা:) কে হত্যা করার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েও আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামে অর্ন্তভূক্ত হয়ে গিয়েছেলেন।[৭২] যে নাবীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন ইসলাম কবুল করার পর তিনি মহান আল্লাহর এবং সেই নাবীর প্রশংসা করে কবিতা রচনা করে বলেন-[৭৩]

الحمد لله ذى المنَ الذى وجبت * له علينا أيادٍ ما لها غير

وقد بدانا فكذبنا فقال لنا * صدق الحديث نبى عنده الخبر

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অনুগ্রহকারী। তারই প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য, আর কারো নয়। আমরা মিথ্যার মধ্যে ডুবে ছিলাম অতঃপর তিনি নাবী (সা:) সত্য কথা বললেন। তিনি যে নাবী, তাঁর কাছে তো সকল খবর আছে।"

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমার নবী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। এমনকি তিনি এক পর্যায়ে রাসূল (সা:) কে হত্যা করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। পথের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে খবর দেয় যে, খাত্তাব দুহিতা তাঁর বোন ফাতেমা এবং তার স্বামী বেদ্বীন হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন রাগে অস্থির হয়ে তিনি বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তিনি কুরআন পাঠ করছেন।[৭৪] তখন তিনি তাকে মারাত্মকভাবে প্রহার করেন। [৭৫] সেই প্রহারের কারণে লজ্জিত হয়ে তিনি কাব্যিক ছন্দে বলেন-[৭৬]

وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى * ربي عشيّة قالوا قد صبا عمر

وقد ندمت على ما كان من زلل * بظلمها حين تتلى عندها السور

"আমি খাত্তাব দুহিতাকে অত্যাচার করেছি। অতপর সন্ধ্যা বেলায় আমার রব আমাকে হেদায়েত করলেন। আর লোকে বলল, উমার ধর্ম ত্যাগী হয়েছে। আমি লজ্জিত আমার এ পদস্খলনে, যদ্দরুন সে কুরআনের সূরা তিলাওয়াত করার সময় আমি তার উপর অত্যাচার করেছি।"

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেছেন-[৭৭]

ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।" বস্তুত তাঁর বোন তখন করুণভাবে আল্লাহকে ডাকছিলেন, আর উমার প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহান আল্লাহকে ডাকার সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য। যা তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই তিনি বলেন–[৭৮]

لما دعت ربها ذا العرش جاهدة * والدمع من عينها عجلان يبتدر

أيقنت أن الذى تدعوه خالقها * فكاد يسبقني من عبرة درر

"যখন সে কাকুতি ভরে আরশের অধিপতি তার রবকে ডাকছিল, আর তার চোখ দিয়ে দ্রুত অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল অবিরাম ধারায়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম, যাঁকে সে ডাকছে তিনি তার সৃষ্টিকর্তা। অতঃপর মতির মত অশ্রু প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে সে আমার অগ্রগামিনী হয়ে গেল।"

ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ এবং কর্মে প্রকাশ।[৭৯] কুফরী অবস্থা থেকে হযরত উমারের ইসলাম বা ঈমান প্রকাশ ঠিক তেমনি। আল্লাহতে পূর্ণ বিশ্বাসের পাশাপাশি রাসূল (সা:) এর আনিত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার অনুগত হওয়ার মাধ্যমেই তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। হযরত উমারও তাই ঈমান গ্রহণ করে আল্লাহ ও তাঁর নাবী (সা:) এর প্রশংসা করেন। জাহিলী যুগে যেখানে আত্মপ্রশংসা ও বংশীয় স্তুতি বেশি পরিলক্ষিত হতো।[৮০] যেমন- কবি আনতারার আত্মস্তুতিমূলক একটি কবিতা-[৮১]

فاذا شربت فإننى مستهلك * مالى وعرضى وافر لم يكلم

واذا صحوت فما اقصر عن ندىً * وكما علمت شمائلى وتكرمى

"যখন আমি মদ্যপান করি (মাতাল হওয়া সত্ত্বেও) তখনও আমার সম্পদকে আমি অকাতরে ব্যয় করি। আর আমার মান-সম্মান তখনো পূর্ণ অটুট ও নিষ্কলুষ থাকে।

আমার নেশা যখন কেটে যায় তখন দান করার ক্ষেত্রে আমি কোনরূপ কার্পণ্য করিনা। আর আমার স্বভাব-মর্যাদা সম্পর্কে তুমি যেরূপ অবগত আছ, আমি (সর্বাবস্থায়) সেরূপই আছি।"

সেখানে ইসলাম গ্রহণ করে উমার বললেন-[৮২]

فقلت اشهد أن الله خالقنا * وأن أحمد فينا اليوم مشتهر

نبي صدق أتى بالحق من ثقة * وافى الأمانة ما في عوده خور

"তাই আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আর আহমাদ আজ আমাদের মাঝে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সত্য নাবী, পূর্ণ আশ্বাসে, পূর্ণ ভরসায় তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন। তিনি আমানত পূর্ণরূপে আদায়কারী, তাঁর পথে কোন জুলুম-শোষণ নাই।"

মক্কা বিজয়ের দিন রচিত তাঁর কবিতা

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী বনু খোযায়া মুসলমানদের সাথে এবং বনু বকর কুরাইশদের সাথে মিত্র স্থাপন করে।[৮৩] এর ফলে উভয় গোত্র নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করছিল, কিন্তু কুরাইশ মিত্র বনু বকর একদিন সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে বনু খোযায়ার উপর রাত্রিতে অতর্কিত হামলা করে।[৮৪] বনু খোযায়ার প্রতিনিধি মদীনায় এসে নাবী (সা:) এর নিকট সাহায্য কামনা করে তাদের উপর অত্যাচারের সব কথা খুলে বললে নাবী (সা:) মক্কা জয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৮৫] রাসূল (সা:) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রায় বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তা জয় করেন। মক্কা জয় করার পর রাসূল (সা:) জনতার উদ্দেশ্যে বলেন-[৮৬]

لا اله الا الله وحده لاشريك له صدق وعده و نصر عبده وحزم الاحذاب وحده-

"আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন।"

সেই মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত উমার কবিতা আবৃত্তি করে বলেন-[৮৭]

الم تر ان الله اظهر دينه * على كل دين قبل ذلك حائد

"তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেছেন এর পূর্বে তারা সঠিক রাস্তা থেকে দূরে ছিল।"

মক্কা বিজয়ের আগের দিন ওসামা রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন পরের দিন রাসূল (সা:) কোথায় অবস্থান করবেন, জবাবে রাসূল (সা:) বলেছিলেন আল্লাহ চাইলে পরের দিন তিনি খায়েফে অবস্থান

করবেন। কেননা সেখানে কাফেররা কুফরীর উপর শপথ করেছিল।[৮৮] পরের দিন রাসূল (সা:) মক্কা জয় করে নেন। উমারের ভাষায়-[৮৯]

واسلبه من اهل مكة بعدما * تداعو إلى أمر من الغى فاسد

"মক্কাবাসীদের নিকট থেকে তা (মক্কাভূমি তিনি) ছিনিয়ে নিয়েছেন। তারা পরস্পরকে বক্রতা ও গোমরাহীর দিকে ডাকার পর।"

পকৃত পক্ষে রাসূল (সা:) মক্কা জয়ের আগে যু তাওয়া অঞ্চলে তাঁর সৈন্য বাহিনীকে পৃথক করেছিলেন। হযরত যুবাইর (রা:) কে তাঁর সৈন্যসহ "কুদা" অঞ্চল দিয়ে মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯০] তিনি বাহিনীর বাম অংশের দায়িত্বে ছিলেন।[৯১] অপর পক্ষে হযরত খালিদ (রা:) কে "লাইত" অঞ্চল দিয়ে সৈন্য সহ মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯২] তিনি ছিলেন বাহিনীর ডান অংশে।[৯৩] এদিকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরামা ইব্নে আবূ জেহেল, সুহাইল ইবন্ আমর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে "খান দামায়" কিছু সৈন্য সমাবেশ করে।[৯৪] অতপর খালিদের বাহিনীর কতিপয়ের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষের সংঘর্ষের ফলে মুশরীক বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তাদের **১২/১৩** জন নিহত হয়।[৯৫] হযরত উমার, যুবাইর ও খালিদের সেই বীরত্বের কথা তুলে ধরে কাব্যিক ছন্দে বলেন-[৯৬]

غداة اجال الخيل فى عرصاتها * مسومة بين الزبير و خالد

فأمسى رسول الله قد عز نصره * وامسى عداه من قتيل وشارد

"মক্কা প্রাঙ্গনে ঘোড়ার নির্দিষ্ট সময়ে যা চিহ্নিত ছিল যুবাইর ও খালিদের মধ্যে, অতপর রাসূল (সা:) এলেন যার সাহায্য খুবই শক্তিশালী। আর তাঁর শত্রুরাও এলো তাদের বহু নিহত ও বহু পলায়নকারী হল।"

উপদেশমূলক কবিতা

উমদা রচয়িতা ইবন্ রশিক বর্ণনা করেন, হযরত উমার একবার একটা নতুন চাদর পরিধান করেছিলেন আর লোকজন তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। তখন তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন।[৯৭]

হযরত উমার বলেন-[৯৮]

لاشئ مما ترى تبقى بشاشته * يبقى الإله ويفنى المال والولد

"(পৃথিবীতে) তুমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছ, তার হাস্যমুখ ও লাবন্যতা অবশিষ্ট থাকবেনা, কেবলমাত্র আল্লাহ্ই অবশিষ্ট থাকবেন আর সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সবই ধ্বংশ হয়ে যাবে।"

হযরত উমারের কবিতা কত বাস্তব সম্মত, পৃথিবীতে যত ঐশ্বর্য্য যত সৌন্দর্য, আর মানুষের যত অর্জন আর যতই অহংকার থাকনা কেন একদিন না একদিন তার সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, কেবলমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা এর সত্ত্বাই অবশিষ্ট থাকবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-[৯৯]

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ইতিহাস সাক্ষ্যদেয় পৃথিবীর যত ধর্নাঢ্য ব্যক্তি, যারা সম্পদের মোহে পড়ে অহংকারী হয়ে উঠেছিল, তারা মনে করত পৃথিবীতে তারা স্থায়ী হয়ে থেকে যাবে। কিন্তু তারা তা পারেনি। যেমন বাদশাহ হুরমুজ চীরস্থায়ী হয়নি বা আদজাতি যারা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তাদের কেউ উঠত এবং একটা প্রকান্ড পাথর উঠিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করত। আর এ পাথরে চাপা পড়ে ঐ সম্প্রদায়ের সবাই মারা যেত।[১০০] তাদের বাসস্থান ছিল ইয়ামেন দেশের আহকাফ নামক জায়গায়।[১০১] তারা বড় বড় প্রাসাদে বসবাস করত।

স্তম্ভের মত দীর্ঘকায় ছিল। তাদের মত এমন প্রাসাদ কোন নগরে তৈরী হয়নি।[১০২] তারা আল্লাহকে অস্বিকার করে মূর্তি পুজায় লিপ্ত হয়েছিল। বিপুল দৈহিক শক্তির অধিকারী হয়ে তারা মানুষের উপর যুলুম করত। আল্লাহ তাদের হেদায়েতের জন্য হুদ (আ:) কে প্রেরন করেছিলেন। তারা তাঁকে অস্বিকার করে। আল্লাহ তাদের উপর ৮ রাত ৭ দিন ঝড় দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেন।[১০৩] উমারের ভাষায়-[১০৪]

لم تغن عن هرمز يوما خزائنه * والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا

"একদিন হুরমুজ বাদশাহ আর তার ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবেনা, আদ জাতি চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা চিরস্থায়ী হতে পারেনি।"

নাবীদের মাঝে হযরত সুলাইমান (আ:) সবচেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন, যেন তাঁর মত রাজ্য কারো না হয়।[১০৫] সুতরাং তাঁকে এমন সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল যা পৃথিবীতে আর কাউকে দেয়া হয়নি।[১০৬] তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন।[১০৭] জ্বিনেরা সুলাইমান (আ:) এর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করত।[১০৮] কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ বায়ুকে সুলাইমান (আ:) এর অধিন করেদিয়েছিলেন। যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকলে এক মাসের পথ অতিক্রম করত।[১০৯] কিন্তু এত প্রতাপশালী একজন নাবীর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য একদিন শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। শুধু তিনি নন বরং মানুষ-জ্বীন তথা জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।[১১০] এদিকেই ইঙ্গিত করে উমার (রা:) বলেন-[১১১]

ولا سليمان إذ تجري الرياح له * والجنُّ والإنس فيما بينها ترد

"সুলাইমান (আ:) চিরস্থায়ী হতে পারেন নি, বাতাস যার নির্দেশে পরিচালিত হত। আর জ্বিন ও মানব সেই মৃত্যু ঘাটিতে অবতরণ করবেই।"

আল্লাহ তা'য়ালা নাবী (সা:) কে বলেছেন যে, তিনি তাঁকে কাওছার দান করেছেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যখন সূরা কাওছার অবতীর্ণ হয় তখন নাবী (সা:) সাহাবীদের জানান তাঁর উপর একটা সূরা অবর্তীণ হয়েছে, অতঃপর তিনি সূরা কাওছার পাঠ করেন। রাসূল (সা:) তাঁদের জানান কাওছার হল একটা জান্নাতি নহর। এতে বহু কল্যাণ নিহিত আছে। মহান আল্লাহ তাঁকে তা দান করেছেন। কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মত সেই কাওছারের ধারে সমবেত হবে। আসমানের যতো নক্ষত্র আছে সেই কাওছারের পিয়ালার সংখ্যাও ততো।[১১২] হযরত উমার (রা:) ও সেই হাওজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কাব্যিক ছন্দে বলেন-[১১৩]

حوض هنالك مورود بلا كذب * لابدَّ من ورده يوما كما وردوا

"সেখানে একটি (হাউজ) ঝর্ণা থাকবে, যেখানে সত্যিকার অর্থে ঘাট থাকবে, সে ঘাটে একদিন নামতে হবে, যেরূপ লোকেরা নেমেছে।"

তবে জাবিহ জাদাহ তাঁর হুসনুস সাহাবা গ্রন্থে কবিতাটির প্রেক্ষাপট ভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত উমার জীবনের শেষ হজ্জ করে ফেরার সময় বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি যাকে যা কিছু ইচ্ছা করেন তাই দান করেন। আমি উমার এই 'দাজনান' উপত্যকায় খাত্তাবের বকরি চড়াতাম, আমি কাজে ত্রুটি করলে তিনি আমাকে প্রহার করতেন। আজ আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি অথচ আমার ও আল্লাহর মধ্যে প্রতিবন্ধক কোন লোক নেই, যাকে আমি ভয় করব। তখন তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করলেন।[১১৪]

কবিতার মাধ্যমে তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:) বলেন, হযরত উমার প্রায়ই মিম্বারে খুৎবা দেওয়ার সময় নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতেন-[১১৫]

هون عليك فإنَّ الأمور * بكف الإله مقاديرها

فليس يأتيك منهيا * ولا قاصر عنك مأمورها

"তোমরা নিজের উপর নম্র আচরণ কর। কারণ সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রনাধিকার ও পরিমাণ নির্ধারণ আল্লাহর হাতে। তাই নিষিদ্ধ জিনিস তোমার কাছে আসবে না। আর সে সমস্ত কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা তোমার থেকে কম হবেনা।"

রাসূল (সা:) এর বিরহে রচিত কবিতা

যখন রাসূল (সা:) ইন্তিকাল করেন, তখন হযরত উমার (রা:) এ ব্যাপারে খুবই কঠোর হয়ে উঠলেন, এমন কি তিনি হুমকি দিলেন, যে ব্যক্তি রাসূলের মৃত্যুর কথা বলবে তাকে তিনি হত্যা করবেন। তিনি বললেন, এটা ইহুদী ও মুনাফেকদের রটনা। তিনি অচিরেই তাদের জিহ্বা ছিন্ন করে দেবেন। আর এসবই ছিল রাসূল (সা:) এর প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং সম্পৃক্ততার কারণে।[১১৬] অবশেষে আবূ বাকর (রা:) বের হয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, যারা মুহাম্মদ (সা:) এর ইবাদত করবে তোমরা জেনে রাখ তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করবে তারা জেনে রাখ তিনি চিরঞ্জীব, তিনি মৃত্যু বরন করবেন না। তখন উমার (রা:) চুপ হয়ে গেলেন এবং রাসূল (সা:) এর বিচ্ছেদে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।[১১৭] রাসূল (সা:) এর বিরহে হযরত উমার (রা:) শোকগাথা রচনা করেন।[১১৮]

আল্লামা শিবলী নোমানী বলেছেন, হযরত উমার (রা:) অসাধারন ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু সাধারন ঐতিহাসিকদের বর্ণনাগুলো তাঁর ধৈর্য্যশীলতার বিপরীত দিক প্রমাণ করে। তিনি বলেন, হযরত উমার ধৈর্য্য হারা হয়ে এরূপ আচরণ করেননি বরং রাসূল (সা:) এর ওফাত কে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা যেন কোন বিপ্লব সৃষ্টি করার সুযোগ গ্রহণ না করতে পারে হয়তো সেজন্যই এই খবরটাকে কিছুক্ষণের জন্য চাপা দেয়ার জন্য তিনি এরূপ আচরণ করে থাকতে পারেন।[১১৯]

রাসূল (সা:) এর শোকে হযরত উমার (রা:) বলেন, [১২০]

لعمري لقد أيقنت أنك ميت * ولكنما أبدى الذي قلته الجزع

"আমার জীবনের শপথ! আমি নিশ্চিত যে, আপনি মৃত; কিন্তু আমি যে কথা বলেছি তা উৎকণ্ঠামূলক।"

রাসূল (সা:) এর ইন্তিকালের পর হযরত উমার (রা:) স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুনাফিকরা মনে করছে রাসূল (সা:) মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তিনি মৃত্যু বরন করেন নি, তিনি তো তাঁর রবের সাথে দেখা করতে গেছেন যেমন মুসা বিন ইমরান গিয়েছিলেন।[১২১] মূলত হযরত উমারের চাওয়া ছিল যেন রাসূল দীর্ঘজীবি হোন। আর নাবী (সা:) এর অনুপাস্থিতিতে উম্মত বিভক্ত না হয়। উমারের ভাষায়-[১২২]

وقلت يغيب الوحي عنا لفقده * كما غاب موسى ثم يرجع كما رجع

وكان هواي أن تطول حياته * وليس لحي في بقا ميت طمع

فلم تك لى عند المصيبة حيلة * أراد بها اهل الشماتة والقذع

"আমি বললাম, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের নিকট অহী আসার ধারা হারিয়ে যাবে, যেরূপ ভাবে মুসা (আ:) হারিয়ে গিয়েছিলেন, অতপর অতীতের মত উহা (ওহী) ফিরে আসবে যেরূপ অতীতে তিনি (মূসা) ফিরে এসেছিলেন।

আমার চাওয়া ছিল তিনি যেন দীর্ঘজীবি হোন। কোন মৃত মানুষের রেখে যাওয়া বস্তুর প্রতি কোন জীবিতের আকাঙ্খা থাকেনা।

বিপদ কালে আমার উদ্ধারের কোন কৌশল জানা ছিলনা, যা বিদ্বেশী ও গীবত কারীগণ কামনা করেছিল।"

রাসূল (সা:) তাঁর ওফাতের পাঁচদিন আগে সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে কিছু নসিহত করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এক বান্দাকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, সে চাইলে দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা সৌন্দর্য্য গ্রহন করতে পারে কিংবা তাঁর (আল্লাহর) কাছে যা আছে তা বেছে নিতে পারে, তখন আল্লাহর সেই বান্দা তাঁর প্রভূর কাছে যা আছে তাকেই বেছে নিলো। আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) এর কথা শুনে হযরত আবূ বাকর (রা:) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। লোকজন বৃদ্ধ আবূ বাকরের অবস্থা দেখে বিস্ময়বোধ করল। অথচ কয়েকদিন পর সবাই বুঝতে পারল আবূ বাকর (রা:) ই ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী।[১২৩] এর কয়েক দিন পরেই রাসূল (সা:) ইন্তিকাল করেন।

হযরত ইবনে উমার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়্যামে তাশরীকের (১১ই, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্ব তারিখের) মধ্যে ভাগে إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সূরাটি রাসূল (সা:) এর উপর অবতীর্ন হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, এটা বিদায়ী সূরা।[১২৪] ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, যখন সূরা إِذَا جَآءَ نَصْرُ অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূল (সা:) ফাতিমা (রা:) কে ডেকে বলেন, তাঁর পরলোক গমনের খবর এসে গেছে। এদিকেই ইঙ্গিত করে উমার (রা:) বলেন, [১২৫]

سوى أذن الله الذي في كتابه * وما آذن الله العباد به يقع

"আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে ঘোষণা দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যা সংঘঠিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন তা একাকার হয়ে যায়।"

রাসূল (সা:) ইন্তিকালের আগে সাহাবাদের কয়েকবার বলেছিলেন, নামায নামায আর তোমাদের দাস-দাসী।[১২৬] ইন্তিকালের আগ মূহূর্তে রাসূল (সা:) মিসওয়াক করেদিলেন আর সামনে রাখা পাত্র থেকে পানিতে দু'হাত দিয়ে চেহারা মুবারক মুছতে ছিলেন আর বলছিলেন, لا اله الا الله মৃত্যু বড়ই কষ্ট দায়ক। মিসওয়াক শেষ করে রাসূল (সা:) খুবই নিচু স্বরে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার উপর রহমত নাযিল করুন, আর সর্বোত্তম বন্ধুর সাথে আমায় মিলিত করুন, হে আল্লাহ! সুমহান বন্ধু।[১২৭]

পৃথিবীর ইতিহাসে এই বেদনাদায়ক ও বিয়গান্তক দুঃসংবাদ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার পর সবকিছু যেন অপরিচিত হয়ে গেল। সাহাবাদের হৃদয় গুলো দুমরে মুচড়ে শেষ হয়ে গেল। আনাস (রা:) বলেন, সে দিনের চেয়ে কোন অসুন্দর ও ঘোর তমাসাচ্ছন্ন দিন আমি জনমেও দেখিনি যেদিন রাসূল (সা:) আমাদের থেকে চির দিনের জন্য চলে গিয়ে ছিলেন।[১২৮] এদিকে ইঙ্গিত করে উমার (রা:) বলেন, [১২৯]

فلما كشفنا البرد عن حرّ وجهه * اذا الأمر بالجزع المرعب قد وقع

"তাঁর মহৎ মুখমন্ডল হতে যখন আমরা পর্দা সরিয়ে নেই তখন ভয়ংকর অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

সাহাবাদের এ করুন অবস্থায় যেন সবকিছু অচল হয়ে গিয়েছিল। তখন সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে আবূ বাকর (রা:) যেন অবির্ভূত হলেন, তিনি রাসূল (সা:) এর হুজরা থেকে বের হয়ে দেখেন উমার (রা:) মানুষের সাথে কথা বলছেন তিনি তাঁকে বসতে বললেন, উমার তাতে অস্বীকৃতি জানালে আবূ বাকর (রা:) কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। লোকজন উমারকে ছেড়ে তাঁর কাছে জড়ো হলে তিনি কুরআনের আয়াত

পাঠ করলেন-[১৩০] উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর কসম! যখন আমি আবূ বাকর (রা:) এর মুখে সেই আয়াতটি শুনতে পেলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম রাসূল (সা:) সত্যি সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন। আমার পা ভেঙ্গে পড়ল। আমি মাটিতে বসে পড়লাম। বুঝতে পারলাম রাসূল (সা:) সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন।[১৩১]

উমারের ভাষায়-[১৩২]

وقد قلت من بعد المقالة قولة* لها في حلوق الشامتين بها بشع

ألا إنما كان النبي محمد * إلى أجل وافى به الوقت فانقطع

"কথায় পিঠে আমি একটি কথা বলেছি, সেকথা বিদ্বেষীদের কণ্ঠে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। জেনে রেখো। হযরত মুহাম্মদ (সা:) একটি সময়কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, তাঁর সময় ফুরিয়ে গেলে তিনি (দুনিয়া থেকে) ছিন্ন হয়ে যান।"

প্রকৃত পক্ষে রাসূল (সা:) কে ভালবাসা এবং তাঁর অনুসরণে হযরত উমারের স্থান হযরত আবূ বাকর (রা:) এর পর পরেই ছিল। তাই তো দেখা যায় তাবুক যুদ্ধে তিনি তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেকটাই রাসূল (সা:) এর জন্য বিলিয়ে দেন।[১৩৩] সেই প্রিয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যু সহ্য করা আসলেই কঠিন, তাইতো তিনি বলেন-[১৩৪]

و وليت محزونا بعين سخينة * أكفكف دمعي والفؤاد قد انصدع

وقلت لعيني: كل دمع ذخرته * فجودي به إن الشجي له دفع

"আমি উত্তপ্ত আখি নিয়ে দুঃশ্চিন্তা গ্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমি আমার অশ্রু মুছে যাচ্ছি এদিকে আমার হৃদয় ফেটে গেছে।

আমি আমার আঁখি কে বলেছি, তোমার মাঝে যত অশ্রু পুঞ্জিভূত করে রেখেছো তা বিসর্জন কর, কেননা এ অশ্রু বেদনা উপশম করে।"

মৃত্যুর সময় রচিত কবিতা

হযরত উমার কিয়ামতের হিসাবকে অত্যন্ত ভয় করতেন। একবার তিনি আবূ মুসা আশআরি (রা:) কে বলেন, আবূ মুসা! আমরা রাসূল (সা:) এর ডাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম, হিজরত করলাম। এ সবের বিনিময়ে যদি আমরা কিয়ামতে বিনা হিসেবে মুক্তি পাই, তবে কি তুমি সুখী হওনা? আবূ মুসা বললেন, কিছুতেই না, আমরা আল্লাহর কাছে অনেক পুরস্কারের আশা করি। উমার বললেন আমার জীবন যার হাতে তাঁর শপথ! আমি কেবল কোন মতে ছুটে যেতে চাই। মৃত্যুর সময় তিনি নিম্নের কবিতা আবৃতি করেন।[১৩৫]

ظلوم نفسی غیر انی مسلم * اصلی الصلوة كلها واصوم

"জীবনের উপর আমি যথেষ্ট অত্যাচার করেছি; তবে হ্যাঁ আমি মুসলমান! ঠিকমত নামাজ পড়ি ও রোযা রাখি।"

হযরত উমার (রা:) এর মৃত্যু ছিল শহীদি মৃত্যু। আর তাঁর শহীদ হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা:) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।[১৩৬] আর তা ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদায়ক। আবূ লুলু নামক এক অগ্নী পুজক তাঁকে নামাজে ইমামতি করার সময় ছুরিকাঘাত করে। এতে দিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁর মৃতু হয়। তখন জিলহজ্ব এর দুই বা তিন দিন বাকী ছিল।[১৩৭] একজন অমুসলিম তাঁর ঘাতক ছিল এতে তিনি আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করেছিলেন।[১৩৮] সে সময় তিনি একটি কবিতা বলেন-[১৩৯]

توعدنى كعب ثلاثا بعدها * ولا شك أن القول ما قال لى كعب

ومابى خوف الموت انى لميت * ولكن خوف الذنب يتبعه الذنب

"কা'ব আমাকে তিনদিনের সময় বেধে দিয়েছিল, যা সে গণনা করত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কা'ব যা বলেছে তাই সঠিক কথা। আমার মৃত্যু ভয় নাই, কারণ আমি অবশ্যই একদিন মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু উপর্যুপরি যে পাপ করেছি তার ভয়েই আমি ভীত।"

উপসংহার

হযরত উমার (রা:) তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে যত অর্জন করেছেন তা ছিল সকল ঈমানদার নর-নারীর জন্য এক মহাআদর্শ। ফারুক ও আমীরুল মুমিনীন খ্যাত হযরত উমার তাঁর অল্প কিছু কবিতার মাধ্যমে যে শিক্ষা রেখে গেছেন তা তাঁকে আরবী কাব্য জগতে চীরকাল স্মরণীয় করে রাখবে। আরবী কাব্য সাহিত্যিক, কাব্য সমালোকে ও কাব্য বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ববান হযরত উমার (রা:) এর কাব্য চর্চা ও তাঁর মননের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইবনু রাশিক তাঁর বিখ্যাত উমদা গ্রন্থে হযরত উমারের কবিতাবলী ও কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। ইকদুল ফারিদ গ্রন্থেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। হযরত উমার (রা:) এর কবিতাবলীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা এসেছে হুমনুস সাহাবা গ্রন্থেও। শাওকী দাইফ, উমর ফররুখ, জুরজী যায়দান, আব্দুল্লাহ আত-তানতুবী সহ অসংখ্য সাহিত্যিক তাঁদের গ্রন্থে হযরত উমার (রা:) এর কবিতাবলী বিস্তারিত ভাবে প্রেক্ষাপট ও পটভূমী সহকারে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে যখনই তাঁর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে তখনই উঠে এসেছে তাঁর কাব্য চর্চা ও কাব্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক। আর তাই যুগ যুগ ধরে আরবী কাব্য প্রেমীও সাহিত্য প্রেমীরা অনুপ্রানীত হয়েছে তাঁর কবিতাবলীর দ্বারা। আর তাঁর কবিতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে চলেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. মুহাম্মাদ রেজা, *তারিখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানাকিবু আমীরুল মু'মিনীন, আল ফারুক উমর বিন আল খাত্তাব*। (মিশর: মাকতাবাতাল জামিয়াহ। আল মাতবাআ'তুল মাহমুদিয়্যাহ আততিজারিয়্যাই বিল আযহার, ১৩৫৫ হিজরী, পৃ. ৮; ড. আলী মুহাম্মাদ আসসালাবি, *তারিখুল খুলাফা আর রাশিদীন, সীরাতু আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব* (রা:) *শাখসিয়াতিহী ওয়া আসরিহী*, খণ্ড-২ (কায়রো: মুআচ্ছাছাতু ইকরা, ১৪২৬ হি. ২০০৫, খ্রী.), পৃ. ১২।

২. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদে রাব্বিহ আল-আন্দালুসী, আল-'ইকদুল ফারীদ, খন্ড ৫ম (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৩৮ খ্রী, ১৪০৪ হি.), পৃ. ২৩; তারিখুল খুলাফা আর রাশেদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩. মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৯ খ্রী.), পৃ. ৩৭।

৪. *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানোকিবু আমীরুল মু'মিনীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৫. *তারিখুল খুলাফা আররাশিদীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮।

৬. *তদেব*, পৃ. ৭২।

৭. ড. উমর ফররুখ, *তরিখুল আদাবিল আ'রাবী, আল আদাবুল কাদীম*, (বৈরূত: দারুল ইলম লিনমালায়ীন আত তবআ'তুর রুবিআ'হ ১৯৮১), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০।

৮. *তারিখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানাকিবু আমীরুল মু'মিনীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।

৯. আব্দুল হামিদ হামদী, *উমর মানাক্বিবু ওয়া আখলাকুহু আল-উমরিয়্যাহ হাফিজ*, (মাতবাআ'তু আছ ছাবাহ, ১৩৩২ হি. ১৯১৮ খ্রী.), পৃ. ৬।

[১০]. *ইকদুল ফরিদ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।
[১১]. *তারীখুল খুলাফা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।
[১২]. *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানোকিবু আমীরুল মু'মিনীন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
[১৩]. *উমর ফররুখ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।
[১৪]. *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানোকিবু আমীরুল মু'মিনীন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।
[১৫]. *উমর ফররুখ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।
[১৬]. ইমাম জামালুদ্দীন আবুল ফর্য বিন আল জাওয়াযী, *তারীখু উমর বিন আল খাত্তাব আউয়ালু হাকিম দিমাকরাতি ফিল ইসলাম*। (মাতবাআ'হ: আততাওফিক আল আদাবিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ১৩।
[১৭]. আল্লামা শিবলী নোমানী, *আল ফারুক*, (ঢাকা: এমদাদিয়াপুস্তাকালয় বাংলাবাজার, ৫/১ গিরদে উরদু রোড, জুন ২০০২ ই), পৃ. ৭।
[১৮]. তারিখু উমর বিন আল খাত্তাব, *আউয়ালু হাকিম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।
[১৯]. *আসহাবে রসূলের জীবন কথা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।
[২০]. *আল ফারুক, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।
[২১]. উমর ফররূখ, *তারিখুল আদাবুল আরবী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।
[২২]. *আল ফারুক, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১৩।
[২৩]. *তারীখু ওয়া সিরাতু ওয়া মানাকিবু আমীরুল মু'মিনীন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯, *তারিখুল খুলাফা আররশিদীন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।
[২৪]. *আল ফারুক, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।
[২৫]. ড. শাওকী দয়েফ, *তারীখুল আদাবুল আ'রবীঃ আল আ'ছরুল ইসলামী*, ২য় খণ্ড, (মিসরঃ দারুল মাআ'রিফ, ১৯৬৩ খ্রী.), পৃ. ৫৫; *ইকদুল ফারিদ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।
[২৬]. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবুল আ'রাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
[২৭]. ইকদুল ফরিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।
[২৮]. উমর ফররূখ, *তারীখুল আদাবুল আরবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০; শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবুল আরবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
[২৯]. *ইকদুল ফারিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
[৩০]. উমর ফররুখ, *তারীখুল আদাবুল আরবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।
[৩১]. *আল-ফারুক, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৫।
[৩২]. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবুল আরবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।
[৩৩]. তদেব।
[৩৪]. ড. ত্বোহা হুসাইন, *আল ওয়াদুল হক্ক* (কায়রো: জামহুরিয়াতু মিসর আল- আরাবিয়াহ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৪৭-১৪৮।
[৩৫]. *উমর ফররুখ তারীখুল আদাবুল আরবী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।
[৩৬]. *তারীখু ওয়া সিরাতু ওয়া মানাকিবু আমিরুল মু'মিনীর, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।
[৩৭]. *উমর ফররুখ, তারীখুল আদাবুল আরবী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।
[৩৮]. *তারীখুল খুলাফা আর রাশিদিন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।
[৩৯]. *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানাকিবু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।
[৪০]. উমর ফররুখ, *তারীখুল আদাবুন আরবী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।
[৪১]. ইকদুল ফারিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।
[৪২]. উমর ফররুখ, *তারীখুল আদাবুল আরবী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।
[৪৩]. *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানাকিবু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

[৪৪]. উমর ফররুখ, *তারীখুল আদাবুল আরবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।

[৪৫]. *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানাকিবু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

[৪৬]. উমর ফররুখ, *তারীখুল আদাবুল আরবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।

[৪৭]. *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানাকিবু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৪।

[৪৮]. *ইকদুল ফারিদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

[৪৯]. তদেব।

[৫০]. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবুল আরবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

[৫১]. *ইকদুল ফরিদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

[৫২]. *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানাকিবু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮।

[৫৩]. জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত লুবনানঃ দারুল ফিকর, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৬ খ্রী.), পৃ. ২০৯।

[৫৪]. তদেব।

[৫৫]. আবু আলী হাসান ইবন রাশীক আল কায়রুয়ানী আল আযদী, *আল উমদাহ ফী মাহাছিনিশ শি'র ওয়া আদাবিহী ওয়া নাকদিহী*, ১ম খণ্ড (বৈরুত লুবনানঃ দারুল জীল, তা. বি.), পৃ. ৭৬।

[৫৬]. আল ফারুক, *শিবলী নুমানী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮।

[৫৭]. ড. গাজী তুনীমাত, তারীখুল আদাবুল আরবী, *আশ শুআ'রা ফী আ'ছরুন নবুয়্যাহ, ওয়াল খুলাফাতে আর রাশিদীন*, ৩য় খণ্ড, (দামেস্কঃ দারুল ফিকর ১৪২৮ হি. ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ৪৫৯।

[৫৮]. আব্দুল্লাহ আত-তানতাবী, *আল-আ'নামুল নাছরিয়্যাহ আল কামিলাহ*, ১ম খণ্ড (দামেস্কঃ দারুল কালাম, ২০০৭ খ্রী./ ১৪২৮ হি., পৃ. ৮৬।

[৫৯]. জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবুল লুগাতিল আরবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

[৬০]. *তদেব*।

[৬১]. *তদেব*।

[৬২]. *তদেব*।

[৬৩]. শিবলী নুমানী, *আল ফারুক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০।

[৬৪]. *উমদাহ*, ইবন রশিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

[৬৫]. *তারীখুল খুলাফা আর রশিদীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

[৬৬]. *উমদাহ*, ইবন রশিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

[৬৭]. *তদেব*, পৃ. ২৮।

[৬৮]. *তদেব*, পৃ. ২৭।

[৬৯]. *তদেব*, পৃ. ২৮।

[৭০]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।

[৭১]. যাবী জাদাহ আলী ফাহমী, *হুসনুস সাহাবা ফী সারহে আশ আ'রুছ ছাহাবাহ*, ১ম খণ্ড, (মাতবাআ' রওশন, ১৩২৪), পৃ. ৩১৯।

[৭২]. *তারীখুল খুনাফা আর রাশিদীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

[৭৩]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।

[৭৪]. *তারীখুল খুলাফা আর রাশিদীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।

[৭৫]. *তারীখু ওয়া সিরাতু ওয়া মানকিবু আমীরুল মু'মিনীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১৬।

[৭৬]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

[৭৭]. আল কুরআন, ৪০-৬০।

[৭৮]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

[৭৯]. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, *তাইসীরুত তাফাসীর*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ডিসেম্বর ২০১১ খ্রী.), পৃ. ১৩৬।

[৮০]. সফীউর রহমান আল-মুবারকপুরী, *আর-রহীকুল মাখতুম* (আর-রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিস-সালাম, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ২৬।

[৮১]. ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা, ইতিহাস ও সংকলন*, (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ডিসেম্বর, ২০১৫), পৃ. ২৮৫।

[৮২]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

[৮৩]. *আর-রহীকুল মাখতুম প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৪।

[৮৪]. *তদেব*।

[৮৫]. *তদেব*, পৃ. ৩৯৫।

[৮৬]. আবু মুহম্মাদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম আল-মু'আফিরী, *আস-সীরাতুন নাববিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড (আল-কাহিরাহ: দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./ ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ৩১৯।

[৮৭]. *হুসনুস সাহাবাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪।

[৮৮]. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-বেদায়া ওয়ান নিহায়া* (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ খণ্ড, জুন ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ৫০৯।

[৮৯]. *হুসনুস সাহাবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪।

[৯০]. *তদেব*, পৃ. ৩২৫।

[৯১]. *আস সীরাতুন নাববিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪।

[৯২]. *হুসনুস সাহাবা*, *প্রাগুক্ত*, প্র. ৩২৫।

[৯৩]. *বেদায়া ওয়ান নিহায়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১০।

[৯৪]. *আস সিরাতুন নববিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫।

[৯৫]. *হুসনুস সাহাবা*, *প্রাগুক্ত*, প্র. ৩২৫।

[৯৬]. *তদেব*, পৃ. ৩২৪-৩২৫।

[৯৭]. ইবন রশিক, *উমদাহ*, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩।

[৯৮]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮; *তারীখুল খুনাফা আর রাশিদীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

[৯৯]. সূরা আর রহমান, আয়াত নং: ২৬-২৭।

[১০০]. হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর (রহ:), *অনু: ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান*, তাফসীরে ইবন ফাসীর, ৮ম খণ্ড, (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ১৫২।

[১০১]. *ইবনে কাসীর*, ৮ম-১১ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।

[১০২]. *তদেব*, পৃ. ৩২২।

[১০৩]. কুরআনে এসেছে- وَأَمَا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত, ৬-৭।

[১০৪]. *আ'লামুল নাছরিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১০৫]. কুরআনে এসেছে- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَّ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّن بَعْدِيَ সূরা ছোয়াদ, আয়াত, ৩৫।

[১০৬]. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *নবীদের কাহিনী*, ২য় খণ্ড (রাজশাহী: হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪৩২ হি./ ২০১০ খ্রী.), পৃ. ১৪৪।

[১০৭]. *নবী কাহিনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

[১০৮]. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রা:), *বুখারী শরীফ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০১২ খ্রী.), পৃ. ১৪৪।

[১০৯]. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌوَرَوَاحُهَا شَهْرٌ সূরা সাবা, আয়াত: ১২।

[১১০]. কুরআনে এসেছে, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ সূরা আলে ইমরান- আয়াত, ১৮৫।

[১১১]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১১২]. *ইবনে কাসীর*, আষ্টাদশ খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩।

[১১৩]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১১৪]. জাবিহ জাদাহ, *হুসনুস সাহাবা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২২; *তারীখুল খুনাফা আর রাশিদীন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।

[১১৫]. মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দলবী, *হায়াতুস সাহাবাহ* (ঢাকা: দারুল কিতাব, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩১৭।

[১১৬]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

[১১৭]. *তদেব* ।

[১১৮]. *তদেব*, পৃ. ৮৮।

[১১৯]. শিবলী নু'মানী, *আল ফারুক, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

[১২০]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১২১]. *সীরাতুন নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৬।

[১২২]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১২৩]. *আর রহীকুল মাখুম, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৬।

[১২৪]. *ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত*, খণ্ড-১৮, পৃ. ১১০।

[১২৫]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১২৬]. *আর রহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৯।

[১২৭]. *তদেব*।

[১২৮]. *তদেব*, পৃ. ৪৭০।

[১২৯]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১৩০]. *আস সীরাতুন নববিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৭। আয়াতটি হলো: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ দ্র সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৪।

[১৩১]. *আর রহীকুল মাখতুম, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭১।

[১৩২]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১৩৩]. *আল ফারুক, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।

[১৩৪]. *আ'লামুন নাছরিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

[১৩৫]. *আল ফারুক, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭।

[১৩৬]. *তারীখুল খুলাফা আর রশিদীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

[১৩৭]. *হুসনুস সাহাবা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪।

[১৩৮]. *তারীখুল খুলাফা আর রশিদীন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৭।

[১৩৯]. ইবনে রশিক, *উমদা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

কবি সম্রাট আহমদ শাওকী'র রম্যকবিতার শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. আবু বকর*

Abstract : Belles-lettres is one of the most meaningful works in the literary arena. It is that piece of writing which produces laughter in readers' mind and brings soothing effect on the body and mind and gives a significant constructive message to its readers. Actually, Belles-lettres, an enjoyable piece of literature, is composed in rhetorical tune by the refined poignant feeling, strong appreciation and formative poetic imagination of a writer. There are three basic components of Belles-lettres. Firstly, it is the most prosperous piece contained by all literary value; secondly, there found clarity and simplicity rather than ambiguity and thirdly, it contains implied inherently significant moral teachings, indications, advice, guide, maxim, correction, refinement, self-constructive historical events and a vivid reflection of real life. Ahmed Shawqi, the prince of modern Arabic literature, has composed more than forty Belles-lettres by the character of various animals. For example, The Indian Cock and the native hen, The Elephant and the monkey, The goat and the crow etc are pworth meantionable. His poems have been placed in the fourth volume of his Dewan and later on, they have published in a separate volume. The subject matter of the poems is full of real and important teachings for all irrespective of rich and poor, senior and junior, clever and stupid, ruler and ruled, tyrannical and oppressed. This paper, highlights shortly on the remarkable moral teachings of his famous poems and in course of discussion, the life and works of the poet along a short description of Belles-lettres are meantioned.

ভূমিকা

কবি আহমাদ শাওকী বেগ আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্যের এক উজ্জল নক্ষত্র। কাব্য সাহিত্যের খুব কম শাখাই আছে যে শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল না। তিনি ছিলেন আরবী কাব্যনাট্যের প্রবর্তক। এ ছাড়াও রম্য কবিতায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। এজন্যই তিনি Prince of the poet বা কবি সম্রাট হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। রম্যসাহিত্য একটি ব্যপক অর্থবোধক সাহিত্যধারা ও শিল্পকর্ম। এটি এমন এক প্রকার লেখনী যা সর্বাগ্রে হাসির খোরাক জোগায় এবং শরীর ও আত্মায় নির্মোহ প্রশান্তি প্রবাহিত করে অতঃপর উহার তাৎপর্য গঠনমূলক বার্তা দেয়। প্রকৃতার্থে রম্যরচনা একটি উপভোগ্য সাহিত্য, যা রচিত হয় পরিশীলিত অনুভূতি, ছন্দময় প্রকৃতি, উর্বর উপলব্ধি, সুসজ্জিত দৃঢ় কল্পনাশক্তি থেকে। শিরোনামের মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে প্রাসঙ্গিকভাবে আহমাদ শাওকীর সাহিত্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা আলোকপাত করা হলো-

আরবী রম্যসাহিত্য পরিচিতি

রম্যসাহিত্যকে আরবীতে বলা হয় الادب الفكاهي । শব্দটির মূলাক্ষর ف ك ه, বাবে سمع থেকে فَكِهَ ওজনে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ামূল فَكَهٌ এবং فكاهةٌ। আলোচ্য ক্রিয়ামূল হতে فُكَاهَة শব্দটি ইসম মাসদার। অভিধানে এর কয়েকটি মৌলিক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন-

১. الضحك[১] অর্থ হাসি। ইরশাদ হচ্ছে, فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ[২]

---

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. المزاح[৩] এটি কাউকে হাসানোর একটি প্রক্রিয়া। যে হাসির আনন্দ হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

৩. السرور[৪] অর্থ আনন্দ, প্রফুল্লতা, বিষন্নতার বিপরীত। ইরশাদ হচ্ছে, وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا[৫]

৪. الدعابة[৬] অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে আনন্দ-ফুর্তি, হাসি-তামাশা করা।

৫. طرف الكلام و ملحه[৭] অর্থ যে কথা আনন্দ দেয়, স্বস্তি দেয়, চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

৬. الهزل[৮] অর্থ কোন জটিল বিষয় হালকা করে উপস্থাপন করা, শৈল্পিকভাবে রসাত্মক করে তোলা। ইরশাদ হচ্ছে, وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ[৯]

৭. السخرية[১০] এমন কথা বা কাজ যাতে মানুষ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় হেসে ফেলে। ইরশাদ হচ্ছে, أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ الآية[১১]

৮. الابتسام[১২] অর্থ সুন্দর হাসি।

৯. المرح[১৩] অর্থ অতিরঞ্জিত হাসি, মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ-উল্লাস, দম্ভ।

১০. الظرف[১৪] অর্থ আকর্ষণীয় কথা, আলংকারিক বচন, শ্রুতিমধুর বক্তব্য।

১১. الطرب[১৫] অর্থ এমন কথা যা কষ্ট দূর করে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনে। অতি কষ্ট আনন্দের মাঝেও স্বাভাবিকতা ধরে রাখে।

পরিভাষায় অভিধানবেত্তা ও সাহিত্য সমালোচকগণ فُكَاهَة এর ব্যপক পর্যালোচনামূলক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন,

ড. আব্দুল আযীয শারাফ বলেছেন,

রম্য সাহিত্য হলো দার্শনিক উপলব্ধি থেকে উপস্থাপিত জীবন বৈচিত্র যা মানুষকে হাসায়, আনন্দ ও তৃপ্তি দান করে।[১৬]

المعجم الوسيط এ বলা হয়েছে-

রম্য রচনা হলো আনন্দদায়ক হাস্যরসাত্মক কালাম।[১৭]

গবেষক জিহাদ আব্দুল কাদির الفكاهة কে বেশকিছু অর্থবহ শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন,

الفكاهة هى الملهاة و التبسم و البش و البشاشة و البشر و البهجة و الابتهاج و الجزل و الدعابة و السخرية و السرور و الطرب والطرفة و الطلاقة والظرف و التظرف و اللعب والمرح والمراح والمزاح والنادرة والتندر والنكتة والهزل والهشاشة.[১৮]

ড. যাকারিয়া ইবরাহীম বলেছেন,

রম্য রচনা হলো মানবীয় স্বভাব থেকে নির্গত সুখবচন যা অতিদ্রুত একটি জীবনের অবসাদ দুর করে হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে আনে। মূলত রম্য রচনা আত্মার কষ্ট লাঘবের পথ অনুসন্ধান করে। সরাসরি কাউকে সম্বোধন না করে পরোক্ষভাবে নির্দেশনা প্রদান করে।[১৯]

জাব্বূর আব্দুন নূর উল্লেখ করেছেন,

ফুকাহা সাহিত্য মূলত বাস্তব অথবা কাল্পনিক আনন্দদায়ক দুর্লভ ছোট-ছোট ঘটনা যার মাধ্যমে বর্ণনাকারী শ্রোতাকে বিস্ময়াভিভূত করে তোলে এবং অনেক সময় সবাইকে হাসির জগতে ভাসিয়ে দেয়।[২০]

ইবন ওয়াহাব বলেছেন,

ফুকাহা এমন এক প্রকার রচনা যা মানুষের দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা সর্বোতভাবে ভুলিয়ে দেয়। [২১]

ইবরাহীম ফাতহী ব্যাখ্যা করে বলেন,

রম্য সাহিত্য হলো মানুষের উপলব্ধি, দর্শন ও বুদ্ধিমত্তা থেকে নির্গত রচনা যা সর্বাগ্রে হাসির উদ্রেক করে।[২২]

সিরাজ উদ্দীন বলেন,

ফুকাহা হাস্যোদ্দীপক রচনা যার মাধ্যমে মানুষ স্বস্তি, নিরাপদ ও প্রশান্তি লাভ করে।[২৩]

অনেকে বলেছেন,

রম্যরচনা হলো যা মানুষকে অকৃত্রিমভাবে হাসায় এবং হৃদয়ে শান্তি যোগায়।[২৪]

এল জি বোটস বলেছেন,

ফুকাহা এমন এক প্রকার সাহিত্যকর্ম যা কেবল সাজানো উর্বর মস্তিস্ক থেকেই উৎগত হয়। অপরিপক্ক উপলব্ধি দ্বারা এটি চর্চা সম্ভব নয়।[২৫]

New Standard Encyclopedia তে বলা হয়েছে,

রম্য রচনা এক প্রকার লেখনী, বাগ্মিতা ও বাদ্যশিল্প যা হাসির খোরাক জোগায় এবং শরীর ও আত্মায় নির্মোহ শান্তি প্রবাহিত করে।[২৬]

প্রধানত লঘুচালে লিখিত হাস্যরসাশ্রিত সুখপাঠ্য রচনাকে রম্যরচনা বলে।[২৭]

সংজ্ঞা বিশ্লেষণ

الفكاهة শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণ করে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এটি একটি অর্থ ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। সেটি হলো ضحك তথা হাসি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাসি একটি সৃষ্টিগত অভিন্ন মানব বৈশিষ্ট্য। এর প্রমাণ বহন করে জন্মের পর সর্বাগ্রে উদ্ভাসিত শিশুর মুখের হাসি।[২৮] হাসি জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করে মানবাত্মায় প্রশান্তি যোগায়, বয়ে আনে অনাবিল স্বস্তি এবং বিকশিত করে হৃদয়কে। সঙ্গত কারণেই অনেকে মানুষকে حيوان ضاحك (হাস্যময় প্রাণী) বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই বৈশিষ্টের মাধ্যমে অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে পৃথক করেছেন।[২৯] এ কারণেই সমালোচকগণ বিখ্যাত রম্যসাহিত্যিক আল জাহিয সম্পর্কে বলেছেন, إذا ضحك ضحكت الدنيا (তিনি যখন হেসেছেন অর্থাৎ নতুন কোন রম্যরচনা উপহার দিয়েছেন তখন গোটা দুনিয়া হেসেছে।) তিনি আরো বলেছেন, من كانت فيه دعابة فقد برئ من الكبر. (অর্থাৎ যে হাসতে পারে সে অহংকার মুক্ত।)

উল্লিখিত প্রামাণ্য সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, রম্যরচনা একটি ব্যপক অর্থবোধক বিষয়বস্তু ও শিল্পকর্ম। এ শিল্পকর্ম দু'টি ধারায় প্রবাহিত হয়। প্রথমত দৃশ্যরূপ। এটি আবার দু'ভাবে প্রকাশ করা যায় মঞ্চায়নের মাধ্যমে যেমন আমরা বর্তমান সময়ে ইলেকট্রিক মিডিয়াতে দেখতে পাই বিভিন্ন কমেডি বা হাস্যরসাত্মক

নাটক, সিনেমা বা বিভিন্ন সিরিয়াল। ব্যাচেলর, টম এন্ড জেরী, মুটু ও পাটলু, মীরাক্কেল, থ্রি স্টুডেন্টস, মি. বিন, সাইন্স অফ স্টুপিডস, Babys day ইত্যাদি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অপরটি হলো প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত অসংখ্য হাস্যরসাত্মক চিত্রশিল্প। দ্বিতীয়ত লেখ্যরূপ। এটি গদ্য, পদ্য, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প বিভিন্ন ধারায় হতে পারে। উল্লেখ্য যে, সমালোচকদের মতে উভয় ধারার মৌলিক দিক তিনটি। প্রথমত এটি সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা, যেখানে সাহিত্যের সকল উপাদান বিদ্যমান।[৩০] দ্বিতীয়ত এটি এমন একটি সাহিত্যকর্ম যাতে কোনরূপ দূর্বোধ্যতা নেই বরং পাঠক বা দর্শক বাহ্যত আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এটি তাকে মুহুর্তেই বদলে দেয়, মনোরঞ্জন জোগায়, আনন্দ দেয়, উদাসীন করে তোলে, ক্ষণিকের জন্য হলেও সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে দিয়ে হাসির জগতে হারিয়ে ফেলে, গাম্ভীরতা দূর করে হৃদয়ে প্রফুল্লতা প্রবাহিত করে, দীর্ঘ ক্লান্তি ও অবসাদ হটিয়ে মনস্পটে প্রশান্তি ফিরিয়ে এনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।[৩১] তৃতীয়ত রম্য রচনার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র হাসির রসদ জোগানো নয় বরং এ সাহিত্যের রয়েছে একটি অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য। সেটি হলো শিক্ষা, দীক্ষা, উপদেশ, পথনির্দেশ, নীতিকথা, সংশোধন, পরিশুদ্ধি, আত্মগঠনমূলক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও বাস্তব জীবনের বিচিত্র প্রতিবেদন।[৩২]

সিরাজ উদ্দীন বলেন,

রম্য রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো হাসির খোরাক জোগানো এবং আত্মগঠনমূলক পথনির্দেশ।[৩৩]

তদ্রূপ ম্যাক জিরওয়া বলেন,

রম্যরচনা পরোক্ষভাবে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অসংগতি দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

অতএব বলা যায় রম্যরচনা একটি উপভোগ্য সাহিত্য। যা রচিত হয় পরিশীলিত অনুভূতি, ছন্দময় প্রকৃতি, উর্বর উপলব্ধি, সুসজ্জিত দৃঢ় কল্পনাশক্তি থেকে। অনেকের মতে এরূপ যোগ্যতা খোদা প্রদত্তই বটে। কারণ এটি এমন একটি সাহিত্য যা মনুষ্যত্বে ফিরিয়ে আনে, সকল বিদ্বেষ ভুলে দিয়ে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে, মুহুর্তেই সকলকে সত্তাগত স্বভাবে আবির্ভূত করে, সবার মাঝে পারস্পারিক ভারসাম্য স্থাপন করে। এ কারণেই সমালোচকগণ মনে করেন, রম্যরচনার প্রকৃত উপাদান তথা হাসি-খুশী, আনন্দ-উল্লাস ছাড়া পার্থিব জগত অকল্পনীয়। মানব জীবন ছন্দহীন ও বিশৃঙ্খল ও ভারী হয়ে উঠবে যদি হাসির উপাদান না থাকে। নবী সা. বলেছেন, তোমরা হৃদয়কে কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম দাও কারণ হৃদয় ক্লান্ত হয়ে পড়লে আর কিছুই দেখতে পায় না।

অতএব রম্য রচনার প্রথম ও শেষ দর্শনই হলো এটি সবার মাঝে সর্বাগ্রে নির্মল ও অকৃত্রিম হাসি প্রবাহিত করা।

রম্য সাহিত্যের পরিচিতি থেকে বুঝা যায়, রম্যরচনার বিষয়বস্তু হাস্য-রসাত্বক নির্ভর হতে হয়। যেন তা পাঠকের কাঙ্খিত আবেদন পূর্ণ করতে পারে। রম্য রচয়িতাকে অবশ্যই হতে হবে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও কৌশলী। তিনি তাঁর রচনাকে সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পনা মাফিক তাঁত শিল্পীর ন্যায় আলংকারিক রূপ দান করবেন।[৩৪] তাকে অবশ্যই প্রচণ্ড কল্পনা শক্তির অধিকারী হতে হবে। মানব জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী, ভাল-মন্দ গ্রহণ ও বর্জনের প্রকৃতি, স্বকীয়তা, ইতিবাচক দিক, স্বভাব ইত্যাদি বিষয় যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করে এমনভাবে তা রচনা করতে হবে যেন তা একই সাথে হাসির রসদ ও নৈতিক শিক্ষার উপাদান সমৃদ্ধ হয়।[৩৫]

এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল আযীয শারাফ যথার্থই বলেছেন,

রচয়িতাকে অবশ্যই উর্বর কল্পনা শক্তি সম্পন্ন হতে হবে। তিনি মানব চরিত্র এমনভাবে চিত্রিত করবেন যা অকপটে হাসির উদ্রেক করে। প্রথমে একটি রম্যবিষয় নির্ধারণ করবেন। এরপর উহার গুরুত্ব ও লক্ষ্য-

উদ্দেশ্য নিরূপণ করে রম্যদর্শনের আলোকে রচনা শুরু করবেন। লেখকের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও তাত্ত্বিক মানদণ্ড থাকতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কোনভাবেই যেন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতি না ঘটে এবং আলংকারিক মান ক্ষুন্ন না হয়।[৩৬]

অনুরূপ সিরাজ উদ্দীন বলেছেন,

রম্য রচয়িতা হবেন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। যিনি নিজস্ব কৌশল, পরিকল্পনা, দক্ষতা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা ছোট-ছোট গল্পাকারে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যা বাহ্যত হাস্যময় হলেও পরোক্ষভাবে গঠনমূলক ও সর্বোজন বিদিত হয়।[৩৭]

ইবনুল জূযী একজন বিচক্ষণ রম্য রচয়িতার বৈশিষ্ট উল্লেখ করে বলেন,

মূলত একজন বিচক্ষণ রম্যকারের ছাপ তাঁর চেহারায়, অবয়বে, পোশাকে, পরিচ্ছন্নতায়, ভাষার বিশুদ্ধতা ও মিষ্টতায়, চলনে, বলনে ও রসিকতায় প্রস্ফুটিত হবে।[৩৮]

কাসাঈ বলেছেন, الظريف: الحسن الوجه واللسان অর্থাৎ একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন হবে দর্শনধারী তেমনি হবে মিষ্টভাষী ও সদালাপী।

কবির রম্যকবিতা ও শিক্ষা

আধুনিক আরবী কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা কবি আহমাদ শাওকী।[৩৯] স্বরচিত বিশাল কাব্যসামগ্রী তাকে কবি সম্রাট উপাধীতে ভূষিত করেছে। শতবর্ষ পূর্বে বিদায় নেয়া কবি আহমাদ শাওকী অদ্যাবধি আরবী কাব্যামোদীদের জন্য দিকপাল ও আলোকবর্তীকা হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। তার কবিতার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি ছিল শিক্ষামূলক রম্যকবিতা। বিভিন্ন পশু-পাখি ও প্রাণীর আচার-আচারণ অবলম্বনে হাসি-রস মিশিয়ে দীক্ষা ও জ্ঞানার্জনের লক্ষে বেশকিছু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তার উল্লেখযোগ্য রম্য কবিতার সারকথা ও সেসবের শিক্ষা কবিতার শিরোনাম ও প্রথম চরণ উল্লেখসহ আলোকপাত করা হলো-

الديك الهندى والدجاج البلدى ভারতবর্ষের মোরগ ও স্বদেশী মুরগী

بينا ضعاف من دجاج الريف * تخطر فى بيت لها طريف[৪০]

তথায় গ্রামাঞ্চলের বেশকিছু মুরগী তাদের প্রিয় গৃহ (পদচারণায়) সদা মুখরিত করে রাখত।

গ্রামাঞ্চলের একটি বাড়িতে কিছু মুরগী বসবাস করত। হঠাৎ তাদের দরজার সামনে খ্যাতিমান ভারতবর্ষীয় এক মোরগ মেহমান সেজে হাজির। সে বলল ওহে সুশ্রীরা! আল্লাহ তোমাদের দীর্ঘজীবি করুক। কোনদিন তোমাদের মন খারাপ দেখিনি। আমি আমার সকল কল্যাণ তোমাদের মাঝে বিতরণ করতে এসেছি এবং তা ইনসাফের সাথেই করব। শুধু পানি আর ঘুম ছাড়া তোমাদের নিকট যা কিছু আছে সবই আমার জন্য হারাম। মূলত মোরগ তার কথায় তাদের মাঝে বিভ্রান্তিকর ঔষধ প্রয়োগ করল। আর তাতেই তারা খাঁচার দরজা খুলে দিল। মোরগ তাদের বাস গৃহে ঢুকে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগল আর তাদের ছানার জন্য দোয়া করতে লাগল। রাত যতই ঘনিয়ে আসে মোরগ ততই এই নতুন গৃহে পুলকিত হয়। একপর্যায়ে মুরগীগুলো নিরাপদে ঘুমিয়ে গেল, কিন্তু প্রভাতে যা ঘটবার তাই ঘটল। পূর্ব দিগন্তে মৃদু আলোর বিচ্ছুরণ ঘটা মাত্রই ঐ মোরগ চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, আমার অবস্থান এই আনন্দময় গৃহে দীর্ঘস্থায়ী হোক। মোরগের ডাক শুনে দুঃস্বপ্ন কেটে মুরগীরা জেগে গেল এবং বলতে লাগল, ওহে মেহমান! কি শর্ত ছিল আমাদের মাঝে?

তুমি তো গাদ্দারী করলে। মোরগ হেসে উঠে বলতে লাগল ওহে নির্বোধের দল! এটা কেমন অন্ধ বিশ্বাস? তোমরা বুদ্ধিমানের জিহবার কর্তৃত্বের মালিক তো হওনি! এটা দরজা খুলে দেয়ার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

শিক্ষা: প্রত্যেক সৃষ্টির সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট রয়েছে। সে তার প্রকৃতিতে ফিরে যাবেই। অতএব কারো তৈলাক্ত বাণীতে প্রভাবিত হওয়ার আগেই সাবধান হওয়া উচিত।

فأر الغيط وفأر البيت মাঠের ইঁদুর ও ঘরের ইঁদুর

يقال كانت فأرة الغيطان * تتيه بابنيها على الفيران[৪১]

কথিত আছে মাঠে বসবাসকারী একটি ইঁদুর তার দু'টি ছানা নিয়ে অন্যান্য সকল ইঁদুরের উপর গর্ববোধ করত।

মাঠে বসবাসকারী একটি ইঁদুরের দু'টি ছানা ছিল। সে ছানা দু'টি নিয়ে বেশ গর্ব করত। বড় ছানাটির নাম মাঠের প্রদীপ। সে তাকে সরু রশির উপর দিয়ে চলাচলের কৌশল শিক্ষা দেয়। অল্প দিনেই ছানাটি দ্রুত লুকানো, নিজেকে রক্ষা করা, গর্তে প্রবেশ ও বাহির হওয়া সবকিছুই রপ্ত করে ফেলে। বলা যায় ছানাটি বাবার মত নিরাপদ জীবন-যাপনে পেশাদার হয়ে উঠে। অপরদিকে ছোট ছানাটি মাকে বেশ উত্যক্ত করতে থাকে। মাকে উপুর্যপুরি বলে, আমার একটি নাম দাও। আর তা হবে প্রাসাদের মণি। কারণ আমিই অত্যাধুনিক। আমি যা দেখি আমার সহোদর তা দেখে না। তার ও আমার পথ ভিন্ন। মা শোন! আমি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে প্রবেশ করে এক তাক থেকে অন্য তাকে লাফিয়ে লাফিয়ে যেখানে যা পাব তোমার জন্য মধু, পনির, তৈল সংগ্রহ করে নিয়ে আসব। মা বিনয়ী হয়ে তার কথায় সম্মত হয়। মা বলল শোন! আমার ভয় হচ্ছে ঘরের অন্ধকার তোমার শক্তি কেড়ে না নেয়। তোমার বাবা একজন কৃষককে দেখে তার মত ফসল সংগ্রহকারী হতে চেয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। সুতরাং আমার উপদেশ মত কাজ করবে। তাতে আমার হৃদয় শান্ত থাকবে। দয়াময়ের যিম্মায় রওনা হও। মা'র কথা শুনে ছানাটি হেসে উঠে ঘাড় নাড়ে আর বলে, কে বলেছে, তার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে? এরপর সে মায়ের প্রতিশ্রুতি গোপন করে প্রতিদিন তাঁর জন্য মধু, পনির সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে থাকে। এভাবে এক মাস অতিবাহিত হয়ে নতুন মাস শুরু হয়। কিন্তু হঠাৎ এই চুরির বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় একদিন সে দিশেহারা হয়ে মা'র সামনে উপস্থিত হয়। মা তাকে জিজ্ঞেস করে, বাছাধন তোমার লেজ কোথায়? সন্তান বলল লেজ হারানোর বিষয়টি বিস্ময়কর নয়। মৌচাকে ঢুকে পড়ি আর তাতেই লেজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয় দিন এক পা হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মা'র সামনে হাজির। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, উঁচু জায়গায় স্থাপিত একটি তাকে লাফ দিয়ে ধরতে না পেরে পড়ে গিয়ে পা হারিয়েছি। এরপর তৃতীয় দিন অন্য দিনের মত সে মা'র নিকট আসছে না। মা খুবই চিন্তিত, বিষন্ন মনে দ্রুত ছুটে বের হলো। চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার উপর তার দেখা পেল, ততক্ষণে ইঁদুর ছানাটির হাড়-মাংস ছিন্ন-ভিন্ন। মা সন্তানের করুণ দৃশ্য দেখে বিলাপ করতে লাগল আর চিৎকার করে বলতে লাগল উচ্চাকাঙ্খা আমার এই তরুণ সন্তানকে হত্যা করেছে।

শিক্ষা: উচ্চাকাঙ্খা ধ্বংসের মূল কারণ।

الظبي والعقد والخنزير হরিণ, হার ও শুকুর

ظبي رأى صورته في الماء * فرفع الرأس إلى السماء[৪২]

একটি হরিণ পানির মধ্যে তার চেহারা দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধাকাশে মাথা উঁচু করল।

একদা একটি হরিণ পানির মধ্যে তার চেহারা দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধাকাশে মাথা উঁচু করে বলতে লাগল, ওহে গণ্ডদেশের সৃষ্টিকর্তা, তুমি তাকে লুলূ হার পরিয়ে তার সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দাও। পরক্ষণেই হরিণটি পানিকে বলতে শুনল, ওহে হরিণ! তুমি এমন কিছু চাইছ যা কখনই দেয়া হবে না। যদি সকল সৌন্দর্য গণ্ডদেশের মধ্যেই থাকত তবে সমুদ্র থেকে মতি বের হত না। হরিণ তার কথা শুনে কিছুটা অপ্রস্তত হয়ে পড়ে এবং এ অবস্থায় কিছুকাল তেপান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ঘুম পানাহার ছেড়ে দিক-বিদিক ছুটতে থাকে। এরপর একদিন পূণরায় পানির নিকট গিয়ে একই অভিযোগ করতে লাগল। পাশেই দুই ব্যক্তি আলাপ করছিল হঠাৎ তাদের নিকট এক রাখাল এগিয়ে আসল যার পিছে ছিল গলায় রশি লাগানো একটি শুকুর। ঐ শুকুরের দিকে নযর পড়তেই হরিণটি স্তম্ভিত ফিরে পেল। বলতে লাগল, বেশী আশা মঙ্গলজনক নয়, আমি যে গলার হার প্রত্যাশা করছি, সেটি তো আমাকে শুকুরের মত বন্দী জীবন উপহার দিবে। অতঃপর পানি তার দিকে তাকিয়ে বলল, বয়স হলে অবস্থা আরো করুণ হবে। এটি মোটেও আশ্চার্যজনক নয় যে, কালান্তর তাকে সহজ করে দিবে। যদি উপদেশ মনে রাখ তবে বয়সও ঠিক থাকবে।

শিক্ষা: নিজগুণে সন্তুষ্টি সম্মান ও মাহাত্ব দান করে।

القرد والفيل বানর ও হাতি

قرد رأى الفيل على الطريق * مهرولا خوفا من التعويق[৪৩]

একটি বানর রাস্তার উপর হাতি দেখতে পেয়ে জীবনের ভয়ে একটু দূরে পালাল।

একদা একটি বানর রাস্তার উপর হাতি দেখতে পেয়ে জীবনের ভয়ে একটু দূরে সরে গেল। বানরটি চোখে কম দেখত। তার ইচ্ছে ছিল, সবকিছু সে বুদ্ধি দিয়ে জানার চেষ্টা করবে। তাই সে এই হাতির ব্যাপারে কৌতুহলী হয়ে উঠল। সে বলল, স্বাগতম সুস্বাগতম। ওহে সর্ববৃহৎ স্থুলকায়, ভীতিসঞ্চারক, পাহাড় পর্বত পাড়ি জমানো প্রাণী, ওহে বিশাল মস্তকের অধিকারী! দাঁড়াও তোমার সৌন্দর্য একটুখানি অবলোকন করি। তুমি কতই না চালাক! তোমর হাড় কতই না মোটা! তোমার চামড়া কতই না পুরু! তোমার সূঁড় কতই না সুন্দর! যখন সূঁড় সোজা কর মনে হয় যেন একটি সাজানা খেজুর গাছ। তোমার পিঠ যেন প্রশস্ত বিছানা, আরোহীর জন্য উন্মুক্ত বিস্তর ভূমি। এভাবে বানরের প্রশংসা শুনে হাতি নিজেকে বেশ ভাগ্যবান মনে করল এবং তাকে পিঠে তুলে নিয়ে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু দুষ্টু বানর পিঠে বসে থাকতে থাকতে সুযোগ বুঝে হাতির চোখে আঙ্গুল ঢুকে দিল। হাতি ভাবল ঠিক মশা পড়েছে। তাই সে মশা তাড়ানোর জন্য সূঁড় দিয়ে আঘাত করল। কিন্তু সেটি গিয়ে পড়ল অন্য আরোহীর উপর। এবার বানর হাতির পিঠ থেকে নেমে অভিযোগ করে বলল, এরূপ লজ্জার কোন প্রতিকার নেই। যার চোখে এরূপ সমস্যা আছে তাকে দিয়ে হবে না। অন্ধের উচিত নিজেই নিজেকে হেফাজত করা।

শিক্ষা: বড় হতে হলে বুদ্ধিতেও সমৃদ্ধ হতে হয় নতুবা স্তুতি বাক্যে ধোকা দিয়ে ছোটরাও তার পরিচালক হয়ে বসবে।

الشاة والغراب ছাগল ও কাক

مرّ الغراب بشاة * قد غاب عنها الفطيم[৪৪]

একটি কাক একটি ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ছাগলটি তার রশি হারিয়ে ফেলেছে।

একদা একটি কাক একটি ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখতে পেল ছাগল তার রশি হারিয়ে দুঃখ কষ্টে অঝোরে কাঁদছে। ছাগল বলছে ওহে কাক! তুমি কি আমার সাথে আগামী কাল পর্যন্ত একটু অবস্থান করবে?

কাক বলছে, ওহে ভাগ্যবতী! এটা অনেক কষ্টের যে, তুমি আগামীকাল নিয়ে ভাবছ অথচ এই মুহূর্তের চিন্তা আমার মাথায় উঠানামা করছে। অনাগত প্রতিটি দিনের মধ্যে রয়েছে অজানা বার্তা। অতএব, আজকের বিষয় নিয়ে ভাব। তারা দু'জন কথাগুলো বলছিল হঠাৎ খবর আসল ছাগলটি মারা গেছে। হাড়-মাংস সব বাঘে খেয়ে ফেলেছে। বাবার যা হয়েছিল তার কপালেও তাই জুটেছে। মৃত্যু খবর শুনে কাক বলছে, নিশ্চয় প্রজ্ঞাবানরা আল্লাহর নবী হয়ে থাকে। তাদের কথা সর্বদা সত্যই হয়। আমি তোমাকে বলেছিলাম না, প্রত্যেক দিনের একটি খারাপ দিক রয়েছে। দেখলে তো ছাগল মারা গেছে। অথচ সে ছাগলের সামনেই তার সাথে কথা বলছে। কাকের কথা শুনে ছাগল বলল, তুমি সত্য বলেছ, তবে এটি পুরাতন খবর এখনকার নয়। কারণ আমার গোত্রের সবাই বলে কাকের চেহারাই কুলক্ষণে।

শিক্ষা: নির্বোধ সে, যে খবর শুনেই তা বিশ্বাস করে এবং ধোকায় পতিত হয়।

أمة الأرانب والفيل একদল খরগোশ ও হাতি

يحكون أن أمة الأرانب * قد أخذت من الثرى بجانب [৪৫]

বর্ণিত আছে একদল খরগোশ (বসবাসের জন্য) কোন এক এলাকায় নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে।

একদল খরগোশ কোন এক এলাকায় নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস শুরু করে। সেখানে তারা বেশ আনন্দ-ফূর্তি ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় পরিবারের ছোট-বড় সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে অবস্থান করতে থাকে। হঠাৎ একদিন একটি হাতি তাদের আবাসভূমির পথ ধরে এগোতে থাকে। এতে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একটি বুদ্ধিমান খরগোশ অবস্থা বুঝতে পেরে সবাইকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলে, ওহে আমার সম্প্রদায়ের জ্ঞানী, কবি, লেখক! তোমরা সবাই এদিকে আস। মহাবিপদ আমাদের সামনে হাজির। দুর্বলদের একতাই কেবল এই বিপদ মোকাবেলা করতে পারে। ডাক শুনে সবাই একত্রিত হয়। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে করণীয় ঠিক করতে তারা নিজেদের মধ্য থেকে বয়স ও বুদ্ধি বিবেচনায় তিনজন প্রতিনিধি মনোনীত করে। প্রথমজন বক্তব্য দিতে গিয়ে বলল, আমাদের উচিত হবে হাতিকে এই এলাকা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া, এছাড়া তার শুঁড় থেকে আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। তার কথা শুনে সবাই সমস্বরে চিৎকার করে বলল, না এটা কখনই হতে পারে না। এটা হবে আমাদের জন্য আরো ভয়ংকর। এবার দ্বিতীয়জন উঠে বলল, আমাদের এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য শিয়ালপণ্ডিতকে ডাকতে হবে। তার পরামর্শ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। এই বক্তব্য শুনে সবাই বলল, না এটাও হবে না। কারণ এক শত্রুকে মোকাবেলা করতে অন্য আরও এক শত্রুকে ডাকা ঠিক হবে না। এবার তৃতীয়জন উঠে বলল, ওহে আমার সম্প্রদায়! আমার মনে হয় তোমরা সবাই একত্রিত হও, কারণ একতাই শক্তি। হাতি যে পথে আসার চেষ্টা করছে, সবাই এক সাথে সেখানে চিৎকার শুরু করবে। সবাই এই পরামর্শকে স্বাগত জানাল। কথামত সবাই একত্রিত হয়ে পালাক্রমে চিৎকার শুরু করল। এক পর্যায়ে তাদের চিৎকার শুনে হাতির কান নষ্ট হওয়ার উপক্রম। সে আর সামনে এগোতে পারল না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। অনন্যপায় হয়ে শেষাবধি বলতে বাধ্য হল, ওহে এলাকাবাসী! যে উচ্চকণ্ঠে বলিষ্ঠ সেই জয়ী হবে। আমার এলাকায় আমি ফিরে যাই। তোমরা তোমাদের গৃহে নিরাপদে বসবাস কর।

শিক্ষা: যে কোন অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধে একতাই সফল কৌশল। অত্যাচারী যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

الأسد ووزيره الحمار সিংহ ও তার মন্ত্রী গাধা

الليث ملك القفار * و ما تضمّ الصحارى[৪৬]

বন এবং তথায় বসবাসকারী সবার রাজা হলো সিংহ।

একদা বনের রাজা সিংহের নিকট অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী বিধ্বস্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, ওহে রাজা মশাই! আপনি তো ভালই আছেন, নিশ্চিন্তে স্বরূপে বহাল তবিয়তে সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু এদিকে তো মন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এখন রাজার কাজ কে সম্পাদন করবে? সিংহ বলল, কেন? আমার মন্ত্রী গাধা সবকিছুর সমাধান দিবে। সিংহের কথা শুনে সবাই হাসতে হাসতে বলতে লাগল, সিংহ এই গাধার মধ্যে কি দেখল যে, তাকে এতবড় দায়িত্ব দিল? গাধা মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে এক দিন-রাত পার না হতেই দেখা গেল সিংহের রাজত্ব ধ্বংসের মুখে প্রায়। ডানে বানর, বামে কুকুর, সামনে বিড়াল সবাই দাপটের সাথে অবস্থান গ্রহণ করেছে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন বানর চুপ চুপ করে সিংহকে বলল, ওহে মহারাজ! প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। এই গাধা দিয়ে আপনার রাজত্ব টিকবে না।

শিক্ষা: চরিত্র ও যোগ্যতা জেনে-বুঝে দায়িত্ব দিতে হবে নতুবা সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে।

الغزال والكلب বাচ্চা হরিণ ও কুকুর

كان فيما مضى من الدهر بيت * من بيوت الكرام فيه غزال[৪৭]

দূর অতীতে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে একটি হরিণ ছিল।

জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ নিজ গৃহে একটি হরিণ পুষত। প্রত্যহ তাকে দামি ঘাস, মধু আরো অনেক কিছু খাবার দেয়া হত। একদিন হরিণটি বিরক্ত হয়ে বাড়ির প্রহরী কুকুরের নিকট এসে বলল, ওহে নিরাপত্তা বিধানকারী! তোমার দিন-কাল কেমন যাচ্ছে? এই বাড়ির লোকজন কেমন? কুকুর উত্তর দিল সত্যি বলতে কি তারা সবাই হিংসুক, ধোকাবাজ, প্রতারক ও নিন্দুক। জানিনা কি কৌশল অবলম্বনে তাদের শান্ত রাখব? একজন খুশী হলে অন্যজন বেজার। সবার সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই কিন্তু সেটাও কঠিন। অতএব, হে অরণ্যবাসী! তুমি তোমার মালিকের ইচ্ছা পূরণ কর, প্রতারিত হইও না। বন্দী অবস্থায় অনেক নিরাপদে আছ। অসুস্থতার ভান করলে তোমাকে ওরা ভক্ষণ করবে। তোমার জন্য সরবরাহকৃত ঘাস ও অন্যান্য খাবারে সন্তুষ্ট থাক। আর আমি মানুষের নিকট হাড়ের সন্ধান না পাওয়া গেলে তাদের সাথে থাকতাম না।

শিক্ষা: ভালো অবস্থায় কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ অনাগত দিন আরো দুর্বিসহ হতে পারে।

الثعلب والديك শৃগাল ও মোরগ

برز الثعلب يوما * في شعار الواعظينا[৪৮]

একদা একটি শৃগাল উপদেশদাতা সেজে বেরিয়ে পড়ল।

একদা একটি শৃগাল সবাইকে উপদেশ দেয়ার নিমিত্তে বেরিয়ে পড়ল। সে একেবারে নির্বোধ, সাদাসিধের ন্যায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ বকাবকি ও ষড়যন্ত্রকারীদের গালি-গালাজ করতে লাগল। সে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে বলতে লাগল, ওহে আল্লাহর বান্দারা! গুহাবাসীর অবস্থানের ন্যায় তাওবা কর। তোমরা বৈরাগী হয়ে যাও কারণ সেটিই সঠিক জীবন। তোমরা মোরগ বাড়িতে রাখ কারণ সে

সবাইকে ফজরের নামাজের জন্য আহ্বান করে। এরপর উপদেশদাতা একটি দূত জনৈক ব্যক্তির মোরগের নিকট পাঠাল। দূত মোরগকে তার সাথে দেখা করতে অনুরোধ করল। মোরগ উত্তর দিল, ওহে পথভ্রষ্ট হিদায়াত দাতা! দুঃখিত আমি পারছি না। তার চেয়ে বরং আমার পক্ষ থেকে শৃগালকে এই খবর পৌঁছে দাও যে, তারা ইতোপূর্বে প্রতারিত হয়ে ঐ অভিশপ্তের পেটে ঢুকেছে, আর নয়। বিজ্ঞজন বলেছেন, যদি কখনও কেউ ধারণা করে, শিয়ালের ধর্ম আছে তবে সে ভুল করবে।

শিক্ষা: অজাত শত্রুর সুপরামর্শ ষড়যন্ত্র ও দূরভীসন্ধিমূলক হয়ে থাকে।

الكلب والقط والفأر কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুর

فأر رأى القط على الجدار * معذّبا فى أضيق الحصار [৪৯]

একটি ইঁদুর দেয়ালের উপর একটি বিড়ালকে দেখতে পেল, সে খুব সংকীর্ণ জায়গায় বিপদে পড়েছে।

একদা একটি ইঁদুর একটি বিড়ালকে দেখতে পেল, সে খুব বিপদে পড়েছে। কুকুর তার উপর হামলা করার জন্য উদ্যত হয়েছে। ইঁদুর ভাবল, এই সুযোগে বিপদগ্রস্থ বিড়ালকে সাহায্য করতে পারলে হয়ত সে পরবর্তীতে আমার নিরাপত্তা বিধান করবে। তাই সে অকাস্মাৎ কুকুরের সামনে দিয়ে দ্রুত গমন করল এবং তার সামনে কিছু মাটি ফেলে দিল। এতে কুকুর অন্যমনস্ক হওয়া মাত্রই বিড়াল লাফ দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। এতে ইঁদুর খুব খুশী ও আনন্দিত হলো। এরপর একদিন একটি খাবার আয়োজনে সেই ইঁদুর উপস্থিত। সে ভাবল, আমি ইতোপূর্বে তার অনেক বড় উপকার করেছি। অতএব আজ হয়তো আমি তার নিকট নিরাপদে থাকব। কিন্তু তা আর হলো না। বিড়াল তার স্বভাব পাল্টাতে পারল না।

শিক্ষা: শত্রুকে যতই রক্ষা করা হোক সে ক্ষতি করবেই।

سليمان والهدهد সুলাইমান আ. ও হুদহুদ পাখি

وقف الهدهد فى با * ب سليمان بذلّة [৫০]

একটি হুদহুদ পাখি অসহায় হয়ে সুলাইমান আ. এর দরজায় এসে দাঁড়াল।

একবার একটি হুদহুদ পাখি অসহায় হয়ে সুলাইমান আ. এর নিকট এসে বলল, ওহে আল্লাহর নবী! আমি তো মৃত্যুপ্রায়, আমাকে বাঁচান। একটি শস্যদানা বক্ষে যন্ত্রণা শুরু করে দিয়েছে। নীল, দিজলা, ফুরাত কোথাও একফোটা পানি পাচ্ছি না। আর কিছুক্ষণ এ অবস্থা থাকলে আমার খুবই খারাপ মৃত্যু ঘটবে। পাখিটির কথা শুনে সুলাইমান আ. আশপাশের সবাইকে বললেন, হুদহুদটি বড় অন্যায় করে ফেলেছে। আর সেই পাপের আগুন তার বক্ষে পীড়া দিচ্ছে। আমার মনে হয়, সে পিঁপড়ার ঘর থেকে খাবার চুরি করেছে।

শিক্ষা: যালিমের হৃদয় কোন কারণ ছাড়াই মর্মদায়ক হয়ে থাকে।

سليمان والطاووس সুলাইমান আ. ও ময়ূর

سمعت بأنّ طاووسا * أتى يوما سليمانا [৫১]

শুনেছি একটি ময়ূর একদা সুলাইমান আ. এর নিকট আসল।

একদা একটি ময়ূর অন্যান্য পাখিকে উপেক্ষা করে নিজের প্রতি সুলাইমান আ. এর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে একবার তার পেখম মেলে ধরে আবার গুটিয়ে নেয়। ময়ূর বলল, আপনার সাথে আমার একটি কথা রয়েছে এবং তা এখনই বলার উপযুক্ত সময়। আমি কি আমার পালক দ্বারা বাগানকে সজ্জিত করি না? বাগানের রং-

বে-রঙের ফুলের শোভাকে আরও বর্ধিত করি না? আপনার শাহী দরবারের ফটকে অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব পালন করি না? তবে অবজ্ঞা কেন? কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি, কিছু মিষ্টি কণ্ঠের পাখি আমাকে অবহেলিত করে তুলেছে, যাদের অস্তিত্ব আমার তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ। অথচ তারা আপনার দরবারকে কাঁপিয়ে তুলছে। সুলাইমান আ. বললেন, ময়ূর! তোমাকে বৃহৎ শরীর দান অথচ সুললিত কণ্ঠ না দেয়ার পেছনে মহান সৃষ্টিকর্তার হিকমাত রয়েছে। বড় হয়েছো বিধায় কৃতঘ্ন ও অবাধ্য হও না। সৃষ্টিকর্তা যদি তোমাকে সুন্দর কণ্ঠ দান করতেন, তবে তুমি মানুষের সাথে কথাই বলতে না, অহংকারে ডুবে থাকতে।

শিক্ষা: সকল সৃষ্টি কোন না কোনভাবে অসম্পূর্ণ। অতএব অহংকার ও বড়ত্বের কিছু নেই।

القبرة وابنها **বুলবুলি ও তার ছা**

رأيت في بعض الرياض قبرة * تطيّر ابنها بأعلى الشجرة[৫২]

কোন এক বাগানে দেখলাম একটি বুলবুলি পাখি গাছের উঁচু শাখায় তার বাচ্চাকে উড়ানো শেখাচ্ছে।

একদা কোন এক বাগানে দেখলাম একটি বুলবুলি পাখি গাছের উঁচু শাখায় বসে তার বাচ্চাকে উড়ানো শেখাচ্ছে। মা পাখি বলছে, কচি ছা তুমি তোমার দুর্বল ডানায় ভর দিয়ে উড়ার চেষ্টা করবে না বরং আমি যেভাবে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে পার হই সেভাবে তুমি চেষ্টা কর। এই বলে মা পাখি লাফানো শুরু করল এবং একবার লাফ দেয়ার পর খানিকটা সময় নিত যেন একটু শরীরের বিশ্রাম হয়। ছা পাখি মার মত কয়েক লাফ দেয়ার পর আর ধৈর্য ধারণ করতে পারল না। মায়ের বারণ অমান্য করে পাখায় ভর দিয়ে উড়ার চেষ্টা করল। ফলে যা হওয়ার তাই হল। একটু না উড়তেই শরীরের ভারে মাটিতে পড়ে দুই বাহু ভেঙে গেল। বাকি জীবন পঙ্গু হয়েই তাকে কাটাতে হল।

শিক্ষা: জীবনের প্রতিটি ধাপের জন্য একটি উপযুক্ত সময় রয়েছে। সে সময়ের আগেই যদি তাড়াহুড়া করা হয় তবে মৃত্যুই তার অণিবার্য ফলাফল।

نوح عليه السلام والنملة في السفينة **জাহাজে নূহ আ. ও পিঁপড়া**

قد ودّ نوح أن يباسط قومه * فدعا إليه معاشر الحيوان[৫৩]

নূহ আ. (জাহাজে আরোহিত) সকলের প্রতি দয়াপর্বশ হয়ে সবাইকে ডাকলেন।

নূহ আ. জাহাজে আরোহিত সকলকে ডেকে বললেন, আমি চাই তোমাদের দেখাশোনার জন্য একজন পরিচালক নির্ধারিত হবে। এবার পশুরাজ সিংহ এগিয়ে এলো পরিচালক হওয়ার জন্য। এতে সর্ববৃহৎপ্রাণী হাতি বেজার হলো। অন্যান্য প্রাণীও তাদের অনুসরণ করে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে তারা সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য নবীর স্মরণাপন্ন হলো। প্রথমেই পিঁপড়া নবীর সামনে এসে বলল, নবীজী! এই পারস্যভূমিতে আমার বিশ্বাস, আমিই সবার উপর আরোহণকারী, আমিই পারব সবাইকে নিরাপদে রাখতে। সবাইকে সুচারুরূপে পরিচালনা করতে। পিঁপড়ার কথা শুনে নূহ আ. হেসে বললেন, আমার এ জাহাজ যেন জীবন আর তুমি মানবতুল্য। সকল কল্যাণ ও মাহাত্ম রয়েছে তোমার মাঝে। অন্য সবার অবস্থান তোমার পরে।

শিক্ষা: আকারে ছোট হলেও গুণে বড় হলে সেই মহৎ।

الثعلب والأرنب في السفينة জাহাজে শিয়াল ও খরগোশ

أتى نبي الله يوما ثعلب * فقال يا مولای إني مذنب[৫৪]

একদা একটি শিয়াল আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, ওহে মনিব! আমি অপরাধী।

একদা একটি শিয়াল আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, ওহে মনিব! আমি অপরাধী। পাপাচারে আমার আমালনামা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। যদি কোন সুপারিশকারী পেতাম, তাওবা করতাম। ওহে দয়াময় নবী, মহান ক্ষমাকারীর নিকট এই অধমের জন্য একটু ক্ষমা প্রার্থনা করুন। যদিও আমার চরিত্র খারাপ তারপরও কিছু ভাল কাজ তো করেছি। যখন এই কথাগুলো শিয়াল বলছিল, তখন তার দরবারের নিচ থেকে হঠাৎ একটি খরগোস বেরিয়ে আসল। খরগোশটি গৃহেই ঘুরে ফিরে বেড়াত, খেলাধুলা করত। তার জন্য কোন তদারককারী নিযুক্ত ছিল না। সে সর্বদা নবীর আশপাশেই থাকত। কোনদিন নবীজী তাকে কষ্ট দেননি। খরগোসকে দেখে শিয়াল তার স্বভাব ধরে রাখতে পারল না। তার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। তৎক্ষনাত নবী আ. তাকে বললেন, খবীছ বেরিয়ে যা। জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও নিজ স্বভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিস না। আর একারণেই তোকে জঙ্গলে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

শিক্ষা: স্বভাব-চরিত্র বিপদে পড়লেও পরিবর্তন হয় না।

الأرنب وبنت عرس في السفينة জাহাজে খরগোশ ও খেকশিয়াল

قد حملت إحدى نسا الأرنب * و حلّ يوم وضعها في المركب[৫৫]

একটি গর্ভবতী খরগোশ নিজ বাচ্চা প্রসবের দিন জাহাজে আরোহণ করল।

একটি গর্ভবতী খরগোশ নিজ বাচ্চা প্রসবের দিন জাহাজে আরোহণ করে। প্রসব যন্ত্রণার চিৎকার শুনে অন্যান্য আরোহী সবাই ক্ষুব্ধ। তখন একটি বৃদ্ধা খেকশিয়াল কাছে এসে বলল, এরূপ বিপদে সবাই আমার নিকটেই আসে কারণ এসব বিষয়ে আমার অনেক পূর্বাভিজ্ঞতা রযেছে। আমি তোমায় সাহায্য করতে প্রস্তুত। খরগোশ বলল, না ওহে প্রতিবেশী! সখ্যতা সৃষ্টির পূর্বে সাক্ষাত নয়। তোমার প্রতি আমার আস্থা নেই। আমি কেবল স্বজাতির উপরই ভরসা রাখি।

শিক্ষা: ভিন্নজাতি কখনও কল্যাণকামী হতে পারে না বরং ফুলের আবরণে বিষাক্ত কাঁটা। অতএব স্বজাতির উপর ভরসা রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

الأسد والضفدع সিংহ ও ব্যাঙ

انفع بما أعطيت من قدرة * واشفع لذى الذنب لدى المجمع[৫৬]

তোমাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা দ্বারা অন্যের কল্যাণ কর, সবার সামনে অপরাধীকে ক্ষমা করার সুপারিশ কর।

একদা পশুরাজ সিংহ বিচারকের আসনে সমাসীন। তার সামনে একটি ব্যাঙকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। রাজাকে বলা হলো, এই আসামী গতকাল সবার কানে কষ্ট পৌঁছিয়েছে। কোন কারণ ছাড়াই ইচ্ছামত চিৎকার দিয়ে পানির মধ্যে ডাকাডাকি করে সবাইকে অস্থির করে তুলেছে। সুতরাং আপনি আদেশ দিন, চার পা বেঁধে তাকে লটকিয়ে রাখা হোক। সিংহাসনের পাশে থাকা প্রধানমন্ত্রী হাতি উঠে

দাঁড়িয়ে বলল, ওহে মহারাজ! কি করে এই বনের রাজার সামনে সামান্য ব্যাঙ শাস্তি পায়? এতে রাজার মর্যাদাই ক্ষুন্ন হয়। এই কথা শুনে সিংহ আদেশ দিলো, সে আমাদের এখানে নিরাপদ।

শিক্ষা: যাকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা দ্বারা সবার কল্যাণ করা উচিত। যাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা দ্বারা অন্যকে রক্ষা করা কর্তব্য।

الكلب والببغاء কুকুর ও তোতা

كان لبعض الناس ببغاء * ما ملّ يوما نطقها الإصغاء[৫৭]

জনৈক ব্যক্তির একটি তোতা পাখি ছিল। কোনদিন পাখিটি তার সুমিষ্ট কণ্ঠে বিরক্ত করেনি।

জনৈক ব্যক্তি অনেক সেবা-যত্ন করে একটি তোতা পাখি পুষত। পাখিটি তার সুমিষ্ট কণ্ঠে সবাইকে আনন্দে ভরে রাখত। বাড়ীর সবাই তার সাথে খেলা করত। লোকটির বাড়িতে একটি দামী কুকুরও ছিল। কিন্তু তোতা'র সুরেলা কণ্ঠ কুকুরকে ক্রমশ মূল্যহীন করে তোলে। তাই সে খুবই চিন্তিত, বিষন্ন। উপায় না পেয়ে কৌশলে একদিন তোতা'র নিকট গিয়ে প্রশংসা করে বলল, ওহে সুরেলা তোতা! তোমার মিষ্টি কণ্ঠ আমার কানে পৌছলে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। একথা শুনে তোতা খাঁচার কিনারায় এসে প্রিয় সুরে ডাকতে লাগল। আর তখনই কুকুর তার স্বভাব অনুযায়ী হিংসার বশবর্তী হয়ে পাখিটির জিহবায় কামড় বসিয়ে দিল। তোতা চিৎকার দিয়ে বাঁচার আকুতি জানায় কিন্তু কুকুর বলল, আমার মর্যাদা ফিরে পেতে এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

শিক্ষা: হিংসা এমন এক ভয়ংকর দোষ যা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে যে কোন অনৈতিক পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

الثعلب الذي انخدع ধোকায় পণ্ডিত শিয়াল

قد سمع الثعلب أهل القرى * يدعون محتالا بيا ثعلب! [৫৮]

(একদা) একটি শিয়াল শুনতে পায়, গ্রামবাসী চালাক (উপনামে) শিয়ালকে ডাকছে।

একদা গ্রামবাসী চালাক, চতুর, পণ্ডিত ইত্যাদি উপনামে শিয়ালকে চিৎকার করে ডাকতে থাকে। শিয়াল শুনতে পেয়ে ভাবল, এই সুযোগ হাত ছাড়া করা যায় না। আমার অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এটাই সুযোগ। এই জগতে আমার চেয়ে চালাক আর কেউ নেই, সবার নিকট আমি চতুরতার উদাহরণে পরিণত হয়েছি। তাদের দেখিয়ে দিব তারা যা মনে করে আমি তার চেয়েও অধিক চালাক। মনে হয় তারা আমার সম্মানে মুরগী, খরগোশ এনে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবে। এবার গর্ভভরে সে গ্রামবাসীর আমন্ত্রণস্থলে গিয়ে হাজির কিন্তু কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই একজন এসে তার কান ধরে কুকুরের সাথে খেলা করতে লেগে দিল। তার আর কিছুই করার অবকাশ থাকল না।

শিক্ষা: ষড়যন্ত্রকারীর উপর কখনই আস্থা রাখা ঠিক না। কারণ শিয়ালও কখন কখন ধোকায় পড়ে।

الثعلب والأرنب والديك শৃগাল, খরগোশ ও মোরগ

من أعجب الأخبار أن الأرنبا * لما رأى الديك يسب الثعلبا[৫৯]

বিস্ময়কর খবর হলো (একদা) একটি খরগোশ একটি মোরগ দেখতে পেয়ে শৃগালকে গালি-গালাজ করছে।

একটি খরগোশ একটি উঁচু দেয়ালের উপর বেশ নিরাপদেই অবস্থান করছিল। হঠাৎ দেখতে পেল একটি মোরগ খুব চিৎকার করে শৃগালকে গালি গালাজ করছে। খরগোশের সন্দেহ হলো ঠিক ধূর্তবাজ শৃগাল দুর্বলের উপর হামলা করার জন্য ওঁত পেতে আছে। তাই সে নেমে এসে সবাইকে বকাবকি করে সাবধান করতে লাগল। আর ঠিক তখনই ছাগলের উপর নেকড়ের আক্রমণের ন্যায় শৃগাল খরগোশের উপর আচমকা হামলা করে বসলো। বলল, মোরগের নিকট আমার কৌশল ফাঁস করার শাস্তি তোমার রক্তদিয়ে গৃহিত হল।

শিক্ষা: অন্যকে ধোকা দিলে নিজেও একসময় প্রতারিত হয়। অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি সাধিত হয়।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা স্পষ্টতই বলতে পারি যে কবি আহমদ শাওকী বেগ এর রম্যকবিতাসমূহ সাহিত্যের সকল উপাদানে সমৃদ্ধ। কবিতার বিষয়বস্তুতে কোনরূপ দুর্বোধ্যতা নেই বরং তা পাঠককে যথার্থতার সাথে আত্মতৃপ্তি দানে সক্ষম। পাশাপাশি কাব্যসামগ্রীর অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যসমূহ ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, নির্বোধ-চতুর, শাসক-শোষিত, অত্যাচারী-নিপীড়িত সবার জন্য শিক্ষা, দীক্ষা, উপদেশ, পথনির্দেশ, নীতিকথা, সংশোধন, পরিশুদ্ধি, আত্মগঠনের অন্যতম বাস্তব প্রতিবেদন।

তথ্যনির্দেশ

১. শরীফ জুরজানী, *আত তা'রীফাত* (বৈরূতঃ আলামুল কুতুব, ১৯৭৮), পৃ. ১৭৮।

২. সূরা তাওবাহ, আয়াতঃ ৮২।

৩. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরাব* (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১৯৬৮), মাদ্দাহ-مزح ; আহমাদ ফারাহীদি, *কিতাবুল আইন*, ৫ম খণ্ড (মাকতাবাতুল হিলাল,তা বি),পৃ.৩৮।

৪. *লিসানুল আরাব*, মাদ্দাহ-سرر

৫. সূরা ইনশিকাক, আয়াতঃ ৯।

৬. *কিতাবুল আইন*, ২য় খণ্ড, পৃ.৫১; ইবন সায়্যিদিহী, *আল মুখাস্‌সাস*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৬), পৃ. ১৫।

৭. আহমাদ হূফী, *আল ফুকাহাতু ফিল আদাব উসূলুহা ওয়া আনওয়াউহা* (কায়রোঃ দারুন নাহদাহ, ১৯৯৬), পৃ. ৪।

৮ আত তা'রীফাত, পৃ. ৩০২; *লিসানুল আরাব*, মাদ্দাহ-هزل ।

৯. সূরা তারিক, আয়াতঃ ১৪।

১০. আল ফীরূযাবাদী, *আল কামূস আল মুহীত*, ১ম খণ্ড (আল মাকতাবাহ আশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, ওযারাতুশ শুউন আল ইসলামিয়্যাহ, সৌদি আরব, ১৪২০ হি.), পৃ. ১৩৮৩, http://www.al-islam.com ।

১১. সূরা হুজুরাত, আয়াতঃ ১১।

১২. *লিসানুল আরাব*, মাদ্দাহ-بسم

১৩. তদেব, মাদ্দাহ-مرح

১৪. ইবনুল জূযী, *আখবারুয যার্‌রাফ ওয়াল মুতামাযিনীন* (লেবাননঃ দারুল ফিকর,১৯৯০), পৃ.৫৪।

১৫. *আত তা'রীফাত*, পৃ. ১৮৩।

---

[১৬] فالفكاهة هى عرض أمور الحياة من الإحساس الفلسفى بالحياة حيث يضحك الناس و يبعث سرورهم و يمتعهم দ্র.- ড. আব্দুল আযীয শারাফ, *আল আদাব আল ফুকাহী* (মিসর: দারু বূনার, ১৯৯২), পৃ.২২।

[১৭]. الفكاهة هى المزاح ما يتمتع به من طرف الكلام দ্র.- ইবরাহীম আনীস, *আল মু'জামুল ওয়াসীত* (দিল্লী: কুতুব খানা হুসাইনিয়্যাহ,১৯৯৬), পৃ. ৬৯৯।

[১৮]. জিহাদ আব্দুল কাদির, *শি'রুল ফুকাহা ফিল আসরিল আব্বাসী* (প্রকাশনা উল্লেখ নেই), পৃ. ১৪-২০।

[১৯]. هى ما تصدر عن الطبيعة البشرية المتناقضة التى سرعان ما تمل حياة الجد و الطرافة و العبوس فتلمس فى اللهو ترويحا عن نفسها و تبحث فى الفكاهة عن منفذ للتنفيس عن آلامها و تسعى عن طريق النكتة نحو التهرب من الواقع الذى كثير ما يثقل كاهلها. দ্র.- ড. যাকারিয়া ইবরাহীম, *সাইক্লোজিয়্যাতুল ফুকাহা ওয়ায যিহ্ক* (কায়রো: মাকতাবাতু মিসর, তা বি), পৃ. ৯।

[২০]. إنها طرفة أو نادرة أو ملحة أو نكتة أو حكاية مؤجزة يسرد فيها الراوى حادثا واقعيا أو متخيلا فيثير إعجاب السامعين و يبعث فيهم الجزل والضحك أحيانا. দ্র.-জাব্বুর আব্দুন নূর, *আল মু'জামুল আদাবী* (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মাল্লাঈন, ১৯৭৯), পৃ.১৯৪-৯৫।

[২১]. الفكافة ما تنسى هموم الناس و آلامهم نفسا و جسما দ্র.-ইবন ওয়াহাব, *আল বুরহান ফী উলূমিল বায়ান*, সম্পাদনা: আহমাদ মাতলূব (প্রকাশনা উল্লেখ নেই), পৃ. ২৪৮।

[২২]. إنها تنطبق على قدرات الرؤية والفهم أو التعبير عما هو فكه فهى مثير الضحك দ্র.- ইবরাহীম ফাতহী, *মু'জামুল মুসতালাহাতিল আদাবিয়্যাহ* (আল মুওয়াস্সাসাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৮), পৃ. ২৬৩।

[২৩]. والأدب الفكاهى ما يطمئن به الناس و يأمن و يستريح و ينشرح به الصدور. দ্র.- সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ, *আল ফুকাহা ফিশ শি'রিল আরাবী* (বৈরূত: দারুর রাতিব আল জামিআহ, তা.বি.), পৃ.৫।

[২৪]. إن الفكاهة ما يضحك الناس فطرة و ما يسر به النفس طبيعة و تركيبا দ্র.- আল জাহিয, *কিতাবুল বুখালা* (বৈরূত: তা. বি.), পৃ ১৯।

[২৫]. الفكاهة هى تنبع كاملة من تلقاء نفسها من الذهن الخصيب و إليه و لا تجد مرعاها الخصيب فى الرؤوس الخاملة أو عند أصحاب المشاعر غير المهذبة দ্র.- এল জি বোটস, *আল মুলহাত ফীল মাসরাহিয়্যাহ ওয়াল কিস্সা* (কায়রো: আল মুওয়াস্সাসাহ আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৫) ,পৃ. ১।

[২৬]. *Standard Educational Corporation* (Chicago, Illinois,1972), p.287.

[২৭]. *বাংলা অভিধান*, অনলাইন সংস্করণ, www ebangla dictionary .org।

[২৮]. সূরা আন নাজম: ৪৩-৪৪।

[২৯]. *আল ফুকাহাতু ফিশ শি'রিল 'আরাবী*, পৃ. ৫।

[৩০]. ড. আব্দুল আযীয শারাফ, *আল আদাব আল ফুকাহী* (মিসর: দারু বূনার, ১৯৯২), পৃ. ৩৪।

[৩১]. তদেব, পৃ. ৩৪।

[৩২]. সিরাজ উদ্দীন, *আল ফুকাহাতু ফিশ শি'রিল 'আরাবী* (বৈরূত: দারুর রাতিব আল জামি'ইয়্যাহ, তা বি), পৃ. ৬।

[৩৩]. الهدف الرئيس للفكاهة إثارة الضحك و لا الإضحاك فقط بل إنها تقوم بوظيفة النقد و الدعوة إلى الإصلاح. দ্র.- *আল ফুকাহাতু ফিশ শি'রিল 'আরাবী*, পৃ. ৬।

[৩৪]. তদেব।

[৩৫]. তদেব, পৃ. ২৪।

[৩৬]. الكاتب الفكاهى تلزم له قوة الخيال والشعور ما يصور به خلق أشخاص أو سيرهم يستثير بها الناس الضحك. أو يعبرها بقولهم قوة الاستبصار أو الإحساس الفلسفى بالحياة فيختار مادة و ينظمها وفقا لغرض خاص و يومئ بذلك على النحو الذى يحدد طابع هذا

الأدب الفكاهى فلسفيا. و لا بد له من معيار ذهنىّ يصدر عنه فيما يكتب كئ لا ينحرف عن المركز. দ্র.- ড. আব্দুল আযীয শারাফ, পৃ. ২২।

৩৭. الفكاهى أن يكون ذا خفة و ظرافة و خبرة عميقة بعيد النظر حيث يبحث عن الحيلة و يتدبر الخطط و ينسج خيوطها و يمتاز بنظرة الثاقب و بموهبته الأصلية التى تضفى عليه خفة و لطفا فتأتى فكاهته نقية غير مصطنعة تفيض بالعذوبة و ترد الفكاهة على شكل قصة قصيرة مؤجزة ساخرة تقوم أحيانا كثيرة على أساس النقد و تمييز بالخروج من المألوف. দ্র.- *আল ফুকাহাতু ফিশ শি'রিল 'আরাবী*, পৃ. ৫।

৩৮ الظرف يكون في صاحبة الوجه و رشاقة القد و نظافة الجسم و الثوب و بلاغة اللسان و عذوبة المنطق و في خفة الحركة و قوة الذهن و ملاحة الفكاهة و المزاح. দ্র.-আখবারুয যার্‌রাফ ওয়াল মুতামাযযিনীন

৩৯. আহমাদ শাওকীর জন্ম ১৬ অক্টোবর ১৮৬৮ মতান্তরে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে। বাবা আরবী, কুর্দী ও মা তুর্কী, গ্রীক বংশোদ্ভূত হওয়ায় এই চারটি ধারার রক্ত তার মাঝে প্রবাহিত হয়েছে। কবির নানা ছিলেন খেদভী ইসমাঈলের রাজদরবারের একজন কর্মকর্তা। রাজপ্রাসাদে নানার আশ্রয়ে রাজকীয়ভাবে বেড়ে উঠেন শাওকী। তিনি ইবতিদায়ী ও তাজহীযিয়্যাহ মাদরাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে মাদরাসাতুল হুকূক এ আইন বিষয়ে পড়ালেখা করেন।

১৮৮৭ সালে সাহিত্য ও আইন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য ফ্রান্সের মুনবালিয়্যাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখানে দু'বছর পড়ালেখা শেষে প্যারিস, ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বেশকটি দেশ সফর করেন।

১৮৯১ সালে মিশরে ফিরে আসেন। রাজা আব্বাস হিলমী কবিকে রাজকবির মর্যাদা প্রদান করেন। এ সময় তিনি كبار الحوادث فى وادى النيل মহাকাব্যসহ অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। এছাড়া আল আহরাম পত্রিকায় عذراء الهند بنتاور لادياس تيمان دلّ গল্পসামগ্রী নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকেন।

১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশরা আব্বাস হিলমীকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করলে আহমাদ শাওকীকে দেশান্তরিত হতে হয়। সে সময় তিনি স্বপরিবারে স্পেনে গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি বিখ্যাত নাটক أميرة الأندلس রচনা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯১৯ সালে মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুলতান আহমাদ ফুয়াদ শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে দ্রুত তাকে مجلس الشيوخ এর সদস্য মনোনীত করেন। এ সময় তিনি রচনা করেন নাটক مصرع كليوباترة ও কাব্য নাটক على بك الكبير ও البخيلة, الست هدى, عنترة, قمبيز, مجنون ليلى।

কবির জীবনে রচিত কবিতা সামগ্রী নামে চার খণ্ডে পর্যায়ক্রমে ১৯২৫, ১৯৩০, ১৯৩৬ ও ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২৭ সালে কায়রোর অপেরা হাউজে কবির সম্মানে একটি জমজমাট কাব্যাসরের আয়োজন করা হয়। সেখানে সকল রাজনীতিবিদ ও স্বনামধন্য কবিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঐ সভায় কবি হাফিজ ইবরাহীম নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তি উচ্চারণ করে আহমাদ শাওকীকে আধুনিক কালের উপাধীতে ভূষিত করেন।

أمير القوافي قد أتيت مبايعا * فهذي وقود الشرققد بايعت معى

(দ্রঃ- হান্না আল ফাখূরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী*, আদাবুল হাদীছ (বৈরূত: দারুল জীল,১৯৯৫), পৃ.৪৩৬-৪৩৯; য়ূসুফ কোকেন, *আলামুন নাছর ওয়াশ শি'র ফিল আসরিল আরাবীইল হাদীছ*, ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদ: দারুল মা'আরিফ,১৯৮০),পৃ. ২৪৩; শাওকী দায়্যিফ, *আল আদাবুল আরাবী আল মুআসির ফী মিসর* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ,তা বি),পৃ. ১১০; আব্দুল্লাহ ইবন আসআদ আল ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান ওয়া আবরাতুল য়াকযান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭), পৃ. ২৭।)

৪০. কবিতাটি পনের চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- আহমাদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাব আল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১২৮।

৪১. কবিতাটি ছাব্বিশ চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৩৩।

৪২. কবিতাটি ষোল চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৩৬।

৪৩. কবিতাটি ষোল চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৪০।

[৪৪]. কবিতাটি পনের চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৪১।
[৪৫]. কবিতাটি চব্বিশ চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৪২-৪৩।
[৪৬]. কবিতাটি ষোল চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৪৭।
[৪৭]. কবিতাটি চৌদ্দ চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৪৯।
[৪৮]. কবিতাটি তের চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৫০।
[৪৯]. কবিতাটি পনের চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৫২।
[৫০]. কবিতাটি দশ চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৫৩।
[৫১]. কবিতাটি আঠার চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৫৪-৫৫।
[৫২]. কবিতাটি দশ চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৫৭।
[৫৩]. কবিতাটি এগার চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৬১।
[৫৪]. কবিতাটি দশ চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৬৫।
[৫৫]. কবিতাটি ছয় চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৬৬।
[৫৬]. কবিতাটি দশ চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৭০।
[৫৭]. কবিতাটি এগার চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৭৪।
[৫৮]. কবিতাটি আট চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৮০।
[৫৯]. কবিতাটি আট চরণ বিশিষ্ট। দ্র.- তদেব, পৃ. ১৮৫।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

আল কা'কা' বিন আমর আত তামীমী (রা.) ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

ড. মো. মনিরুজ্জামান*

Abstract : Poetry is the Diwan of the Arabs, known for their culture, literature and history. If the poet depicts the events of himself in his poetry, it is truer and stronger. Al-Qaqaa ibn Amr al-Tamimi, (R.), was a great Sahabi. He contributed greatly to the call to way of Allah and to the jihad for him. Abu Bakr (R.) and Omar (R.) liked both him for his heroism and courage. He showed his military genius in the battle field againist the polytheists of the Romans and the Persians and Arab Christians in Syria and Iraq. He had a poetic power that he showed in the verses he sang in wars. This Sahabi is not well known to people, people do not know about his dedication to jihad and his contributions to the spread of the kingdoms of Islam. They do not know about his poetic power also. We try in the article to present a part of his poetic life in the fields of war.

Key words: Acquaintance Al Qaqaa bin Amr Al Tamimi, his contributions to the victoryof Syria and Iraq, his genius in poetry, some exempls of his poetry.

ভূমিকা

আরবি কবিতা আরবজাতির দর্পন। প্রাচীন আরবগণ কবিতার মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও গৌরবগাথা তুলে ধরত। কবিতা আরবদের ঐতিহাসিক দলিলও বটে। হযরত ইব্ন আব্বাস রা. বলেন, 'কুরআনের কোনো কিছু পড়ার পর বোধগম্য না হলে আরবদের কবিতায় তা সন্ধান কর। কেননা কবিতা আরবদের দপ্তর।' তাঁকে কুরআনের কোনো শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আরবি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। এই যখন আরবি কবিতার বৈশিষ্ট্য, তখন কবিতাটি যখন কোনো সাহাবীর মুখ-নিঃসৃত বাণী হবে তখন তার দালিলিকভিত্তি আরো মজবুত হবে। ইসলামের বিজয়াভিযানের পরিধি ব্যাপক। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে ঘটনার চিত্র তুলে ধরেন। আল কা'কা' ইবন আমর আত তামীমী (রা.) একজন যুদ্ধা কবি। তিনি যেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তার বেশকিছু বর্ণনা কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এরফলে একদিকে যেমন সেসব ঘটনার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখে শোনা গেল, অপরদিকে একজন কবি সাহাবীর কাব্যদক্ষতা ও বুৎপত্তিমূলক যোগ্যতার বিষয়ও ফুটে উঠল। উক্ত নিবন্ধে এ মহান সাহাবীর কাব্য দক্ষতা ও সংগ্রামী জীবন আলোকপাত করার চেষ্টাকরা হয়েছে।

পরিচয়

তাঁর নাম আল কা'কা' ইব্ন আমর ইব্ন মালিক আত তামীমী।[১] তাঁর জন্ম ও বেড়ে উঠা সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। কারো কারো মতে তিনি সাহাবী ছিলেন। নবম হিজরীতে তিনি বনু তামীমের প্রতিনিধি হয়ে রাসুল সা. এর নিকট আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।[২] কেউ কেউ তাকে মুখাদরাম[৩] সাহাবীদের শ্রেণিভুক্ত মনে করেন।[৪] ইব্ন কানি' (২৬৬-৩৫১হি.), ইব্ন আবদুল বার (৩৬৮-৪৬৩হি.), ইব্ন আছীর (৫৫৫-৬৩০ হি.) ও ইব্ন হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) উক্ত অভিমত পোষণ করেন।[৫] এ ব্যাপারে তাঁর ও অন্যান্যদের নিকট থেকে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সকল বর্ণনার কোনো কোনো সূত্র নির্ভরযোগ্য, আবার কোনো কোনোটি দুর্বল। সর্বোপরি দুটি হাদিসে এ মতামতের সমর্থন মেলে। বর্ণনা দুটি হলো-

---

* সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

1 - روي عنه أنه قال : قال لي رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم ما أعددت للجهاد ؟ قلت : طاعة الله ورسوله ، والخيل . قال : تلك الغاية.

2 - روي عنه أنه قال : شهدت وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، فلما صلينا الظهر جاء رجل حتى قام في المسجد ، فأخبر بعضهم أن الأنصار قد أجمعوا أن يولوا سعدا - يعني ابن عبادة - ويتركوا عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، فاستوحش المهاجرون ذلك. رواه ابن السكن.

> ১. হযরত কা'কা' রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, জিহাদের জন্য তোমার প্রস্তুতি কেমন? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) এর আনুগত্য করার অভিপ্রায় গ্রহণ করেছি এবং ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছি। রাসুল সা.বললেন, এটাই লক্ষ্য হওয়া চাই।[৬]
>
> ২. হযরত কা'কা' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সা. এর জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলাম। যোহরের সালাত আদায়ের পর এক লোক এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল যে, আনসার সাহাবীগণ সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা.) কে আমীর নিযুক্ত করে তাঁর উপর রাসুলের সা. খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু মুহাজিরগণ তাঁদের এ সিদ্ধান্ত অপসন্দ করেন। হাদিসটি ইব্ন সাকান সূত্রে বর্ণিত।[৭]

অবশ্য এ দুটি বর্ণনা দুর্বল সনদের কারণে অগ্রহণযোগ্য। দুটি হাদিসের সনদেই সাঈফ ইব্ন উমর আদ্দাবী আত তামীমী নামক জনৈক রাবী রয়েছেন। মুহাদ্দিসগণের মাপকাঠিতে তিনি একজন দুর্বল রাবী।[৮] এ জন্য ইবনু আবদিল বার (রহ.) কা'কা' (রা.) সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ও তাঁর ভাই সাহাবী ছিলেন না। বরং তাঁরা প্রথম স্তরের তাবিঈ ছিলেন।'[৯] তিনি সাহাবী না হলেও প্রথম স্তরের তাবিঈ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। আবুবকর ও উমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে ভালোধারণা রাখতেন। তাঁরা উভয়ই যুদ্ধের ময়দানে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যাশা করেছেন এবং তাঁর বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি একজন দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। আবু বকর (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, لصوت القعقاع بن عمروفي الجيش خير من ألف رجل অর্থাৎ, সৈন্যবাহিনীর মাঝে ক'াক'া ইব্ন আমর (রা.) এর আওয়াজ হাজারো পুরুষের চেয়ে উত্তম।[১০] অপর একটি বর্ণনায় আবু বকর (রা.) বলেন-

لايهزم جيش فيه مثل هذا

> অর্থাৎ, যে বাহিনীতে ক'াক'া (রা.) এর মতো লোক থাকে, সে বাহিনী পরাজিত হতে পারে না।[১১]

আল কা'কা' (রা.) উমর (রা.) এর আমলে সংঘটিত কাদিসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উমর (রা.) যুদ্ধের সেনাপতি সা'দ (রা.) কে চিঠি লিখে জানতে চান যে, কাদিসিয়ার যুদ্ধে কোন যোদ্ধা অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছে? জবাবে তিনি লিখেন আমি ক'াকা'(রা.) এর মতো যোদ্ধা দেখিনি। সে একদিনে ত্রিশবার শত্রুর প্রতি আক্রমণ করেছে। আর প্রত্যেকটি আক্রমণে এক একজন শত্রুসেনাকে হত্যা করেছে।[১২] ইব্ন আসাকির (রহ.) বলেন, তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও কবি ছিলেন। তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে ও দামেশক বিজয়ে অংশ নেন। পারস্য বাহিনীর সাথে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তিনি সেসব যুদ্ধেও অংশ নেন এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।[১৩] তিনি মাদাইন যুদ্ধে পারস্য-সম্রাটের কতিপয় যুদ্ধ-বর্ম গনীমতস্বরূপ পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি বর্ম ছিল হিরাক্লিয়াসের, একটি খাকানের এবং একটি নু'মানের। এছাড়া নু'মানের একটি তরবারি ও পারস্য-সম্রাট কিসরার একটি তরবারিও ছিল। সা'দ (রা.) এগুলো উমর (রা.)এর নিকট প্রেরণ করেন। রাবী সাঈফ আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, ক'াকা'(রা.) বড় হাতিটির শুঁড় কেটে দেন এবং শত্রুদেরকে পরাজিত করেন।[১৪] এছাড়া তিনি খালিদ (রা.) এর নেতৃত্বে রিদ্দার যুদ্ধে বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে অংশ নেন। ইসলামের এ মহান যোদ্ধা ৪০ মতান্তরে ৪১ হিজরিতে ফিলিস্তিনের আল মানযিলাহ শহরে ইন্তেকাল করেন।[১৫]

কাব্যপ্রতিভা:

কা'কা' (রা.) কাব্যযোগ্যতা ছিল অসাধারণ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর কবিতা সম্পর্কে ইতিহাসে কোনো প্রকার তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর কবিতা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হলো, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর বিভিন্ন যুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তিনি যে-সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সে সকল যুদ্ধকে উপজীব্য করে যুদ্ধের ময়দানে স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করেছেন। এদিকটি বিবেচনা করে তাঁর কবিতাকে ঐতিহাসিক দলিলও বলা চলে। কবিতার চরণে চরণে তিঁনি যুদ্ধকে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। একারণে যোদ্ধা কবিদের মাঝে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিগণিত। তাঁর কবিতায় সাহাবীদের বীরত্বগাথা, ঈমানের বর্ণনা ও শাহাদাতের অনন্য বাসনার কথা ব্যক্ত হয়েছে।[১৬] তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে যে-সব কবিতা আবৃত্তি করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় কবিতা নিম্নরূপ-

ইয়ারমুকের যুদ্ধ:[১৭] কা'কা' (রা.) ইরাকের ইয়ারমুকে বিশাল অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থায় তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তাঁর এরূপ একটি কবিতা হলো-

أَلَمْ تَرَنَا على اليرموك فُزنا   كما فُزنا بأيام العراق

فتحنا قبلها بُصرى وكانت   محرّمة الجناب لدَى البُعاق

وعذراءُ المدائن قد فتحنا   ومَرْجَ الصُّفَّرين على العِتَاقِ

فضضنا جمعَهم لمّا استحالوا   على الواقوص بالبتر الرِّقاقِ

قتلنا الروم حتى ما تُساوي   على اليرموك مفْروق الوِراقِ

> তোমরা কি ইয়ারমুকে আমাদের বিজয় দেখনি, যে রূপ আমরা ইরাকে বিজয়ী হয়েছি? ইতঃপূর্বে আমরা বসরা নগরী বিজয় করেছি, যার নিকটে যাওয়াও অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য দুঃসাধ্য ছিল। আমরা চমৎকার উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে মাদাইনের আযরা ও মারজাস সুফরাইন অঞ্চল বিজয় করেছি। আমরা তাদের বাহিনীকে মিহিন তরবারি দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি যখন তারা ওয়াকুস অঞ্চলে অবস্থান করছিল। আমরা রোমানবাহিনীকে এমনভাবে হত্যা করেছি যে, তারা ইয়ারমুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাগজের টুকরোর অনুরূপ হয়ে গেছে।[১৮]

উক্ত কবিতায় কবি উপমা প্রয়োগ করেছেন। যেমন তিনি ইয়ারমুকের বিজয়কে ইরাক বিজয়ের সাথে এবং শত্রুর লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকাকে বিক্ষিপ্ত কাগজের সাথে তুলনা করেছেন।

মুসায়্যাখের যুদ্ধ: খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, মুসলিম-বাহিনী হাসীদের যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছে। তখন তিনি আইনুততামার নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি হুযাইল বিন ইমরান তাগলীবীর নেতৃত্বাধীন আরব খ্রিস্টান-বাহিনীর মোকাবেলা করার মনস্থ করেন। তাঁর সঙ্গে চারজন কমান্ডারও ঐকমত্য পোষণ করেন। এ চারজনের একজন হলেন কা'কা' (রা.)। শত্রু-স্থানে পৌঁছে তাঁরা ত্রিমুখী আক্রমণ করেন এবং অনেক শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেন। হুযাইল অল্পকিছু সৈন্য নিয়ে পালায়ন করতে সক্ষম হয়। কা'কা' (রা.) মুসলমানদের এ মহান বিজয়ে গর্ববোধ করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃতি করেন।

سائل بنا يوم المصيّخ تغلبا   وهل عالم شيئا وآخر جاهل

طرقناهم فيه طروقا فأصبحوا   أحاديث في أفناء تلك القبائل

وفيهم إياد والنمور وكلهم   أصاخ لما قد عزّهم للزلازل

কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ব্যাক্তি কি মুসায়্যাখের যুদ্ধে আমাদের ভুমিকা সম্পর্কে তাগলিব গোত্রকে জিজ্ঞেস করবে?

আমরা সেখানে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। ফলে তারা তাগলীব গোত্রের আঙিনায় গল্পের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

তাদের শক্তিসামর্থ্য ও বাঘের মতো সৈন্য ছিল। তথাপি প্রকম্পন সৃষ্টি হওয়ার পর তাদের প্রত্যেকে কষ্ট অনুভব করে চিৎকার করে ওঠে।[১৯]

কবি শত্রুকে ঘায়েল করে এক ইতিহাস রচনা করেছেন। শত্রুরা তাঁর আক্রমণের কথা ভুলতে পারে না। তাই অমাবস্যা বা চন্দ্রিমা রাতে তারা যখন একত্র হতো তখন সেদিনের আঘাতের কথা আলোচনা করতো। এ কবিতায় কবি খূব সূক্ষ্মভাবে শত্রুর করুণ অবস্থা তুলে ধরেছেন।

ফিরাদ যুদ্ধ:[২০] ফিরাদ নামক জায়গাটি রোম ও পারস্য সীমান্তে অবস্থিত। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মুসলিম-বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর সম্মুখ সারিতে রয়েছেন কা'কা (রা.)। এখানে পারস্য রোম ও আরব খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে মুসলিমগণ সমবেত হয়েছেন। এ যুদ্ধে মুসলিম-বাহিনী বিজয় অর্জন করে। কা'ক'া (রা.) এ যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে বলেন-

لَقينا بالفِراض جموعَ رُوم   وفُرس غَمّها طولُ السَلام

أبَدْنا جَمعَهُم لَما التَقينا   وبَيّتْنا بجمع بني رزام

فما فتئت جنودُ السلم حتى   رأينا القوم كالغنم السَّوام

দীর্ঘ সুখশান্তিতে আচ্ছন্ন রোমান ও পারস্য বাহিনীর সাথে আমরা ফিরাদে যুদ্ধে জড়িয়েছি। তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আমরা বনী রিযাম গোত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি।আমরা সুখশান্তিতে নিমজ্জিত সৈন্যদেরকে বিচরণকারী মেষের পালের মতো ছুটে যেতে দেখেছি।[২১]

ছাগলের বা মেষের পালকে যেদিকে রাখাল নির্দেশ করে সেদিকে তারা ছুটে চলে। যুদ্ধের ময়দানে তীব্র আক্রমণের শিকার হয়ে শত্রুরাও সেসব ছাগল ও মেষের পালের মত জীবন বাঁচাতে ছুটে চলেছে। উল্লিখিত কবিতায় কবি নিজেদের বীরত্ব আর শত্রুর কাপুরুষত্বকে সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ:[২২] কাদিসিয়ার যুদ্ধে কা'কা'র (রা.) অনবদ্য ভূমিকা ছিল। পারস্য-বাহিনীকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য যুদ্ধ-কৌশল প্রয়োগ করেন। কাদিসিয়ার যুদ্ধ তিনদিন স্থায়ী হয়। তিনি দ্বিতীয় দিন সিরিয়া থেকে এসে মুসলিম-বাহিনীর সাথে যোগ দেন। সেদিন আগওয়াসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এদিন তিনি মুসলিম বাহিনীকে দশ দশজনের দলে বিভক্ত করে দেন। তাঁর এ কৌশলের ফলে পারস্য-বাহিনীর পরাজয় তরান্বিত হয়। উমর (রা.) ইরাকে যুদ্ধরত-বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সিরিয়ায় অবস্থানরত বাহিনীকে আদেশ দেন। হাশিম বিন উতবা (রা.) এর নেতৃত্বে ছয়হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী রওয়ানা হয়। এ বাহিনীর সম্মুখ সারীতে কা'কা' (রা.) অবস্থান করেন। আগওয়াসে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করতে কা'কা' (রা.) একহাজার সৈন্য নিয়ে আলাদা হয়ে আগওয়াসের দিকে অগ্রসর হন। মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর বাহিনীকে দশ দশজন করে বিভক্ত করেন। তিনি প্রত্যেক দলকে পূর্বে রওয়ানাকারী দল মুসলিম-বাহিনীর নিকট পৌঁছার পর রওয়ানা করতে আদেশ করেন। তিনি প্রথম দশজনের দলটিকে নেতৃত্ব দিয়ে ভোর বেলায় আগওয়াসে অবস্থানরত মুসলিম-বাহিনীর সাথে মিলিত হন। পরবর্তীতে অন্যান্য দল তাদের সাথে যোগ দেয়। মুসলিম বাহিনী ইতঃপূর্বে ইরাকের আরমাছে মারাত্মক কষ্ট স্বীকার করে। তাঁরাএরূপ সাহায্যকারী দল দেখতে পেয়ে মানসিকভাবে শক্তি সঞ্চয় করে। কা'কা'(রা.) সেখানে পৌঁছে ঘোষণা করেন-

يا أيها الناس أني قد جئتكم في قوم، والله لو كانوا مكانكم، ثم أحسوكم حسدوكم حظوتها، وحاولوا أن يطيروا بهادونكم، فلصنعوا كما أصنع.

> হে মুসলিম বাহিনী! আমি এমন একদল সৈন্য নিয়ে এসেছি, আল্লাহর শপথ! যদি তাঁরা তোমাদের জায়গায় অবস্থান করে তোমাদের শত্রুদের ভাগ্যবরণ তোমাদেরকে অনুভব করিয়ে তোমাদের ছাড়াই তাদেরকে উড়ে দেয়ার চেষ্টা করে তাহলে ঈর্ষান্বিত হবে। সুতরাং যুদ্ধের ময়দানে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর।[২৩]

অতপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং বিজয় নিশ্চিত করেন। এদিন তিনি ত্রিশবার শত্রুর উপর আক্রমণ করেন এবং প্রতিটি আক্রমণে কোনোনা কোন শত্রুকে পরাস্ত করে হত্যা করেন। যুদ্ধের মাঝে মাঝে তিনি এ স্তুতি আবৃত্তি করতেন-

أُزعِجُهُم عَمداً بِها إِزعاجاً أَطعَنُ طَعناً صائِباً ثَجّاجاً

> আমার এ আক্রমণের দ্বারা শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলি। আমি সঠিক লক্ষ্যে প্রবল আক্রমণ চালিয়ে যাই।[২৪]

এ দিন তিনি বাযার জামহার নামক শত্রু পক্ষের এক বড়মাপের কমান্ডারকে হত্যা করেন। এসম্পর্কে তিনি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন-

حبوته جياشة بالنفس

هدارة مثل شعاع الشمس

في يوم أغواث فليل الفرس

أنخس بالقوم أشدالنخس

حتى تفيض معشري ونفسي

> আমি আগওয়াসের দিন ও পারস্যবাহিনীর রজনীতে উত্তেজনার সাথে সূর্যের রশ্মির মতো তার প্রতি শব্দ করেছিবা হামাগুড়ি দিয়ে তাকে তাড়া করেছি। আমি শত্রুবাহিনীকে চরমভাবে তাড়া করেছি। যেন আমি ও আমার সম্প্রদায় ফিরে যেতে পারি।[২৫]

আগওয়াসে কবি নৈপূন্যপূর্ণ যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করে শত্রুকে পরাস্ত করেছিলেন। তিনি যখন আওয়াজ তুলতেন তখন শত্রুর অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠত। সূর্যের কিরণের মতো তাঁর আওয়াজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেত। তাঁর দরাজ ও ভরাট আওয়াজ ক্ষেত্রবিশেষে অস্ত্রের চেয়ে ফলপ্রসূ ছিল।

আগওয়াসের যুদ্ধে মুসলিম-বাহিনী তাঁদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার ফলে তাঁদের বিজয়ের পাল্লা ভারী হয়ে আসে। রাতভর যুদ্ধ চলতে থাকে। সে রাতকে যুদ্ধের তীব্রতার কারণে কালো রাত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অতঃপর দুপক্ষ স্ব স্ব ঘাটিতে ফিরে যায়। কা'কা' (রা.) নিজ তাঁবুতে ফিরে গিয়ে এদিনের বর্ণনায় নিম্নের কবিতাটি আবৃতি করেন-

لم تعرف الخيل العراب سواءنا عشية أغواث بجنب القوادس

عشية رحنا بالرماح كأنها على القوم ألوان الطيور الرسارس

> কাওয়াদিসের পার্শ্বস্থ আগওয়াসের রাত্রিতে তুমি আমাদেরকে ব্যাতীত আর কোনো আরব বাহিনীর অবস্থান জানতে পারবে না। সেদিন রাতের আঁধারে আমরা বর্শা নিয়ে ছুটেছি। শত্রু শিবিরের উপর দিয়ে তিরগুলো নানা রঙের পাখির মতো উড়ে বেড়িয়েছে।[২৬]

কবি কাদিসিয়ার যুদ্ধে রোম ও পারস্য-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ছেড়েছেন। সেখানে বর্শার বন্যা বয়ে গেছে। কবি তাঁর এ রনকৌশলকে মাথার উপর উড়ন্ত রঙবেরঙের পাখির সাথে তুলনা করেছেন।

আমাসের যুদ্ধঃ কাদিসিয়ার তৃতীয় দিনের যুদ্ধকে আমাসের যুদ্ধ বলে। হাশিম বিন উতবা (রা.) তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধস্থলে যথাসময়ে পৌঁছতে না পারার আশঙ্কা রয়েছে।তাই এ দিন কা‘কা‘ (রা.) তার বাহিনীকে পূর্বের দিন যেস্থান হতে দশ দশ জন করে ভাগ করে দিয়েছিলেন সেস্থানে পাঠিয়ে দেন। তাঁদেরকে ভোর বেলায় একশ একশ জন করে বিভক্ত হয়ে আমাসে উপস্থিত হতে আদেশ করেন। সৈন্যদল পরামর্শ মোতাবেক দলের পর দল হাজির হতে থাকে। কা‘কা‘ (রা.) এক একটি দলকে দেখামাত্র তাকবীর ধ্বনি তোলেন। সাথে অন্য মুজাহিদগণও তাকবীর দ্বারা আমাস ময়দানকে প্রকম্পিত করে তুলতে থাকেন। সাধারণ সৈন্যগণ ভাবতে থাকে যে, হাশিম বিন ওতবার রা. বাহিনী তাঁদের সাহায্যে এসে হাজির হয়েছে এবং তারা যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। কা‘কা‘ (রা.) এর কৌশলটি মুসলিম-বাহিনীকে নবোদ্যমে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রতি উজ্জীবিত করে তোলে। এদিকে সর্বশেষ শতসৈন্যের দলটি যাত্রা করতে না-করতেই হাশিম বিন উতবার (রা.) বাহিনী তদস্থলে হাজির হয়। হাশিম বিন উতবা (রা.) কা‘কা‘ (রা.) এর কৌশল অবগত হন এবং তাঁর এ কৌশলকে খুব পসন্দ করেন। তিনি তাঁর বাহিনীকেও সত্তর জন সত্তরজন করে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। প্রথম সত্তরজনের অগ্রগামী দলের নেতৃত্বে তিনিই ছিলেন। পূর্বের দিন রোমানরা হস্তীবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করে। মুসলিম-বাহিনী হস্তীর উপর স্থাপিত সিন্দুকরূপী বক্স ভেঙে দিলে তারা তাদের হস্তী বাহিনীকে অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যে রক্ষা করে। আজও তারা হস্তী বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ শুরু করে। এদিকে পারস্য-বাহিনীর সাহায্যে ইয়াযদিগার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। শত্রুর আক্রমণে মুসলিম-বাহিনী পরাজিত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। সেনাপতি সা‘দ (রা.) লক্ষ করলেন যে, হস্তীবাহিনী যুদ্ধে মূল ভূমিকা পালন করছে। তিনি পারস্যের নবমুসলিমদের ডেকে হাতিকে কাবু করার ব্যাপারে পরামর্শ চান। তাঁরা তাকে অবহিত করেন যে, এ হাতির চোখ ও শুঁড় বিনষ্ট করা হলে তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। সা‘দ (রা.) ডানে-বামে তাকিয়ে খুঁজছিলেন কাকে দিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণকাজ সাধন করা যায়। তিনি এ জন্য কা‘কা‘ ও তার ভাই আসিম বিন আমর আত তামীমী (রা.) কে উপযুক্ত মনে করেন। তাদের দুজনকে সাদা হাতির দায়িত্ব দেন। দুভাই কাছে গিয়ে একসাথে বর্শা ছুড়লে হাতির চোখে তা বিদ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পর হাতিটি অস্থির হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠামাত্র আল কা‘কা‘ (রা.) তরবারি কোষমুক্ত করে এটির শুঁড়ে আঘাত করেন। শুঁড় কেটে যাওয়ার পর হাতিটি মাটিতে লুটে পড়ে যায় এবং হাতির উপরে অবস্থিত সিন্দুকে অবস্থানরত যোদ্ধাও লুটে পড়ে। মুসলিম যোদ্ধাগণ তাকে ঘিরে ধরে হত্যা করেন। হস্তীদলের পরাজয়ের পর দুদলের মাঝে সন্ধ্যা যাবৎ তীব্র যুদ্ধ চলতে থাকে। পরিশেষে পারস্য-বাহিনীকে পরাজিত করে মুসলিম-বাহিনী বিজয় লাভ করে। এ যুদ্ধে আল কা‘কা‘ (রা.) ও তার সম্প্রদায় যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা তিনি নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেন। এ সংক্রান্ত তাঁর কবিতাটি হলো-

حضض قومي مضرحي بْن يعمر   فلله قومي حين هزوا العواليا

وما خام عنها يوم سارت جموعنا لأهل قديسيمنعون المواليا

فإن كنت قاتلت العدو فللته   فإني لألقى في الحروب الدواهيا

فيولا أراها كالبيوت مغيرة أسمل أعيانا لها ومآقيا

> মাদরাহী ইব্ন ইয়া'মার আমার সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহর শপথ! আমার সম্প্রদায় যখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। খ্রিস্টানগণ আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম গোত্রকে বাঁধা দেয়ায় তাদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যেদিন আমরা যাত্রা করেছিলাম সেদিনের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর ছিল না। আমি যদি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতাম তাকে ধ্বংশ করে দিতাম! কেননা আমি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি, গৃহ সদৃশ হস্তীকে আক্রমণ করতে দেখতে পেয়েছি। আমি এটির চোখ ও চোখের মনি উপড়ে ফেলি।[২৭]

পারস্য সৈন্যরা হাতির উপর লোহার সিন্দুক বানিয়ে তাতে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধ করতো। এ বাহিনীর মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনী প্রায় ধরাশায়ী হয়ে যায়। কা'কা' (রা.) এরূপ সাদা হাতির নাক ও শুঁড় কেটে দিয়ে তাদের পরাস্ত করে যুদ্ধের গতি পাল্টেদেন। কবিতায় বৃহদাকারের হাতিকে গৃহের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কাদিসিয়ায় আমাস যুদ্ধের দিবাগত রাতে দুপক্ষের মাঝে তীর ছোড়াছুড়ি হয়। প্রতিপক্ষের একটি তীর খালিদ বিন ইয়া'মারের শরীরে বিদ্ধ হলে কা'কা' (রা.) ক্ষেপে যান এবং সেনাপতির অনুমতি না নিয়েই রোমানদের উপর আক্রমণ করে বসেন। অবশ্য পরবর্তীতে সা'দ (রা.) বাস্তবতা উপলব্ধি করে তাকে অনুমতি প্রদান করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন সে রাত্রির যুদ্ধের জন্য মুসলিম বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়ের পথ সুগম হয়। এ রাত্রিকে হারির রজনী বলা হয় । এ রাত্রির যুদ্ধ প্রসঙ্গে কা'কা' (রা.) নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃতি করেন-

سَقَى اللهُ يَا خَوْصَاءُ قَبْرَ ابْنِ يَعْمُرٍ   إِذَا ارْتَحَلَ السُّفَارُ لَمْ يَتَرَحَّلِ

سَقَى اللهُ أَرْضًا حَلَّهَا قَبْرُ خَالِدٍ   ذَهَابَ غَوَادٍ مُدْجِنَاتٍ تُجَلْجِلِ

فَأَقْسَمْتُ لا يَنْفَكُّ سَيْفِي يَحُسُّهُمْ   فَإِنْ زَحَلَ الأَقْوَامُ لَمْ أَتَزَحَّلِ

> হে খাউসা! আল্লাহ ইব্ন ইয়া'মারের কবরকে সিক্ত করুন। সফর সঙ্গীরা যাত্রা করে চলে গেলেও সে যাত্রা করেনি। আল্লাহ সে ভূমিকে সিক্ত করুন যেখানে খালিদের কবর রয়েছে। বিকেল বেলায় ঘন্টা বাজিয়ে আপন নিবাসে প্রত্যাবর্তনকারী পোষা প্রাণীদের মতো তারা ফিরে যাচ্ছে। আমার তরবারি তাদেরকে টের না পাইয়ে ছাড়বে না। আমি শপথ করেছি যে, সকলে চলে গেলেও আমি চলে যাব না।[২৮]

মাদরাহী বিন ইয়া'মার একজন প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলিম-বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। কবিতায় কবি এ মহান পুরুষের গুণকীর্তন করেন।

মুসলিম বাহিনীর ইতিহাসে রাত্রিকালীন এমন যুদ্ধ কখনো সংঘটিত হয়নি। সেনাপতিসা'দ (রা.) যুদ্ধের পরিণতি জানতে খুবই অস্থির হয়ে যান। এমন একটি মুহূর্তে তিনি কা'কা' (রা.) কে নিম্নের স্তুতিটি গাইতে শুনতে পান-[২৯]

نحن قتلنا معشرا وزائدا   اربعة وخمسة وواحدا

يحسب فوق اللبد الأساودا   حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا

> আমরা একটি দলকে হত্যা করেছি। আরো অনেককে, চার পাঁচ ও এক হতে পারে। কালো পশম দেখে দেখে তাদের গণনা করা যায়। অনন্ত যখন তাদের মৃত্যু হয় তখন তাদের দেহ সরাতে আমি একজন শ্রমিককে ডাকি।

কাদিসিয়ায় মুসলমানদের বিজয়ের পর কা'কা' রা. মুসলিম বাহিনীর বিশ্রামের জন্য এবং উমর (রা.)এর পরামর্শের অপেক্ষায় সেখানে দুমাস অবস্থান করেন। উমর রা. নির্দেশ করেন পারস্যের রাজধানী মাদাইন অভিযানে বের হতে। আল কা'কা' রা. মুসলিম বাহিনীর সাথে মাদাইন বিজয় করে বাহার সায়ের অভিযানে

বের হন। এটি পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি শহর। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছে দেখেন শহরে কেউ নেই। তারা শহর ছেড়ে দজলা পেরিয়ে পূর্ব মাদাইন শহরে আশ্রয় নিয়েছে। আল কা'কা' এযুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে নিম্নের স্তুতি আবৃতি করেন।

فتحنا بهرسير بقول حق   أتانا ليس من سجع القوافي

وقد طارت قلوب القوم منا   وملوا الضرب بالبيض الخفاف

আমাদের কাছে ছন্দ নয় এমন সত্য বার্তা আসাতে আমরা বাহার সাইর জয় করি। আমার সম্প্রদায়ের প্রাণ প্রায় উষ্ঠাগত। তারা হালকা তরবারি দ্বারা আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।[৩০]

কবি আল কা'কা' রা. এর বিশ্বাস কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি কোনো ছন্দ্য নয়। একুরআনের নির্দেশে মুসলমানগণ দিকবিদিগ জয় করেন। হালকা সাদা তরবারী আক্রমণের জন্য খুবই কার্যকরী। তাই মুসলমানগণ এ তরবারি দ্বারা শক্রর উপর আক্রমণ করতেন।

জালুলা যুদ্ধ:[৩১] **১৬** হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পারস্যবাহিনী মাদাইনে পরাস্ত হওয়ার পর জালুলাতে পলায়ন করে। সেখানে তারা মিহরান রাজী নামক যোদ্ধাকে তাদের সেনাপতি মনোনীত করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। সা'দ রা. খবর পেয়ে উমর (রা.) এরনিকটপরামর্শ চেয়ে পত্র লিখেন। উমর রা. জবাবে বলেন, বারোহাজার সৈন্যসহ হাশিম বিন উতবা (রা.) কে জালুলায় প্রেরণ কর। এদলের সম্মুখে আল কা'কা'কে,ডানে সি'র বিন মালিককে, বায়ে আমর বিন মালিক বিন উতবাকে, এবং হাশিমের পেছনে আমর বিন মুররাকে রাখ। আল্লাহ পারস্যবাহিনীকে পরাজিত করলে আল কা'কা'কে পাহাড় ও সমতল ভূমির মাঝে নিয়োজিত রাখবে। আদেশমতো মুসলিম বাহিনী ষোল হিজরির সফর মাসে যুদ্ধে অংশ নেয়। এযুদ্ধে একলক্ষ কাফির নিহত হয়। আল কা'কা' (রা.) তাদের সেনাপতি মিহরান রাজীকে ধাওয়া দিয়ে হত্যা করেন। এযুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়কে আল কা'কা'রা.নিম্নের কবিতায় চিত্রিত করেন-

ونحن قتلنا في جلولا أثابرا   ومهران، إذ عزّت عليه المذاهب

ويوم جلولاء الوقيعة أفنيت   بنو فارس، لمّا حوتها الكتائب

আমরা জালুলার যুদ্ধে আসাবির ও মিহরানের সাথে যুদ্ধ করেছি। তাদের সকল পথ কঠিন হয়ে ওঠেছিল। জালুলার দিন পারস্যবাসী বিভিন্ন সেনাদল কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।[৩২]

অনুরূপ তিনি যেখানে শক্রর মুখোমুখি হতেন শক্রদের উদ্দেশ্য করে কবিতা বলতেন। তাঁর এরূপ একটি কবিতা হলো-

ولم أر قوما مثل قوم رأيتهم   على ولجات البر احمى وأنجبا

واقتل المرواس في كل مجتمع   إذا ضعضع الدهر الجموع وكبكبا

فنحن حبسنا بالزمازم بعدما   أقاموا لنا في عرصة الدار ترتبا

قتلناهم ما بين قلع مطلق   إلى القيعة الغبراء يوما مطنبا

আমি ঐ সম্প্রদায়ের মতো কোন সম্প্রদায় দেখিনি, আমি যাদেরকে স্থলপথের প্রবেশদ্বারে সুরক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত দেখতে পেয়েছি। প্রত্যেক সমাবেশস্থলে আমি মুররাওয়াসকে হত্যা করবো যখন যুগ শক্রদলকে ধ্বংস করবে এবং উপড়ে ফেলবে।তারা আমাদের উপর আক্রমণ করতে বাড়ির আঙিনায় সারিবদ্ধভাবে অবস্থান করার পর আমরা তাদের পানির উৎস আটকে দিয়েছি।আমরা এক দীর্ঘ দিনে তাদেরকে ধুসর রঙের পাদদেশমুখি কিল্লার মাঝে হত্যা করেছি।[৩৩]

তিনি মিসরের সা'ঈদ অঞ্চল বিজয়কালে অসাধারণ যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এ যুদ্ধে তিনি ও তাঁর মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। নিম্নের কবিতায় তিনি সে ছবি অঙ্কন করেছেন-

أنا الهمام الفارس القعقاع ليث شجاع ضيغم مطاع

وبحسامي تنشوي الاصلاع وتقطع الهامات والأضلاع

من الحياة تقطع الأطماع وتهدم الحصون والقلاع

يفر من أغرى به النزاع   منى إذا احتكت الأدراع

وللأعادي طال منى الباع وسيد مهذب شجاع

আমি সাহসী যোদ্ধা আল কা'কা'। আমি সাহসী ও অনুগত সিংহ। আমার তরবারির আঘাতে টাকু মাথা ঝলসে ওঠে। এটি উঁচু মাথা ও পাঁজরকে টুকরো টুকরো করে দেয়। এটি জীবনের আশা-আকাঙক্ষা মিটিয়ে দেয় ।আর দুর্গ ও আস্তানা ধ্বংস করে দেয়। কেউ আমার প্রতি বিবাদে জড়ালে বর্মের সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর সে পালায়। শত্রুর প্রতি আমার বাহু সম্প্রসারিত হয়। আমি এক সাহসী ও ভদ্র সেনাপতি।[৩৪]

রোমান বাহিনীর সাথে হুবুদ নামক যুদ্ধে বিজয় লাভের পর কবি নিম্নোক্ত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন-

ألم تسمع بمعركة الهبود غداة الروم حافلة الجنود

غداة الروم صرعى في يباب   تنهنها القبائل من ثمود

تجاوب عاصما فرس وروم   وأوباش من الأمم الرفود

نصارى ليس ينهاها رشيد   وأخرى من ضوالعة اليهود

وباقي تغلب وبني أياد   وحى النمر رهط أبي كنود

হুবুদের যুদ্ধের কথা কি তুমি শুননি? সে দিন সকালে রোমানরা সমবেত হয়েছিল। সেদিন সকালে রোমান বাহিনী শূন্যস্থানে নিহত অবস্থায় পড়েছিল। সামুদের কতিপয় গোত্র ধমক খেয়েছিল। রোমান, পারস্য ও তাদের সহায়তাকারী বিভিন্ননিম্নশ্রেণির বাহিনী আসেমের জবাব দিয়েছিল।তারা ছিল খ্রিস্টান, তাদেরকে রশীদ বাধা দেয়নি। আর অন্য এক দল ছিল শক্তিধর ইহুদীদের।অবশিষ্টরা হলো তাগলিব, বনূ আয়াদ ও নামার এলাকার আবূকানূদ গ্রুপের সদস্য।[৩৫]

আল কা'কা'(রা.) এরচরিত্রের উপর সিরিজ: আল কা'াকা'(রা.) এর চরিত্র বিভিন্ন সিনেমা ও টিভি সিরিজে প্রচারিত হয়েছে। ১৯৮১ সালে ইসলামের বিজয় অভিযান সিরিজে মুহিউদ্দীন আবদুল হাসান নামক অভিনেতা তাঁর চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০০৭ সালে মুহাম্মাদ মিফতাহ খালিদ বিন ওয়ালিদ সিরিজে আল কা'কা' (রা.) এর চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০১০ সালে সালুম হাদ্দাদ নামক অভিনেতা আল কা'কা' বিন আমর আত তামীমী সিরিজে আল কা'কা'র চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০১০ সালে সত্যের পতাকা সিরিজে বাসিম ইয়াখুর নামক অভিনেতা তাঁর চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০১২ সালে উমর সিরিজে ইয়াযিন সায়্যিদ তাঁর চরিত্রে অভিনয় করেন।

পরিসমাপ্তি:

নিবন্ধে আল কা'কা'(রা.) এর কতিপয় কবিতা উল্লেখ করা হলো। প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে তাঁর কবিতা ও স্তুতির অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। আল কা'কা' (রা.) কে স্ব-ভাব কবি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

তিনি যুদ্ধের যে-কোনো চিত্র তাৎক্ষণিকভাবে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁর কাব্যে শ্রেষ্ঠমানের কাব্যিক উপাদান যেমন- উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে ভাষার লালিত্য যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে উন্নত সংস্কৃতির পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। তিনি ইসলামের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ও মমতা অনুভব করতেন তা ছন্দে ছন্দে প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেননি। তাঁর কবিতার শব্দভাণ্ডার ও বিষয়বস্তু যুগে যুগে মুসলিম উম্মার প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

[১]. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, সাউদী ও জর্দান: বাইতুল আফকার আদ দুওয়ালিয়্যাহ,খ.৩, পৃ.৩৭৫।

[২]. আহমাদ আদিল কামাল, আত তারীক ইলাল মাদাইন, বৈরূত: দারুন নাফাইস, ১৯৮৬ ইং, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৯২।

[৩]. যারা রাসুল (সা.)এর জীবদ্দশায় ইমান এনেছেন কিন্তু তাঁর সা. সাক্ষাৎ পাননি, তাদেরক মুখাদরাম সাহাবী বলে। শাঈখ উসায়মীন, কিতাবু মুস্তালাহিল হাদীস।

[৪]. শিহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল আশবীহী, আল মুসতাতরাফ ফি কুল্লি ফান্নিল মুসতাযরাফ, মিশর: মাতবা'আহ মিশর, ১৯৩৩ইং, খ.১, পৃ.১৭৯।

[৫]. আবুল হুসাইন আবদুল বাকী ইব্‌নু কানি' আল বাগদাদী, মু'জামুস সাহাবা, মদীনা মুনাওয়ারাহ: আল গুরাবা আলআসরিয়্যাহ, ১ম প্রকাশন ১৪১৮,খ.২, পৃ.৩৬৭।

[৬]. তদেব,খ.২, পৃ.৩৬৭।

[৭]. আবুল ফাদল আহমাদুব্‌নু আলী ইবনি মুহাম্মাদিবনি হাজার আল আসকালানী, আল ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, তাহকীক: আহমাদ আবদুল মাওজুদ ও আলী মুহাম্মাদ মু'আওয়াদ, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি., খ.৫, পৃ.৩৪৩।

[৮]. আবুল ফাদল আহমাদুব্‌নু আলী ইবনি মহাম্মাদিবনি হাজার আল আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ভারত: দাইরাতুল মা'আরিফ আন নিজামিয়াহ, ১ম সংস্করণ,১৩২৬হি., খ.৪, পৃ.২৯৫-৯৬।

[৯]. আবু উমার ইউসুফবিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদিল বার বিন আসিম আন নামরী আল কুরতুবী, আল ইসতি'আব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, তাহকীক: আলী মুহাম্মাদ আল বাজাবী, বৈরূত: দারুল জিল, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২,খ.২, পৃ.৭৮৪।

[১০]. আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম আল জাযরী ইব্‌নুল আছীর, উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবাহ, দারু ইব্‌নি হাযম,খ.৪, পৃ.৩৯০।

[১১]. আবু আলী আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, মিসকুবিয়্যাহ, তাজারুবুল উমাম, তাহকীক: সাইয়িদ কিসরাবী হাসান, মিশর: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি., খ.১, পৃ.৩৩২।

[১২]. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আল ইসাবা, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৩৪৩।

[১৩]. আবুল কাশিম আলী বিন হাসান বিন হিবাতুল্লাহ ইব্‌নু আসাকির, তারীখু দামিস্‌ক, বৈরূত: দারুল ফিকর, খ.৮৯, পৃ.৩৫২।

[১৪]. ইব্‌ন হাজার আসকালানী, আল ইসাবা, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৩৪৪।

[১৫]. আবদুল বাসিত মাদখিলী, আল কা'কা' ইব্‌ন আমর আত তামীমী ওয়া দাওরুহু ফিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া আহদাসি আসরির রাশিদীন, মাস্টার্স থিসিস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব, ১৯৮৯, পৃ.২৬৪; যারকালী, আল আ'লাম, খ.৫, পৃ.২০১।

[১৬]. কাজী নু'মান, শি'রুল ফুতুহাতিল ইসলামিয়্যাহ ফি সাদরিল ইসলাম, কায়রোঃ আদ দারুল কাওমিয়্যাহ, ১৯৬৫ইং, পৃ. ২২৯-২৩০; আবদুল বাসিত মাদখিলী, আল কা'কা' ইব্‌ন আমর আত তামীমী ওয়া দাওরুহু ফিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া আহদাসি আসরির রাশিদীন, মাস্টার্স থিসিস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব, পৃ.৮৭-৮৮।

[১৭]. রাসুল (সা.) এর ওফাতের চার বছর পর ১৫ হিজরীতে রোমানদের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবু উবাইদাহ আল জাররাহের (রা.) অপসারনের পর খালিদ বিন ওয়ালিদ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার। আর রোমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দুলক্ষ চল্লিশ হাজার।

[১৮]. আল হামাবী, মু'জামুল বুলদান, খ.৫, পৃ.৩৫৪; আব্বাস হামুদী আল কায়সী, শি'রুল আকিদাহ ফি 'আসরি সাদরিল ইসলাম, বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ ১৯৮৬, পৃ.৩২১।

[১৯]. তদেব, পৃ.১৪৪।

[২০]. বার হিজরীর পনর যিলকাদ এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রোমান, পারস্য ও আরব নাসারাদের সম্মিলিত বাহিনী যাদের সংখ্যা লক্ষাধিক অংশ গ্রহণ করে। এ যুদ্ধে খালিদ রা. নেতৃত্ব দেন।

[২১]. আবু আবদুল্লাহ ইয়াকুত ইবন আবদুল্লাহ আল রূমী আল হামাবী, মু'জামুল বুলদান, মিশরঃ দারু সাদির, ১৩৯৭ ইং, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.২৪৪।

[২২]. এ যুদ্ধ পনর হিজরীর তেরই শা'বান সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের রা. নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মূলত কাদিসিয়ার যুদ্ধ চারদিন স্থায়ী হয়। প্রথমদিন আর মাসে দ্বিতীয় দিন আগওয়াসে ও তৃতীয় দিন 'আমাসে এবং চতুর্থ দিন কাদিসিয়ায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৃতীয় দিন রাতে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এরাতকে লাইলুল হারির বলে।

[২৩]. আত তাবারী, তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৫৪৩।

[২৪]. ইবনুল আসীর, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৪৭৫; আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৫৪৬।

[২৫]. আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৫৪৭।

[২৬]. তদেব, পৃ.৫৪৭।

[২৭]. আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৫৫৭।

[২৮]. আহমদ আদিল কামাল, আল কাদিসিয়্যাহ, কায়রোঃ দারুন নাফাইস, ২০০০ইং, পৃ.১৭৮।

[২৯]. তদেব, পৃ.১৭২; আত তাবারী, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৫৬২ ।

[৩০]. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবদুল মুনইম আল হিময়ারী, আর রাউদুল মি'তার ফি খাবরিল আকতার, তাহকীকঃ ইহসান আব্বাস, বৈরূতঃ মাকতাবাতু মুআসসাসাতু নাসির, ১৯৮০ ইং, পৃ. ৫২৭।

[৩১]. এ যুদ্ধ ষোল হিজরীর সফর মাসে হাশিম বিন উতবা রা. ও আল কা'কা' রা. এর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বার হাজার।

[৩২]. ইয়াকুত হামাবী, মু'জামুল বুলদান, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৫৬।

[৩৩]. মুজামুল বুলদান, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৩৮৩।

[৩৪]. নূরী হাম্মুদী আল কায়সী, শু'আরাউন ইসলামিয়্যুন, বৈরূতঃ মাকতাবাতু আন নাহদা আল আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪ ইং, পৃ.২১।

[৩৫]. আবুল কাশিম আবদুর রাহমান বিন হুবাইশ, তাহকীকঃ আহমাদ গুনাইম, গাযাওয়াতু ইব্‌ন হুবাইশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩, খ.৪২, পৃ.৪৩

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম *সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402*

মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান আশ্‌-শায়বানী (র) ও তাঁর আল-মুওয়াত্তাঃ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[*]

Abstract : The documenting of Hadith had been started since the second era of Hijri. The scholars who played crucial contribution in documentation of Hadith, Muhammad Ibnul Hasan Ash-Shaybani (R) was one of them. As a matter of fact, Imam Muhammad (R) played a significant role in the field of Fiqh. He acquired knowledge in Fiqh from Imam Abu Hanifa (R) and Imam Abu Yousuf (R). He learned about Hadith from Imam Malik (R). He had known seven hundred Hadith from him. His composed work *'Al Muwatta'* was reflective production of Imam Malik (R). In regard to that, his Iztihadi viewpoint was manifested in his practice of Fiqh. He was motivated to bring together Iraqi and Hifjzul Fiqh through *'Al Muwatta'*. Eleven hundred and eighty narrations had been recorded in *'Al Muwatta'*. No fabricated or Mauju Hadith was found in it. Perceiving its worth, many scholars from the later generation produced an interpretative work on it. In my piece of work, Imam Muhammad Ash-Shaybani (R) has been introduced briefly and also a discussion of his production *'Al Muwatta'* has been presented.

ভূমিকা

ইমাম মুহাম্মাদ (র) ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন ফিক্‌হ ও হাদীছ শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল। তাঁর অবদান ছিল বহুমুখী। ফিক্‌হ চর্চায় তাঁর প্রতিভা ছিল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। তিনি তৎকালিন যুগের প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাজলিসে মাত্র চার বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এছাড়া সুফইয়ান আছ্‌-ছাওরী, আমর ইব্‌ন দীনার, ইমাম আবূ ইউসুফ (র), আবূ 'আমর আল-আওযা'ঈ (র) ও ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর ন্যায় প্রসিদ্ধ ফকীহ্‌ ও মুহাদ্দিছগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের সমুদয় সম্পদ ব্যয় করেন। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত সফলতা লাভ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। বিশেষত তিনি হানাফী ফিক্‌হ প্রচার ও প্রসারে অসামান্য অবদান রেখে যান। লিখনীর মাধ্যমে তিনি হানাফী মাযহাবের গবেষণা গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হাদীছ বিষয়ক *'আল-মুওয়াত্তা'* গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি মূলত তিনি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেন। এ গ্রন্থে ১১৮০টি হাদীছ বর্ণিত আছে। গ্রন্থটির হাদীছগুলো বিশুদ্ধ। গ্রন্থটি সংকলনে তিনি একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। প্রতিটি হাদীছ বর্ণনার পর তিনি নিজের একটি অভিমত ও তাঁর মতের স্বপক্ষে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত উল্লেখ করেন। গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর রচিত 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থটি আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন ফারকাদ আশ্‌-শায়বানী,[১] আল-কূফী আল-হানাফী। উপনাম আবূ 'আব্দুল্লাহ্‌।[২] কেউ কেউ তাঁর দাদার নাম 'ফারকাদ'-এর পরিবর্তে 'ওয়াকিদ' উল্লেখ করেছেন। তবে এটি সঠিক নয়। খতীব আল-বাগদাদী (র) এ সম্পর্কে বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَرْقَدْ، أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيْ مَوْلَاهُمْ. صَاحِبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَإِمَامُ أَهْلِ الرَّأْيِ.[৩]

---

[*] প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

-'মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইব্‌ন ফারকাদ, আবূ 'আব্দিল্লাহ্ আশ্-শায়বানী তাদের মাওলা।[৪] আবূ হানীফাহ্ (র)-এর শিষ্য আহলুর রায় বা কিয়াস পন্থীদের ইমাম।'

জন্ম ও জন্মস্থান

মুহাম্মাদ (র) ১৩২ হিজরী মোতাবেক ৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়াসীতে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] ইব্‌ন খাল্লিকান (র)-এর মতে مَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاثِيْنَ -'তিনি ১৩৫ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন।'[৬] কারও কারও মতে إِحْدى وَثَلاثِيْنَ -'তিনি ১৩১ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন।'[৭] কার্ল ব্রুকেলম্যান বলেন,

مُحَمَّدَ بْنُ الْحَسَنْ الشَّيْبَانِيَ. وَلِدَ بَيْنَ سنّي ١٣١–١٣٥هـ/٧٤٨–٧٣٥ م فِيْ مَدِيْنَةِ وَاسِطِ.[৮]

-'মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান আশ্-শায়বানী ১৩১-১৩৫ হিজরী মোতাবেক ৭৪৮-৭৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওয়াসীত শহরে জন্মগ্রহণ করেন।'

উপর্যুক্ত মতের মধ্যে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রতিয়মান হয়।

পূর্বপুরুষ

তাঁর পূর্বপুরুষের বাসস্থান সম্পর্কে কিছু মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে 'তাঁর পূর্বপুরুষ ফিলিস্তিনের কোনো এক গ্রামে বাস করতেন।' অপর মতে তার পূর্ব পুরুষগণ দিমাশকের এক পল্লী থেকে আগমন করেন। প্রকৃত মত হলো, তাঁর পিতা মুহাম্মাদ 'ইরাকে আগমন করার পর ওয়াসীতে ১৩২ হিজরীতে মুহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেন। খতীব আল-বাগদাদী (র) উল্লেখ করেন, 'তাঁর মূল বংশ দিমাশ্‌কের হারাস্তা নামক গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতা 'ইরাকে আগমন করার পর ওয়াসীতে মুহাম্মাদ (র)-এর জন্ম হয়।'[৯]

ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন,

كَانَ أَصْلُ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجَزِيْرَةِ، وَكَانَ أَبُوْهُ مِنْ جُنْدِ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَدِمَ وَاسِطًا، فَوَلَدَ بِهَا مُحَمَّدٌ.

-'তাঁরা মূলত জাযীরার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা শামের সেনাবাহিনীর সাথে 'ওয়াসীতে' পৌঁছান। সেখানেই মুহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেন।'

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) ইব্‌ন সা'দ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

أَصلُهُ جَزَرِيٌّ، سَكَنَ أَبُوْهُ الشَّامَ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مُحَمَّدٌ سَنَة اثْنَتَيْنِ وَثَلاثِيْنَ وَمائَةٍ.[১০]

-'তাঁর মূলবংশ জাযারী হতে উদ্ভূত। তাঁর পিতা সিরিয়ায় বসবাস করেন এবং সেখানে তার ছেলে মুহাম্মাদের জন্ম হয়।'

কেউ কেউ এ সব উক্তির মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য করেছেন যে, 'তাঁরা মূলত জাযীরার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা যেহেতু শামের সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাই কখনো হারাস্তার এবং কখনো ফিলিস্তীনের কোনো এক গ্রামে বসবাস করেন। এতদুভয় গ্রাম শামের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।'

তাঁর পিতা সিরিয়া থেকে 'ইরাকে আগমন করেন। ওয়াসীতে বসবাস করেন অতঃপর উল্লিখিত মুহাম্মাদ সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।[১১]

শিক্ষাজীবন

মুহাম্মাদ (র) কূফায় লালিত-পালিত হন।[১২] সেখানে হাদীছ শিক্ষার্জন করেন।[১৩] তিনি একদল বিশিষ্ট 'আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র) (মৃত ১৫০ হি.)-এর নিকট গমন করে

দুবছর সেখানে শিক্ষার্জন করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল সতের বছর। ইমাম মুহাম্মাদ (র) নিজেই এ সম্পর্কে বলেন,.عَادَنِيْ الإِمَامُ وَأَنَا اِبْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.[১৪] -'আমি সতের বছর বয়সে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দরবারে হাযির হলাম।' আবূ হানীফা (র)-এর দারসে তিনি চতুর্থ সফে বসতেন।[১৫] কিন্তু তিনি ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র)-এর সান্নিধ্য বেশি পাননি।[১৬] কারণ তাঁর যুবক অবস্থাতেই ইমাম আবূ হানীফা (র) শাহাদাত বরণ করেন। এ কারণে দীর্ঘদিন তাঁর নিকট শিক্ষার সুযোগ পাননি। এ সময় মুহাম্মাদ এর বয়স ছিল আঠার বছর। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র)-এর ইন্তিকালের পর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর নিকট পূর্ণাঙ্গভাবে ফিক্হে হানাফী আহরণ করেছিলেন।[১৭] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,

كَتَبَ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ثُمَّ لاَزَمَ أَبَا يُوْسُفَ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى بَرَعَ فِيْ الْفِقْهِ.[১৮]

-'তিনি আবূ হানীফা (র) থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করেছেন। অতঃপর আবূ ইউসুফের সাহচর্য লাভ করেন। যার কারণে তিনি ফিক্হশাস্ত্রে অন্যতম স্থান লাভ করেছেন।'

ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, হাদীছ, ফিক্হ ও তাফসীর বিষয়ের উপর অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞানার্জন সম্পর্কে বলেন,

مَاتَ أَبِيْ وَتَرَكَ ثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَأَنْفَقْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا عَلَى النَّحْوِ وَالشِّعْرِ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا عَلَى الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ[১৯]

-'আমার পিতা ইন্তিকালের সময় আমার জন্য ত্রিশ হাজার দিরহাম রেখে যান। আমি এর অর্ধেক পনের হাজার দিরহাম 'আরবী ব্যাকরণ ও কবিতা শিক্ষায় এবং অবশিষ্ট পনের হাজার দিরহাম হাদীছ ও ফিক্হের জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করি।'

ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র) (মৃত ১৫০ হি.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) (মৃত ১৮২ হি.), মালিক ইব্ন আনাস (র) (মৃত ১৭৯ হি.), ইব্ন জুরায়জ আল-মাক্কী (র) (মৃত ১৫০ হি.), মিস'আর ইব্ন কিদাম (র) (মৃত ১৫৩ হি.), 'আমর ইব্ন যুর আল-হামাদানী (র) (মৃত ১৫৩ হি.), মুহিল ইব্ন মুহরিয আয্-যাবী আল-কূফী (র) (মৃত ১৫৩ হি.), আবূ 'আমর আল-আওযা'ঈ (র) (মৃত ১৫৭ হি.), যুফার ইবনুল হুযায়ল (র) (মৃত ১৫৮ হি.), মালিক ইব্ন মিগওয়াল (র) (মৃত ১৫৯ হি.), ইউনুস ইব্ন আবী ইসহাক (র) (মৃত ১৫৯ হি.), সুফইয়ান আছ্-ছাওরী (র) (মৃত ১৬১ হি.), দাউদ আত্-তা'ঈ (র) (মৃত ১৬২ হি.), আল-কাসিম ইব্ন মু'আন (র) (মৃত ১৭৫ হি.), বিক্র ইব্ন মা'আয ইব্ন মালিক আল-কূফী (র), মালিক ইব্ন মাস'উদ (র), জাম'আহ্ ইব্ন সালিহ্ (র) থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন ও লেখেন।[২০]

এছাড়া হাসান ইব্ন 'উমারা (র), ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ (র), যাহ্হাক ইব্ন 'উছমান (র), তালহা ইব্ন 'আমর (র), মক্কায় সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্ (র), বসরায় সা'ঈদ ইব্ন আবী আরুবা (র), খুরাসানে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারক (র) থেকেও হাদীছ শিক্ষাগ্রহণ করেন।

মাহ্দীর খিলাফতকালে যখন ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র)-এর 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থের সুনাম ও খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন ইমাম মুহাম্মাদ (র) মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করেন। সেখানে ইমাম মালিক (র)-এর খিদমতে একাধারে তিন বছর অবস্থান করে ফিক্হ, ইতিহাস, তাঁর চিন্তাধারা ও অভিমত আহরণ করেন। সাথে সাথে তার থেকে সাতশত হাদীছ শ্রবণ করেন।[২১] ইমাম শাফি'ঈ (র) এ সম্পর্কে বলেন,

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ: أَقَمْتُ عِنْد مَالِكٍ ثَلاَثَ سِنِيْنَ وَكَسْراً، وَسَمِعْتُ مِنْ لَفْظِه سَبْعَ مائَةِ حَدِيْثٍ.[২২]

-'মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন, আমি মালিক (র)-এর নিকট তিন বছরের অধিককাল অবস্থান করেছি এবং তার মুখ থেকে সাতশত হাদীছ শুনেছি।'

তিনি শিক্ষা অর্জনের জন্য কূফা, মক্কা, বসরা, ওয়াসীত, সিরিয়া, খুরাসান, ইয়ামামা প্রভৃতিস্থানে গমন করে বহুসংখ্যক ফকীহ্ ও মুহাদ্দিছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম মালিক (র)-এর দারসের মাজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি কোনো জুনবী ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও পানি না পায়, তাহলে সে কী উপায়ে মাসজিদে প্রবেশ করবে?" ইমাম মালিক (র) জবাবে বললেন, "ঐ ব্যক্তি গোসল করার পর মাসজিদে প্রবশে করবে।" ইমাম মুহাম্মাদ (র) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং শেষ হওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে সে কী করবে?" ইমাম মালিক (র) আবারো জবাব দিলেন। তাঁর জবাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁকে এ মাস'আলার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র) জিজ্ঞাসা করে বললেন, "তোমার মতামত কী?" তিনি বলেন, "জুনুবী ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্তের সংকীর্ণতার মুহূর্তে তায়াম্মুম করার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে মাসজিদে প্রবেশ করবে। অতঃপর পানি দ্বারা গোসল করে নামায আদায় করবে।" ইমাম মালিক (র) এ জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) শুধু 'ইরাকী ফিক্‌হ সংকলন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি ইমাম মালিক (র) থেকে 'আল-মুওয়াত্তা' রিওয়ায়াত করেছেন, তা সংকলন ও বিন্যাস করেছেন। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (র)-এর রাবীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর রিওয়ায়াতসমূহ উত্তম রিওয়ায়াত বলে গণ্য। 'ইরাকী ফিক্‌হের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তিনি ইমাম মালিক (র) ও হিজাযবাসীগণের মতামত খণ্ডন করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) সিরিয়াবাসীগণের ফিক্‌হ সিরিয়ার প্রখ্যাত শায়খ ইমাম আওযা'ঈ (র)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। গণিতশাস্ত্রে তিনি সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। অপূর্ব ও অতুলনীয় বাকশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কাযীর দায়িত্ব পালনে তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় 'সোনায় সোহাগা' হিসেবে পরিণত হয়েছিলেন। এতে তিনি ফিক্‌হের পাণ্ডিত্য কার্যকরী অভিজ্ঞতা লাভে ধন্য হলেন। এর ফলে তিনি ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার জগতের সীমা-পরিসীমার চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কার্যকরী জগতে পা রাখতে সক্ষম হন।

মদীনায় ইমাম মালিক (র) প্রমুখ আহলুল হাদীছ ফকীহ্-এর ফিক্‌হচর্চার সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে ইমাম মুহাম্মাদ (র) ফিক্‌হ ও ফাতাওয়া চর্চায় এবং আহ্‌কাম ইস্তিম্বাতে হাদীছকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি হাদীছ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন ও উসূল থেকে ফুরূ'আত ইস্তিম্বাতের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবকে সমৃদ্ধ করেন। মূলত তিনি হানাফী মাযহাবের সংরক্ষক ও এ মাযহাবের উপর সর্বাধিক গ্রন্থ প্রণয়নকারী হলেও বস্তুত তিনি **فقهاء الحديث** ও **فقهاء الرأى**-এর মাঝে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পান।[২৩]

কর্মজীবন

ইমাম মুহাম্মাদ (র) অত্যন্ত মেধাবী, প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ ছিলেন। মাস'আলা বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সময়েই তিনি এত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, মাস'আলার ব্যাপারে দলে দলে লোক তাঁর শরণাপন্ন হতো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বিশ বছর বয়সে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমে হাজার হাজার তালেবে 'ইলম তথা ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি কূফাতে 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থের দারস্ দিতেন, সেখানে তাঁর দারসে বহুসংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতির কারণে তাঁর বাড়ি পূর্ণ হয়ে যেত; এমনকি রাস্তাঘাট পর্যন্ত প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতো। এ দৃশ্য দেখে সা'দু মালিকী (র) বলেন,

وَمِمَّا بِهِ أَهْلُ الْحِجَازِ تَفَاخَرُوْا * إِنَّ الْمُوَطَّأَ فِيْ الْعِرَاقِ مُحَبَّبُ.

-‘হিজাযবাসীদের গর্বের বিষয়গুলোর মধ্যে এটিও একটি যে, ‘আল-মুওয়াত্তা’ ‘ইরাকীদের নিকট অতি প্রিয়।’

একদা ইমাম শাফি‘ঈ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর গৃহে একসাথে রাত্রি যাপন করেন। তিনি সারারাত নামায আদায় করেন। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) শায়িত ছিলেন। তিনি বিছানা থেকে উঠে বিনা ওযূতেই ফজরের নামায আদায় করেন। ইমাম শাফি‘ঈ (র) এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, ‘আমি রাতে ঘুমাইনি। এ রাতে আমি এক হাজার মাস’আলা ইস্তিম্বাত করেছি। আপনি নিজের জন্য কাজ করেছেন। আর আমি উম্মাতের জন্য কাজ করেছি।’[২৪]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) অধিকাংশ রাত নির্ঘুম কাটাতেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল আপনি ঘুমান না কেন? তিনি উত্তরে বলেন,

كَيْفَ أَنَامُ وَقَدْ نَامَتْ عُيُوْن النَّاسِ تَعْوِيْلاً عَلَيْنَا، وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ إِذَا وَقَعَ لَنَا أَمْرٌ رَفَعْنَاهُ إِلَيْهِ فَيَكْشِفُهُ لَنَا فَإِذَا نِمْنَا فَفِيْهِ تَضِيْعُ لِلدِّيْنِ.[২৫]

-‘আমি কিভাবে ঘুমাব? অথচ আমাদের উপর নির্ভর করে মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। তারা বলে, ‘আমাদের কোনো সমস্যা দেখা দিলে তাঁর কাছে যাব। তিনি তার সমাধান করে দিবেন। এখন আমরা যদি ঘুমাই তাহলে দ্বীন বরবাদ হয়ে যাবে।’

হাদীছ বর্ণনা

ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বহুসংখ্যক ছাত্র হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ্-শাফি‘ঈ (র) (মৃত ২০৪ হি.)। হাফিয আল-মিয্যী (র) বলেন,

رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنْ الشَّيْبَانِيِّ.[২৬]

-‘ইমাম শাফি‘ঈ (র) ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আশ্-শায়বানী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।’

ইমাম আবূ ‘উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফি‘ঈ (র)-কে বলতে শুনেছি,

لَقَدْ كَتَبْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنْ الْحَسَنِ وَقْرَ بَعِيْرٍ ذَكَرٍ، وَلَوْ لاَءُ مَافَتَقَ لِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا انْفَتَقَ.[২৭]

-‘আমি ইমাম মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান (র) থেকে এ পরিমাণ জ্ঞান লিখেছি, তাকে একটি নর উটই বহন করতে পারবে। যদি তিনি না হতেন তাহলে তখন আমার জ্ঞানের ঐ রাস্তা উন্মুক্ত হতো না যা বর্তমানে হয়েছে।’

ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেন তাঁরা হলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ্-শাফি‘ঈ (র), আবূ ‘উবায়দ (র), হিশাম ইব্ন ‘উবায়দুল্লাহ্ (র), আহমাদ ইব্ন হাফ্স বুখারা (র), ‘আমর ইব্ন আবী ‘আমর আল-হার্রানী (র), ‘আলী ইব্ন মুসলিম আত্-তূসী (র),[২৮] আবূ সুলায়মান আল-জুযাজানী (র), হিশাম ইব্ন ‘আব্দিল্লাহ্ আর-রাযী (র), আবূ ‘উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র), ইসমা‘ঈল ইব্ন তূবাহ্ (র), আল-ওয়াহাযী (র), খালফ ইব্ন আইয়্যুব (র) ও অন্যান্যরা।[২৯]

ড. ‘আলী আহ্মাদ আন্-নাদভী (র) তাঁর ‘আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান আশ্-শায়বানী’ গ্রন্থে নিম্নোক্ত ছাত্রগণের তালিকা বর্ণনা করেন,

শু'আয়ব আল-কায়সানী (র) (মৃত ২০৪ হি.), আবূ সুলায়মান মূসা ইব্ন সুলায়মান আল-জূযাজানী (মৃত ২০০ হি.), খালফ ইব্ন আইয়্যূব (র) (মৃত ২০৫ হি.), ইবরাহীম আল-মারূযী (র) (মৃত ২১০ হি.), আবূ ই'য়ালা আর-রাযী (র) (মৃত ২১১ হি.), আসাদ ইব্ন আল-ফুরাত (র) (মৃত ২১৩ হি.), আবূ হাফ্স আল-কাবীর (র) (মৃত ২১৭ হি.), 'আলী ইব্ন মা'বাদ (র) (মৃত ২১৮ হি.), আবূ যাকারিয়া আল-বুহাযী (র) (মৃত ২২২ হি.), আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র) (মৃত ২২৪ হি.), মুহাম্মাদ ইব্ন সামা'আহ্ আত্-তায়মী (র) (মৃত ২৩৩ হি.), নাসির ইব্ন যিয়াদ আন্-নায়সাপূরী (র) (মৃত ২৩৩ হি.), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (মৃত ২৩৩ হি.), আবূ জা'ফর আল-হারূবী (র) (মৃত ২৩৬ হি.), আহমাদ আল-'আমিরী (র) (মৃত ২৩৮ হি.), দাঊদ ইব্ন রুশায়দ (র) (মৃত ২৩৯ হি.), আল-হাসান আল-হাযরামী (র) (মৃত ২৪১ হি.), মুহাম্মাদ আর-রাযী (র) (মৃত ২৪৮ হি.), ইসমা'ঈল আল-কাযভীনী (র) (মৃত ২৪৯ হি.), 'আলী আত্-তূসী (র) (মৃত ২৫৩ হি.), সুলায়মান আল-কায়সানী (র) (মৃত ২৭৮ হি.), মূসা ইব্ন নাসর আর্-রাযী (র), আবূ জা'ফর আস্-সুকূনী (র), আবূ রিযা আল-খুরাসানী (র) (মৃত ২০৭ হি.), আহমাদ আল-কারী (র), ইসামা'ঈল আশ্-শানজী (র), আয়্যূব আন্-নায়সাপূরী (র) (মৃত ২৫১ হি.), আল-হাসান ইব্ন হারব (র), হাম্মাদ আন্-নায়সাপূরী (র), 'আব্দুর রহমান আল-মারওয়াযী (র), 'আব্দুল করীম 'আব্দাক (র), আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মিহ্রাত (র), ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্দিল ওয়াহ্হাব (র), আল-হাসান ইব্ন মুসহার (র), যায়দ ইব্ন নু'আয়ম (র), সাওরাহ্ ইব্নুল হাসান আল-আলওয়াযানী (র), 'আমর ইব্ন আবী 'আমর আল-হার্রানী (র), লায়ছ আল-মারওয়াযী (র), হিশাম ইব্ন মা'দান (র) প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন।[৩০]

বিচারপতির দায়িত্ব পালন

'আব্বাসীয় খলীফাহ্ হারুন অর-রশীদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। খলীফাহ্ অধিকাংশ সময় তাঁকে সাথে রাখতেন। তাঁর শাসনামলে মুহাম্মাদ (র) কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৩১] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,

وَلِيَ القَضَاءَ لِلرَّشِيْدِ بَعْدَ القَاضِي أَبِي يُوْسُفَ، وَكَانَ مَعَ تَبَحُّرِهِ فِي الفِقْهِ، يُضْرَبُ بِذَكَائِهِ المَثَلُ.

-'হারুন অর-রশীদের খিলাফত আমলে কাযী আবূ ইউসুফ (র)-এর পর তিনি কাযী পদে নিয়োজিত হন। ফিক্হ বিষয়ে তাঁর গভীরতা ও স্মৃতি মেধার প্রখরতার উপমা দেয়া হতো।'

রাজ দরবারের সাথে সম্পর্কিত থাকলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও মর্যাদাবান লোক; নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধে সামান্যতম আঁচড় লাগতে দিতেন না। খতীব আল-বাগদাদী (র) বলেছেন,

> "একদা খলীফা হারুন অর-রশীদ আগমন করলেন। সকলেই তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) দাঁড়ালেন না। খাদিম এল এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-কে ডাকানো হলো। তাঁর সহচর ও ছাত্রগণ বিচলিত হয়ে গেল। যখন তিনি খলীফার দরবার থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন সকলেই ঘটনা জানতে চাইলে তিনি বললেন, খলীফা হারুন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি সকলের সাথে সম্মানার্থে দাঁড়ালেন না কেন?' আমি জবাবে বললাম, 'আপনি আমাকে যে মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আমি পছন্দ করি না যে, সে দল থেকে বের হয়ে যাই। আপনি আমাকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল করেছেন। আমি চাই না যে, সে স্তর থেকে নেমে এসে কর্মচারী ও সাধারণ চাকরদের মধ্যে পরিগণিত হই।"[৩২]

এ ঘটনার পর কাযী পদের দায়িত্ব পালনে তাঁর আরও ব্যাপকতা ও বিশালতার সৃষ্টি হয়েছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) খলীফা হারুর অর-রশীদের দরবারে বিভিন্ন দীনি মাস'আলা নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি ফিক্হশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ আলোকপাত করার কারণে তাঁর ফিকহী মাস'আলাসমূহ অন্যদের

ফিক্‌হচর্চার মূল উপাদানে পরিণত হয়। ইবরাহীম আল-হার্‌রানী (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়,

مَنْ أَيْنَ لَكَ هَذِهِ المَسَائِلُ الدِّقَاقُ؟ قَالَ: مَنْ كُتُبِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ.[৩৩]

-'এসব সূক্ষ্ম মাস'আলা কোথা থেকে পেয়েছেন? আমি বললাম, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের গ্রন্থসমূহ থেকে।'

ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সাথে তাঁর কয়েকবার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব বিতর্কের বিষয় ও সম্পূর্ণ বিবরণ সৌভাগ্যক্রমে আজও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত আছে।[৩৪] তিনি মদীনায় গিয়ে ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র), সাতরী মিসআর (র) এবং আল-আওযা'ঈ (র)-এর নিকট থেকে হাদীছ ও ফিক্‌হের কিছু বিষয় শিক্ষা করেন।[৩৫]

রচনাবলী

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যেখানে লেখালেখির কাজ করতেন তার চারপাশে কিতাবের এক বিশাল স্তুপ থাকত। তাঁকে লেখালেখির কাজে সাহায্য করার জন্য সবসময় দশ জন ব্যক্তি প্রস্তুত থাকতেন। হানীফ গাংঙ্গুহী (র) বলেন,

آب في بی شمار کتابین تصنیف کین آب کی تصنیف کردة تمام کتب کی تعداد نوسو کناوی.[৩৬]

-'তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহকে গণনা করে দেখা যায় এর সংখ্যা নয়শত নিরানব্বইটি।'

তাঁর নাতি তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে বলেন,

مَا رَأَيْتَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ مَعَ عِيَاله إِلاَّ بِإِشَارَةِ الْحَاجِب وَالأَصَابع.[৩৭]

-'তিনি রচনার কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে আঙ্গুল অথবা ভ্রুর ইশারা ছাড়া তাঁকে কথা বলতে দেখিনি।'

ইমাম মুহাম্মাদ (র) রচিত গ্রন্থাবলীই ছিল প্রাথমিক যুগে হানাফীদের প্রধান সম্পদ ও হানাফী ফিক্‌হর প্রথম পর্যায়ের ভিত্তিগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর রিওয়ায়াত করা গ্রন্থাবলীকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত'[৩৮] বলা হয়। কেননা এগুলো ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে ছিকাহ্‌ সূত্রে বর্ণিত। যেমন, মুহাম্মাদ (র) বর্ণনা করেন, আবূ ইউসুফ (র) থেকে। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি যে সব গ্রন্থ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে শুনিয়েছেন কিংবা 'ইরাকবাসীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ফিক্‌হর আলোকে রচনা করেছেন অথবা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অপরাপর উস্তাদগণ থেকে আহরণ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর গ্রন্থসমূহ 'উলামায়ে কিরামের নিকট নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ততার দিক থেকে তিনভাগে বিভক্ত।

এক. যাহিরুর রিওয়ায়াত: সেগুলো হলো, আল-মাবসূত অথবা আল-আসল, আল-জামি'উস্‌-সাগীর, আস্‌-সিয়ারুস্‌-সাগীর, আস্‌-সিয়ারুল কাবীর, আল-জামি'উল কাবীর, আয্‌-যিয়াদাত।

দুই. কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোকেও যাহিরুর রিওয়ায়াতের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো, মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ, কিতাবুল হুজ্জাত 'আলা আহলিল মাদীনাহ্‌, কিতাবুল আছার।

তিন. গায়রু যাহিরুর রিওয়ায়াত: এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো, যিয়াদাতুয্-যিয়াদাত, আর-রাক্কিয়াত, আল-কায়সানিয়্যাত, আল-হারূনিয়্যাত, আল-জুরজানিয়্যাত।[৩৯]

প্রথমত: যাহিরুর রিওয়ায়াত (ظَاهِرُ الرِّوَايَةْ) গ্রন্থসমূহ। এ প্রকারের গ্রন্থগুলোর সংখ্যা ছয়টি। তা নিম্নরূপ,

১. আল-মাবসূত (اَلْمَبْسُوْطْ): এ গ্রন্থটি কিতাবুল আস্ল (كِتَابُ الأَصْلْ) নামে পরিচিত।[৪০] ইমাম মুহাম্মাদ (র) রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়। এতে তিনি এমন হাজার হাজার মাস'আলা একত্রিত করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে স্বয়ং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এর মধ্যে কোনো কোনো মাস'আলা, যাতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অধিকাংশ মাস'আলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) একটি পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত করেছেন যাতে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) ও ইব্ন আবূ লায়লা (র)-এর মধ্যকার মতভেদের উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থের রিওয়ায়াতকারী ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর ছাত্র আহমাদ ইব্ন হাফ্স (র)। এতে কোনো কিয়াসী আহ্কাম নেই। ইবনুল 'আবিদীন (র) বলেন,

> "জেনে রাখুন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের বিভিন্ন নুস্খা বর্ণিত হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম নুস্খা হলো, আবূ সুলায়মান আল-জুযজানী (র)-এর নুস্খা। পরবর্তী যুগের একদল 'উলামার ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম বাক্র (র)-এর নুস্খা 'আল-মাবসূত আল-কাবীর' এবং শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র) প্রমুখ। এরপর উলামায়ে কিরাম 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের যে সব নুস্খা বর্ণনা করেছেন, মূলত তা হলো ভাষ্যগ্রন্থ। তাঁরা তাঁদের ভাষ্যকে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর 'আল-মাবসূত'-এর সাথে সংমিশ্রণ করে ফেলেছিলেন। যেমনটি করেছিলেন, 'আল-জামি'উস্-সাগীর'-এর ভাষ্যকারগণ। যেমন ফখরুল ইসলাম (র) ও কাযী খান (র) প্রমুখ। অতএব বলা যায় যে, কাযী খান (র)-এর উক্ত গ্রন্থ 'আল-জামি'উস্-সাগীর' এ বর্ণনা করেছেন, এমনিভাবে অপরাপর গ্রন্থেও করেছেন।"[৪১]

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, আবূ সুলায়মান (র)-এর নুস্খা সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক। আবূ সুলায়মান (র)-এর প্রকৃত নাম মূসা ইব্ন সুলায়মান (র)। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে 'ইলমুল ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেছেন। খলীফা আল-মামূন তাঁকে কাযীর পদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি দ্বিতীয় হিজরীর পরে ইন্তিকাল করেন।[৪২]

'আল-মাবসূত' গ্রন্থটির ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আস্-সুরুখসী (র) (মৃত ৪৮৩ হি.) ও 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ইসবায়জানী (মৃত ৫৩৫ হি.)।[৪৩]

'মুখতাসারুল মাবসূত' শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মারূযী আল-হাকিম (র) (মৃত ৩৩৪ হি.), মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র) ও 'আব্দুর রহমান ইসমা'ঈল আল-বাহদী 'মুখতাসারুল আস্ল' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৪]

২. আল-জামি'উস্-সাগীর (اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرْ): এ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) স্বীয় ওস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ৫৩৩টি মাস'আলা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ১৭০টি মাস'আলার সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন।[৪৫] এ গ্রন্থটি লিখার কারণ উল্লেখপূর্বক ইব্ন 'আবেদীন আশ্-শামী (র) বলেন,

وَسَبَبُ تَأْلِيْفِهِ اَنَّ الإِمَامَ أَبَايُوْسُفَ طَلَبَ مِنَ الإِمَامِ مُحَمَّدٍ أن يَجْمَعَ لَهُ كِتَابًا يَرْوِيْهِ عَنْهُ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَجَمَعَ لَهُ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهِ، فَأَعْجَبَهُ.[৪৬]

-'এ গ্রন্থটি লিখার কারণ হলো এই যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে অনুমতি চাইলেন যে, তিনি [ইমাম মুহাম্মাদ (র)] ইমাম আবূ হানীফা (র) যে সমস্ত রিওয়ায়াত করেছেন সেগুলো গ্রন্থাবদ্ধ করবেন। অতঃপর তিনি এ রিওয়ায়াতগুলোকে একত্রিত করে তাঁর নিকট উপস্থাপন করলেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এতদ্‌দর্শনে বিস্মিত হয়ে গেলেন।'

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) গ্রন্থটি দেখে মন্তব্য করেন, 'গ্রন্থটি খুব সুন্দর হয়েছে, তবে আবূ 'আব্দুল্লাহ্ তিনটি মাস'আলা ভুল করেছেন।' ইমাম মুহাম্মাদ (র) কথটি জানতে পেরে বলেন, 'আমি ভুল করিনি, সম্ভবত তিনি ভুলে গিয়েছেন।'

ইব্‌ন মু'ঈন (র) বলেন, [৪৭] كَتَبْتُ الجَامِعَ الصَّغِيْرَ عَنْ مُحَمَّد بن الْحَسَنْ. -'আমি মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান থেকে জামি'উস্‌-সাগীর লিপিবদ্ধ করেছি।'

'বুলুগুল আমানী' গ্রন্থে 'জামি'উস্ সাগীর'-এর ফযীলাত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظْمِ شَأْنِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الإِمَامَ اَبَايُوْسُفَ كَانَ لاَ يُفَارِقُهُ فِيْ حَضَرٍ وَلاَسَفَرٍ. [৪৮]

-'এ গ্রন্থটির উচুঁ মর্যাদার প্রমাণ এই যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) স্বীয় অবস্থায় ও সফরে কখনো এ গ্রন্থটি ছাড়া থাকতেন না।'

ইমাম মুহাম্মাদ (র) পুরো 'আল-জামি'উস্‌-সাগীর' ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি এমন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন যে, প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শুরুতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। এতে অনুমিত হয় যে, পূর্ণ পরিচ্ছেদই ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত।

'আল-জামি'উস্‌-সাগীর' গ্রন্থে ফিক্‌হী মাস'আলার চল্লিশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রথমে কিতাবুস্‌-সালাত (كِتَابُ الصَّلاَة) এবং শেষে কিতাবুল ওয়াসায়া ওয়াল মুতাফার্‌রিকাত (كِتَابُ الْوَصَايَا وَالْمُتَفَرِّقِيَات) বিষয়ক অধ্যায় রয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ গ্রন্থে শুধু মাস'আলাসমূহ বর্ণনা করেছেন। এতে কোনো দলীল বা যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ করেননি। এ গ্রন্থটি 'ঈসা ইব্‌ন আবান (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন সামা'আহ্ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। গ্রন্থটি মিসর থেকে প্রকাশিত। 'আব্দুল হাই ফিরিঙ্গী আল-মাহাল্লী (র)-এর টীকাসহ গ্রন্থটি ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৯]

৩. আল-জামি'উল-কাবীর (اَلْجَامِعُ الْكَبِيْر): এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে প্রত্যেক পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদের শুরুতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর রিওয়ায়াতের কথা উল্লেখ করেননি; বরং রিওয়ায়াতের উল্লেখ ব্যতীতই মাস'আলা বর্ণনা শুরু করেছেন। এর মর্ম হলো এ গ্রন্থ সংকলনে তিনি শুধু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর বর্ণনার উপর নির্ভর করেননি; বরং অন্যান্য ওস্তাদগণের বর্ণনা এবং তাঁদের সংকলিত 'ইরাকে বহুলভাবে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ মাস'আলার সাহায্যও গ্রহণ করেছেন।[৫০] 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, 'ইমাম মুহাম্মাদ (র) এ গ্রন্থটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেননি।'[৫১] যদিও এর অধিকাংশ মাস'আলা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও অন্যান্য 'ইরাকী ফকীহ্‌গণ থেকে আহরিত।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'জামি'উল কাবীর' গ্রন্থটিকে দুবার সংকলন করেছেন। প্রথম সংকলনের রিওয়ায়াত করেছেন তাঁর বহুসংখ্যক ছাত্র। অতঃপর তিনি গ্রন্থটি পুনরায় গবেষণা করে দ্বিতীয়বার অনেক অধ্যায়

ও মাস'আলা সংযোজন করেন। অধিকাংশ স্থানে মূলভাষা পুনরায় সাজিয়ে লেখেন। ফলে গ্রন্থটি শব্দ চয়ন ও মর্মের দিক থেকে প্রথমবারের থেকে উন্নততর হয়। এ গ্রন্থটিকে পুনরায় তাঁর বহুসংখ্যক ছাত্র বর্ণনা করেন।[৫২] তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, আবূ হাফ্স আল-কাবীর, আবূ সুলায়মান আল-জূযজানী, মুহাম্মাদ ইব্ন সামা'আহ্, 'আলী ইব্ন মা'বাদ ইব্ন শাদ্দাদ, হিশাম ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ্ আর-রাযী।

ইব্ন শুজা (র) বলেন, [৫৩] مَاوُضِعَ فِيْ الإِسْلاَمِ كِتَابٌ مِثْلُ جَامِعَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَبِيْرِ. -'মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান-এর জামি'উল কাবীরের ন্যায় এমন কোনো গ্রন্থ ইসলামে রচিত হয়নি।'

জনৈক ইয়াহুদী পণ্ডিত ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর 'আল-জামি'উল কাবীর' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-হুসায়রী (র) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, إِيَاسُ اَلْمُخَالِفِيْنَ عَنِ الْمُعَارَضِةِ. -'গ্রন্থটি বিরোধীদের জন্য হতাশা।'[৫৪]

এ গ্রন্থটির 'আরবী ভাষা মানের দিক থেকেও অভিধানবেত্তাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। আখ্ফাশ ও আবূ 'আলী ফারসী (র) গ্রন্থটির সাহিত্যমানের অত্যাধিক প্রশংসা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর চিন্তাধারার সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম যুফার (র)-এর চিন্তাধারাকেও যুক্ত করেন। পরবর্তী ফকীহ্গণ মাস'আলা-মাসাইল ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের আহ্কাম ইস্তিম্বাত পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

ইব্ন নুজায়ম (র) জামি'উস্ সাগীর ও জামি'উল কাবীর সম্পর্কে বলেন,

كُلُّ تَأْلِيفٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مَوْصُوفٌ بِالصَّغِيرِ فَهُوَ بِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْرَضْ عَلَى أَبِي يُوسُفَ.[৫৫]

-'ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর যে সব সংকলন 'সাগীর' নামে প্রসিদ্ধ তা ইমাম মুহাম্মাদ (র) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর ঐক্যমত মাস'আলার সমাহার। পক্ষান্তরে যে সব সংকলন 'আল-কাবীর' নামে পরিচিতি, তা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সমীপে পেশ করেননি।'

ইব্ন আমীর হাজ্জ হালাবী (র) বলেন,

إِنَّ مُحَمَّداً قَرَأَ أَكْثَرَ الْكتب عَلَى أَبِيْ سُوْسُف الا مَاكَانَ فِيْهِ إِسْمُ الْكَبِيْرِ فَإِنَّهُ مِنْ تَصْنِيْفِ مُحَمَّد.[৫৬]

-'ইমাম মুহাম্মাদ (র) স্বীয় অধিকাংশ গ্রন্থই ইমাম আবূ ইউসুফ (র)- কে শুনিয়েছেন। তবে 'আল-কাবীর' নামে যে সব গ্রন্থ রয়েছে, তা শুনাননি। এ সব গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর স্বরচিত।'

৪. আস্-সিয়ারুস্-সাগীর (اَلسِّيَرُ الصَّغِيْرِ): ইমাম মুহাম্মাদ (র) প্রথমে সিয়ারুস্ সাগীর রচনা করেন। এতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত সব মাস'আলাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এতে জিহাদের বিধি-বিধান, সন্ধির বিধি-বিধান, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিধান, মুক্তিপণ, বন্দি সম্পর্কিত বিধান, যুদ্ধ সম্পর্কিত মাস'আলা সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

৫. আস্-সিয়ারুল কাবীর (اَلسِّيَرُ الْكَبِيْرِ): এতে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত মাস'আলা-মাসাইল বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর রচিত 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ্' গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ রচিত গ্রন্থ এটি। এতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত ফিক্হী আহ্কাম রয়েছে। এটি 'ইরাকে অবস্থানকালে তাঁর

সর্বশেষে রচনা। এ গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আস্‌-সুরুখসী (র)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের সাথে পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত গ্রন্থ দুটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর নিজস্ব আঙ্গিকে ব্যতিক্রমী মর্যাদার অধিকারী। এ গ্রন্থ দুটিতে জিহাদ, গনীমাত ও মালে ফাই প্রভৃতির বিধানাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাদশাহ্‌ হারুন অর-রশীদ 'আস্‌-সিয়ারুল কাবীর' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য দেখে নিজের দুই সন্তানকে তা পড়ানোর ব্যবস্থা করেন।

আস্‌-সিয়ারুস্‌-সাগীর ও আস্‌-সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত বিধি-বিধানের স্বপক্ষে আছার ও আখবার থেকে দলীল-প্রমাণ সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এ দুটি গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ।

৬. আয্‌-যিয়াদাত (اَلزِّيَادَاتُ): এটি যাহিরুর রিওয়ায়াত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। এটি প্রথমে ইমাম মুহাম্মাদ (র) সজ্জায়ন করেন। অতঃপর তাঁর ছাত্র আবূ 'আব্দুল্লাহ্‌ আয্‌-যা'ফারানী (র) নতুনভাবে গ্রন্থটিকে সজ্জায়ন করেন। বর্তমানে যা'ফারানীর সংকলিত গ্রন্থটি পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন 'আয্‌-যিয়াদাত'। কেননা এ গ্রন্থটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর 'আল-আমালী'র উপর ভিত্তি করে রচিত।

এ গ্রন্থটিতে এমন সব মাস'আলা বর্ণিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন, 'এ গ্রন্থে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গবেষণামূলক বিষয়াবলী স্থান পেয়েছে। এতে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা অপরাপর গ্রন্থে নেই।'[৫৭]

উপর্যুক্ত ছয়টি গ্রন্থ খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ গ্রন্থগুলোকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' বলা হয়। এগুলোকে 'যাহিরুর রিওয়ায়াত' বলার কারণ হলো, উক্ত গ্রন্থগুলো ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে সরাসরি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ মুতাওয়াতির অথবা মাশহূর পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উপরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ব্যতীত আরও কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোকে সনদের দিক থেকে যাহিরুর রিওয়ায়াতের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। যেমন,

৭. আল-মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (اَلْمُوَطَّأُ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٌ): এ গ্রন্থটি সম্পর্কে বক্ষমান প্রবন্ধে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৮. কিতাবুল আছার (كِتَابُ الْآثَارُ): এ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ আশ্‌-শায়বানী (র)-এর এমন সব আছার বর্ণিত আছে, যা দ্বারা হানাফীগণ দলীল গ্রহণ করে থাকেন।[৫৮] এ গ্রন্থটি মূলত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর রিওয়ায়াত। যা তাঁর থেকে তাঁর প্রসিদ্ধ অন্যান্য অনেক ছাত্র বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে ইমাম মুহাম্মাদ (র) নিজের থেকেও কিছু রিওয়ায়াত সংযোজন করেছেন।

৯. কিতাবুল হুজ্জাত 'আলা আহলিল-মাদীনাহ্‌ (كِتَابُ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ): এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকার অর্থাৎ যাহিরুর রিওয়ায়াত-এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) তিন বছর মদীনায় অবস্থান করে ইমাম মালিক (র)-এর নিকট 'আল-মুওয়াত্তা' শ্রবণ করেন। এ সময় তিনি মদীনাবাসীদের 'আমলসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর তিনি 'ইরাকে গমন করে كِتَابُ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ শিরোনামে গ্রন্থ রচনা

করেন। এ গ্রন্থে তিনি তাদের ফাত্ওয়া ও ফিক্হী সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মাস'আলা নিম্নে উদ্ধৃত হলো,

এক. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে 'মুকীম এক দিন এক রাত এবং মুসাফির তিন দিন তিন রাত মোজার উপর মাস্হ করতে পারবে, এরজন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। যতদিন সে মুসাফির থাকবে, ততদিন এর উপর মাস্হ করতে পারবে।' কিন্তু মুকীমের মোজার উপর মাস্হ করার বিষয়ে আহলিল মাদীনার মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে 'মোজার উপর মাস্হ করতে পারবে না।' ইমাম মালিক (র) এ মতের প্রবক্তা। কিন্তু অন্যান্য মদীনাবাসীর মতে 'মোজার উপর মাস্হ করার সময়সীমা মুকীম ও মুসাফির উভয়ের জন্য সমান। অর্থাৎ তারা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এর উপর মাস্হ করতে পারবে। ইমাম মালিক (র) প্রথমে এ মতের প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এ মত পরিত্যাগ করে উপর্যুক্ত মত পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন,

'মোজার উপর মাস্হ করার সময়সীমা মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত বিষয়ক হাদীছসমূহ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ বর্ণনা করেন। এ সব হাদীছের মাঝে ইমাম মালিক (র) এবং আহলিল মদীনা কর্তৃক রিওয়ায়াতকৃত হাদীছসমূহ বিদ্যমান ছিল।' অতঃপর তিনি বলেন, 'এগুলো হলো তাঁদের বর্ণনাকৃত আছার। অতঃপর তাঁরা 'রায়' প্রয়োগপূর্বক নিজেদের রিওয়ায়াতকৃত আছারের বিরোধিতা করেন।'[৫৯]

দুই. নামাযে অট্টহাসি দেয়ার মাধ্যমে ওযু ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কিত মাস'আলায় ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, 'নামাযে অট্টহাসি দিলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। কারণ, এতদ্সম্পর্কিত হাদীছ ও আছার বিদ্যমান। আহলিল মদীনার মতে, 'অট্টহাসি হলো সাধারণ কথোপকথনের ন্যায়। তাই এর মাধ্যমে নামায ভঙ্গ হবে; ওযূ নয়। সুতরাং নামাযে অট্টহাসি দিলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে, নতুন করে ওযূ করার প্রয়োজন নেই।' ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন,

'যদি এ বিষয়ে কোনো হাদীছ ও আছার বিদ্যমান না থাকত, তবে আহলিল মদীনার এ কিয়াস সঠিক বলে ধরে নেয়া যেত। কিন্তু সুস্পষ্ট হাদীছ ও আছার বিদ্যমান থাকলে কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কিত আছার উদ্ধৃত করেন।'[৬০]

এ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) প্রথমে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি মদীনাবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি তথা ইমাম মালিক (র)-এর মতামত উপস্থাপন পূর্বক হাদীছ রিওয়ায়াত ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অধিক বিশুদ্ধ ও বাস্তবসম্মত।

ইমাম শাফি'ঈ (র) (তাঁর ছাত্র) 'কিতাবুল উম্ম' (كِتَابُ الْأُمِّ) গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর গ্রন্থ থেকে রিওয়ায়াত করে তা খণ্ডন করেছেন এবং অনেক স্থানে মদীনাবাসীর পক্ষাবলম্বন করে তাঁদের মতের স্বপক্ষে সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত করেছেন।

তৃতীয়ত: ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর এমন সব গ্রন্থ যা তাঁর প্রতি আরোপিত হওয়ার ব্যাপারে প্রথম প্রকারের গ্রন্থসমূহের সমকক্ষ নয়। তবে এগুলো 'খবরে ওয়াহিদ'-এর পন্থায় বর্ণিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ,

১০. যিয়াদাতুয্-যিয়াদাত (زِيَادَاتُ الزِّيَادَاتِ): এ গ্রন্থটি তিনি আয্-যিয়াদাত গ্রন্থ রচনার পরে বাদ পড়ে যাওয়া মাস'আলাসমূহকে একত্রিত করে নামকরণ করেন 'যিয়াদাতুয্-যিয়াদাত'। গ্রন্থটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এতে সাতটি অধ্যায় রয়েছে। এ গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা রচনা করেন ইমাম আস্-সারাখসী (র)। তিনি

এর নামকরণ করেন 'আন্-নুকাত'। ইমাম আল-আত্তাবী (র)ও এ গ্রন্থটির একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।

১১. আর-রাক্কিয়াত (اَلرَّقِّيَّاتُ): তিনি রিক্কা শহরে বিচারপতি থাকা অবস্থায় যে সব রায় প্রদান করেন; সে সব রায়ের সমষ্টি এ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি মুহাম্মাদ ইব্ন সামা'আহ্ তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান (র)-এর সাথে রিক্কায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন। রিক্কা দিয়ারে বাক্রের একটি শহর।[৬১]

১২. আল-কায়সানিয়্যাত (اَلْكَيْسَانِيَّات): এ গ্রন্থটির অপর নাম আল-আমালী। এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে শু'আয়ব ইব্ন সুলায়মান আল-কায়সানী (র) বর্ণনা করেন।[৬২] পরবর্তীতে ইমাম তাহাভী (র) সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতা থেকে তিনি মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। এ গ্রন্থটির কিছু অংশ 'আল্লামা আবুল ওয়াফা আল-আফগানী (র)-এর তাহ্কীকসহ প্রকাশিত হয়েছে।[৬৩]

১৩. আল-হারূনিয়্যাত (اَلْهَارُوْنِيَّاتُ): এ গ্রন্থটিকে খলীফাহ্ হারুন অর-রশীদের দিকে নিসবত করে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা এটি তাঁর শাসনামলে খলীফাকে উদ্দেশ্য করে সংকলিত হয়েছে।[৬৪]

১৪. আল-জুরজানিয়্যাত্ (اَلْجُرْجَانِيَّاتُ): ইমাম মুহাম্মাদ (র) জুরজান শহরে অবস্থানকালে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন 'আলী ইব্ন সালিহ্ আল-জুরজানী।[৬৫]

উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহকে গারবু যাহিরুর রিওয়ায়াত (غَرْبُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةُ) বলা হয়ে থাকে। কেননা এ সব গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মাদ আশ্-শায়বানী (র) থেকে প্রামাণ্যরূপে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি প্রথম প্রকারের পর্যায়ভুক্ত নয়।

১৫. কিতাবুল কাসাব (كِتَابُ الْكَسَبُ): এ গ্রন্থটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সর্বশেষ রচিত গ্রন্থ। এটি তিনি ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে রচনা করেন। কারও কাওর মতে 'তিনি গ্রন্থটি যেভাবে রচনা করতে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে রচনা করতে সক্ষম হননি। কেননা তাঁর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। গ্রন্থটি তাঁর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সাম'আহ্ আত্-তামীমী (র) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে তিনি এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্তকরণ করেন। এটি 'আল-ইকতিসাব ফির-রিযকিল মুস্তাতব' নামে পাওয়া যায়।[৬৬]

১৬. কুতুবুন্-নাওয়াদির (كُتُبُ اَلنَّوَادِر): কুতুবুন্-নাওয়াদির বলা হয় ঐ সকল গ্রন্থকে যেগুলো আহাদ সনদে বর্ণিত। কিন্তু তা মায্হাবী গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৬৭]

১৭. কিতাবুল মাখারিয ফিল হিয়াল (كِتَابُ الْمَخَارِجِ فِيْ الْحِيَل): এটির অধিকাংশ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত।

১৮. আল-'আকীদাহ্ (اَلْعَقِيْدَةُ): গ্রন্থটি 'ইলমুল কালাম বিষয়ক। এটি কবিতা ও ছন্দাকারে রচিত গ্রন্থ। এতে ৭৯টি পংক্তি রয়েছে।

১৯. কিতাবুল ফী উসূলিল ফিক্হ (كِتَابُ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ): এটির একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। যা ইমাম সারাখসী রচনা করেন।

২০. কিতাবুল হুজ্জাজ (كِتَابُ الْحُجَّجُ): এতে হানাফী ও মালিকী মাযহাবের সকল মতানৈক্যপূর্ণ মাস'আলাগুলো বর্ণিত রয়েছে।

২১. ফাত্ওয়া ফী মানযূমাহ্ (فَتوَى فِيْ مُنْظُوْمَةْ): গ্রন্থটিতে কিছু ফাত্ওয়া ছন্দাকারে বর্ণিত আছে।

২২. কিতাবুস্ সালাত (كِتَابُ الصَّلاَةْ):

২৩. কাসীদাতুশ্ শায়বানী (قَصِيْدَةُ الشَّيْبَانِيْ)।[৬৮]

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর রচিত গ্রন্থসমূহ হানাফী ফিক্হ-এর প্রথম পর্যায়ের ভিত্তিগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। যদিও তিনি সে সব গ্রন্থ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে শুনিয়েছেন কিংবা 'ইরাকীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ফিক্হ-এর আলোকে রচনা করেছেন অথবা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অপরাপর উস্তাদগণ থেকে আহরণ করেছেন।

'ইবাদাত ও তাক্ওয়া

ইমাম মুহাম্মাদ (র) ছিলেন দুনিয়া বিমুখ, 'আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। তাঁর 'ইবাদাত সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ্ (র) বলেন,

إِنَّ مُحَمَّداً يُدَرِّسُ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَيُصَلِّى ثلثَ اللَّيْلِ وَيَنَامُ ثلثَ اللَّيْلِ.[৬৯]

-'মুহাম্মাদ (র) প্রতিদিন রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অধ্যয়ন করতেন। একভাগ নফল নামায আদায় করতেন। আর একভাগ ঘুমাতেন।'

ইমাম আবূ জা'ফর আত্-তাহাভী (র) তাঁর উস্তাদ কাযী ইব্ন আবী 'ইমরান (র) থেকে বর্ণনা করেন,

انَّ مُحَمَّداً يتلو ثلث القرآن كُلَّ يَوْمٍ.[৭০]

-'ইমাম মুহাম্মাদ (র) দৈনিক এক তৃতীয়াংশ আল-কুর'আন তিলাওয়াত করতেন।'

ইমাম মুহাম্মাদ (র) সাধারণত খুব কম ঘুমাতেন। অধিকাংশ রাত তিনি নির্ঘুম অবস্থায় কাটাতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ঘুমান না কেন? উত্তরে তিনি বললেন,

لأَنَّ عُيُوْنَ الْمُسْلِمَين نَامتُ عَلَى اِعْتِمَادِنَا فَكَيْفَ أَنَامُ.[৭১]

-'আমাদের উপর ভরসা করে সাধারণ মুসলমানগণ ঘুমায়, এমতাবস্থায় আমি কিভাবে ঘুমাই।'

ইমাম মুহাম্মাদ (র) সম্পর্কে মণীষীগণের অভিমত

১. মুহাম্মাদ (র)-এর উস্তাদ ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) বলেন,

اتَانِى رِجَالُ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَلكِنَّ لَيْسَ لَهُمْ عُمُقٌ فِيْ الْعِلْمِ مِثْلَ هَذَا اَلشَّابِّ.[৭২]

-'আমার নিকট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞান পিপাসুরা আগমন করে থাকে। তাদের মধ্যে এ যুবকের মতো জ্ঞানের গভীরতা আর কারও নেই।'

২. ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর শিষ্য ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন,

اعَانَنِي الله برجلين سُفْيَان بنُ عُيَيْنَةْ وَمُحَمَّد. وَقَالَ مَرَّة مَا رَأَيْتَ احدا اَفْصَحُ وَاَبْلَغُ مِنْهُ كَانَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلى لِسَانِهِ.[৭৩]

-'আল্লাহ্‌ তা'আলা দুজন ব্যক্তির মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেছেন। একজন হলেন, সুফইয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়নাহ্‌ (র) এবং অপরজন হলেন, মুহাম্মাদ (র)। তিনি আরও বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ (র)-এর চেয়ে অধিক সুবক্তা এবং স্পষ্টভাষী আর কাউকে দেখিনি। তিনি এমনভাবে 'আরবী বলতেন, মনে হতো যেন তাঁর ভাষায় আল-কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে।'

৩. ইব্‌ন 'আব্দিল বার (র) বলেন,

كَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله يَثْنِيْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَيَفْضله وَيَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ قط رجلاً سَمِيْنًا أَعْقل مِنْهُ.[৭৪]

-'ইমাম শাফি'ঈ (র) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান কোনো মোটা মানুষ আমি কখনো দেখিনি।'

৪. ইমাম আশ্‌-শায়বানী (র) নিজ যুগের কিতাবুল্লাহ্‌ অর্থাৎ আল-কুর'আনের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। আহ্‌কাম ইস্তিম্বাত বিষয়ে সবচেয়ে বড় ফকীহ্‌ ছিলেন। ইমাম আবূ 'উবায়দাহ্‌ আল-কাসিম ইব্‌ন সালাম (র) বলেন, مَارَأَيْتَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. -'কিতাবুল্লাহ্‌ বিষয়ে আমি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর চেয়ে বড় 'আলিম আর কাউকে দেখিনি।'[৭৫]

৫. আবূ জা'ফর আত্‌-তাহাভী (র) বলেন,

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِيْ عِمْرَان يَحْكِيْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَّ مُحَمَّداً كَانَ حزبه فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثلث الْقُرْآنِ.[৭৬]

-'আমি আহমাদ ইব্‌ন আবী 'ইমরান (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র)-এর কতিপয় শিষ্যের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ (র) প্রতিদিন আল-কুর'আনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতেন।'

৬. ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর প্রখ্যাত শিষ্য ইদরীস ইব্‌ন ইউসুফ করাতিসি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফি'ঈ (র)-কে বলতে শুনেছি,

مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَعْلَمَ بِالْحَرَامِ وَالْحَلاَلِ وَالْعِلَلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.[৭৭]

-'আমি হালাল ও হারাম, ইল্লাতসমূহ, রহিত ও রহিতকারী জ্ঞান সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান (র) থেকে বেশি জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।'

মোটকথা হচ্ছে, ইমাম আশ্‌-শায়বানী (র) নিজ জীবনে পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছিলেন। ফলে 'আলিমগণ নিঃসংকোচে তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁর প্রশংসার জন্য ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর এই মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ عَيْنَاى مِثْلَ مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنْ، وَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ فِيْ زَمَانِهِ مِثْلَهُ. -'আমার চক্ষুদ্বয় মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এর মতো আর কাউকে দেখেনি এবং তৎকালে কোনো মহিলা তাঁর মতো সন্তান জন্ম দেয়নি।'

৭. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফি'ঈ (র)-কে বলতে শুনেছি,

مَا سَأَلْتُ أَحَداً مَسْأَلَةً إِلاَّ تَبَيَّنَ لِيْ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ إِلاَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.[৭৮]

-'আমি যে কেউ থেকে কোনো দীন ও জ্ঞানগর্ভ মাস'আলা শিখেছি তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান ব্যতীত প্রত্যেককে উত্তর দিতে চেহারা পরিবর্তিত দেখেছি।'

৮. ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (র) বলেন,

كَانَ مِنْ بُحُوْرِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ.[৭৯]

-'তিনি ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।'

৯. ইমাম আবূ বকর কাযী আহমাদ ইব্‌ন কামিল (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) সম্পর্কে বলেন,

أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ مَوْلَى لَبَنِيْ شَيْبَانَ، وَكَانَ مَوْصُوْفًا بِالْكَمَالِ، وَكَانَتْ مَنْزِلَتُهُ فِيْ كَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَالرَّأْيِ وَالتَّصْنِيْفِ لِفُنُوْنِ عُلُوْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَنْزِلَةُ رَفِيْعَةً يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ جِدًّا.[৮০]

-'আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান মাওলা বনূ শায়বান ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শিষ্য ছিলেন। তিনি গুণাবলীর অধিকারী, অধিক বর্ণনা ও পরিপক্ক অনুধাবনের বাহক, হালাল-হারামের বিবিধ-বিধানের অনুধাবন দক্ষতায় উঁচুস্থানের অধিকারী। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে সবিশেষ সম্মান দিতেন।'

১০. 'উমার রিযা কাহ্‌হালাহ্ (র) বলেন,

مُحَمَّد بن الْحَسَن بن فَرقد الشَّيْبَانِيْ بِالْوَلَاءِ، اَلْحَنَفِي (أَبُوْ عَبْدِ اللهِ). فَقِيْهٌ، مُجْتَهِدٌ، مُحَدِّثٌ.[৮১]

-'মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী (র) (ওয়ালা সূত্রে) আল-হানাফী, উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ্ ফকীহ্, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিছ ছিলেন।'

১১. এক ইয়াহূদী পণ্ডিত ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর 'আল-জামি'উল কাবীর' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,

هذَهِ عُلُوْمِ مُحَمَّدُ الصَّغِيْرِ فَكَيْفَ عُلُوْمِ مُحَمَّد الْكَبِيْرِ؟[৮২]

-'ছোট মুহাম্মাদের জ্ঞানই যদি এত বেশি হয়ে থাকে, তাহলে বড় মুহাম্মাদ তথা নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর জ্ঞান কত ছিল?'

ইন্তিকাল

মুহাম্মাদ (র) ৫৮ বছর বয়সে ১৮৯ হিজরী মোতাবেক ৮০৪ খ্রিস্টাব্দে রায় শহরে ইন্তিকাল করেন।[৮৩] হানীফ গাঙ্গুহী (র)-এর মতে 'ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।'[৮৪] ইব্‌ন সা'দ (র), ইব্‌ন যাইয়্যাত (র) ও খতীব আল-বাগদাদী (র) সহ অধিকাংশ ঐতিহাসিক ১৮৯ হিজরী সাল সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেন। কিছুসংখ্যকের মতে 'তিনি ১৮৮ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেছেন বলে মত পোষণ করেন।' তাদের মধ্যে রয়েছেন ইব্‌ন আবিল আওয়্যাম (র)। তবে তাঁদের এ মতটি সঠিক নয়।[৮৫]

আবূ 'আব্দুল্লাহ্ আস্-সামীরী (র) আল-মিরযাবানী (র) থেকে তিনি ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আরাফাহ্ আন্-নাহ্‌ভী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

مَاتَ مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ وَالْكِسَائِي بِالرَّيْ سَنَة تِسْع وَثَمَانِيْنَ وَمَائَة فَقَالَ الرَّشِيْد: دَفِنْتَ الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ بِالرَّى. وَسَبَقَ أَنَّهُ قِيْلَ مَاتَ مُحَمَّد ثُمَّ الْكِسَائِىْ بِعَهْدِهِ بِيَوْمَيْنِ.[৮৬]

-'মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও ইমাম কিসা'ঈ (র) ১৮৯ হিজরীতে রায় শহরে ইন্তিকাল করেন।' আর-রশীদ (র) বলেন, 'আমি রায় শহরে ফিক্‌হ ও 'আরবী সাহিত্যকে দাফন করে দিয়েছি।' পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, কারো মতে 'ইমাম মুহাম্মাদ (র) যে দিন ইন্তিকাল করেছেন, তার দুদিন পর ইমাম কিসা'ঈ (র) ইন্তিকাল করেন।'

আস্‌-সাম'আনী (র) বলেন,

مَاتَ مَعَهُ أَبُوْ الْحَسَنْ عَلِيْ بن حَمْزَةْ اَلْكِسَائِيْ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ رحمها الله تعالى، فَقَالَ الرَّشِيْد: دفنت اليوم اللغة وَالْفِقْه.[৮৭]

-'মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন হামযাহ্‌ আল-কিসা'ঈ (র) একই দিনে ইন্তিকাল করেন।' আর-রশীদ বলেন, 'আমি এ দিন ফিক্‌হ ও 'আরবী সাহিত্যকে দাফন করেছি।'

"আল-মুওয়াত্তা" পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর 'আল-মুওয়াত্তা' মূলত ইমাম মালিক (র)-এর 'আল-মুওয়াত্তা'-এর প্রতিলিপি। ইমাম মালিক (র)-এর নিকট অসংখ্য মুহাদ্দিছ ও ফিক্‌হবিদ হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন এবং তারা নিজস্বভাবে এর সংকলনও তৈরি করেন। কিন্তু সারা দুনিয়াতে তাদের কারো সংকলনেরই অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল তার দুই প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান আশ্‌-শায়বানী (র) (মৃত ১৩২ হি.) ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আন্দালূসী (র) (মৃত ১৩৪ হি.) সংকলন দুটিই আজ পর্যন্ত বর্তমান বহাল রয়েছে। ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া (র)-এর সংকলনটি 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক' নামে এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্‌-শায়বানী (র)-এর সংকলনটি 'মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ' নামে পরিচিত। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (র) বলতেই আমাদের দৃষ্টি যে কিতাবের দিকে চলে যায় তা হচ্ছে ইয়াহ্‌ইয়ার এই সংকলন যা কোনো কোনো মনীষীর মতে اَصَحَّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ. -'আল্লাহ্‌র কিতাবের পর সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ।' দুটি মুওয়াত্তাকে একই মায়ের দুই জমজ সন্তান বললেও অত্যুক্তি হবে না।[৮৮]

নামকরণ

আল-মুওয়াত্তা (اَلْمُوَطَّأ) শব্দটি وطء মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ পদদলন, প্রস্তুতকরণ ও সহজীকরণ। কোনো মানুষ নম্র, ভদ্র, কোমল আচরণের অধিকারী হলে 'আরবগণ বলে থাকেন, رَجُلٌ مُوَطَّأُ الأكناف। যে রাস্তা দিয়ে কোনো কষ্ট ছাড়া নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়, তাকে মুওয়াত্তা বলা হয়।[৮৯]

আবূ 'আব্দিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-কাসানী আল-ইস্পাহানী (র) বলেন,

قُلْتَ لأَبِيْ حَاتِمٍ الرَّازِي: لِمَ سُمِّي مُوَطَّا مَالِكٍ بِالْمُوَطَّا؟ فَقَالَ شَيْءٌ قَدْ صَنَّفَهُ وَوَطَّأَهُ لِلنَّاسِ، حَتَّى قِيْلَ مُوَطَّا مَالِكٌ.[৯০]

-'আমি আবূ হাতিম আর-রাযী (র)-কে মুওয়াত্তা নামকরণের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইমাম মালিক এটি রচনা করেন এবং মানুষের চলার পথ সহজ করে দেন। তাই একে 'মুওয়াত্তা' নামে অভিহিত করা হয়।'

ইমাম মালিক (র) যেসব হাদীছ ও আছার বর্ণনা করেছেন তা এক সাথে সন্নিবেশিত করে মদীনার সত্তর জন ফকীহ্‌ 'আলিমের সম্মুখে পেশ করেন। তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে তাঁর সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। এজন্যই তিনি এ গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'আল-মুওয়াত্তা'। অর্থাৎ সে কিতাব যাকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং যার পরিশুদ্ধিকরণ করা হয়েছে। হাদীছ বিশারদগণের পরিভাষায় আল-মুওয়াত্তাকে কিতাবুস্‌-সুনান বা 'সুনান গ্রন্থ' বলা উচিৎ। কিন্তু এর মধ্যে যেহেতু সনদযুক্ত ও সনদবিহীন উভয় প্রকারের

রিওয়ায়াত রয়েছে তাই শায়খ ইবনুস্ সালাহ্ আল-মুওয়াত্তাকে কিতাবুল জাওয়ামি' বা 'জামি' গ্রন্থ'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৯১]

ইমাম মালিক (র)-এর সকল শিষ্য এবং আল-মুওয়াত্তার সকল রাবী আল-মুওয়াত্তার কপি (নুসখাহ্) প্রস্তুত করেননি। তবে তাঁর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিষ্য এর কপি প্রস্তুত করেছেন। ইমাম রযীন আবদারী (র) كِتَابُ التَّجريد لِلصِّحَاح وَالسُّنَن গ্রন্থে এবং ইমাম দারা কুতনী (র) كِتَابُ إِخْتِلَافِ نُسَخِ الْمُوَطَّا গ্রন্থে এর বিভিন্ন নুসখার উল্লেখ করেছেন। শাহ্ 'আব্দুল 'আযীয দিহলভী (র) ও মুহাম্মাদ যাকারিয়্যাহ্ (র) 'আল-মুওয়াত্তা'র ১৬টি কপি (নুসখার) বিবরণ প্রদান করেন।[৯২] এ কপিসমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-লায়সী আল-আন্দালূসী (র)-এর কপি দুটিই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

আল-মুওয়াত্তা দুটির মধ্যে পার্থক্য

ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-আন্দালূসী (র) সংকলনটির প্রতিটি রিওয়ায়াত عَنْ مَالِكٌ (মালিকের সূত্রে) বলে সূচনা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি পুরো আল-মুওয়াত্তা তার নিকট থেকে শুনতে পারেননি। কারণ তিনি যে বছর তার সাহচার্যে আসেন সে বছরই ইমাম মালিক (র) (১৭৯ হিজরী সালে) ইন্তিকাল করেন। এজন্য তিনি মুওয়াত্তার কিছুসংখ্যক অনুচ্ছেদ মালিকের অপর ছাত্র যিয়াদের নিকট থেকে শুনেন এবং তার বর্ণনা এভাবে আরম্ভ করেছেন, حَدَّثَنِيْ زِيَاد عَنْ مَالِك 'যিয়াদ আমাকে মালিকের সূত্রে বলেছেন।' কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) পূর্ণ তিন বছর তাঁর সাহচর্য লাভ করেন এবং ইমাম মালিক (র) তাকে গোটা মুওয়াত্তা পড়ে শুনান। এটি ছিল ইমাম মালিক (র)-এর দরবারের একটি ব্যতিক্রম। কারণ ছাত্ররা তাকেই পাঠ করে শুনাতো, কিন্তু মুহাম্মাদ (র)-এর ক্ষেত্রে মালিক (র) নিজেই পড়ে শুনান। ইমাম মুহাম্মাদ (র) মালিক (র)-এর নিকট থেকে প্রায় সাতশত হাদীছ শ্রবণ করেন।

ইয়াহ্ইয়া (র)-এর সংকলনে অনেক অনুচ্ছেদে কোনো হাদীছের উল্লেখ নেই, শুধু ইমাম মালিক (র)-এর ইজতিহাদী মাস'আলা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সংকলনের প্রতিটি অনুচ্ছেদে হাদীছ অথবা আছার বিদ্যমান রয়েছে। অনন্তর ইয়াহ্ইয়ার সংকলনে কেবল মালিক (র)-এর রিওয়ায়াতই স্থান পেয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ (র)-এর সংকলনে অন্য শায়খদের রিওয়ায়াতও অন্তর্ভুক্ত আছে। এতে ইখতিলাফী মাস'আলার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দলীল আনা হয়েছে এবং এর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইয়াহ্ইয়ার সংকলনে তা নেই। তবে তার সংকলনের চর্চা ব্যাপক এবং বহুল বিস্তারিত।[৯৩]

'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র) ইয়াহ্ইয়া আন্দালূসী (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর 'আল-মুওয়াত্তা'র নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো বর্ণনা করেন,

১. ইয়াহ্ইয়া আন্দালূসী (র) 'মুওয়াত্তা'র কিছু অংশ ইমাম মালিক (র) থেকে এবং বেশি অংশ ইমাম মালিকের অন্যান্য ছাত্র থেকে শুনেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) সম্পূর্ণ মুওয়াত্তা শুনেছেন ইমাম মালিক (র) থেকে সরাসরি। আর সরাসরি শোনা যে, মাধ্যমে শোনার চেয়ে উৎকৃষ্ট, তা বলাই বাহুল্য।

২. ইয়াহ্ইয়া আন্দালূসী (র) ইমাম মালিক (র)-এর নিকট এসেছিলেন তাঁর ইন্তিকালের বছর। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) একাধারে তিন বছর তাঁর দারসে অংশগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, طَوِيْلُ الْمُلاَزِمَة-এর বর্ণনা قَلِيْلُ الْملازِمَة-এর বর্ণনার তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

৩. ইয়াহ্ইয়া (র)-এর মুওয়াত্তায় ফিক্হী মাস'আলা এবং ইমাম মালিক (র)-এর ইজতিহাদের উল্লেখ বেশি। অনেক অধ্যায়ে কোনো হাদীছ বা 'আছার' ব্যতীত শুধুমাত্র ইমাম মালিক (র)-এর ইজতিহাদ

উল্লেখিত হয়েছে, যা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মুওয়াত্তার মধ্যে নেই। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মুওয়াত্তায় প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে কোনো না কোনো হাদীছ অবশ্যই রয়েছে। আর অবিমিশ্রিত হাদীছ মিশ্র হাদীছের চেয়ে অবশ্যই উত্তম।

৪. ইয়াহ্‌ইয়া (র)-এর মুওয়াত্তার মধ্যে শুধুমাত্র ইমাম মালিক (র)-এর সূত্রের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মুওয়াত্তার মধ্যে অন্যান্য শায়খের রিওয়ায়াতসমূহও রয়েছে। এ বিরাট ফায়দাটি ইয়াহ্‌ইয়া (র)-এর মুওয়াত্তার মধ্যে নেই।

৫. ইয়াহ্‌ইয়া (র)-এর মুওয়াত্তায় শুধুমাত্র ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাবের অনুকূলে হাদীছসমূহ রয়েছে, যার কতগুলোর উপর কোনো কারণবশত হানাফী মাযহাবে 'আমল করা হয় না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মুওয়াত্তায় যে সমস্ত হাদীছ অনুপাতে হানাফী মাযহাবে 'আমল করা হয় না সেগুলো উল্লেখ করার পর ঐ সমস্ত হাদীছও উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো অনুপাতে 'আমল করা হয়, যা হানাফীদের জন্যে পরিতৃপ্তির কারণ।[৯৪]

আল-মুওয়াত্তার অনুসৃত পদ্ধতি

প্রত্যেক গ্রন্থগারের গ্রন্থ রচনার কিছু অনুসৃত পদ্ধতি থাকে। অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) তাঁর 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থটির রচনায় কিছুসংখ্যক অনুসৃত পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো,

১. ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থটি রচনায় সর্বপ্রথম 'তারজুমাতুল বাব' উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে ইমাম মালিক (র) থেকে রিওয়ায়াতটি مَرْفُوْع হোক বা مَوْقُوْف হোক তা উল্লেখ করেছেন।

২. হাদীছসমূহ উল্লেখের পর তার ফায়দা বা উপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন وَبِهٰذَا نَأْخُذُ অথবা وَبِهِ نَأْخُذُ -'আমরা এ মত গ্রহণ করেছি' বলে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের বাক্য এদিকে ইঙ্গিত করে যে, তিনি এ মতকেই গ্রহণ করেছেন বা তার উপরেই ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ (র) যদি ভিন্নমত পোষণ করতেন, সে ক্ষেত্রে তিনি অপরাপর রাবীর বর্ণিত হাদীছ পেশ করে ইমাম মালিক (র)-এর রিওয়ায়াতের উপর 'আমল না করার কারণ বলে দিতেন। অতঃপর তিনি নিজ মতের সপক্ষে সনদসহ হাদীছ উল্লেখ করতেন, ইমাম মালিক (র)-এর সনদ ব্যতীত।

৪. তিনি তাঁর মতামত উল্লেখের পর তাঁর ওস্তাদ ইমাম আবূ হানীফার সমর্থন এভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.[৯৫]

-'আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে যেন ওযূর পানির পাত্রে তার হাত ঢুকানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেয়। কেননা তার জানা নেই, ঘুমের ঘোরে তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।'

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ وَلَيْسَ مِنَ الأَمْرِ الْوَاجِبِ الَّذِي إِنْ تَرَكَهُ تَارِكٌ أَثِمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ.[৯৬]

-'ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ঘুম থেকে উঠে পানির পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেয়া উত্তম। তবে এটা ওয়াজিব নয় যে, কোনো ব্যক্তি তা লংঘন করলে গুনাহ্গার হবে।' ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই মত।'

তিনি নিজের মতামত উল্লেখ করার পর বলেন, فُقَهَاءُ وَالْعَامَّةُ مِنْ فُقَهَائِنَا -'এটি অন্যান্য ফিক্হবিদ ও আমাদের ফিক্হবিদগণের অভিমত।'

তবে যে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সমর্থন পাননি সে ক্ষেত্রে তা উল্লখ করেননি।[৯৭]

৫. তিনি তাঁর 'আল-মুওয়াত্তা' ও 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর কোনো মতামত তাঁর সমর্থনে বা বিপরীতে উল্লেখ করেননি।

৬. শিরোনামের ক্ষেত্রে তিনি কিতাব (كِتَاب) বা অধ্যায় (بَاب) শব্দ ব্যবহার করেন। فَصْل শব্দটি মাত্র দুটি স্থানে ব্যবহার করেছেন। এরপর وَبِهَذَا نَأْخذ -'আমরা এ মত গ্রহণ করেছি' বলে হানাফী মাযহাবকে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম মালিক (র)-এর বর্ণনা হানাফী মাযহাবের সমর্থনে না হলে সে সম্পর্কে আলোকপাত করে অন্যান্য শায়খের হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি সকল বর্ণনার ক্ষেত্রে কেবল أَخبَرَنَا শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ হাদীছ নিম্নরূপ,

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظُهُورِهِمَا لا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا، قَالَ: ثُمَّ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ فَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ.[৯৮]

-'মালিক (র) বলেন, হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র) বলেন, তিনি তাঁর পিতাকে মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাস্হ করতে দেখেছেন, তিনি মোজাদ্বয়ের নিচের দিক মাস্হ করেননি। অতঃপর তিনি মাথার পাগড়ী তুলে মাথা মাস্হ করেন।'

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ، نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَنَرَى الْمَسْحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لا يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَعَامَّةُ هَذِهِ الآثَارِ الَّتِي رَوَى مَالِكٌ فِي الْمَسْحِ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُقِيمِ، ثُمَّ قَالَ: لا يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.[৯৯]

-'ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, 'আমরা উল্লিখিত সব বর্ণনার উপর 'আমল করি এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) এ মত পোষণ করেন। মুকীম (নিজ আবাসে উপস্থিত) ব্যক্তির জন্য মোজার উপর মাস্হ করার সর্বোচ্চ সময়সীমা এক দিন এক রাত এবং মুসাফির (সফররত) ব্যক্তির জন্য তিনি দিন তিন রাত। ইমাম মালিক (র) বলেন, মুকীম ব্যক্তির মোজার উপর মাস্হ করা জায়েয নয়। অথচ ইমাম মালিক (র)-এর সূত্রে বর্ণিত সবগুলো হাদীছের মাধ্যমে মুকীম ব্যক্তির জন্য মোজার উপর মাস্হ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। এতদসত্ত্বেও তিনি মুকীম ব্যক্তির জন্য মোজার উপর মাস্হ করার সমর্থক নন।'

ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম মালিক (র)-এর যে মত উল্লেখ করেছেন তা তার প্রথম দিককার মত। কেননা ইমাম মালিক (র)ও মুকীম ব্যক্তির মোজার উপর মাস্হ করার প্রবক্তা। তবে তার [ইমাম মালিক (র)-এর] মতে মোজার উপর মাস্হ করার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। যতদিন ইচ্ছা মোজার উপর মাস্হ করা যেতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন হাদীছ থেকে জানা যায়, মুকীম ব্যক্তি এক দিন এক রাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাস্হ করতে পারে।[১০০]

৭. এখানে ফুকাহা বলতে তিনি 'ইরাকের ফিক্হবিদ এবং العامة বলতে তাদের অধিকাংশের মতকে বুঝিয়েছেন, আবার কোথাও তিনি কেবল ইবরাহীম আন্-নাখ'ঈর মত উল্লেখ করেন, কোথাও ইমাম আবূ হানীফার মত নকল করার সাথে সাথে ইমাম মালিক (র) ও অপরাপর ইমামের মতও উল্লেখ করেছেন। তিনি কোথাও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর রায়ের সাথে একমত পোষণ না করলে তার কারণও উল্লেখ করেছেন। যেমন,

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَرَّبَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لأَبِيهِ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُلْ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ.[১০১]

-'আবূ মুর্‌রা (র) থেকে বর্ণিত। 'আব্দুল্লাহ্ (রা) আইয়্যামে তাশরীকে ('ঈদুল আযহার দিনের পরের তিন দিন) তার পিতা 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর নিকটে গেলেন। তার সামনে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে 'আমর (রা) বলেন, 'খাও'। 'আব্দুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতাকে বলেন, 'আমি রোযা রেখেছি।' আমর (রা) বলেন, 'খেয়ে নাও। তুমি কি জানো না, রাসূলুল্লাহ্ এই কয়দিন রোযা না রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।'

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَامَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ لِمُتْعَةٍ، وَلا لِغَيْرِهَا، لِمَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَالْعَامَّةِ مِنْ قَبْلِنَا، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: يَصُومُهَا الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي لا يَجِدُ الْهَدْيَ، أَوْ فَاتَتْهُ الأَيَّامُ الثَّلاثَةُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.[১০২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, 'আমরা এ নীতি গ্রহণ করেছি। আইয়্যামে তাশরীকে (১১, ১২ ও ১৩ যিলহাজ্জ কারো রোযা রাখা ঠিক নয়, চাই সে তামাত্তু' হজ্জকারী হোক অথবা অন্য প্রকারের হজ্জকারী। কেননা নবী করীম (সা) এ কয়দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং আমাদের পূর্ববর্তী যুগের সাধারণ ফকীহ্গণ 'আলিমগণ এ মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, 'যে তামাত্তু' হাজ্জকারী কুরবানী করার জন্য পশু সংগ্রহ করতে পারেনি অথবা কুরবানীর পূর্বেকার তিন দিন (৭, ৮ ও ৯ যিলহাজ্জ) রোযাও রাখতে পারেনি, তার জন্য আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিন রোযা রাখা জায়েয।'

৮. গ্রন্থটির কোনো কোনো স্থানে مستحسن ,هذا جميل ও هذا حسن পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা তিনি মুস্তাহাব পর্যায়ের 'আমল বুঝাননি, বরং তা যে ওয়াজিব পর্যায়ের 'আমল নয় তা বুঝিয়েছেন। তা সুন্নাতে মুআক্কাদাও হতে পারে আবার গায়রি মুআক্কাদাও হতে পারে। আমরা এর অর্থ নিয়েছি 'উত্তম' ও 'ভালো'।

৯. তিনি কখনো কখনো لا بأس -'এতে কোনো দোষ নেই' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা কোনো কাজ করা যে জায়েয তা বুঝিয়েছেন। মুতাআখ্খিরীন 'উলামায়ে কিরাম এ শব্দটিকে 'মাকরূহে তানযিহী' বুঝানোর জন্যে ব্যবহার করে থাকেন।

১০. তিনি কখনো ينبغى -'উচিৎ' শব্দটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করেন। যার মধ্যে ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুআক্কাদা অর্ন্তভুক্ত থাকে।

১১. তিনি আছার (أَثَر) বা মারফূ‘ (مَرْفُوْعٌ), মাওকূফ (مَوْقُوْف) ও মাকতূ‘ (مَقْطُوْع) সব ধরনের রিওয়ায়াত বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। কতক আছার (أَثَرْ)-এর সনদ বর্ণনা না করে بلغنا বলে উদ্ধৃত করেন, যেগুলো মুহাক্কিক ‘উলামায়ে কিরামের নিকট মুসনাদ (مُسْنَدْ) বলে গণ্য হয়।[১০৩]

মুওয়াত্তা মুহাম্মাদের হাদীছ সংখ্যা

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর ‘আল-মুওয়াত্তা’য় বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ১১৮০টি। এর মধ্যে মারফূ‘, মাওকূফ এবং সব প্রকারের হাদীছ বর্ণিত আছে। তিনি ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র)-এর সূত্রে ১৩টি ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে ৪টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ‘আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র) মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদের সমস্ত বর্ণনা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করে বলেন,

جَمِيْعُ مَا فِيْ هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الأَحَادِيْثِ الْمَرْفُوْعَةِ وَالأَثَارِ اَلْمَوْقُوْفَةِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَمَنْ بّعْدَهُمْ، مُسْنَدَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُسْنَدَةٍ أَلْفٌ وَمِئَةٌ وَثَمَانُوْنَ، مِنْهَأ عَنْ مَالِكٍ أَلْفٌ وَخسْمَةٌ، وَبِغَيْرِ طَرِيْقِهِ مِأَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسْبْعُوْنَ، مِنْهَا عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَة ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَمِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ يُوْسُفَ أَرْبَعٌ وَالْبَاقِيْ عَنْ غَيْرِهِمَا.[১০৪]

-‘এ গ্রন্থে (মুওয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ) মুসনাদ (সনদসহ) ও গায়রি মুসনাদ (সনদ বিহীন)সহ মারফূ‘ (اَلْمَرْفُوْع) ও মাওকূফ (اَلْمَوْقُوْف) হাদীছের সংখ্যা সর্বমোট ১১৮০টি। এগুলোর মধ্যে ১০০৫টি ইমাম মালিক (র) সূত্রে বর্ণিত। অন্য সূত্র থেকে ১৭৫টি। তন্মধ্যে ১৩টি ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে, ৪টি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এবং অবশিষ্টগুলো অন্যান্য সূত্রে থেকে বর্ণনা করেছেন।’

মুওয়াত্তা মুহাম্মাদে কোনো মাওযূ‘ বা জাল হাদীছ নেই। এতে য‘ঈফ হাদীছ থাকলেও তা ভিন্ন সূত্রে সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ‘আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র) তাঁর ‘আল-মুকাদ্দামাহ্’ সমাপ্ত করেছেন এ বলে,

وَلَيْسَ فِيْ هَذَا الْكِتَابِ حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ، نَعَمْ فِيْهِ ضِعَافٌ، أَكْثَرُهَا يَسِيْرُةُ الضَّعْف، اَلْمُنْجَبِرُ بِكَثْرَةِ الْطُّرُقِ، وَبَعْضُهَا شَدِيْدَةُ الضُّعْف لَكِنَّهُ غَيْرُ مَضِرٍّ أَيْصًا لِوُرُوْدِ مِثْلِ ذَالِكَ فِيْ صِحَاحِ الطُّرُق.[১০৫]

-‘এ গ্রন্থে কোনো মাওযূ‘ বা জাল হাদীছ নেই। তবে এতে কিছু দুর্বল বা য‘ঈফ হাদীছ রয়েছে। যার অধিকাংশই সামান্য দুর্বলতা, যা কাছরাতুত্-তুরুক (বিভিন্ন সূত্র) দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। অল্প সংখ্যক অধিক দুর্বল হাদীছ রয়েছে কিন্তু তাও ক্ষতিকারক নয়, কেননা একই ধরনের হাদীছ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে।’

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর ‘আল-মুওয়াত্তা’র কপিতে ৪৩৮টি অধ্যায় (بَابٌ), ৫টি অধ্যায়সমষ্টি (أَبْوَاب), ১৩টি পর্ব (كِتَاب) ও ২টি অনুচ্ছেদ (فَصْلٌ) রয়েছে।

মুওয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সংকলিত ‘আল-মুওয়াত্তা’ গ্রন্থের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে ‘আলিমগণ বেশ কয়েকটি শারহ্ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ নিম্নরূপ,

ক. মোল্লা ‘আলী আল-কারী হারাবী মাক্কী (র) (মৃত ১০১৪ হি.) কর্তৃক রচিত ‘ফাতহুল মুগতিলা বি শারহিল মুওয়াত্তা’। এটি দুখণ্ডে রচিত। এ গ্রন্থে রাবীদের ‘তানকীদে’ গ্রন্থকারের অনেক বেশি বিচ্যুতি ঘটেছে।[১০৬] গ্রন্থটির হস্তলিপি পাণ্ডুলিপিটি ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

খ. ইব্রাহীম পীরিযাদা (র) (মৃত ১০৯৯ হি.) 'শারহুল মুওয়াত্তা' বা মুওয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এটি বিশাল দুখণ্ডে সমাপ্ত। এর একটি কপি ইস্তাম্বুলের পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।

গ. মাওলানা 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র) (মৃত ১২০৪ হি.) 'আত্-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ 'আলাল মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ পাদটীকা রচনা করেছেন। এ গ্রন্থটির বহুসংখ্যক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[১০৭]

গ. হাফিয কাসিম ইব্ন কুতলূবুগী (র) (মৃত ৮৭৯ হি.) 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থের রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

উপসংহার

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী (র) একজন হাদীছবেত্তা, ফকীহ্ ও উসূল শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি মিসরীয় বংশোদ্ভূত, 'ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মজলিসে দুবছর শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)সহ বহুসংখ্যক উস্তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র)সহ অনেকে তাঁর নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফিক্হ শাস্ত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ আলোকপাত করার কারণে তাঁর ফিক্হী মাস'আলাসমূহ অন্যদের ফিক্হচর্চার মূল উপাদানে পরিণত হয়। তিনি হাদীছ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন ও উসূল থেকে ফুরূ'আত ইস্তিম্বাতের মাধ্যমে হানাফী মায্হাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর লেখনির মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের গবেষণাসমূহকে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। তিনি 'আল-মুওয়াত্তা' নামে একটি হাদীছের গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থটির বিন্যাস পদ্ধতি অনন্য ও অসাধারণ। এতে তিনি মুলত ইমাম মালিক (র) থেকে শ্রবণকৃত "আল-মুওয়াত্তা"ই সংকলন করেছেন। তবে এখানে হাদীছ বর্ণনার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজের মতামত ও ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র)-এর মতামত ব্যক্ত করেছেন। যাতে ফিক্হী মাস'আলাসমূহ পরিস্ফুটিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. আস্-সাম'আনী, 'আব্দুল করীম ইব্ন মুহাম্মাদ, *আল-আনসাব*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারূল ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪৮২।

২. ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্রিস্ত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩৪৫; 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কুতায়বাহ্ (র) বলেন, مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَن اَلْفَقِيْه يَكْنَى أَبَا عَبْدِ الله. দ্র. *আল-মা'আরিফ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২৮০।

৩. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ১৭২।

৪. তিনি শায়বানী বংশের আযাদকৃত ছিলেন বলে তাঁকে শায়বানী নিসবতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

৫. *আল-মা'আরিফ*, পৃ. ২৮০; *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ৩৪৫; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযাম ফী তাওয়ারীখিল-মুলূকি ওয়াল-'উমাম*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ১৪১৫ হি. /১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫৩২; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল 'আইয়ান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু-ইহ্ইয়াইত্-তুরাছিল-'আরাবী, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হি. /১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩২২; ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, *শাযারাতুয যাহাব*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি) পৃ. ৩৩২; ড. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ২০৩।

৬. *ওয়াফায়াতুল 'আইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২।

৭. পূর্বোক্ত।

৮. কার্ল ব্রুকেলম্যান, *তারীখুল আদাবিল ‘আরাবী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা‘রিফাহ্, তা. বি.), পৃ. ২৪৬।

৯. মূল ‘আরবী ভাষ্য, أصله دمشقي من أهل قرية تسمى حرستا، قدم أبوه العراق فولد مُحَمَّد بواسط.

দ্র. *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২; *আল-আনসাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।

১০. আয্-যাহাবী, মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন, *সিয়ারু আ‘লামিন্-নুবালা*, ৯ম খণ্ড (বৈরূত: মু’আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১২৫; *তারীখুল আদাবিল ‘আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬।

১১. *ওয়াফায়াতুল ‘আইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২; ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১০ম খণ্ড (বৈরূত: দারু-ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল-‘আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৪৫।

১২. খতীব আল-বাগদাদী (র) বলেন, .ونشأ بالكوفة -‘তিনি কূফায় লালিত-পালিত হন।’

দ্র. *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২।

১৩. *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ৩৪৫; ‘উমার রিযা কাহ্হালাহ, *মু‘জামুল মু‘আল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: মু’আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২২৯; ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কুতায়বাহ্ (র) বলেন, .وَنَشَأَ بِالْكُوْفَةِ وَطَلَبَ الْحَدِيْثَ

দ্র. *আল-মা‘আরিফ*, পৃ. ২৮০।

১৪. ইব্ন বায্যায, *মানাকিবুল ইমামিল আ‘যম আবী হানীফা*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ১৫৫।

১৫. *আল-মা‘আরিফ*, পৃ. ২৮০; *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ৩৪৫; ইব্ন বায্যায করদরী (র) বলেন, كَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ الإِمَامِ فِيْ الصَّفِّ الرَّابِعِ. দ্র. *মানাকিবুল ইমামিল আ‘যম আবী হানীফা*, ২য় খণ্ড, পৃ ১৫৫।

১৬. তিনি দুবছর ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র)-এর মাজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ড. আহমাদ আমীন বলেন,

وأخذ العلم عن ابى حنيفة ولكن الظاهر أنه لم يصاحبه طويلاً، فقد مات ابو خنيفة وعمر مُحَمَّد نحو ثمان عشرة سنة وتتلمذ ايضًا لأبى يوسف

দ্র. *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড (কায়রো: আল-মাকতাবাতুন-নাহদাহ্, তা. বি.), পৃ. ২০৩।

১৭. ‘আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র) বলেন,

وحضر مجلس ابى حنيفة سنين ثم تفقه على ابى يوسف

দ্র. *মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ্* (দেওবন্দ: মাকতাবাতু রাশীদিয়্যাহ্, তা. বি.), পৃ. ১৩।

১৮. *মানাকিবু ইমামিল আবী হানীফা ওয়া সাহিবায়হী*, পৃ. ৫০।

১৯. *আল-আনসাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; *তাহ্যীবুল আসমা’ ওয়াল লুগাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।

২০. *আল-মা‘আরিফ*, পৃ. ২৮০; *আল-ফিহ্রিস্ত*, পৃ. ৩৪৫; ‘আরবী ভাষ্য,

وسمع العلم بها من أبي حنيفة، ومسعر بن كدام، وسفيان الثوري، وعمر بن ذر، ومالك بن مغول. وكتب أيضا عن مالك بن أنس، وأبى عمرو الأوزاعي، وزمعة بن صالح، وبكير ابن عامر، وأبى يوسف القاضي، وسكن بغداد وحدث بها.

দ্র. *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২।

২১. *মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ্*, পৃ. ১৩; আবু ছা‘ঈদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭৬; সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১১১।

২২. *সিয়ারু আ‘লামিন্-নুবালা*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

২৩. ড. ওয়াহ্বাতুয্-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩০।

---

[২৪]. *যাফরুল মুহাস্সিলীন*, পৃ. ৯৪-৯৫।

[২৫]. মুহাম্মাদ যাহিদ আল-কাওছারী, *বুলূগুল আমানী* (হিমস্: রাতিব হাকিমী, ১৩৮৯ হি.), পৃ. ৪৫-৪৬।

[২৬]. হাফিয আল-মিয্যী, *তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, ২৪শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ৩৫৭; হাফিয ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) বলেন, رَوَى عَنْهُ الشَّافِعِيُّ. -'ইমাম শাফি'ঈ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।'

দ্র. *লিসানুল মীযান*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ১২১।

[২৭]. আবূ 'আব্দিল্লাহ্ হুসায়ন ইব্ন 'আলী আস্-সয়মুরী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া সাহিবিহী* (হায়দারাবাদ: ইহ্ইয়াইল মা'আরিফ আন্-নু'মানিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৪ হি.), পৃ. ১২১।

[২৮]. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন

أَخَذَ عَنْهُ: الشَّافِعِيُّ، فَأَكْثَرَ جِدّاً، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَهِشَامُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَحْمَدُ بنُ حَفْصٍ فَقِيْهُ بُخَارى، وَعَمْرُو بنُ أَبِي عَمْرٍو الحَرَّانِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ مُسْلِمٍ الطُّوْسِيُّ، وَآخَرُوْنَ.

দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৪।

[২৯]. *আল-আনসাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; খতীব আল-বাগদাদী (র) বলেন,

فروى عنه مُحَمَّد بن إدريس الشافعي، وأبو سليمان الجوزجاني، وهشام بن عبيد الله الرازي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وإسماعيل بن توبة وعلي بن مسلم الطوسي، وغيرهم.

দ্র. *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২।

[৩০]. ড. 'আলী আহমাদ আন্-নদভী, *আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান আশ্-শায়বানী* (দিমাশক: দারুল কালাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫৫-৯১।

[৩১]. *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪; সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৮শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭৯; *ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৭৩; 'আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র) বলেন,

وكان الرشيد قد ولاه قضاء الرقة ثم عزله وقدم بغداد ولم يزل هولازمًا للرشيد حتى خرج الى الرئ الأولى فخرج معه ومات يرنبوية من قرى الرى فى سنة تسع وثمانين ومائة

দ্র. 'আব্দুল কাদির আল-কারশী, *আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ্*, ৪র্থ খণ্ড (মিশর: 'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ১৪।

[৩২]. মূল 'আরবী ভাষ্য,

إِذْ أَقْبَلَ الرَّشِيدُ فَقَامَ إليه النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ثَقِيلَ القلب (ممتلئ البطن) عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، فَقَامَ وَدَخَلَ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِ الْخَلِيفَةِ، فَأَمْهَلَ الرَّشِيدُ يَسِيرًا ثُمَّ خرج الآذن. فقال محمّد ابن الحسن. فجزع أصحابه له فَأُدْخِلَ فَأَمْهَلَ، ثُمَّ خَرَجَ طَيِّبَ النَّفْسِ مَسْرُورًا فَقَالَ: قَالَ لِي مَالَكَ لَمْ تَقُمْ مَعَ النَّاسِ؟ قُلْتُ: كَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ عَنِ الطَّبَقَةِ الَّتِي جَعَلْتَنِي فِيهَا، إِنَّكَ أَهَّلْتَنِي لِلْعِلْمِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى طَبَقَةِ الْخِدْمَةِ الَّتِي هي خارجة منه.

দ্র. *তারীখু বাগদাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২।

[৩৩]. *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৫; *আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২০৩।

[৩৪]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৭৯; 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র) বলেন, وجرى بينه وبين الامام الشافعى رح مجالس

দ্র. *মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ্*, পৃ. ১৪।

[৩৫]. *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৩; 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র) বলেন,

وطلب الحديث وسمع عن مسعر ومالك والاوزاعى والثورى

দ্র. *আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ্*, পৃ. ১৪।

[৩৬]. *যাফরুল মুহাস্-সিলীন*, পৃ. ৯৭।

[৩৭]. *'আকীদাতুত্-তাহাবী মা'আল হাওয়াশি ওয়ায্-যিয়াদাহ্*, পৃ. ২৬।

[৩৮]. এটি একটি পরিভাষা।

[৩৯]. *রুসমু আল-মুফতী*, পৃ. ১৯; ইব্‌ন 'আবিদীন, *রাসাইলু ইব্‌ন 'আবিদীন* (বৈরূত: দারুল কুতুব, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭।

[৪০]. *তারীখুত্-তুরাছিল 'আরাবী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫; হাজী খলীফাহ্, *কাশফুয্-যুনূন*, ১ম খণ্ড (ইস্তাম্বুল: আল-মাতবা'আতুল বাহিয়্যাহ্, ১৩৬০ হি.), পৃ. ৩১৮।

[৪১]. *রুসমুল মুফতী*, পৃ. ১৭; *ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)*, পৃ. ২৮৯-২৯০।

[৪২]. *আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ্ ফী তারাজিমুল হানাফিয়্যাহ্*, পৃ. ২১৬।

[৪৩]. *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭-২৪৮।

[৪৪]. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

[৪৫]. ইব্‌ন 'আবেদীন, *রুসমুল মুফতী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯; *বুলূগুল আমানী*, পৃ. ৬২।

[৪৬]. ইব্‌ন 'আবেদীন, *রুসমুল মুফতী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।

[৪৭]. *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন*, পৃ. ৯৭।

[৪৮]. *বুলূগুল আমানী*, পৃ. ২৩।

[৪৯]. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮-১৭৯।

[৫০]. *ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)*, পৃ. ২৮৭।

[৫১]. *ইমাম মুহাম্মাদ*, পৃ. ৯৪।

[৫২]. মুহাম্মাদ আবূ যুহ্‌রাহ্, *আবূ হানীফাতা, হায়াতুহু ওয়া আছারুহু আরাউহু ওয়া ফিক্‌হুহু* (কায়রো: দারুল ফিক্‌রুল 'আরাবী, তা. বি.), পৃ. ২৩৮।

[৫৩]. ইব্‌ন নাসিরুদ্দীন, *ইতহাফুস্ সালিক বিরুওয়াতি মুওয়াত্তা মালিক* (মক্কা: জামি'আহ্ উম্মুল কুরা, বিরকম ৮২০), পৃ. ৪৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মানাকিবু আবূ হানীফা ওয়া সাহিবায়হি* (বৈরূত: ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৮৪।

[৫৪]. আল-হুসায়রী, *মুকাদ্দামাতুল ওয়াজীয শারহুল জামি'উল কাবীর*, পৃ. ১।

[৫৫]. যায়নুদ্দীন ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন নুজায়ম, *আল-বাহরুর রাইক শারহু কানযুদ্-দাকাইক*, ১ম খণ্ড (মিশর দারুল 'কিতাবিল ইসলামী, তা. বি.), পৃ. ২৫১।

[৫৬]. ইব্‌ন 'আবেদীন, *রিসালাতু রুসমু আল-মুফতী*, পৃ. ১৯।

[৫৭]. *ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)*, পৃ. ২৯৭।

[৫৮]. *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৪।

[৫৯]. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী, *কিতাবুল হুজ্জাত 'আলা আহলিল মদীনাহ্*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: 'আলামুল কুতুব, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ২৩-২৪।

[৬০]. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩-২০৭।

[৬১]. *বুলূগুল আমানী*, পৃ. ৬৫; সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয্-যুবায়দী, *ইত্তিহাফু আস্-সাদ্দাহ্ আল-মুত্তাকীন*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইয়াহ্ইত্-তুরাছিল 'আরাবী, তা. বি.), পৃ. ২৯৯।

[৬২]. *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৫৭।

[৬৩]. *আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্‌-শায়বানী*, পৃ. ১৪৮।

[৬৪]. *ইত্তিহাফু আস্‌-সাদ্দাহ্‌ আল-মুত্তাকীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৯।

[৬৫]. *বুলূগুল আমানী*, পৃ. ৬৪।

[৬৬]. *বুলূগুল আমানী*, পৃ. ৬৫; *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬

[৬৭]. 'আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র) বলেন, وقيل إنه ضيف تسعمائة وتسعين كتابًا كلها فى العلوم الدينية

দ্র. *মুকাদ্দামাতুল হিদায়াহ্*, পৃ. ১৪।

[৬৮]. *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭-২৫৭।

[৬৯]. মাওলানা তাইয়্যেব, *'আকীদাতুত্ তাহাভী মা'আল হাওয়াশি ওয়ায্‌-যিয়াদাহ্* (দেওবন্দঃ মাদমুদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ২৭।

[৭০]. পূর্বোক্ত।

[৭১]. পূর্বোক্ত।

[৭২]. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

[৭৩]. পূর্বোক্ত।

[৭৪]. শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, *মানাকিবু আবী হানীফাহ্ ওয়া সাহিবীহি*, পৃ. ৮০।

[৭৫]. পূর্বোক্ত।

[৭৬]. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

[৭৭]. সায়মূরী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসাবিহী*, পৃ. ১২৩; ইব্‌ন বায্‌যায করদরী, *মানাকিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

[৭৮]. সায়মূরী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসাবিহী*, পৃ. ১২৫।

[৭৯]. ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, *লিসানুল মীযান*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২১।

[৮০]. সায়মূরী, *আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসাবিহী*, পৃ. ১৩০।।

[৮১]. *মু'জামুল মু'আল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৯।

[৮২]. *কাশফুয্‌-যুনূন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮১।

[৮৩]. *আল-ফিহ্‌রিস্ত*, পৃ. ৩৪৫; 'আরবী ভাষ্য, .وَهُوَ ابن ثَمَان وَخَمْسِيْنَ سَنَة দ্র. *আল-আনসাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪।

[৮৪]. মুহাম্মাদ হানীফ গাঙ্গুহী, *যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বিআহ্‌ওয়ালুল মুসান্নাফীন* (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ৯৬।

[৮৫]. *বুলূগুল আমানী*, পৃ. ৭২।

[৮৬]. পূর্বোক্ত।

[৮৭]. *আল-আনসাব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৪।

[৮৮]. মুহাম্মাদ আশ্‌-শায়বানী, *মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা (ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, ২য় প্রকাশ, ১৪৩৬ হি./২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২১-২২।

[৮৯]. ড. ইবরাহীম আনীস, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (কায়রোঃ মাজমা'উল লুগাত আল-'আরাবিয়্যাহ্, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ১০৪১।

[৯০]. মুহাম্মাদ আব্দুল হাই আল-লক্ষ্ণৌভী,*আত্-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ 'আলা মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ* (লক্ষ্ণৌঃ আল-মুস্তাফাঈ, ১২৯৭ হি.), পৃ. ১৪।

[৯১]. *মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা, পৃ. ২২।

[৯২]. শাহ্ ‘আব্দুল ‘আযীয দিহলভী, *বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন*, পৃ. ২৯-৩০; মুহাম্মাদ যাকারিয়্যাহ্, *আওজাযুল মাসলিক ইলা মুওয়াত্তা মালিক*, ১ম খণ্ড (সাহরানপুর: মাকতাবাহ্ আল-ইয়াহ্ইয়াহ্, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ২২-২৪।

[৯৩]. পূর্বোক্ত, ২২।

[৯৪]. *আত্-তা‘লীকুল মুমাজ্জাদ ‘আলা মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ*, পৃ. ৩৪-৩৫; *যাফরুল মুহাস্সিলীন বিআহ্ওয়ালুল মুসান্নাফীন*, পৃ. ৯৮-৯৯; শায়খুল হাদীছ মাওলানা সালীমুল্লাহ্ খান, *বিশ্ববিখ্যাত নয়জন মুহাদ্দিস ও তাঁদের সংকলিত কিতাবুল হাদীস পরিচিতি*, অনুবাদ মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.), পৃ. ২৪৮-২৪৯।

[৯৫]. *মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ*, হাদীছ নং ৫, পৃ. ২৭।

[৯৬]. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।

[৯৭]. *আত্-তা‘লীকুল মুমাজ্জাদ*, পৃ. ৪০-৪১।

[৯৮]. *মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ*, হাদীছ নং ৪৭, পৃ. ৪০-৪১।

[৯৯]. পূর্বোক্ত।

[১০০]. পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১০, পৃ. ৪১।

[১০১]. *আল-মুওয়াত্তা*, পৃ. ১৯৮।

[১০২]. পূর্বোক্ত।

[১০৩]. *আত্-তা‘লীকলু মুমাজ্জাদ*, পৃ. ৩৯-৪০।

[১০৪]. পূর্বোক্ত।

[১০৫]. পূর্বোক্ত।

[১০৬]. *মুকাদ্দিমাতুত্-তা‘লীকুল মুমাজ্জাদ*, পৃ. ২৫-২৬।

[১০৭]. *মুকাদ্দিমাতুত্-তা‘লীকুল মুমাজ্জাদ*, পৃ. ২৫-২৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

Muslim Occupation of Spain (al-Andalus) and the Policy of Islamization

Dr. Md. Rafiqul Islam*

[Abstract: Spain was occupied by the Muslims in 711 A.C. The condition of the Spanish people under Gothic rule was a very miserable one before the conquest. When the Muslims had come to Spain with noble ideals of Islam, the downtrodden people hailed the new comers as their saviors from cruel oppression of the then rulers. Warm welcome of the conquered community might have tempted the Muslims to settle in Spain. As a result, many Muslim scholars began to come from the East gradually and settled in various places of Spain with the intention of diffusing Islamic teachings. To Islamize Spain they erected many mosques and *maktabs* where they founded their colonies. After all, the Umayyad caliph, Hishām b. ‘Abd al-Raḥmān (788-796 A.C.) made Arabic the official language and a medium of education. In addition, the historical background of Muslim occupation of Spain along with the policy of Islamization of the territory taken by the then (Muslim) rulers have been mentioned in the concluding remarks under study in the Article]

Introduction:

Muslim Spain denotes the Iberian peninsula, i.e. modern Spain and Portugal. Before the conquest, the condition of the Spanish people, especially the lower classes under Gothic rule was a very miserable one. The Christian clergy had a preponderating influence in the state affairs and they took the advantage of their power to persecute the common people, especially the Jews. As a result, when the Muslims had come to Spain with noble ideals of Islam, the downtrodden people hailed the new comers as their deliverers from such cruel oppression. Warm welcome like this from the conquered community might have tempted the Muslims to take their abode in Spain for the betterment of their future. The rulers of Spain by their generous patronage of Islamic cultural activities attracted the Muslim notabilities of the East to settle in Spain. Gradually, many Muslim scholars came and settled in various places of Spain. Because, their first and foremost target was to preach Islam all over Spain. To Islamize Spain the Muslims erected many mosques and *maktabs* in their respective localities. Moreover, the Muslim rulers won the hearts of the Spaniards. As a result, the Spanish people started to embrace Islam in flocks. These converted Muslims are called ‘*the Musalima’* and their successors are termed as ‘*the Muwalladūn’*. With the passage of time, this converted Muslims and their offspring became the backbone of Muslim community in the country. After all, the Umayyad caliph, Hishām b. ‘Abd al-Raḥmān (788-796 A.C.) made Arabic the official language and a medium of education. Thus, Arabic language became so popular that every inhabitant of Spain had learned it as a medium of expression and for daily communications. The then rulers along with their generals, governors and officials took positive steps to the

* Professor, Department of Islamic Studies, Rajshahi University.

spreading of Islamic knowledge to all the corners of Muslim Spain. Now, I would like to discuss here about the conquest and the Islamization of Spain elaborately.

Discussion:
Spain known to the Arab geographers as al-Andal[1] is situated in the Iberian Peninsula (i.e. modern Spain and Portugal) at the south west of Europe.[2] The Peninsula has a unique geographical location encompassing by natural boundaries on all sides. On its south stands Gibraltar which is only 18 miles wide at its narrowest part from the mainland of North Africa. On the North the Peninsula is separated from France and the rest of Europe by the Pyrenees Chains spreading up to 300 miles. On the East and West it is surrounded by the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean respectively.[3] The country symbolizes an area of transition between African and European continents and is connected to Asia by the Sea of Mediterranean.

The Islamic Empire expanded to a great extent within a century of Hijrah. It extended from the Hindu Kush in the East to the Atlantic coast in the West. The Muslims emerged with flying colours ultimately through beating the sedentary and nomadic Berbers and accommodated themselves in Tunisia. As in 698 A.C the Byzantines were exiled from their Capital Carthage in North Africa, just after two years the victorious Muslims attempted to enter into Algeria and Morocco.[4] The sedentary Berbers prevailing there could in no way resist Mūsā b. Nuṣayr, who was appointed the Governor of Tunisia in 708 A.C. He was directly responsible to the Umayyad Caliph and earlier to the administrative of Qayrawān, the North African Muslims capital.[5] It is stated by Ameer Ali that the neighbouring Iberian Peninsula cried out in agony under the domination of Visigoths while the North-West Africa excelled in gaining worldly and spiritual prosperity enjoying the blessings of tolerance and justice under Muslim rule.[6] The Gothic Kings could bring no changes; rather they just followed their venomous predecessors like the Suevi and the Vandals. In fact, the Goths possessed Spain for about three centuries (409-712 A. C.). Nevertheless, they could not do away with the injustice and misrule planted by the last of the Caesars.[7] Horribly enough, they put the inhabitants in much worse situation and proved to have founded an administration of sheer devastation, massacres, political assassinations and above all, intestinal wars among the invading Barbarians.[8] Until Recardo ascended the throne and established a hereditary monarchy, no sign of peace traced there. Very soon, the nobles sought for election that is why chaos in every step seemed apparent. In fine, the Visigothic monarchy proved nothing more than an aggravation of Roman Empire.[9]

1. The Conquest of Spain
At the beginning of the Muslim conquest, the Spanish people passed very miserable life under the Gothic rule. The lower classes mostly Jews, serfs and slaves were much oppressed, devastated and massacred by their misrule.[10] The common people especially the Jews were persecuted by the Christian clergy who had an overwhelming influence in state affairs.[11] The Jews and slaves many of whom migrated to North-Africa for a secured life, and to escape from the ruling authorities

of their land who oppressed them. As a result these downtrodden people had been waiting for a saviour who would rescue them from the hand of the oppressors. They looked upon the Muslims as their saviours and benefactors and believed that the Muslims could rescue them from such beastly cruelty.[12] That is why the Spaniards joined hands with the Muslim invaders and rendered every possible help to them to enable them to complete the conquest of Spain within a short time.[13] It is clear from the statement mentioned above that the Spaniards did not resist the invasion of the Arabs who invaded with incomparable and noble ideals of Islam. Actually, the miserable socio-political condition of Spain was a contributory factor for the invasion which hurried the Muslim conquest.

Another vital issue for the conquest of Spain was 'the Ceuta' fort which was situated in the North-Eastern region of Morocco, under the king, Witiza of Visigothic Spain.[14] His son-in-law, Count Julian was the commander-in-Chief of this fort. Count Julian was the governor of both Ceuta and Algiars and he defended the Muslim invasion many times.[15] But a sudden event hurried the Muslim conquest in Spain. According to the custom of Goth dynasty, the children of the ruling elite were sent in the palace under the supervision of the palace authorities in order to learn the royal etiquette.[16] In this time the political scenario of Spain was much degrading and frustrating. Moreover, Roderick possessed the throne as a result of palace conspiracy by killing the Gothic king, Witiza and expelled his son, Achila from the Capital City, Toledo to Galicia.[17] Though Roderick was the killer of Count Julian's father-in-law, he sent his daughter, Florinda to the palace for her improvement and education.[18] Roderick was charmed by her attractive beauty. So, he took her to his quarters by force and then she became pregnant by him.[19] Having heard the news, Count Julian hurried to the palace at Toledo and took her away.[20] In order to take revenge, he contacted with the Spanish refugees in their march to free their country from the grasp of the usurper and rendered updated information about the internal whereabouts of Spain to Mūsā b. Nuṣ ayr, the governor of North Africa. He also requested Mūsā to invade Spain and for this he promised to give him all possible helps.[21]

1.1 First Expedition

Considering the situation, Mūsā responded to the urge of Count Julian and the Spanish refugees, and sought permission of *Khalīfah* Walīd b. 'Abd al-Mālik of Damascus in order to launch an expedition into Spain. It was permitted to be only a small and sudden attack.[22] Accordingly, Mūsā assigned Ṭārif b. Mālik with total five hundred Berbers; four hundred foot and one hundred horse in July 710 to conduct a survey and gather information in the southern coast of the Peninsula. They entered into Spain in four vessels and supplied favourable reports.[23] Where he landed was an island and subsequently it was named *Ṭārifah* in accordance with his name. Victoriously he attacked the regions of Algeciras and came back with huge number of prisoners and plenty of wealth. Since then nothing mentionable could be known about him.[24]

According to the account of Ṭabarī, before this the Muslims invaded Spain in the reign of Ḥaḍrat ‘U<u>th</u>mān ®. Being Caliph, he took steps to conquer Spain. Fixing the targets, the Caliph commissioned the two chiefs of Banī Fihr named ‘Abd Allāh b. Nāfi‘ b. al-Ḥuṣayn and ‘Abd Allāh b. Nāfi‘ b. ‘Abd al-Qays to invade Spain by sea in 27 A.H. They got the Arabs and the Berbers of North Africa under their command to discover the way to Constantinople and to find the means for their conquest.[25] On this occasion ‘U<u>th</u>mān ® is reported to have addressed a letter to the invading force. In the course of the letter, ‘U<u>th</u>mān ® said, “ اما بعد فان القسطنطنية انما تفتح من قبل الاندلس و انكم ان فتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الاجر و السلام" - “Constantinople will be conquered from the side of Spain. If you conquer Spain, surely you will share the reward and commendation with the conquerors of Constantinople.[26] However, they stepped on the main land of Spain through the Mediterranean Sea. In this way, the arrival of the Muslims in Spain was a notable event in the history of Islam.[27]

The Muslims of North Africa were much helpful to their brethren in Spain. But when they continued to follow their evil ways, the relation between them was snapped. After that no information about those evil doers and their whereabouts was known.[28] With the passage of time, the Caliph’s representatives might have settled there to preach Islām. The Caliph was not able to take any more steps for the plan as he faced some internal problems.[29]

1.2 Second Expedition

The credit of the conquest of Spain goes to Ṭāriq b. Ziyād, a great Muslim general and a native of North Africa. Another Muslim general was Mūsā b. Nuṣayr. Ṭāriq’s father Ziyād was a personal servant of Mūsā. Ziyād being a very brave person, took part in many battles along with his master and several times he saved his life. To honour his loyalty and gallantry, Mūsā made him his deputy. Ziyād was wounded in a battle and died. So, Mūsā took Ṭāriq and his mother under his protection. Mūsā trained Ṭāriq in military affairs and rose to the rank of general by virtue of his bravery and remarkable military achievements.[30]

In April 711, Ṭāriq b. Ziyād, the governor of Tangiers was sent to Spain by Mūsā ibn Nuṣayr with a regiment of 7000 soldiers having Berbers in major number. Imbued with the strength of faith and spirit of *Jihād,* Ṭāriq led a small force of seven thousand Berbers and Arabs to invade Spain. Later on, the forces were increased to twelve thousand.[31] Ṭāriq landed at the shores of Spain near a mountain which later took his name *Jabal al-Ṭāriq,* Gibraltar and took it the base of operation from which he marched to the North subsequently.[32] Count Julian supplied four merchant vessels for the help of the Muslim army. On the eve of the battle Ṭāriq directed his troops with the following words: “My brethren, the enemy is before you, the sea is behind; whither could you fly? Follow your general; I am resolved either to lose my life or to trample on the prostrate king of Romans.”[33] When Roderick came to know about Ṭāriq’s landing at Gibralter, he sent a large number of well-equipped soldiers (near about one lac). Though the forces of the Muslims was small compared to that of

Roderick, Ṭāriq led a bloody war against him (Roderick) in the historic battle of Guadalete and routed the host of Gothic completely after a fierce battle of one week. Roderick was killed drowning in the river Guadilquiver.[34] This victory disorganized the Spaniards. Then Ṭāriq made a quick journey towards the North. Following a magnificent victory, Ṭāriq conquered several other cities including the Capital City, Toledo.[35] In Ecija the broken forces of Roderick made some resistance against Ṭāriq but they failed and surrendered to some honourable terms.[36] With the loss of Ecija, the Spaniards lost their moral strength and did not have much courage to face the Muslims again. Within one year Ṭāriq conquered the Southern Spain.[37]

1.3 Arrival of Mūsā

After learning about the victory of Ṭāriq, Mūsā with an army of 18 thousand soldiers, rushed to join with Ṭāriq to expand their conquest towards Europe in Rajab, 93 A.H. Count Julian also joined with this expedition for the purpose of helping Mūsā b. Nuṣayr with many Christian princes.[38] In this expedition, Mūsā conquered all the cities on his way and joined the forces with Ṭāriq near Toledo.[39] Mūsā and Ṭāriq together launched the victory to as far as Narbone in the north, Barcelona in the east and Galicia in the west. In this way all the intermediate provinces came under their control.[40] Thus within three years almost the whole of Spain came to be ruled by the Muslims.

1.4 Departure of Mūsā and Ṭāriq

Mūsā was still ready to continue his invasion toward France when Caliph Walid sent him a letter by a messenger named Abū Naṣr and called him back to Damascus. By the order of the Caliph Walīd, Mūsā and Ṭāriq started to go towards Damascus in 714 A.C.[41] In the time of their departure, Mūsā appointed his eldest son, 'Abd al-'Azīz (95-97 A.H.) the governor of Spain for its effective and constant administration. He also appointed his elder son, 'Abd Allāh the governor of Ifriqiyah and his youngest son, 'Abd al-Mālik the governor of Morocco.[42] On his way to Damascus, Mūsā got another letter from the Caliph who was seriously ill. In the letter the Caliph asked him to hasten to the capital, Damascus. In the meantime, Mūsā received another one from Prince Sulaymān asking him to slow down his return to Damascus till the Caliph's death.[43] But Mūsā hurried unheeding their contradictory orders and reached to Damascus before the death of the Caliph in 715 A.C. This displeased Sulaymān. So, ascending the throne, he sacked Mūsā from all ranks, accused him of misappropriating war funds and reduced him to stark poverty. Mūsā lived the rest of his life as a beggar and at the mercy of public charity.[44]

In the course of time, Spain became one of the centres of Muslim civilization, enlightenment and development. Within one century, they made remarkable development in every field, from cultivation to construction of huge number of buildings, mosques, hospitals, gardens, palaces, libraries, canals and roads, from translation of Greek literature to developing scientific knowledge and establishing universities. The light of their achievements spread all over Europe.

The Europe is indebted to the Muslims who ruled Spain near about 800 years. However, due to the internal strife among the Muslims, their power came to end after eight centuries till Granada was conquered by Ferdinand and Isabella.[45]

2. Growth of Muslim Population in Spain

The development of the Muslims in Spain is regarded as a wonderful happening in the history of Islam. At first, in comparison with the large number of Christians and Jews, the Muslims were very small. But it has been noticed that the Muslims grew as much as to surpass them by the 3rd Century A.H.[46] Some of the most remarkable issues which are the keys to the surprising growth of the Muslims there have been illustrated below.

2.1 Muslim Settlement

With the overwhelming conquest of Ṭāriq with only twelve thousand Muslims, mostly Berbers in the battle of Guadelete, the Muslims from all the corners, especially North Africa were much inspired and they started coming in huge number to join the Muslim army.[47] To manifest the victory Mūsā launched into Spain with eighteen thousand armies comprising many Arab nobles of Yemen, some Berber chiefs, several *Tābi'ūn* and at least one companion of the Prophet (sm) named al-Munaydhir one year later.[48] Most of the survivors from the soldiers of the battles started dwelling in various places of Spain.[49] Hurr ibn 'Abd al-Raḥmān al-Thaqafī, the governor of Spain taking four hundred men of the main Arabian families of Africa reached there in 98 A.H. These Arabians ultimately turned to be the stock of the Muslim nobility of Spain.[50] In this way with the very beginning of the victory, the Muslim settlement began in Spain. The law and order was established and the Arab administration was activated in Spain within four years of the great victory.[51]

2.2 Migration

In this circumstances the Caliph 'Umar b. 'Abd al-'Azīz' (99-101 A.H.) asked his then governor of Spain, Samh b. 'Abd al-Mālik al-Khawlānī (100-102 A.H.) to send him a report describing the security and the honour of the Muslims living there.[52]

The report was so satisfactory that it could make the Caliph pleased. Seeing the report the Muslims of al-Ḥijāz, al-Yemen and North Africa became inspired to shift to Spain in large number. The trend of shifting was in such a large number that Spain was filled with Arab and Berber colonies before the arrival of 'Abd al-Raḥmān al-Dākhil in 756 A.C.[53] The vital issue for the migration of the Muslims to Spain was the political torture. Many Muslim migrated to Spain for a secured life and to escape from the ruling class of their land who oppressed them.[54] For example, the Abbasids used to oppress the surviving Umayyads so severely that the latter were compelled to hide for their lives. In the meantime 'Abd al-Raḥmān ascended the throne of Spain and called for the surviving Umayyads to come and settle in Spain.[55] This way in the lifetime and after the death of 'Abd al-Raḥmān, the surviving Muslims especially members and supporters of Umayyad dynasty got settled in Spain gradually.[56]

The presence of Qur'ānic personalities was required to hasten the process of Islamization of Spain. The benevolent Islamic cultural functions of the rulers could easily fascinate a great number of the Muslims of the East to be migrated to Spain.[57] It is mention worthy that the settlement of the Arabs in Spain was great in number during the period of *Wilāya*, but during the Umayyad period and thereafter it was in a minor extent. But the Berbers migrated to Spain continuously and restlessly till the end of the Muslim empire.[58]

2.3 Conversion

The Muslims who were enthusiastic manifestation and the embodiment of the Islamic virtues arrived in Spain with incomparable and noble ideals of Islam. They used to call the people to the shelter of Islam with their noble ideals. Moreover, the Muslims rulers with all the human qualities such as equity, toleration, mercy, high mindedness etc. won the hearts of the people.[59] As a result, the Spanish people started to embrace Islam in flocks. At first the slaves of Spain converted to Islam. Then the remnants lower, middle and noble classes started embracing Islam in groups.[60] This motion of the conversion was running till the fall of Granada. These converted Muslims are called '*the Musalima'* and their successors are termed as '*the Muwalladūn'*. With the passage of time, this converted Muslims and their offspring by dint of their huge number and unique position in religion, politics and intellect became the backbone of Muslim community in the country.[61]

3. Islamization of Spain

The Muslims took various steps several times to Islamize Spain. These are as follows;

3.1 Arabicization

During the time of 'Abd al-Mālik (685-705 A.C.) the whole administration was arabicized and Arabic was made the state language.[62] The officials as well as the people living within the jurisdiction of the Umayyad caliphate had to learn the language when the Muslims conquered Spain in 711 A.C. During the time of al-Walīd b. 'Abd al-Mālik (705-715 A.C.) they took with them the legacy of Arabic in the conquered territory. Besides, Hishām b. 'Abd al-Raḥmān (788-796 A.C.) made Arabic the official language and medium of education.[63] During the tenure of Umayyad Caliphate Arabic language became so popular that every inhabitant of Spain had learned it as a medium of expression and for daily communications, some adopted the same cloths as their rulers wore, some took Arabic names and even some Christian women started wearing veil.[64]

3.2 Preaching Islām

Just after the conquest the victorious Muslims settled in various places of Spain and their first and foremost target was to preach Islām all over Spain.[65] The powerful authority must have taken necessary steps for the sake of preaching Islam. It is mentionable that the then governor of Spain, 'Uqbāh b. Ḥajjāj al-Salūlī (116-21 A.H.), himself took part in the campaign of the spread of Islām.[66] Moreover, as the Muslims are an embodiment of all the human qualities, the Spaniards who had long been oppressed by the beastly rule of Goths, were much inspired by the principles of

Islām and their manifestations in the practices of the Muslims. As a result they in a body joined the tent of Islam.[67] With the passage of time, the number of the converts raised so high that their successors constituted the majority of the inhabitants of the country and this increase went on unless this reign ceased to be in Spain.[68] This overwhelming conversion can be proved by the incident that when the remnant Muslims were exiled from Spain in 1610 A.C. almost all the areas of the country became deserted and there was nobody to revive them. Those exiled Muslims were the successors of the Spanish origin and they had little or no blood relation with the Arabs.[69]

3.3 Establishment of Mosques

In order to Islamize Spain, the Muslim took another very vital measure of establishing mosques in various locations where they built their colonies.[70] Then mosques were used for various purposes, like educational institutions, court of justice and above all places of worship.[71] So the Muslims established a mosque in any conquered area as soon as possible because it was a must to spread Islam there. Soon after the migration of al-Madinah, the Prophet (sm) established a mosque there to impart the companions the teachings of Islām as well as performing legislative works and daily worships.[72] In the same way Mūsā b. Nuṣayr did the same thing in Spain. He together with his companions established the first mosque at Cordova in Spain. It was in one half of the Grand Church of Cordova which was promised by the Christians of the then Roman empire of Syria and Palestine.[73] Later on, this mosque of Cordova turns to be the Grand mosque and the main centre of Qur'ānic and traditional learning in the country. It is mentioned that Ḥanash b. 'Abd Allāh (d. 100 A.H.) a companion of Mūsā in his Spanish launch, founded the Grand mosque at Saragossa.[74] He also laid the foundation of another one at Granada.[75] In this way, the process of establishing mosques started from the very commencement of the conquest and their descendents also did so in this regard.[76] During the *wilāya* period and thereafter many mosques were erected at various cities of the Iberian Peninsula. This fact of the establishment of numerous mosques in various places had been well proved by the phenomena that only at Cordova during the reign of 'Abd al-Raḥmān (138-72 A.H.), 450 mosques were established.[77] In the later days when Qur'ānic learning flourished centring those mosques, the importance of them soared greatly.

3.4 *Maktab*

At the primary level, *Maktab*, another kind of educational institutions other than mosques, was introduced in Spain.[78] This kind of educational institution played a pioneering role in teaching the children the Qur'ān, the primary knowledge of Islam, poetry, grammar and penmanship.[79] Both the local people and government encouraged and supported this system of teaching *Sharī'ah*. In this way, many elementary schools were established in every town and village of Spain. Moreover, the Caliph, Ḥakam II (350-366 A.H.) established 27 elementary schools at Cordova alone.[80] Thus, the task of founding *Maktab* was implemented with its educational programme emphasizing the teachings of the primary knowledge on various aspects of Islam, which played a great role in the process of Islamization of Spain.

3.5 Teaching of the Rudiments of *Sharī'ah* (to the Spaniards)

Tābi'ī Mūsā b. Nuṣayr was a man of genius. He was not only a soldier but a scholar also.[81] Moreover, he was an educator and promoter of learning. He stepped into Spain with many pious Muslims. They were *Tābi'ūn* and atleast one *Ṣaḥābī* named al-Munaydhir who were well versed in the teachings of Islam. They used to accompany the Muslim forces as well. They were made to be the delegation to the Muslims who dwelt in different places of Spain to impart them the principles of Islāmic *Sharī'ah*.[82] It is mentionable that one of the noble Muslims named Ḥanash b. 'Abd Allāh al-San'ānī (d. 100 A.H.), who dwelt in Saragossa established a mosque there.[83] Everyone of them played a leading role in imparting the rudiments of *Sharī'ah* to the neo-Muslims.

For this purpose a great many Muslim scholars took their abode in Spain for the sake of teaching the Qur'ān and the *Sunnah*. For example, with the presence of Mu'āwiyah b. Ṣālih[84] (d. 158 A.H.) and Ṣa'ṣa' b. Sallām[85] (d. 192 A.H.) learning promoted to a great extent in Spain and the Spanish students were inspired a lot for achieving Islamic knowledge from important learning centres such as, al-Madīnah, Makkah and other cities of the Muslim regime. A great number of eager students of Spain left their homes and dispersed in quest of Islamic learning. These students being well equipped with knowledge flew back to their home and started imparting the invaluable teachings to the eager students in various places of Spain. The encouragement of achieving Islamic education which helped the ultimate islamization of Spain can be well proved by the phenomena that they were not afraid of undertaking lengthy journeys when travel was so risky with no built roads and worst transport.[86] The then ruling authority also took great steps in the process of islamization by exercising cultural activities.[87] Most of the authorities were scholars in Qur'ānic knowledge. They employed only those who had vast knowledge in fundamental aspects of Islām, in various important posts of administration.[88] These rulers along with their generals, governors and officials took positive steps to the spreading of Qur'ānic knowledge to all the corners of Muslim Spain.

Conclusion:

Mūsā accompanied by Ṭāriq b. Ziyād and a *ṣahābī*, named al- Munaydhir together with a number of *tābi'ūn* subjugated Spain in 711 A.C. Ṭāriq conquered several other cities including the Capital City, Toledo. Within one year he conquered the southern Spain. The Muslims, having conquered Spain, started inhabiting all over the country. A great number of *tābi'ūn* were among them. The majority of these *tābi'ūn* established lot of mosques in their respective localities. Having made the mosques the bases of Islamic teachings; they dedicated their time and labour with a view to disseminating teachings of Islam among the Spaniards. Nevertheless their knowledge and teachings finally proved to be the background of the development of Islamic teachings in Spain. In the course of time, Spain became one of the centres of Muslim civilization, enlightenment and development. Within one century, they made remarkable development in every field. The light of their achievements spread all over Europe. The Europe is indebted to the Muslims who ruled Spain near about 800

years. However, due to the internal strife among the Muslims, their power came to end after eight centuries till Granada was conquered by Ferdinand and Isabella.

Notes & References

1. W. Montgomery Watt, "*A History of Islamic Spain*" (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1965 A.C.), p. 17; Riyāsat 'Alī Nadwī, *Tārīkh-i-Andalus* (A'zamgharh: Matba' Ma'ārif, 1369 A.H.), vol.1, p.1; *The Encyclopaedia of Islam* (Layden: E.J.Brill, 1986 A.C.), vol. 1, p. 486.
2. *Ibid.*
3. Riyāsat 'Alī, *op.cit*, vol.1, p.4; Ahmad Haykal, *al-Adab al-Andalusi* (Cairo: Dār al- Ma'ārif , 1985 A.C.) , p. 16.
4. Imamuddin, S. M. *A Political History of Muslim Spain* (Dhaka: Najmah and sons Limited, 1961 A.C.), p. 6.
5. *Ibid.*
6. Sayed Ameer Ali, *History of the Saracens* (London: Macmillan & co. Ltd., 1951 A.C.), p. 106.
7. Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 7.
8. *Ibid.*; Louis Bertrand, *The History of Spain* (London: 1956 A.C.), p. 18.
9. *Ibid.*, p.19. Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 8.
10. *Ibid.*, pp. 1-3; Aḥ mad Shalabī, *Mawsū'ah al-Tārīkh al-Islāmī wa al-Ḥadārah al-Islāmiyyah,* 7th ed. (Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Miṣ riyyah, 1984 A.C.), vol. 4, p. 28.
11. Ameer Ali, *History of the Saracens*, p. 107; Muḥ ammad 'Abd Allāh 'Inān, *Dawlah al-Islām fī al-Andalus: Duwal al-Tawā'if*, 3rd ed. (al-Qāhirah: Mu'assasah al-Khānijī, 1380 A.H.), pp. 31-32.
12. *Ibid.*, p. 62; Aḥ mad Shalabī, *Mawsū'ah al-Tārīkh al-Islāmī wa al-Ḥadārah al-Islāmiyyah,* 7th ed. (Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Miṣ riyyah, 1984 A.C.), vol. 4, pp. 27-28.
13. Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 25.
14. Watt, *op. cit.*, p.13; Ḥusayn Mu'nis, *Fajr al-Andalus* (al-Qāhirah: al-Shirkah al-'Arabiyyah li al-Ṭ iba'ah wa al-Nashr, 1959 A. C.), p. 53.
15. *Ibid.*, p.63.
16. *Ibid.*, p. 59; Shihāb al-Dīn al-Maqqarī, *Nafh al-Tīb min Ghusan al-Andalus al-Ratīb*(Bayrūt: Dār al-'Ilmiyyah, 1415 A.H.), vol. 1, p. 222.
17. Ḥusayn Mu'nis, *op. cit.*, p. 63.
18. Watt, *op. cit.*, p. 13; Ḥusayn Mu'nis, *op. cit.*, p. 59; Reinhart Dozy, *Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain*, trans. Francis Griffin stokes (London: Chatto & Windus, 1913 A.C.), p. 291.
19. Ḥusayn Mu'nis, *op. cit.*, p. 59.
20. *Ibid.*; al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 1, p. 222.
21. *Ibid.*
22. Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 17.
23. *Ibid.*, p.16; Anwar G. Chejne, *Muslim Spain: Its History and Culture* (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1974 A.C.), p. 7.
24. *Ibid.*; Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 16.
25. Muḥ ammad Jarīr al-Tabarī, *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk* (Lugd Bat: E.J. Brill, 1964 A.C.), Series 1, vol. 5, p. 2817.
26. *Ibid.*; Ibn Kathīr, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1416 A.H.), vol. 4, pt. vii, p. 163.

27. Dr. Muhammad Ruhul Amin, *Tafsīr: Its Growth and Development in Muslim Spain* (Dhaka: University Grants Commission of Bangladesh, 2006 A.C.), p.36.

28. Riyāsat ʻAlī, *op. cit.,* vol. 1, p. 64.

29. Ruhul Amin, *op. cit.*, p. 37.

30. Ibn ʻIdhārī al-Marrākushī, *al-Bayān al-Maghrib fī Akhbār al-Andalus wa al-Maghrab* (Leyden: E.J. Brill, 1951 A.C.), vol. 2; pp. 12-15; Dozy, *op. cit.*, p. 233; Anwar, *op. cit*., p. 8; Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 16.

31. Ibn al-Faraḍ ī, *Tārīkh ʻUlamā' al-Andalus* (Egypt: 1966 A.C.), pt. ii, p. 146; Dozy, *op. cit.*, pp. 230-31; Khalīl al-Raḥ mān, *Akhbār al-Andalus*, trans. of Scotts History of the Moorish Empire in Europe (Hyderabad: Jāmiʻah ʻUthmāniyyah, 1922 A.C.), pp. 215-18.

32. Ruhul Amin, *op. cit.*, p.38.

33. Anwar, *op. cit.*, p. 8.

34. Ibn al-Athīr, *op. cit.*, vol. 4, p. 122; A.N.M. Raisuddin, *Spanish Contribution to the Study of Ḥadīth Literature* (Ph.D. Thesis, University of Dhaka, 1984 A.C.), p. 20.

35. Anwar, *op. cit.,* p. 8; Riyāsat ʻAlī , *op. cit*., vol. 1, pp. 86-93.

36. *Ibid*., p. 87; Imamuddin, *Political History of Spain*, pp. 10-11; Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens* (London: Macmillan & Com. Ltd., 1961 A.C.), p. 109.

37. Riyāsat ʻAlī, *op. cit.*, vol. 1, p. 88; Ibn Idhārī, *op. cit*., vol. 2; pp. 8-9.

38. Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 21.

39. *Ibid*., p. 12; Ibn Idhārī, *op. cit.*, vol. 2, pp. 12-15; Dozy, *op. cit*., p. 233.

40. Imamuddin, *Political History of Spain*, pp. 12-13; al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 1, p. 223; Anwar, *op. cit*., p. 9.

41. Ḥusayn Mu'nis, *op. cit*., p. 107; Watt, *op. cit*., p. 15; Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 24.

42. *Ibid*., p. 25; Ḥusayn Mu'nis, *op. cit*., p. 109.

43. Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 24.

44. *Ibid*.

45. Watt, *op. cit*., pp. 149-50.

46. Anwar, *op. cit*., p.111.

47. Al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 1, p. 250; Khalīl al-Raḥ mān, *op. cit*., p. 226; Riyāsat ʻAlī, *op. cit*., vol. 1, p. 86.

48. *Ibid*., p. 106; Aḥ mad Mukhtār al-ʻIbādī, *Fi Tārīkh al-Maghrab wa al-Andalus* (Bayrūt: Dār al-Nahdah al-ʻArabiyyah, n. d.), p. 70.

49. Khalīl al-Raḥ mān, *op. cit.,* p. 238.

50. *Ibid*., p. 266; Ḥusayn Mu'nis, *op. cit*., p. 135.

51. Raisuddin, *op. cit*., p. 23; Riyāsat ʻAlī, *op. cit*., vol. 1, pp. 134-35.

52. *Ibid*., p. 148; Ibn ʻIdhārī, *op. cit*., vol. 2, p. 26.

53. Al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 1, p.278; Shāh Muʻīn al-Dīn Aḥ mad Nadwī, *Islām Awr ʻArabī Tamaddun*, trans. of Md. Kurd ʻAlī's al-Islām wa al-Ḥaḍ ārah al-ʻArabiyyah (Aʻzamgharh: Dār Maṭ baʻ, 1371 A.H.), p. 264; Raisuddin, *op. cit*., p. 22.

54. Ḥusayn Mu'nis, *op. cit*., pp. 127-28; Khalīl al-Raḥ mān, *op. cit*., p. 273.

55. P. D. Gayangos, *The History of the Mohammedan Dynasties* in Spain (New York: Johnson Reprint Corporation, 1964 A.C.), vol. 2, p. 75.

56. *Ibid*.; al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 4, p. 40; Riyāsat ʻAlī, *op. cit*., vol. 1, pp. 257-58.

[57]. H.A.R. Gibb, *Arabic Literature: An Introduction,* 2nd rev. ed., (Oxford: The Clarendon Press, 1963 A.C.), p. 108.

[58]. Ḥusayn Mu'nis, *op. cit*., p. 379.

[59]. Ameer Ali, *History of the Saracens*, pp. 112-14; Dozy, *op. cit*., pp. 234-37.

[60]. T.W. Arnold, *Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith* (Lahore: Shirkat-i-Qalam, n.d.), p. 134.

[61]. Anwar, *op. cit*., p. 114; Ruhul Amin, *op. cit.*, p. 43.

[62]. P.K. Hitti, *History of the Arabs*, 10th ed. (London: The Macmillan Press Ltd., 1970 A.C.), p. 206.

[63]. 'Inān, *op. cit*., p. 226.

[64]. Ruhul Amin, *op. cit.*, p. 104.

[65]. *Ibid*., p. 44.

[66]. Riyāsat 'Alī , *op. cit*., vol. 1, p. 170; Al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 4, p. 15.

[67]. Imamuddin, *Political History of Spain*, p. 6; Ameer Ali, *History of the Saracens*, p. 114.

[68]. Ruhul Amin, *op. cit*., p. 43; Arnold, *op. cit*., p. 146.

[69]. *Ibid*.

[70]. 'Umar Farrūkh, *al-'Arab wa al-Islām fī al-Ḥawḍ al-Gharbā min al-Baḥr al-Abyad al-Mutawassiṭ* (Bayrūt: Manshūrah al-Maktabah al-Tijārī, 1969 A.C.), p. 185.

[71]. Aḥmad Shalabī, *History of Muslim Education* (Bayrūt: Dār al-Kashshāf, 1954 A.C.), p. 48; Amīr Ḥasan Ṣiddīqī, "Islamic Institution during the Prophet's period," *The Voice of Islam,* vol. x, No. 2, (November 1961 A.C.), pp. 96-97.

[72]. Aḥmad Shalabī, *History of Muslim Education*, p. 48.

[73]. Al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 1, p. 276; *Ibid*., vol. 2, p. 97.

[74]. Khayr al-Dīn Al-Ziriklī, *al-A'lām* (Bayrūt: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1997 A.C.), Vol. 2, p. 286; Raisuddin, *op. cit*., p. 35.

[75]. Al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 4, p. 5; 'Umar Farrūkh, *op. cit*., p. 89.

[76]. *Ibid*., p.185.

[77]. Al-Maqqarī, *op. cit*., vol. 2, p. 79.

[78]. Shawqī Dayf, *al-Adab al-'Arabī: 'Aṣr al-Duwal wa al-Imārāt: al-Andalus* (al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1989 A.C.), p. 61.

[79]. *Ibid*.

[80]. *Ibid*.; Hitti, *op. cit*., p. 530.

[81]. Raisuddin, *op. cit*., p. 26.

[82]. Aḥmad Haykal, *al-Adab al-Andalusī* (al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1985 A.C.), p. 60.

[83]. Al-Ziriklī, *op. cit*., vol. 2, p. 286; Raisuddin, *op. cit*., p. 35.

[84]. Mu'āwiyah b. Ṣāliḥ was born towards the end of the first century A.H. at Ḥims in Syria. Hence his appellation, *Nisbah* is al-Ḥimsī. He was a reputed *muḥaddith, faqīh* and *thiqah rāwī*, reliable transmitter of *ḥadīth*. He listened to *ḥadīth* from many prominent *muḥaddithūn* of Syria. Then Mu'āwiyah b Ṣāliḥ started for al-Madīnah where he came in touch with the then renowned scholars and acquired Islamic teachings from them. Afterwards Mu'āwiyah set for Spain in 125 A.H. and landed at Malaga. There he established a mosque where he commenced spreading Islamic teachings among the Spaniards. Spending two years there, he went to Ishbiliyyah in 127 A.H. There he devoted himself to the transmission of *ḥadīth* and other fundamentals of Islam orally. Ascending to power as an *Amīr* of Spain, 'Abd al-Raḥmān al-Dākhil (755-787 A.C) sent Mu'āwiyah to Syria in order to bring his sister, *Umm* al-Aṣbagh. On the way to Syria, he accomplished Ḥajj. During

his short stay in Makkah, he narrated *aḥādīth* to many keen students and listened a lot of it to many contemporary scholars. Returning from Syria, Mu'āwiyah was appointed the chief justice of Spain by *Amīr* 'Abd al-Raḥmān al-Dākhil (755-787 A.C). **As** he was a bosom one of *Amīr* 'Abd al-Raḥmān, he took part with the *Amīr* in military campaign. Although he used to be busy with judicial activities, he succeeded in disseminating Qur'ānic learning at Cordova. At the time of performing Ḥajj for the second time in 154 A.H., Mu'āwiyah b Ṣāliḥ came in touch with Imām Mālik b Anas. Mu'āwiyah b Ṣāliḥ contributed a lot to the field of Qur'ānic studies greatly by leaving many precious manuscripts of Qur'ānic studies which he had fetched from the east. One of his valuable collections was *tafsīr* of 'Alī b Abī Ṭalḥah (d. 143 A.H.) which was collected from him by Abū Ṣāliḥ (d. 223 A.H.). He was a reliable transmitter of *ḥadīth*. Some of the *aḥādīth* related by him were also preserved in the *Ṣaḥīḥ* of Bukhārī, the *Ṣaḥīḥ* of Muslim and *al-Sunan al-Arba'*. He passed away in 158 A.H. Vide Ḥusayn Mu'nis, *op. cit.*, pp. 651-52; Al-'Asqalānī, Shihāb al-Dīn b. Ḥajar, *Tahdhīb al-Tahdhīb* (Lahore n.d.), vol. 10, pp.189-91; Ibn al-Faraḍī, *op.cit*., pt.ii, pp.138-40; Al-Dhahabī, Shams al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad, *Tadhkirah al-Ḥuffāẓ*, trans. Muḥammad Isḥāq (Kolkata: Dār al-Ishā'ah al-Islāmiyyah, n.d.), vol.1, pt. i, p.153; Al-Dhahabī, *Sīyar A'lām al-Nubalā'*, 9th ed. (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1413 A.H.), vol. 5, p. 101.

85. Ṣa'ṣa'h b. Sallām was born in the second century A.H. in Syria. He was a disciple of Imām Awzā'ī (d. 157 A.H.). He was educated in his native land from Imām Awzā'ī, Sa'īd ibn 'Abd al-'Azīz (d. 160 A.H.) and their contemporary scholars. In 145 A.H. he set for al-Madīnah and heard *ḥadīth* from Imām Mālik ibn Anas (d. 179 A.H.) and became one of his most devoted disciples. Having been vastly versed in *ḥadīth, fiqh* and Qur'ānic knowledge, he started for Egypt. There he devoted himself to disseminating *ḥadīth* and other principles of Islam. A number of students heard and copied *ḥadīth* from him. Mūsā ibn Rabī'ah al-Jumaḥī was one of his mentionable students of Egypt. During the reign of 'Abd al-Raḥmān al-Dākhil (755-787A.C.) Ṣa'ṣa'h ibn Sallām set for Spain in 160 A.H. and was settled at Cordova. There he started teaching *ḥadīth* to the keenly interested students. One of his mentionable students was 'Abd al-Mālik b. Ḥabīb. Besides, he performed the functions of *muftī* and the *khaṭīb* during the period of 'Abd al-Raḥmān and his heir Hishām b. 'Abd al-Raḥmān (788-796 A.C.). He breathed his last in 192 A.H. at Cordova during the reign of al-Ḥakam b. Hishām (796-822 A. C.). Ibn al-Faraḍī (d. 403 A.H.), the author of "*Tārīkh 'Ulamā' al-Andalus''* opines that Ṣa'ṣa'h b. Sallām was the first introducer of *ḥadīth* in Spain. Although it has been mentioned that Mūsā b. Nuṣayr and the *tābi'ūn* along with their followers played the pioneering role in planting the seedlings of *ḥadīth* in Spain, the true and concrete basis of it was broadened by Ṣa'ṣa'h b. Sallām. The students of Spain were mainly encouraged by him to take the journey towards al-Madīnah with a view to acquiring more knowledge on all branches of Islamic teachings. Vide Ruhul Amin, *op.cit*., p. 94; Al-Ḥumaydī, Muḥammad b. Fattūḥ, *Jadhwah al-Muqtabīs fī Dhikr Wulah al-Andalus* (Cairo: al-Dār al-Miṣriyyah li al-Ta'līf wa al-Tarjamah, 1966 A. C.), p.244; Ibn al-Faraḍī, *op.cit*., pt. i, pp. 203-4; Al-Ziriklī, *op. cit*., vol. 3, pp. 204-5.

86. Ruhul Amin, *op.cit.*, p. 47.

87. Shawqī Dayf, *op.cit*., p.63.

88. Aḥmad Naḍwī., *op. cit*., p. 272; S.M. Imamuddin, *Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural History of Muslim Spain* (Leyden: E.J. Brill, 1965 A.C.), p. 142.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

শরী‘আহ্ এর দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়ঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মুহা. শহীদুল্লাহ[*]

Abstract : Selling and buying system is an important factor for the development of economics sector of any country. It's a one of the important parts of business also. Business means the work which is relating to the production, buying and selling of goods or services. We know business is allowed to Islam and interest is strongly prohibited. But it's to be noted that selling and buying of all kinds of products are not permitted in Islamic Shariah. Islamic shariah has made some rules and regulations for selling and buying in business purpose. However, currently we can see that some dishonest businessmen run their business without maintaining the rules and regulations of Islamic Shariah. This paper is a humble attempt to examine and clarify the rules and regulation of Islamic shariah about selling and buying system in business. The study is based on both primary and secondary data/information, collected by the author. The paper ends with some policy recommendations and concluding remarks as well.

ভূমিকা

ইসলাম একটি শাশ্বত, সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যেখানে ইসলাম নিখুঁত ও স্বচ্ছ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেনি। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি (এ) গ্রন্থে (তাদের) বর্ণনার কোনো কিছুই বাকী রাখিনি’।[১] তিনি আরো বলেন, ‘আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, যা হচ্ছে সব কিছুর ব্যাখ্যা’।[২] সুতরাং দুনিয়ার জীবনে মানুষের চলার জন্য প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ সুস্পষ্ট। মানুষ কিভাবে আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করবে, মানুষের পারস্পারিক আদান-প্রদান, লেনদেন ও পারস্পারিক সম্পর্ক কেমন হবে, কিভাবে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ এমনকি মানুষ কিভাবে অর্থনৈতিক উপার্জন ও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পণ্য-বস্তু পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করবে তার সবিস্তার সুষ্ঠু সমাধান ইসলামী শরী‘আতে বিদ্যমান।

মানুষের জীবন-যাপনের জন্য অর্থ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ। অর্থোপার্জনের জন্য মানুষকে বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করতে হয়। তন্মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে অন্যতম উৎকৃষ্ট মাধ্যম। যেখানে একপক্ষ বিক্রেতা এবং অন্যপক্ষ ক্রেতা হয়ে উভয়ের মাঝে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা আর্থিক লেনদেনের মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জন হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনা করা ফরজসমূহের অন্যতম ফরজ। আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতিকে জীবিকার জন্য সৎ উপায়ে উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন, সাথে সাথে তার যাবতীয় কৌশল ও নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূল (স.) তার সমগ্র জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে দিয়েছেন।

মানুষ যে সকল উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ও পারস্পারিক চাহিদা মিটায় সেগুলোর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যই সর্বোত্তম মাধ্যম। কেননা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানটি কুর’আন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। জীবন বাঁচার জন্য মানুষ যে সকল বস্তু ভোগ করে তা শরী‘আহ সম্মত না হলে হারাম হবে। আর হারাম ভক্ষণ করলে তার ইবাদাত-বন্দেগী কোন কাজে আসবে না বরং তাকে পরকালে চরম শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেননা ‘রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন

---

[*] প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

না'।[৩] তিনি আরো বলেন, 'যে শরীর হারাম খেয়ে প্রতিপালিত হয়েছে সে শরীর জাহান্নামে যাবে।'[৪] তাই ক্রয়-বিক্রয় ও বেচা-কেনার ইসলামী মূলনীতি জানা এবং সে অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্য আদান-প্রদান করা অতীব জরুরী।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা করার জন্য বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে এবং তা আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ সন্ধান বলে অভিহিত করেছেন। উপরন্ত ব্যবসার জন্য যারা বিদেশ সফর করে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদকারী লোকদের সাথে।[৫] তৎকালীন সময়ে আল্লাহ তা'আলা মক্কায় লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করে মক্কা নগর সমগ্র আরব উপদ্বীপের মধ্যে একটি বিশেষ ও বিশিষ্ট ধরণের ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিল। এজন্য ইবরাহীম (আ.) দু'আ করেছিলেন-

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

'অতএব হে আল্লাহ! তুমি লোকদের মনকে তাদের প্রতি আগ্রহী বানিয়ে দাও এবং তাদের নানা প্রকারের ফলমূল দিয়ে রিযিক দাও, যেন তারা শোকর আদায় করতে পারে।'[৬]

নবী (স.) নিজে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসার কাজের জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহ দান করেছেন। এ ব্যাপারটি ছিল তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন- 'বিশ্বস্ত সত্যাশ্রয়ী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে অবস্থান করবে।[৭] জীবিকা অন্বেষণে অতি প্রত্যুষে বের হওয়ার প্রতি এভাবে বলেছেন, 'হে আল্লাহ আমার উম্মতের প্রত্যুষে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় বরকত দাও।'[৮] রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে হালাল সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত দেখতে ভালবাসেন।'[৯] ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আমাদের পথ-প্রর্দশনের জন্য রাসূলে কারীম (স.) এর কর্মনীতি যথেষ্ট। তিনি যেমন আধ্যাতিক দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তেমনি তিনি মানুষের অর্থনৈতিক দিকের উপরও যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নির্ভেজাল ইসলামী বাজার সৃষ্টি করেছিলেন, যার ওপর ইয়াহুদীদের কোন কর্তৃত্ব বা আধিপত্য চলতে পারত না।

ক্রয়-বিক্রয় এর গুরুত্ব

ইসলামের বিধান শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগীতেই সীমাবদ্ধ নয়। জাগতিক বিষয়াদি তথা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূল (স.) ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, সাথে সাথে হালাল-হারাম এর সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন। সুতরাং 'ক্রয়-বিক্রয়' বিষয়ে শার'ঈ বিশ্লেষণ এর যথার্থ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলামী পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় এমন এক পদ্ধতি যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) যে সকল ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিকে জায়েয বা বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তা হালাল আর যে ক্রয়-বিক্রয়কে নাজায়েয বা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তা হারাম।[১০] বস্তুতঃ হালাল-হারামের পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে শরী'আহ ক্রয়-বিক্রয়ের সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। যে সব নীতিমালাগুলো আলোচ্য বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক যৌক্তিকতার স্বাক্ষর বহন করবে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে পারস্পারিক সম্মতি, পরিমাণ ও ওযন ঠিক করা, নোংরা ও শয়তানী কাজ পরিত্যাগ, ধোঁকাবাজি, সকল পদ্ধতিতে সব ধরণের ব্যবসা সূদমুক্ত হওয়া, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন না করা, মিথ্যা শপথ না করা, অংশীদারী ব্যবসায় বৈষম্য ও খিয়ানত না করা, মুনাফাখোরী ও প্রতারণা না করা এবং ক্রয়-বিক্রয় বস্তু বা পণ্যটি অস্তিত্বশীল ও হস্তগত হওয়া।

একজন ক্রেতাকে যেমনভাবে সাবধান থাকতে হবে, তাকে সকল হালাল পদ্ধতিতে হালাল পণ্য ক্রয় করা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে যুক্ত হওয়া। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল-কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন।'[১১] অনুরূপভাবে বিক্রেতাকেও সাবধান হতে হবে যে, সে যে সব পণ্য বিক্রি করবে সেগুলো যেন অবশ্যই হালাল পণ্য বিক্রয় করে। কোনভাবেই যেন ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরি ও মিথ্যা শপথ করে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় না করে। কারণ মহানবী (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে সে আমার উম্মাতের অর্ন্তভূক্ত নয়।'[১২]

আল-কুর'আনের ঘোষণা, 'যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা দাঁড়ায় সে ব্যক্তির মত যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা জ্ঞান শূন্য করে দিয়েছে। তাদের অবস্থা এরূপ হওয়ার কারণ, তারা বলে ব্যবসা বা ক্রয়-বিক্রয়তো সুদের মতই; অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার রবের পক্ষ থেকে এ উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকবে - সে আগে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ এর উপর সোপর্দ। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুণরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।'[১৩] মহানবী (স.) এর বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা সুদের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত। সুদের অবৈধতা ও সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে- আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্র সম্পাদনকারী, সাক্ষী সকলের উপর অভিশাপ (লা'নত) দিয়েছেন।[১৪] অন্য হাদীসে এসেছে, 'হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (স.) অভিসম্পাত করেছেন সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের হিসাবরক্ষক ও তার সাক্ষীদ্বয়কে এবং তিনি বলেছেন, এরা সকলেই সমান অপরাধী।[১৫]

ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি, শর্ত ও মূলনীতি

ক্রয়-বিক্রয় পরিভাষাটি দু'টি বিপরীতমুখী অর্থ প্রকাশ করে যথা ক্রয়-বিক্রয় এবং বিক্রয়-ক্রয়।' ক্রয়-বিক্রয় এর অর্থজ্ঞাপক সমার্থক শব্দ হিসেবে আল-কুর'আনে তিনটি শব্দ যথা বায়' (بيع) ৭টি স্থানে[১৬], শিরা' (شراء) ১৪টি স্থানে[১৭] ও তিজারাহ (تجارة) ৮টি স্থানে[১৮] উল্লিখিত হয়েছে। আভিধানিক অর্থ সাধারণ বিনিময়,[১৯] কিছু গ্রহণ করা ও কিছু প্রদান করা এবং মূল্যের বিনিময়ে কিছু প্রদান করা।[২০] 'Bai: To purchase; To sell (of goods).[২১]।'

ক্রয়-বিক্রয় বলতে বুঝায় কিছু দিয়ে তার বিনিময়ে কিছু নেওয়া। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মালের বিনিময়ে মাল বিনিময় করা। আল্লামা কায়সানী (রহ.) বলেছেন, 'মাল দ্বারা মালের পরিবর্তনকে বিক্রয় বলে।'[২২] ফকিহগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তথাপি হানাফী ফকীহগণ বলেন, 'কোন বস্তু অর্জনের লক্ষ্যে পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে মালের পরিবর্তে মাল বিনিময় করা।'[২৩]

ক্রয়-বিক্রয়ে রুকন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর নির্ভর করে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম। রুকন বিষয়ে ফিক্হবিদগণ মতভেদ করেছেন। হানাফী মাযহাবের নিকট ক্রয়-বিক্রয় এর রুকন দু'টি। ইজাব ও কবুল।[২৪] এক. 'ইজাব' ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ থেকে প্রথম প্রকাশিত প্রস্তাব। দুই. 'কবুল' প্রস্তাবের জবাবে অপর পক্ষ থেকে প্রকাশিত পরবর্তী বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়া। ক্রয়-বিক্রয় মানুষের পারস্পারিক লেনদেনের আওতাভুক্ত এবং আন্তরিক সম্মতি এর ভিত্তি। এই সম্মতি যদি গোপন ও অব্যক্ত থাকে, তবে তা অপর পক্ষের জানা সম্ভব নয়। এ জন্য অন্তরের সম্মতির অভিব্যক্তি ঘটে, এমন শব্দ বা বাক্যকে শরী'আত সম্মতির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে এবং তার উপরই শরী'আতের বিধি নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করেছে। ইজাবকারী ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কেউ হতে পারে। অনুরূপ কবুলকারীও যে কোন পক্ষ হতে পারে।

প্রতিটি কর্ম ও ক্ষেত্র কিছু না কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিও কতকগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। ক্রয়-বিক্রয় শরী'আতে বৈধ কর্ম হলেও একাধারে সব ধরণের লেন-দেন বৈধ নয়। ক্রয়-বিক্রয় বৈধ-অবৈধ হওয়ার নিমিত্তে কতকগুলো শর্ত সম্পর্কে সব ধরণের ক্রেতা-বিক্রেতা ও বিনিয়োগকারীর জানা অতীব জরুরী। ক্রয়-বিক্রয় এর শর্তাবলীর মধ্যে মৌলিক চারটি শর্ত হল, ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার শর্তসমূহ, ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ, ক্রয়-বিক্রয় বাস্তবায়ন হওয়ার শর্তসমূহ, ক্রয়-বিক্রয় প্রয়োজনীয়তা হওয়ার শর্তসমূহ। সামগ্রিকভাবে এ শর্তগুলোর মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে সংঘটিত দ্বন্দ-বিবাদ দূরীকরণ, চুক্তিবদ্ধকারীদ্বয়ের সন্ধি স্থাপন, সম্ভাবনাময় ধোঁকা থেকে বাঁচানো এবং অজ্ঞতার কারণে ঘটে যাওয়া ঝুঁকিসমূহ থেকে দূরে রাখা।[২৫]

ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলামে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বিদ্যমান। সেগুলো হলো মজুদদারী না করা। ইসলামী ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয় নীতিতে এ ধরণের কাজ সমর্থন করে না। রাসূল (স.) বলেছেন "পণ্য দ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী নিঃসন্দেহে অপরাধী।"[২৬] তিনি আরো বলেন, অপরাধী ব্যক্তি ব্যতিত কেউ গুদামজাত করে না।[২৭] ওযনে কম না দেওয়া। অথচ আল্লাহ তা'আলা ওযনে কম প্রদানকারী সম্পর্কে বলেন, 'দুর্ভোগ ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়), যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়, আর তাদেরকে মেপে দেওয়ার সময় কম দেয়, চোরাচালান ও মুনাফাখোরী না করা, ভেজাল না দেওয়া, পারস্পারিক সম্মতি থাকা।' আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় বৈধ।'[২৮] মিথ্যা শপথ না করা, নিজে ঠকা যাবে না এবং অপরকেও ঠকানো যাবে না, ব্যবসার সাথে সুদকে মেশানো যাবে না, অনুমানভিত্তিক ব্যবসা করা হতে বিরত থাকা, অপরের মাল হনন করার চেষ্টা করা যাবে না, ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি করা যাবে না, ব্যবসায় কারো ক্ষতি করা যাবে না, অংশীদারী বেচাকেনায় বৈষম্য ও খিয়ানত না করা।

শরী'আহ অনুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়সমূহ

পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি মানুষকে জীবিকার অন্বেষণ করতে হয়। জীবিকা অন্বেষণের এ পদ্ধতি দুনিয়াতে মানবজাতির আগমনের সূচনালগ্ন হতে চলে আসছে। তৎকালিন সময়ে মানুষ পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসাকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু তখনকার ক্রয়-বিক্রয়ের সকল পদ্ধতি ঢালাওভাবে বৈধ ছিল না। পরবর্তীতে যুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও রাসূল আগমনের ধারার শেষ রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ (স.) এর আগমন ঘটে। রাসূল (স.) নিজে ব্যবসা করতেন এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের সদস্যসহ অনেক সাহাবী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ধরণের বৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁরা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি ইবাদতের মাধ্যমও মনে করতেন। ব্যবসা একটি ইবাদত এবং জীবিকা অর্জনের সর্বোত্তম পেশা। মুসলিম জাতির ঐতিহ্যগত পেশাও হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়। পেশার গুরুত্ব বিচারে ব্যবসার গুরুত্ব সমধিক। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ে সততা না থাকায় ইবাদতের এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটির ঐতিহ্য হারানোর উপক্রম হয়েছে। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরণের ইসলামী শরী'আহ বিরোধী ও শরী'আহ বহির্ভূত ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত ছিল। তাই মানবতার শ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ (স.) কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে কতকগুলো বৈধ ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির অনুমোদন দিয়েছেন এবং রাসূল (স.) ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রিক উপার্জনকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে ঘোষণা করেছেন। কুরআনে ক্রয়-বিক্রয়কে (ব্যবসা) হালাল বা বৈধ বলা হয়েছে। আর সুদকে করা হয়েছে হারাম। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম।'[২৯] সুতরাং ইসলামী শরী'আতে অনুমোদিত ক্রয়-বিক্রয় বলতে সে সকল ক্রয়-বিক্রয়কে বলা হয়, যেগুলোকে ইসলামী শরী'আহ পারস্পরিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যকে হালাল ও বৈধ হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ যে সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিয়োগ পদ্ধতি বৈধ এবং স্বীকৃত সেগুলোর মধ্যে মুদারাবা ও মুশারাকা (লাভ লোকসানে অংশীদারিত্ব) পদ্ধতি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম এবং শরী'আহ সমর্থিত পদ্ধতি। ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদারাবা (مضاربة) একটি অন্যতম শরী'আহ ভিত্তিক অনুমোদিত পদ্ধতি। মুদরাবা শব্দটি আরবী শব্দ থেকে গঠিত।[৩০] এর শাব্দিক অর্থ হলো ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য জমিনে পদচারণা করা।[৩১] চলাফিরা ও ভ্রমণ করা এবং চেষ্টা করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-"তারা পৃথিবীতে চেষ্টা সাধনা করে নিজের জীবিকা উপার্জন করে।[৩২] এটি কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত।[৩৩] শরী'আতের পরিভাষায়, মুদারাবা হচ্ছে এমন এক ধরণের অংশীদারী কারবার বা চুক্তি যাতে দু'টি পক্ষ থাকে, এক পক্ষ ব্যবসায় (ক্রয়-বিক্রয়ে) মূলধন সরবরাহ করে আর অপরপক্ষ সময়, শ্রম, মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির শর্তানুসারে মুনাফা ভাগ করে নেয়।[৩৪] এভাবে একজনের পুঁজি ও অপরজনের দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের সমন্বয়ে যে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা পরিচালিত হয় তাই মুদারাবা।

বায়' মুদারাবা বৈধ হওয়ার জন্য যেসব শর্তাবলী আবশ্যক (১) অর্থ যোগানদাতা ও অর্থগ্রহীতা উভয়কেই জ্ঞানবান হতে হবে। শুধু বালেগ হলে চলবে না। উভয়কেই কারবার ও কারবারের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে হবে।[৩৫] (২) যে পরিমাণ অর্থই মুদারাবাত এর জন্য নির্ধারণ করা হবে তা অবিলম্বে মুদারিব এর হাতে সমর্পন করতে হবে। যেমন, রাব্বুল মাল মুদারিবকে বললো, "তোমাকে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি তা দিয়ে তুমি বাণিজ্য কর।" তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা কাজ সম্পাদনকারীর হাতে দিতে হবে।[৩৬] (৩) মূলধনের মালিক ও মুদারিবের মধ্যে ব্যবসায় মুনাফার অংশ যেমন ৬০%; ৪০%; ৫০%; ৫০%; ৪৫%; ৫৫% ইত্যাদি হারে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পূর্বেই সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কিন্তু কোন পক্ষই মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে যেমন বাৎসরিক বা মাসিক ৬০০০/=, ৮০০০/=, ২০০০/= টাকা ইত্যাদি নিতে পারবে না, টাকার অংক এরূপ নির্দিষ্ট করা হলে তা সুদের পর্যায়ভূক্ত হবে। মুনাফার অংশ পূর্বে নির্ধারিত করা না হলে উভয় পক্ষই সমান সমান হারে মুনাফা লাভ করবে। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে।[৩৭] (৪) মুদারাবাতে উভয়ে এ কথা স্থির করবে, কতদিন পর পর হিসাব করা হবে। যেমন, একবছর, দু'বছর, একমাস বা দু'মাস পর ইত্যাদি।[৩৮] (৫) উভয় কারবারের শর্তাবলী লিখিতভাবে নিজেদের হাতে রেখে দেয়া উত্তম, যাতে করে পরবর্তী পর্যায়ে মতবিরোধ এড়ানো যায়। যদি লিখিত অবস্থা ছাড়াও আন্তরিক প্রশান্তির কোন ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। (৬) সাহিবুল মাল ও মুদারিব উভয়কেই মুসলমান হতে হবে। তবে বিধর্মীদের সঙ্গেও লেনদেন করা বৈধ।[৩৯] (৭) চুক্তিপত্রে মুদারাবা নীতিমালার পরিপন্থী কোন শর্তারোপ করা হলে তা বৈধ হবে না। (৮) ঋণের দ্বারা মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। যেমন ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে বলে, তোমার নিকট আমার প্রাপ্য ঋণ দ্বারা মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হও তাহলে তা বৈধ হবে না। (৯) মুদারাবা কারবারে উভয় পক্ষের মুনাফার হার নির্দিষ্ট না করে এক পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা নির্ধারণ করা হলে কিংবা মূলধন সরবরাহকারী বা তার কোন প্রতিনিধি ব্যবসায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার শর্ত করা হলে মুদারাবা চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

মুশারাকা একটি স্থায়ী ও সর্বজন স্বীকৃত অনুমোদিত একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। মুশারাকা হচ্ছে এমন অংশীদারি কারবার যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাভ করার উদ্দেশ্যে পুঁজি যোগান দেয়, কারবার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেয়। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে তা ভাগ করে নেয়; আর লোকসান হলে অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করেন। সুতরাং শরী'আতের পরিভাষায়, মুশারাকা হচ্ছে এমন অংশীদারী কারবার যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মূলধন বিনিয়োগ করে লাভ লোকসানে অংশীদার হবার চুক্তিতে কারবার পরিচালনা করে।[৪০] ইসলামী আইনের চারটি প্রধান উৎস কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস

দ্বারা মুশারাকা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। সকল মাযহাবে মুশারাকা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলা হয়েছে।[৪১] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন 'হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভবান হতে পার।[৪২] অন্যত্র আল্লাহ বলেন 'তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে।'[৪৩] মহান আল্লাহ আরোও বলেন 'আর শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প।[৪৪] আর রাসূল (স.) বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, আমি দুই শরীকের মধ্যে তৃতীয় জন হই, যতক্ষণ না তারা একে অপরের প্রতি খিয়ানত করে, এরপর যখন তাদের কেউ অন্যের প্রতি খিয়ানত করে, তখন আমি তাদের সংস্রব পরিত্যাগ করি।[৪৫] বস্তুত: এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা শরীকানা ব্যবসায়-বাণিজ্য করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও প্রমাণ বহণ করে।

মুশারাকা কারবারে কতক শর্তাবলী আবশ্যক যথা (১) মুশারাকা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় শুরু করার পূর্বেই অংশীদারদের মধ্যে শিরকাতুল ইনান[৪৬] সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। আল-কুর'আনের নির্দেশ অনুসরণের চুক্তি লিখিত হওয়া বাঞ্চনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও।"[৪৭] মূলতঃ চুক্তিপত্রে প্রত্যেক অংশীদারের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ, মুনাফার অংশ ও কারবারের অন্যান্য যাবতীয় শর্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। (২) চুক্তিপত্রে প্রত্যেক অংশীদার মুনাফার কত অংশ পাবে তা অনুপাত হিসাবে বা মুনাফার শতকরা হিসাবে উল্লেখ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন অংশীদারকে নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা শর্ত করা যাবে না।[৪৮] মুনাফার অংশ নির্ধারণকালে প্রত্যেক অংশীদারকে তার পুঁজির আনুপাতিক হারে মুনাফা দিতে হবে। শরী'আতে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, বরং অংশীদারদের পুঁজি, দক্ষতা, গুরুত্ব ও অবদান ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে পুঁজির আনুপাতিক হারে, অনুপাত অপেক্ষা অধিক হারে অথবা অনুপাতের চেয়ে কম হারে মুনাফার অংশ নির্ধারণ করা যেতে পারে।[৪৯] বস্তুত হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের মধ্যে মুশারাকা কারবারে অংশীদারদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যেকের মুনাফার অংশ নির্ধারণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।[৫০] (৩) মুশারাকা কারবারে কোন অংশীদারের মুনাফার অংশ তার পুঁজির অনুপাতে না হলে দোষ নাই কিন্তু লোকসানের অংশ অবশ্যই পুঁজির অনুপাত অনুযায়ী হতে হবে। এটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কোন অংশীদারকে যদি তার পুঁজির অনুপাতের চেয়ে অধিক বা কম লোকসানের অংশ নেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে চুক্তি অবৈধ ও বাতিল হবে।[৫১] (৪) কোন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য মুশারাকা চুক্তি করা হলে সেই মেয়াদ শেষে অংশীদারগণ যদি এ চুক্তি নবায়ন করার সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে সে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যে কোন অংশীদার যে কোন সময়ে নোটিশ দিয়ে মুশারাকা চুক্তির অবসান ঘটাতে পারে। তবে দু'য়ের অধিক অংশীদার থাকলে অন্যান্য অংশীদারগণ কারবার চালিয়ে যেতে পারে। কোন অংশীদারের মৃত্যু হলেও মুশারাকা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তবে অবশিষ্ট অংশীদারগণ কারবার চালু রাখতে পার।[৫২]

মুরাবাহা এমন একটি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি যেখানে শরী'আহর ভিত্তিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা পারস্পরিক লাভবান হয়ে থাকে। যে পদ্ধতিতে কেউ কাউকে প্রতারণা করা হয় না। পণ্যের মূল্য হিসাবে বৈধ বিক্রয় পদ্ধতি চার ভাগে বিভক্ত।[৫৩] তম্মধ্যে মুরাবাহা বিক্রয় পদ্ধতি হলো বৈধ পদ্ধতির একটি ধরণ। মূলতঃ এ পদ্ধতিকে 'আমান' বা ন্যায়সঙ্গত বিক্রয় পদ্ধতিও বলা হয়। সুতরাং শরী'আতের পরিভাষায় কোন ব্যক্তি একটি মাল অপর ব্যক্তির নিকট হতে যে মূল্যে ক্রয় করল সে মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের অংক যোগ করে ঐ প্রথম ব্যক্তি ক্রেতা উক্ত মাল অন্য কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করলে তাকে বায়' মুরাবাহা বলে।[৫৪]

বায়' মুরাবাহা কারবারে কতক শর্তাবলী আবশ্যক যথা (১) ক্রয়-বিক্রয়ের মাল মুদ্রার অংক না হয়ে পণ্য (Commodity) হতে হবে। (২) যে মাল বিক্রয় করা হবে সে মালের বিক্রয়মূল্য মুদ্রার অংকে নির্ধারিত হতে হবে। (৩) দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকলে কোন মুদ্রায় বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করা হবে তা চুক্তি পত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতার (عاقدين) ইজাব ও কবুল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ইজার ও কবুল একই মজলিসে হতে হবে। কারণ কোন ব্যক্তির (বিক্রেতার) কোন জিনিস বিক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ ব্যতিত এবং ক্রেতার ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ ব্যতিত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। ইশারা বা কোন কর্মের মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা যায়। (৫) বিক্রয়ের মালামাল (معقود عليه) প্রয়োজনীয় ও উপকারী হওয়া আবশ্যক। (৬) ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য অবশ্যই হালাল পণ্য হতে হবে যা ইসলামী শরী'আয় নিষিদ্ধ নয়। (৭) যে পণ্য বিক্রয় করা হবে সে পণ্যের বাস্তব উপস্থিতি অবশ্যই থকতে হবে। (বায়' সালম এর ক্ষেত্রে পৃথক মাসআলা) (৮) বিক্রয়ের মাল হস্তান্তরযোগ্য এবং ক্রেতার নিকট পরিচিত হতে হবে। (৯) বিক্রয়ের মাল অস্থাবর সম্পত্তি হলে এর উপর বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত থকতে হবে। কারণ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে তা দখল করার পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়। (১০) জমি কিংবা অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করার পর তা দখল করার পূর্বে বিক্রয় করা যাবে। (১১) মালের প্রকৃতি, পরিমাণ, গুণাগুণ বিক্রয়মূল্য (Sale price) ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট হতে হবে, নতুবা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। (১২) ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বুদ্ধিমান হতে হবে অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। (১৩) মাল যার নিকট বিক্রয় করা হবে অর্থাৎ ক্রেতা যদি মালের ক্রয়মূল্য, মুনাফা অন্যান্য খরচের পরিমাণ জানতে চায় তা জানাতে বাধ্য থাকবে। (১৪) নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত মালের হস্তান্তর বন্ধ রাখতে পারবে। (১৫) প্রথমে পণ্যটি দ্বিতীয় পক্ষ বা ক্রেতার নিকট জ্ঞাত হতে হবে। কেননা, বায়' মুরাবাহ এমন একটি বেচাকেনা পদ্ধতি যেখানে পণ্যের সাথে লাভ যুক্ত থাকে। আর বেচাকেনা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পণ্যটির মূল্য জানা শর্ত। সুতরাং যখন পণ্যটির মূল্য জানা যাবে না তখন তা বাতিল হয়ে যাবে।[৫৫] (১৬) পণ্যের লভ্যাংশ জানা থাকতে হবে। আর মূল্য জানা ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।[৫৬] পণ্যটি যেন সুদ যুক্ত না হয়।[৫৭]

মু'য়াজ্জাল পদ্ধতি ইসলামী শরী'আহ্‌র ক্রয়-বিক্রয় বৈধ পদ্ধতিগুলোর অন্যতম। এই পদ্ধতিতে ক্রেতার পরামর্শ অনুযায়ী পণ্যের উপর মালিকানা অর্জনের পর ক্রেতার কাছে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমেই ক্রয়মূল্যের উপর অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। সুতরাং মু'য়াজ্জাল পদ্ধতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি চুক্তি যার আওতায় ক্রেতার অনুরোধে বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে এবং ক্রেতা ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এককালীন বা কিস্তিতে দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করে।[৫৮] বায়' মুয়াজ্জাল বা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। আল্লাহর বাণী "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।[৫৯] উসূলে ফিক্‌হের সূত্রানুসারে আয়াতে বায়' (بيع) শব্দটি আম বা ব্যাপক অর্থেবোধক শব্দ। কাজেই উহা নগদ ও বাকী উভয় প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে শামিল করে। হাদীসের মাধ্যমেও বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণিত। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স.) বনু জাফর গোত্রের এক ইয়াহুদীর নিকট হতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকীতে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেছিলেন।[৬০] ফকীহগণ এ হাদীসটির মাধ্যমে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করার বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আ'মাশ বলেন, আমি ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) এর নিকট জিজ্ঞেস করেছি যে, (নগদ মূল্যে বাকিতে পণ্য ক্রয় করা) এর মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে বন্ধক তলব করতে পারবে কি না? হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বললেন, হুজুর (স.) এক ইহুদী থেকে বিলম্বে পরিশোধের শর্তে কিছু খানা ক্রয় করেছিলেন এবং তার নিকট একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। এর দ্বারা বন্ধক রাখা জায়েয বোঝা যায়।[৬১]

বায়' মু'য়াজ্জালে কয়েকটি শর্ত থাকা আবশ্যক। যথা- (১) মালের বিক্রয় মূল্য নির্দিষ্ট হতে হবে এবং তা চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন কলহের সৃষ্টি না হয়। (২) ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত ইজাব ও কবুল এর সময়েই মালের বিক্রয়মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে, নতুবা ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। কারণ এতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা থকে। (৩) ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ইজাব ও কবুল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। (৪) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিক্রেতা পাওনা টাকার তাগাদা করতে পারবে না, ক্রেতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাওনা টাকা পরিশেধ করতে বাধ্য থাকবে। (৫) ক্রেতা আর্থিক অভাবের কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয়মূল্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এবং বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিলে তা বৈধ হবে। তবে সময় বার্ধিত করা হলে তা বর্ধিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার পূর্বে বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্য তাগাদা দিতে পারবে না। (৬) মূল্য পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিত করা হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য বিক্রিত বস্তুতে অতিরিক্ত কোন মুনাফা ধার্য করা কিংবা বিক্রয় মূল্য বাড়িয়ে দেয়া যাবেনা, যদি তা করা হয় তাহলে অতিরিক্ত অর্থ সুদের পর্যায়ভূক্ত হবে। এ পদ্ধতিতে একবার বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হলে তা আর পরিবর্তন করা যায় না। কারণ ক্রেতার নিকট জিনিসের মূল্য ঋণ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আর ঋণের উপর অতিরিক্ত কিছু আদায় করার অর্থ হচ্ছে সুদ আদায় করা।

বায়' সালাম হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। এ পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য আগে পরিশোধ করা হয়। আর বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট পণ্য সরবরাহ করা হয় ভবিষ্যতের একটি নির্ধারিত সময়ে। অগ্রিম মূল্য প্রদান এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে মাল হস্তান্তরের শর্তে যে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয় তাকে বায়' সালাম বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়। বায়' সালামের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা বায়' সালাম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরী। এ সব শর্তের কয়েকটি এমন রয়েছে যা মূলধনের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর কয়েকটি এমন আছে, যা পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। বায়' সালাম পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার কতিপয় শর্তাবলী যা মূলধনের সাথে যুক্ত যথা- (ক) শ্রেণী নির্দিষ্ট হওয়া। (খ) পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া। একই বৈঠকে হস্তান্তরিত হওয়া এবং যেগুলো পণ্যের সাথে যুক্ত যথা- (ক) নিশ্চয়তা সহকারে প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ। (খ) এমন স্পষ্টভাবে তার বর্ণনা দেয়া, যাতে পরিমাণ ও গুনাবলী জানা যাবে এবং সেই গুনাবলী দ্বারা পণ্যটিকে অন্যান্য পণ্য থেকে পৃথক করা যাবে, যাতে বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রতারণার সম্ভাবনা না থাকে। (গ) সময় নির্দিষ্ট থাকা। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, ফসল কাঁটা ও হাজীদের আগমন ইত্যাদি দ্বারা সময় নির্দিষ্ট করা বছর ও মাসের সংখ্যা জানা জায়েয।[৬২]

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পাদিত এমন চুক্তিকে ইসতিসনা বলে যাতে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত বস্তু বিক্রেতা কর্তৃক তৈরি করে দেয়ার অঙ্গিকার থাকে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন কারিগর বা কারখানার মালিকের নিকট তার উদ্দিষ্ট দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে প্রস্তুত করে দেয়ার প্রস্তাব করলে এবং কারিগর বা মালিক ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করলে এক্ষেত্রে ইসতিসনা সম্পাদিত হয়। শরী'আহর পরিভাষায়, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন জিনিস নির্মাণ বা উৎপাদন করে দেয়ার জন্যে কোন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে বায়' ইসতিসনা বলে।[৬৩]

শরী'আহ বহির্ভূত ক্রয়-বিক্রয়সমূহ

ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসাকে হারাম করেননি বরং আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। তবে ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ে জুলুম, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, ঠকবাজি, মুনাফাখোরী কিংবা কোন নিষিদ্ধ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় হারাম। জাহেলিয়াতের যুগের মানুষ হালাল-হারামের একটা সম্পূর্ণ ভুল মানদণ্ড ঠিক করে নিয়েছিল। তারা মদ্যপান, সুদ খাওয়া, নারীদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করা, বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্নকারী দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় কিংবা শূকর ব্যবসা, মূর্তি বেচা-কেনা ও প্রতারণা-ধোঁকা মূলক ক্রয়-বিক্রয়সহ বিভিন্ন ধরণের শরী'আহ বহির্ভূত ও নিষিদ্ধ পণ্য বেচা-কেনায় অভ্যস্থ ছিল।

বস্তুত: ইসলাম আগমনের দ্বারা সে সময়ের প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, শরী'আতে মুয়া'মালাহ বা সকল প্রকার লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ও অর্থ উপার্জনের সকল পথ ও পদ্ধতি হালাল তবে যেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) হারাম বলে ঘোষণা করেছেন কেবল সে সব পদ্ধতি ও পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হারাম ও নিষিদ্ধ।[৬৪] তাই ইসলামী শরী'আহ যে সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ ও হারাম বলে ঘোষণা করেছে সেগুলো মৌলিকভাবে পাঁচটি কারণে হারাম হয়ে থাকে। যেমন- **(ক)** ধোঁকা ও অজ্ঞতার কারণে যে সব পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হারাম। তন্মধ্যে বায়' মুযাবানাহ[৬৫], বায়' মুলামাসাহ[৬৬], বায়' হাসাত[৬৭], বায়' হাবলুল হাবলাহ[৬৮], বায়' মাযামীন ও মালাকীহ[৬৯], বায়' আসফুল ফাহাল[৭০], ফল পরিপক্কতার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়, বায়' মাজহুল[৭১], বায়' সুনাইয়্যাহ[৭২] এবং অধীনে যা নেই তা বিক্রয় করা। **(খ)** সুদের কারণে যে সব ক্রয়-বিক্রয় হারাম। আর সুদ[৭৩] ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।[৭৪] সুতরাং সুদ মিশ্রিত কতকগুলো ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি বিদ্যমান আছে। যেমন- বায়' ঈনাহ বা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে বাকিতে বিক্রয়, বায়' মুযাবানা[৭৫], বায়' মুহাকালাহ[৭৬], একই জাতীয় পণ্যের সাথে অতিরিক্ত দিয়ে অথবা ভিন্ন জাতীয় পণ্যে বাকিতে অতিরিক্ত কিছু দিয়ে বিক্রয় করা, পরস্পর বিনিময়ে একই জাতীয় পণ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ হারাম এবং ঋণের পরিবর্তে ঋণ বিক্রয় করা নিষেধ। **(গ)** ক্ষতিসাধন ও প্রতারণার কারণে যে সব ক্রয়-বিক্রয় হারাম। যেমন- কোন ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করা, প্রতারণামূলক বিক্রয়[৭৭], তালাক্কীল জালব[৭৮] ও হাজির লিবাদ[৭৯]। **(ঘ)** যে সব পণ্য সত্তাগতভাবে ক্রয়-বিক্রয় হারাম। যথা- মদ, মৃত প্রাণী, শূকর, মূর্তি ক্রয়-বিক্রয়, কুকুর ও বিড়াল ক্রয়-বিক্রয়, প্রবাহিত রক্ত, ছবি বাদ্যযন্ত্র ও গান ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। **(ঙ)** অন্যান্য কারণে যে সব ক্রয়-বিক্রয় হারাম। যেমন- জুমু'আর আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয়, মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয়, ফিতনার সময় যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয়, কাফিরদের জন্য মাসহাফ বা কুর'আন বিক্রয় করা প্রভৃতি।

পর্যালোচনা

ইসলাম মানুষকে যেমনভাবে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছে তেমনিভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য মৌলিক ইবাদত নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ছাড়াও মানুষের পারস্পারিক জাগতিক বিষয়াবলী তথা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করার প্রতি ইসলামে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিধান ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (স.) মানুষকে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের সাথে সাথে এর হালাল ও হারামের প্রতি সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন। শরী'আহ প্রবর্তক যা করার অনুমতি দিয়েছেন বা করতে নিষেধ করেননি এমন বস্তু বা কারবার হালাল নামে অভিহিত করা হয়, আর যা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে, যা করার পরিণামে পরকালে শাস্তি অনিবার্য, এমনকি পার্থিব জীবনেও দণ্ডনীয়, এরূপ বস্তু বা কাজ অবৈধরূপে স্বীকৃত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) যে সকল ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তাই হালাল, আর যে সব ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন তা হারাম হিসেবে পরিচিত।[৮০] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'তোমাদের রাসূল যে সব বিষয় করতে আদেশ করেছেন সে সব পালন কর আর যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা তোমরা বর্জন কর।[৮১] বস্তুত: ইসলামী শরী'আতে কতকগুলো ক্রয়-বিক্রয় কে বৈধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন যেমন- বায়' মুদারাবা, বায়' মুশারাকা, বায়' মুরাবাহা, বায়' মুয়াজ্জাল, বায়' সালাম, ইজারা, ইসতিসনা ইত্যাদি। আবার কতগুলো এমন রয়েছে যেসব ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হিসেবে স্বীকৃত যেমন-বায়' মুযাবানাহ, বায়' মুনাবাযাহ, বায়' মুলামাসাহ, বায়' মুহাকালাহ, বায়' মুয়া'ওয়ামাহ, বায়' মুখাবারাহ, বায়' হাবলুল হাবলাহ, বায়' আল-গারার, বায়' আন-নাজাশ, নিলামে বিক্রয়, বায়' হাসাত, বায়' ঈনাহ, বায়' হাযের লিল বাদ ইত্যাদি।

এছাড়াও এমন কতকগুলো ক্রয়-বিক্রয় সমাজে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মাঝে প্রচলন আছে যেগুলো বৈধ ও অবৈধতার ব্যাপারে সন্দেহ বা অস্পষ্টতাসহ উলামাদের নিকট বৈধ-অবৈধতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেননা, সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে নু'মান ইব্‌নু বশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর।[৮২]

সুতরাং আমরা বলতে পারি শরী'আহ-এ কতকগুলো ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি সুস্পষ্ট বৈধ আর কতক রয়েছে অবৈধ এবং এতদুভয়ের মাঝে কতক ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি আছে যেগুলো বৈধ-অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে।

উপসংহার

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। এতে মানবজীবনের ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলসহ যাবতীয় সকল বিষয়ের সমাধান বিদ্যমান আছে। মানুষের জাগতিক জীবনে চাহিদার কোনো শেষ নেই। মানুষ নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতানুযায়ী নিজেই প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ উপার্জন করবে এটা তার সৃষ্টিগত অধিকার। কিন্তু অর্থ-সম্পদ উপার্জনের সে সকল পথ ও পন্থা অবশ্যই বৈধ হতে হবে। হাদীসে নবী (স.) ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্যক্তির নিজ হাতের কর্মকেই সর্বোত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামী শরী'আহ-এ হালাল ও হারাম পন্থাগুলো সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ। হালাল বলতে আমরা সাধারণত: যাবতীয় বৈধ পন্থাকেই বুঝি, যা কল্যাণকর ও হিতকর এবং যাবতীয় অবৈধ ও অকল্যাণকর হতে মুক্ত। ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে উপার্জনের জন্য শুধু উৎসাহ দেননি; বরং যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ পন্থাও বলে দিয়েছেন। অতএব হালাল উপার্জন বলতে বুঝায় উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ ও শরী'আহসম্মত পন্থা অবলম্বন। আর হারাম বলতে আমরা সাধারণত: যাবতীয় অবৈধ পন্থাকেই বুঝি, যা অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর। ইসলাম হারাম পথে উপার্জনের প্রতি জোরালো নিন্দা, নিষেধাজ্ঞা ও পাপাচারের পন্থা বলে আখ্যায়িত করেছে। অতএব হারাম পন্থায় লেনদেন বলতে, শরী'আহ কর্তৃক যাবতীয় নিষেধ ও অবৈধ পন্থা। ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির কতকগুলি হালাল এবং হারামের ব্যাপারে শরী'আহ সুস্পষ্ট ও প্রামাণ্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। আবার কতকগুলো অস্পষ্ট। তন্মধ্যে কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়, বর্তমানে বাগান বেচাকেনা, শেয়ার লেনদেন, বায়' মুজতার (উপায়হীনের ক্রয়-বিক্রয়), বায়' ঈনাহ, নিলামে বিক্রয়, অগ্রিম মূল্যে পণ্য বিপণন উল্লেখযোগ্য। ক্রয়-বিক্রয়ের এই সব পদ্ধতিগুলো নিয়ে ইসলামী শরী'আতে যেমন মতভেদ রয়েছে তেমনি ফকিহগণের মাঝে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। অত্র প্রবন্ধে এগুলোর পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত ও সাধারণ পাঠক সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে।

তথ্য নির্দেশ

[১]. আল-কুর'আন, সূরা আনআম, ৬ : ৩৮।

[২]. আল-কুর'আন, সূরা নাহাল, ১৬ : ৮৯।

[৩]. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ আত-তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী* (বৈরূতঃ মাকতাবাতু শিরকাহ, ২য় সং, ১৯৭৫ খৃ.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫, হাদীস নং ২৯৮৯।

[৪]. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাতীব আত্ তিবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৩য় সং, ১৯৮৫ খৃ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৯, হাদীস নং ২৮২৫।

[৫]. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান,* মূল: আল্লামা ইউসুফ কারযাভী, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১৯২ ; এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- 'কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে সফর করবে এবং অপর কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ করবে।' (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ : ২০)

[৬]. আল-কুর'আন, সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৭

[৭]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল-কাযবিনী, *সুনান ইব্‌ন মাজাহ (*বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৪, হা/২১৩৯। (التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة)

[৮]. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ আত-তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়্যাউত তুরাস আল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৫), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১৭, হা/১২১২।

روي الترمذي عن صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لامتي في بكورها)

[৯]. আব্দুর রউফ আল-মানাবী, *ফায়যুল কাদীর* (মিশরঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৬ হি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৮, হা/৯২৮০।

عن علي، كرم الله وجهه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى يحب أن يرى عبده يعني في طلب الحلال)، رواه الطبراني والديلمي.

[১০]. *ইসলামে হালাল হারামের বিধান, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৩০।

[১১]. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا দ্র. আল-কুর'আন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৭৫।

[১২]. আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূতঃ দারু ইহইয়্যাউত তুরাস আল-'আরাবী, তা.বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯, হাদীস নং ১০২; সুনান আবু দাউদ, হা/৩৪৫২; জামে' আত-তিরমিযী, হা/১৩১৫, সুনান ইব্‌ন মাজাহ, হা/২২২৪।

[১৩]. আল-কুর'আন, সূরা আল-বাকারাহ, ২: ২৭৫।

[১৪]. ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ্‌আস আস-সিজিস্তানী, অনু: ড. আ. প. ম. আবু বকর সিদ্দীক, *সুনানু আবী দাউদ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭), ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, পৃ. ৩৪৯, হাদীস নং ৩৩০০।

[১৫]. *সহীহ মুসলিম* (দিল্লী : মাকতাবাতু রশীদিয়া), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭, হাদীস নং ১৯৩৮।

[১৬]. আল-কুর'আন, সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ২৫৪, ২৭৫; সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ১১১; সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩১; সূরা হজ্জ, ২২ : ৪০; সূরা নূর, ২৪ : ৩৭; সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৯।

[১৭]. আল-কুর'আন, সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ৪১, ৮৬, ৯০, ১০২, ১৭৫, ২০৭; সূরা আল ইমরান, ৩ : ১৭৭ ও ১৮৭; সূরা নিসা, ৪ : ৭৪; সূরা মায়িদাহ, ৫: ৪৪; সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ১১১; সূরা ইউসুফ, ১২ : ২০-২১।

[১৮]. আল-কুর'আন, সূরা আল-বাক্বারাহ, ২ : ১৬, ২৮২; সূরা নিসা, ৪ : ২৯; সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ২৪; সূরা নূর ২৪ : ৩৭; সূরা ফাতির, ৩৫ : ২৯; সূরা ছফ, ৬১ : ১০; সূরা জুমু'আ, ৬২ : ১১।

[১৯]. আস-সাইয়্যেদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ* (আল-কাহিরাহঃ দারুল ফাতাহ লিল ই'লামিল 'আরাবী, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬।

[২০]. মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল‘আজী, *মু‘জামু লুগাতুল ফুকাহা* (লেবানন: দারুন নাফায়েস, ২য় সং, ১৯৮৮ খৃ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩।

[২১]. *Arbi Bangla Ovidhan,* Bangla Academy, 1984, Second Edition, Vol. 1, p. 745

[২২]. আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদায়ি‘উস স্বনায়ি‘ ফি তারতিবিশ শারাঈ* (বৈরূত: দারুস কুতুব আল-আরাবী, ১ম সং, ১৯৮২ খৃ.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪০।

[২৩]. কামাল উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহীদ আস-সিওয়াসী, *শারহু ফাতহুল কাদীর* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৭।

[২৪]. আব্দুন নাসের বিন খিজির মিলাদ, *আল-বু‘য়ূ আল-মুহহার্‌রামা ওয়াল মানহী আনহু (*মিশর: দারুল হুদা আন-নববী, ২০০৫ খৃ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬।

[২৫]. বুরহান উদ্দিন আবুল হাসান আল-মুরগীনানী, *আল-হিদায়া,* অনু: আবু তাহের মেছবাহ (ঢাকা: ই. ফা. বা, সম্পাদনা পরিষদ, জুন ২০০০), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যেদ সালিম, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ* (আল-কাহিরাহ: দারু আত-তাওফিকিয়্যাহ লিত-তুরাম, ১ম সংস্করণ, ২০১০ খৃ.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

[২৬]. আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইহইয়্যাউত তুরাস আল-‘আরাবী, তা.বি), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬, হাদীস নং ৪২০৬।

[২৭]. *সহীহ মুসলিম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬, হাদীস নং ৪২০৭।

[২৮]. আল-কুর’আন, সূরা নিসা, ৪ : ২৯।

[২৯]. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا দ্র. আল-কুর’আন, সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২৭৫।

[৩০]. লুইয়াস মা‘লুফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাত* (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ১ম সং, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ৪৪৮; ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু‘জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দ: কুতুবখানাহ হুসাইনিয়্যাহ, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৫৩৭।

[৩১]. উদ্যোক্তা বা শ্রম বিনিয়োগকারী যেহেতু জমিনে পদাচারণা করে একস্থান হতে অন্য স্থানে, একদেশ হতে অন্যদেশে গমন করে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে সেহেতু হানাফী ফকীহগণ এ জন্য এ ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের নাম দিয়েছেন মুদারাবা এবং অন্যান্য মাজহাবের ফকিহগণ এর নাম দিয়েছেন ‘ক্বিরাদ’ (قراض) বা ধারে ব্যবসা। দ্র. ইমাম মালেক, *আল মুয়াত্তা* (দেওবন্দ: ইয়াসীর নাদিম এ্যাণ্ড কোম্পানী, তা.বি), কিতাবুল ক্বিরাদ, টীকা নং ১, পৃ. ২৮৫।

[৩২]. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ **দ্র.** আল-কুর’আন, সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ : ২০।

[৩৩]. ড. ওয়াহাব বিন মুসত্বফা আয-যুহাইলী, *ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (*দিমাশক: দারুল ফিকর, তাবি), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৭।

[৩৪]. সম্পাদনা পরিষদ, বিধিবব্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ (ঢাকা: ই.ফা.বা., গবেষণা সংস্থা, এপ্রিল ১৯৯৫), পৃ. ৪৯৩; প্রাগুক্ত, T.P. *Hughes, Dictionary of Islam* (New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1st published, 1985), p. 426.

Ataul Haque **মুদারাবাহ এর সংজ্ঞায় বলেন,** Mudarabah is a contract between two persons where by one person gives the second a sum of money for trade purposes, profit sharing to be agreed upon before Land.cf. Reading in Islamic Banking (Dhaka: I. F. B., 1st edition, April 1987), p.132.

[৩৫]. ড. ওয়াহাব বিন মুসত্বফা আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৪১।

[৩৬]. *তদেব*, পৃ. ৮৪৪।

[৩৭]. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা (*ঢাকা : এমদাদিয়া বুক হাউস, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৯৬।

[৩৮]. শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১ম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১০৫।

---

৩৯. ড. মুহাম্মদ রাওয়াশ কালাজী, মাওসুয়াতু ফিক্হ আব্দুল্লাহিবনু আব্বাস (সৌদি আরব: আত তুরাশ আল-ইসলামী, তা.বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।

৪০. ইকবাল কবীর মোহন, *আধুনিক ব্যাংকিং* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ১২২; *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ৪৭৯; *ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা*, ৯৯; *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ১৩৩; *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৪৮০।

৪১. *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৫৪। وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. ; ড. এম. উমর চাপরা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩।

৪২. আল-কুর'আন, সূরা আন-নিসা, ৪ : ২৯।

৪৩. আল-কুর'আন, সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২।

৪৪. আল-কুর'আন, সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৪।

৪৫. *আবূ দাউদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪, হা/৩৩৮৫।

عَنْ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.»

৪৬. শিরকাতুল ইনান বা অসম অংশীদারিত্ব ভিত্তিক শিরকাত হলো, দুই ব্যক্তি কর্তৃক তাদের কোন সম্পত্তিতে এরূপ শর্তে ব্যবসায় করতে সম্মত হওয়া যে, মুনাফা উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে। শিরকাতুল ইনান কারবারে অংশীদারদের পুঁজি ও লাভের অংশ সমান সমান হওয়ার শর্ত থাকে না। অসম অংশীদারিত্ব বা স্বাধীন অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল ইনান বলা হয়। শিরকাতুল ইনান কারবারে অংশীদারদের প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতিনিধি কিন্তু জামিনদার নন। সুতরাং এ কারবারে তৃতীয় পক্ষের নিকট অংশীদারদের দায়িত্ব ব্যক্তিগত, যৌথ নয়। দ্র. ড. ওহাবাতুয যুহাইলী, ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৪র্থ খন্ড, তদেব, পৃ. ৭৯৫।

৪৭ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ দ্র. আল-কুরআন, সূরাহ আল-বাকারাহ: ২৮২।

৪৮. *Partnership and profit sharing in Islamic Law*, p.15.

৪৯. Dr. Erag Totensian, *Comperative Analysis of Investment in Capitalistic and Islamic Banking Systems under Certainly and Risk Conditions*, paper Submited and fifth international course in Islamic Banking, Central Bank if Islamic Republic of Iran, Training and manpower studies department, October 1994, p.5

৫০. *Partnership and profit sharing in Islamic Law*, p.15.

৫১. Ibid, p. 16

৫২. Ibid, p. 93

৫৩. অবশিষ্ট তিন প্রকার বিক্রয় পদ্ধতিগুলো হলো-

(ক) তাওলিয়া বিক্রয় পদ্ধতি (অনরূপ বিক্রয় পদ্ধতি) : কোন পণ্যকে কম বেশি না করে অবিকল কেনা দামে বিক্রয় করাকে তাওলিয়া বিক্রয় পদ্ধতি বলে।

(খ) ডিসকাউন্ট বিক্রয় পদ্ধতি : কোন পণ্য বা দ্রব্য সামগ্রীকে কেনা দাম থেকে কিছু কম দামে বিক্রয় করাকে ডিসকাউন্ট বিক্রয় পদ্ধতি বলে।

(গ) দর কষাকষি বিক্রয় পদ্ধতি (Bargain Sale) : কোন পণ্যের কেনা দাম নির্বিশেষে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মূল্যে উক্ত পণ্য বিক্রয় করাকে দর কষাকষি বিক্রয় পদ্ধতি বলে। এছাড়াও ওয়াদিয়াও হচ্ছে এক প্রকার বিক্রয় পদ্ধতি। আর তা হচ্ছে বিক্রেতা যদি ক্রয় মূল্যের চেয়ে কমদামে বা নির্ধারিত লোকসানের ভিত্তিতে পণ্য বিক্রয় করে তাহলে শরী'আতে তাকে বলা হয় ওয়াদিয়া। - দ্র. *দৈনিক সংগ্রাম*, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৫৫, ১১ই মার্চ, ২০০০, শনিবার, ঢাকা, পৃ. ৫।

৫৪. * بيع المرابحة: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين. الفقه الإسلامي وأدلته (267/5)

ড. মাহফুজুর রহমানের মতে, 'বিক্রেতা কর্তৃক তার ক্রয়মূল্য ক্রেতাকে জানিয়ে তার ওপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যোগ করে পণ্য বিপণন করা হলে তাকে বলা হয় বায়' মুরাবাহা'। (দ্রষ্টব্য: ড. মাহফুজুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অনুসৃত মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি : পরিপ্রেক্ষিত কুর'আন ও সুন্নাহ (প্রবন্ধ)* (ঢাকা: থট্স অন ইকনোমিকস, ভলিউম ২০, নম্বার ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯), পৃ. ৮৮।

ড. এম. উমর চাপরা এর মতে, Bai Murabaha in its simplest sense stands for supply of goods by the seller to the buyer at a specified profit margin mutually agreed between them. (ড. এম. এ. উমর চাপরা, *টুওয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারি সিস্টেম* (ইউ.কে : দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, *১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ১৭০।)*

ড. এম. এ. মান্নান- এর মতে, Murabaha means resale of goods with the addition of a fixed surcharge to the stated original cost (M.A. Mannan, *The Making of Islamic Economic Society* (Cairo : Intarnational Association of Islamic Banks, First edition 1984), p.xxvi)

৫৫. মুস্তফা তুয়েল, *ইসলামী ব্যাংক* (তুনতা, গাশী, ১৯৯৯), পৃ. ২০২।

1 – ... أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني ، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح ، والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماً فهو بيع فاسد .

৫৬. মুহাম্মাদ সালাহুস সাবী, *ইসলামী ব্যাংক বাস্তবায়ন পর্যালোচনা* (বৈরূত: দারুল ওফা' মানসূরাহ, ১৯৯০ খৃ), পৃ. ২০৬।

2 - ... أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.

৫৭. আব্দুর রায্যাক আল-হাইতী, *আল-মুসারিফুল ইসলামিয়্যাহ বায়নান নাযরিয়্যাহ ওয়াত তাদবীক* (আম্মান: দারু উসামাহ, ১ম সং, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৫১২।

৫৮. *আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ.৬৩।

**বাকিতে বিক্রির ব্যাখ্যা: বাকিতে বিক্রির অর্থ হলো, পণ্য এখন ক্রয় করা হলো এবং মূল্য পরিশোধের জন্য ভবিষ্যতের কোন একটি তারিখ নির্ধারণ করা হলো। এটা কিছু শর্ত সাপেক্ষে জায়েয আছে। (দ্র: ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামের পদ্ধতি, ২নং সিরিজ, পৃ. ৫০।)

৫৯. আল-কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২৭৫।

৬০. *সহীহুল বুখারী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭, হা/২০৬৮।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ -بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ

৬১. *ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামের পদ্ধতি*, ২নং সিরিজ, পৃ. ৫০।

৬২. *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪।

৬৩. Muhammad Taqi Uusmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Published by: Kluwer Law International, P.B. Box 85889, 2508 CN The Hague p.195; মাওলানা ফজলুর রহমান, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?* (ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ১৫১।

৬৪. আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন সলেহ বিন হামদ বিন মুহাম্মাদ বিন হামদ আল-বাস্সাম, *তাইসিরুল আল্লাম শারহু উমদাতুল আহকাম* (আল কাহিরাহ: মাকতাবাতুস সাহাবাহ, আল-আমারাত, সং, ২০০৩ খৃ.), খণ্ড. ২য়, পৃ.১২৬।

وفي القاعدة الشرعية: أن الأصل في المعاملات وأنواع التجارات والمكاسب الحل والإباحة فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله

দ্র. *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬০।

৬৫. ক্রেতা-বিক্রেতা কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মত হওয়ার পর যদি বিক্রেতা বিক্রিত জিনিসটিকে ক্রেতার দিকে নিক্ষেপ করতো তখনই ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হতো। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে বায়' মুনাবাযা বলা হয়। (*আল-কামুসুল ফিকহী*, পৃ.৩৪৬; *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, পৃ. ২২১)

[৬৬]. ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করে কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মত হওয়ার পর ক্রেতা যদি বিক্রিত জিনিসটি স্পর্শ করতো তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হতো। এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে বায়' মুলামাসাহ বলে। (Md. sofiq Ahmed, *Morality in trade under the perspective of Islam*, J.A.S.B, op.cit., p.70)

[৬৭]. বায়' হাসাত বলতে বুঝায়, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, আমি যখন পাথর নিক্ষেপ করব তখন বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এভাবেও বলা যায় যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, আমি পাথর নিক্ষেপ করব তা যেখানে গিয়ে পতিত হবে ততটুকু জমি তোমার কাছে বিক্রয় করব। (*ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী পদ্ধতি*, পৃ. ১৬৭।)

[৬৮]. 'গর্ভস্থ মাদি বাচ্চার সম্ভাব্য বাচ্চা বিক্রি করা। (*লিসানুল আরাব*, ১১দশ খণ্ড, পৃ.১৩৪।)

[৬৯]. পশুর পেটের মধ্যে ঐ সকল বাচ্চা যেগুলোর অবস্থা ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবগতি হওয়া অসম্ভব। (*আল-কামুসুল ফিকহী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪।)

[৭০]. 'আসবুল ফাহাল' হলো নর প্রাণী মাদীর উপর চড়িয়ে যে মজুরী গ্রহণ করা হয় তাকে বলে। (*আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ*, ৩০খণ্ড, পৃ. ৯৩)

[৭১]. যে বস্তু বা পণ্য সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোন তথ্য জানা যায় না এমন পণ্য বেচা-কেনা করাকে বায়' মাজহুল বলে। (*মু'জামু লোগাতুল ফুকাহা*, পৃ. ৪০৭।)

[৭২]. 'কোনবস্তু বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য সম্পর্কে অজান্তে কোন অংশ বিরত রেখে বিক্রয় করা যাহা বেচাকেনাকে বাতিল করে দেয়।' (*লিসানুল আরাব*, ১৪ তম খণ্ড, পৃ. ১১৫।)

[৭৩]. একই শ্রেণীভুক্ত মালের লেন-দেন কালে কোন পক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষের নিকট হতে যে বর্ধিত অংশ গ্রহণ করে তাকে 'সুদ' বলে।

[৭৪]. وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا দ্র.আল-কুর'আন, সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৫।

[৭৫]. খেজুর গাছে থাকা তাজা খেজুরকে পরিমাপ করে কর্তিত বা শুকনো খেজুর বিনিময়ে বিক্রয় করা। (*আত-তা'রিফাত*, পৃ. ২৭০।)

[৭৬]. শুকনো গমকে জমিতে শীষ থাকা গমের সাথে ওযন করে বিক্রয় করা। অনুরূপভাবে সাইয়্যেদ সাবিক বলেন, খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট পাত্র দিয়ে মেপে ক্ষেতের ফসল বিক্রয় করা। (*ফিকহুস সুন্নাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬।)

[৭৭]. ইব্রাহীম হারবী বলেন, 'নাজাশ' বলা হয় কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতঃ এমন প্রশংসা করা যে, ক্রেতাগণ মনে করে এটা খুবই দামি জিনিস। (*তাজুল উরূস লিযযুবাইদী*, ৪/৩৫৪, *ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী পদ্ধতি।)*

[৭৮]. কতিপয় অসাধু ও প্রতারক ব্যবসায়ী সস্তা মূল্যে ক্রয় এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় করার পণ্য সামগ্রী বাজারে পৌঁছার পূর্বেই অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয় করাকেই (تلقى الجلب) তালাক্কীল জালব বলে। (সায়্যেদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯)

[৭৯]. গ্রামবাসী ব্যবসায়ী কোন দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে স্বহস্তে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শহরে আগমন করে, অথচ শহরের এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী গ্রাম্য লোকের নিকট হতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে দেয়ার শর্তে ক্রয় করে এবং নিজের ইচ্ছামত চড়া দামে বিক্রি করাকে حاضر لبادى বলে। (*ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯)

[৮০]. *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, তদেব, পৃ. ৩৩০, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, *ইসলামী অর্থনীতি*, অনুবাদঃ আব্বাস আলী খান, আব্দুস শহীদ নাসিম ও আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকা: সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ৬৮; ইমাম গাযালী, *মিনহাজুল আবেদীন*, ইবাদত সোপান, অনুবাদঃ মাওলানা মুজীবুর রহমান (ঢাকা: ই.ফা.বা., ৩য় সং, জুন ১৯৯৪), পৃ. ১৪২।

[৮১]. আল-কুর'আন, সূরা হাশর, ৫৯ : ৭।

[৮২]. *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬, হা/৫২; *সহীহ মুসলিম*, হা/১৫৯৯; *আহমাদ* হা/১৮৩৯৬, ১৮৪০২।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

ইবন সিনা: চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রদূত

আবুল বাশার মোহাম্মাদ সরোয়ার আলম*

Abstract : Ibn Sina was born in 980 AD. at Afsana in Bukhara. He spent his childhood in Afsana and Bukhara. He memorized the holy Quran at the age of ten. Ibn Sina gained a higher knowledge of theology, fiqh, logic and mathematics from three house tutors. In addition, he also gained profound knowledge in physics.geography and medicine by his own attempts. At the age of 16 he became an expert in medical science. Along with treatment, he also served as a minister. He wrote more than 100 books. Al-Qanun Fittib is his prominent creation in medical science. This book is known as theBible in medical science. The Al-Qanun of Ibn Sina is divided into five parts. In this book knowledgeable discussion have been provided about almost all branches of medical science without surgery. He had a medical related manuscript Al-Adwiyh al-Qalbi. In that article the thoughts of Ibn Sina about medical sciences like the responsibilities of the physician, diagnosis method, urine test, diabetic, treatment of eye, cancer, heart disease, anatomy, enbryology, orthopedics, deontology, obstetrics and use of catheters are discussed. Ibn Sina the pioneer of medical science died at Hamadan in 1037 AD.

ভূমিকা

চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথিকৃত ইবন সিনা মধ্যযুগের এক কালজয়ী প্রতিভা। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে ইবন সিনার চিন্তা ও কর্মে মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞান পূর্ণতা পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে ইবন সিনার বিশেষ অবদান রয়েছে। চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি মুসলিম গ্যালন নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। ইবন সিনার অনবদ্য সৃষ্টি 'আল-কানূন ফিত তিব্ব' গ্রন্থটি চিকিৎসা জগতে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। ৫ খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা স্থান পেয়েছে। এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'ফি আহকামিল আদবিয়াতিল কালবিয়াত' চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ চিকিৎসা জগতে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করলেও পাঠক-পাঠিকা ও শিক্ষার্থীদের নিকট দুর্লভ গ্রন্থ হিসেবেই রয়েছে। কেননা তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সাধারণ পাঠকসমাজের জ্ঞান অর্জন করা খুবই দুরুহ অথচ এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিম্নে ইবন সিনার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর অবদান উপস্থাপন করা হলো।

নাম ও বংশ পরিচয়

ইবন সিনার প্রকৃত নাম আল-হুসাইন, কুনিয়াত 'আবু আলী, উপাধি জ্ঞানীকুল শিরোমণি[১] (الشيخ الرئيس)ও চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বিতীয় শিক্ষক[২] (المعلم الثانى فى الطب)। তিনি ল্যাটিন ভাষায় আভিসিনা (Avicenna) এবং হিব্রুতে আভিনসিনা Avensina নামে পরিচিতি।[৩] তবে বিদ্বান মহলে তিনি ইবন সিনা[৪] নামেই প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতার নাম 'আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম সিতারা। পিতা-মাতা দু'জনেই জাতিতে ইরানী ছিলেন। পিতা আবদুল্লাহ সামানী শাসকদের অধীনে বুখারার অন্তর্গত খারমাইছানের শাসনকর্তা[৫] ছিলেন।[৬] তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবু আলী আল হুসাইন ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আলী ইবন সিনা আল-বুখারী।[৭]

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জন্ম পরিচয়

ইবন সিনা ৩৭০ হিজরী মুতাবিক ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান উজবেকিস্তানের বুখারার অন্তর্গত খার্মাতায়েন জেলার আফসানা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৮] কারো মতে, তাঁর জন্মস্থান খারমাইছানে। আবার কেউ কেউ তাঁর জন্মস্থান বলখ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] এক্ষেত্রে প্রথম মতটিই প্রসিদ্ধ ও সঠিক।

শিক্ষাজীবন

ইবন সিনা আফসানা ও বুখারায় শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। পিতার গৃহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ থাকার ফলে নিজ গৃহেই প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ইবন সিনা পাঁচ বছর বয়সে আফসানা থেকে পরিবারের সাথে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বুখারায় গমন করেন।[১০] 'আবদুল্লাহ তাঁর শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। ইবন সিনা শৈশবকাল থেকেই তীক্ষ্ম ধী-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়সে সমগ্র কুর'আনসহ 'আরবী সাহিত্য, কবিতা, গণিত ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেন।[১১] তাঁর তিনজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে ইসমাঈল মতান্তরে ইব্রাহিমের নিকট থেকে ধর্মতত্ত্ব, ফিকহ্ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী মাহমুদ মসাহ নামক মুদী দোকানী মতান্তরে ফল বিক্রেতার নিকট অংকশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে গণিত বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন। অতঃপর আবূ 'আবদিল্লাহ আল-নাতিলীর নিকট যুক্তিবিদ্যা, জ্যামিতি এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন।[১২] চৌদ্দ বা পনের বছর বয়স পর্যন্ত তিনি গৃহশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেন। এরপর নিজের প্রচেষ্টায় পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোলশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। প্লেটো এবং এরিস্টটলের গ্রন্থও পড়তে থাকেন। এরিস্টটলের অধিবিদ্যা বিষয়ক ما بعد الطبيعة (প্রকৃতির পরে যা) গ্রন্থটি ৪০ বার অধ্যয়ন করে তিনি কিছু না বুঝার কারণে নিরাশ হয়ে পড়েন। অবশেষে আল ফারাবীর 'আল-ইবানা' গ্রন্থ পাঠ করে অধিবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।[১৩] একইভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং মাত্র ১৬ বছর বয়সেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন। ১৮ বছর বয়সে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১৪]

কর্মজীবন

ইবন সিনা স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সম্পদের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। জ্ঞান চর্চাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। অন্যায়ভাবে কারো নিকট মাথানত না করার ফলে তাঁর কর্মময় জীবন সুখকর হয়ে উঠেনি। ইবন সিনা চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের পর স্থানীয় ব্যক্তিদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। অল্প সময়েই তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় স্থানীয় সামানী শাসক নূহ ইবন মানসূর কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে তিনি অতি সহজেই সুলতানকে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হন। সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে ইবন সিনাকে রাজকীয় লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমতি দেন।[১৫] অনন্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী ইবন সিনা রাজকীয় লাইব্রেরীর সংস্পর্শে জ্ঞানচর্চা করে নিজেকে পূর্ণরূপে বিকশিত করেন। তিনি সামানী শাসকের অধীনে চাকুরী করেন বলে জানা যায়।[১৬]

২২ বছর বয়সে ইবন সিনার পিতা মৃত্যুবরণ করলে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। গজনীর সুলতান মাহমূদ সামানী সুলতানকে উৎখাত করে বুখারা দখল করলে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে তিনি বুখারা ত্যাগ করে খাওয়ারিযমে গমন করেন।[১৭] সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর নাসা, তুস, নিশাপুর হয়ে গুরগাঁও আশ্রয় গ্রহণ করতঃ গবেষণামূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। গুরগাঁও-এর সুলতান কাবুসের পতনের পর ইবন সিনা পারস্যের বিখ্যাত নগরী রায়ে চলে যান। সেখানে প্রায় তিন বছর অবস্থানের পর কাযবীন হয়ে হামাদানে পৌঁছেন। হামাদানের শাসনকর্তা শামস-উদ-দৌলা-এর রাজপ্রাসাদে প্রথমে চিকিৎসক ও পরে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।[১৮] দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর দায়িত্ব পালনের পর অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের ফলে ইবন সিনা কারাবরণ করেন। প্রায় চার মাস কারাভোগের পর ইস্পাহানের শাসনকর্তা আলাউদ-দৌলা-এর নিকট

রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেন।[১৯] অবসর সময়ে তিনি গ্রন্থ রচনায় মগ্ন থাকতেন। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর ইস্পাহানে অতিবাহিত করার পর ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে হামাদানে পৌঁছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

ইন্তিকাল

ইবন সিনা ৪২৮ হিজরী মুতাবিক ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে হামাদানে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত করা হয়।[২০] কারো মতে, তিনি ইস্পাহানে ইন্তিকাল করেন।[২১] কেউ কেউ বলেন, হামাদানে কারারুদ্ধ অবস্থাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে প্রথমোক্ত মতামতটি বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।[২২] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৭ বছর।

গ্রন্থ রচনা

ইবন সিনা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় অবদান রেখেছেন। তিনি অল্প বয়সে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। বুখারা, খাওয়ারিযম, হামাদান ও ইস্পাহানের রাজদরবারের সংস্পর্শে থাকার ফলে তাঁর রচনাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করে। মাতৃভাষা ফার্সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবন সিনার একান্ত শিষ্য ও জীবনী লেখক জুরজানী তাঁর রচিত ১৯২টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[২৩] তন্মধ্যে ১৮৩টি ‘আরবী গ্রন্থের নামের তালিকা পাওয়া যায়।[২৪] কারো মতে, তিনি চিকিৎসা, দর্শন, গণিত, পদার্থ, জ্যোতিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ৯৯টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২৫] মিফতাহুস সা'আদাহ গ্রন্থে ১০০টি গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে।[২৬] তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল-কানূন ফিত তিব্ব ও আশ-শিফা গ্রন্থ দুটি চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবন সিনার অবদান

মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তন্মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে ইবন সিনা চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রদূত ছিলেন। ইবন সিনা গ্রীক, রোমক, ভারতীয় ও চৈনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সার সংগ্রহ করে নিজের সরল স্বচ্ছ ভাষায় القانون فى الطب (চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূত্রাবলী) রচনা করেন। এছাড়াও তিনি ‘ফি আহকামিল আদবিয়াতিল কালবিয়াত’সহ কয়েকটি চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর ‘কানূন’ গ্রন্থটিই সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও গোছানো। একাদশ শতক হতে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত গ্রন্থটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলে পাঠ্যসূচী ছিল।[২৭] দ্বাদশ শতকে ক্রেমোনার জিরার্ড কর্তৃক কানূন গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। পঞ্চদশ শতকের শেষ ত্রিশ বছরে গ্রন্থটির ১৫টি ল্যাটিন ও একটি হিব্রু সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[২৮] ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে কানূন সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় রোম থেকে প্রকাশিত হয়।[২৯] টমাস ক্লিফোড বলেন, ইবন সিনার কানূন হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে।[৩০] চিকিৎসাশাস্ত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি পশ্চিমে The Princess of Physicians নামে পরিচিতি লাভ করেন। আর কানূন গ্রন্থটি চিকিৎসা জগতে মেডিকেল বাইবেল (Medical Bible) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। স্যার উইলিয়াম অসলার বলেন, ‘It has remained a Medical Bible for a longer period than any other work’.[৩১] চিকিৎসাশাস্ত্রে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য তাঁকে ‘মুসলিম গ্যালন’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কলিন বলেন, ‘Ibn Sina sometimes has been called, the Galen of Islam because of his encyclopedic Qanun of medicine’.[৩২]

ইবন সিনার কানূন গ্রন্থটি পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। এ গ্রন্থে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া তিনি ফি আহকামিল আদবিয়াতিল কালবিয়াত পাণ্ডুলিপিতে

Phycho-therapy ও Heart Drugs বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবন সিনা তাঁর কানূন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শারীরবিদ্যা (Physiology), রোগের কারণ ও লক্ষণাবলি এবং স্বাস্থ্যবিধি (Hygeine)-এর সাধারণ মূলনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৩৩] দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি প্রাণী উদ্ভিদ ও খনি থেকে আহরিত নানারকম ঔষধের মিযাজ[৩৪] নির্ণয়, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, কার্যকারিতা, রোগের প্রকৃতি ও কঠোরতা অনুসারে ঔষুধের গুণগত এবং পরিমাণগত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৩৫] এ খণ্ডটি ৮০০টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এতে আরবী 'আবজাদ' (বর্ণনাক্রম) প্রণালী অনুসারে ৭৬০টি[৩৬] মতান্তরে ৭৮৫টি ঔষুধির বিবরণ রয়েছে।[৩৭]

ইবন সিনা কানূন গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গের রোগ এবং সেগুলোর উপসর্গ (Symptom), রোগ নির্ণয় (Diagnosis), পূর্বাভাস (Prognosis), চিকিৎসা (Treatment) এবং রোগের কারণ (Etiology) নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৩৮] এতে মাথার রোগ যেমন- মাথাধরা, মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক তাপ, মৃগী, অবশতা, চোখ, কান, নাক, গলা ও দাঁতের রোগ, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগ, জননেন্দ্রিয় সংক্রান্তরোগ, গর্ভধারণ ও স্ত্রীরোগ ছাড়াও পেশী, সন্ধিস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।[৩৯] চতুর্থ খণ্ডে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন রোগের কথা আলোচনা করেছেন।[৪০] এ খণ্ডটি ৪ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নানা ধরনের জ্বরের সাধারণ বর্ণনা ও কারণ, কৌষ্ঠবদ্ধতা, ডায়রিয়া, ক্রোধ, ভয়, বেদনা, প্রদাহ পচন, মহামারী জ্বর, বসন্ত, বমি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ফোঁড়া, ফোলা, কুষ্ঠ, ঘা, আলসার, হাড়ভাঙ্গা প্রভৃতির আলোচনা ও তাঁর চিকিৎসা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে খনিজ, উদ্ভিজ এবং জান্তব পদার্থ থেকে বিষক্রিয়া, মানুষ এবং জন্তুর কামড় থেকে বিষক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ ভাগে সৌন্দর্য, প্রসাধনী, স্থূলতা, চুল, নখ এবং গাত্রচর্ম, বসন্তের চিহ্ন, ধবল প্রভৃতির চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৪১] ৫ম খণ্ডে বিভিন্ন রোগের জন্য ঔষুধের ব্যবস্থাপত্র, বড়ি, পাউডার, সিরাপ ইত্যাদির তৈরী কৌশল নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৪২]

চিকিৎসকের দায়িত্ব

প্রাচীনকালে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছিল না। চিকিৎসকরা নিজের মানসিক শক্তি, বাহ্যিক নিদর্শন, উপসর্গ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে রোগের স্বরূপ নির্ণয় করতেন। এক্ষেত্রে ইবন সিনা তাঁর 'কানূন' গ্রন্থে চিকিৎসকদের জন্য অবশ্য পালনীয় কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসককে নিজের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। এক্ষেত্রে চিকিৎসককে দেখতে হবে যে, তাঁর প্রস্রাবে কোন তলানি নেই, পেট ভারভার নয়, মাথা ব্যথা, মানসিক ক্লান্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন সমস্যা নেই। এছাড়া চিকিৎসক সালাত আদায় করে আল্লাহর নিকট দোয়া করে নিজের মনকে প্রশান্ত রাখবে। এ সকল বিষয়ে চিকিৎসক প্রস্তুত না থাকলে রোগ নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি হবে। কারণ রোগীকে দেখেই তার রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে না উঠলে চিকিৎসকের মানসিক শক্তির মধ্যে রোগীর নানাবিধ শক্তির চাপ পড়ে গোলযোগের সৃষ্টি হবে। রোগী যেন একখানা পাণ্ডুলিপি, জড়ান অক্ষরে লেখা। এ পাণ্ডুলিপি পড়তে হলে শুধু অক্ষর জ্ঞান থাকলেই চলবে না, লেখার নানা ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে সে সব ভঙ্গি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানও থাকা প্রয়োজন।[৪৩]

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

আরব চিকিৎসাবিদগণ রোগীর কতগুলো বাহ্যিক অবস্থা সুক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করতেন। ইবন সিনা এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি কানূন গ্রন্থে রোগীর রোগ নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, চিকিৎসক পুরুষ রোগীর বাম হাতের নাড়ী স্পন্দন ও নারী রোগীর ডান হাতের নাড়ী স্পন্দন পরীক্ষার সময় মন-প্রাণ নিবিষ্টভাবে সন্নিবেশ করবেন। এরপর রোগের ইতিহাস শুনবেন এবং সুক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করে ঐ বিষয়ে নোট করবেন। এছাড়া রোগীর খাদ্য, পানীয়, ব্যায়াম, কাজ, অবসর, স্বপ্ন ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসাবাদ

করে জেনে নিবেন। চিকিৎসক রোগীর শরীর সম্পর্কে বাহ্যিকভাবে যে সকল বিষয় জানবেন তা হলো, শরীরের গঠন- (১) একহারা, দোহারা না স্ফীতোদর; (২) মাংসল না ক্ষীণ দেহ; (৩) গায়ের রং এর কোন পরিবর্তন বা গায়ে কোন দাগ আছে কিনা; (৪) চুলের রং এর কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা; (৫) হাত; (৬) আঙ্গুলের নখ; (৭) চোখ; (৮) জিহব্বা; (৯) শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কাজ; (১০) ঘুম কিরূপ; (১১) কানের লতির আকার; (১২) নাকের আকার ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাকের কার্যকলাপ; (১৩) হাতের আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য; (১৪) হাত ও পায়ের পেশী থলথলে না আটসাট; (১৫) হাত পায়ের গিরাগুলোর আকার; (১৬) কণ্ঠ মনির আকার প্রভৃতি।[৪৪]

ইবন সিনা বলেন, চিকিৎসক তাশরীহ (Functional Anatomy) তথা প্রতিটি অঙ্গের বিভিন্ন কাজ বিষয়ে অবগত হয়ে রোগীর শরীরের ভিতরের রোগ নির্ণয় করতে অগ্রসর হবেন। ছয়টি বিষয় নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে রোগীর রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন- (১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিকতা তথা দৃষ্টিক্ষীণ হওয়া, বদ হজম ইত্যাদি; (২) মলমূত্রের অস্বাভাবিকতা তথা কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময় ইত্যাদি; (৩) বেদনার স্থান ও তীব্রতার পরিমাণ; (৪) শরীরের ফুলা; (৫) আকৃতি ও পারস্পারিক সম্পর্ক; (৬) বিশেষ উপসর্গ যা থেকে প্রত্যক্ষভাবে রোগের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।[৪৫] এ সমস্ত উপসর্গ, লক্ষণ প্রভৃতি নিরীক্ষার মাধ্যমেই চিকিৎসকের পক্ষে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।

প্রস্রাব পরীক্ষা

ইবন সিনা রোগীর রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষার পর প্রস্রাব পরীক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি সঠিক প্রস্রাব পরীক্ষার কতকগুলো দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। যেমন-

১. সকালের প্রস্রাব পরীক্ষা করা।
২. প্রস্রাব সংগ্রহের পর পরীক্ষার জন্য সময় ক্ষেপণ না করে ৬ ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষা করা। এর ব্যত্যয় হলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না।
৩. পরীক্ষার জন্য প্রস্রাবের পূর্বে কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ না করা।
৪. যে সমস্ত জিনিস খেলে বা শরীরের কোন অঙ্গে ব্যবহার করলে প্রস্রাবের রং পরিবর্তন হয় সেগুলো পরিহার করা। যেমন, জাফরান ও ডালিম।
৫. মূত্র বৃদ্ধিকারক খাদ্য পরিহার করা।
৬. অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম পরিহার করা। যেমন- রোজা, অনিদ্রা, ক্ষুধা প্রভৃতিতে প্রস্রাবের রং হলদে হয়।
৭. প্রস্রাবের সমস্তটুকুই একটি বড় মুখওয়ালা বোতলে সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে প্রস্রাবের কোন অংশ যেন ছিটকে না পড়ে।
৮. প্রস্রাব সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কাঁচের পাত্রটি বর্ণহীন ও পরিষ্কার হওয়া।
৯. সংগৃহীত প্রস্রাব বেশী বাতাস বা রোদ এবং বেশী গরম বা ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ না করা।
১০. প্রস্রাব সংগ্রহের সাথে সাথে পরীক্ষা না করে বোতলের মধ্যে থিতিয়ে স্থির হয়ে গেলে পরীক্ষা করা।
১১. সংগৃহীত নমুনার কাছে এবং দূরে থেকে পরীক্ষা করা। কারণ কাছে থেকে প্রস্রাব ঘন এবং দুরে থেকে পরিষ্কার দেখায়।
১২. উজ্জ্বল আলোতে প্রস্রাব পরীক্ষা করা, তবে প্রত্যক্ষ আলোতে নয়।[৪৬]

উপরিউক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধৈর্য্য সহকারে প্রস্রাব পরীক্ষা করলে রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে।

ডায়াবেটিক

ইবন সিনা ডায়াবেটিক তথা বহুমূত্র রোগীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ মতামত প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাব সাধারণত পরিষ্কার, ভারী এবং ঘনঘন হয়। প্রস্রাব বাতাসে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং চিনির মত একটি মিষ্টি অংশ পড়ে থাকে। বহুমূত্র রোগী অতি পিপাসা, ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং গ্যাংগ্রিন (পচা ঘা) সমস্যায় ভুগে এবং রোগী কৃষকায় হয়ে যায়।[৪৭] ইবন সিনা সর্বপ্রথম ডায়াবেটিক রোগীর প্রস্রাবের সুইট টেস্ট লিপিভুক্ত করেন। সৈয়দ আশরাফ আলী বলেন, 'He first recorded the sweet taste of urine of Diabetic patients'.[৪৮]

চক্ষু চিকিৎসা

একাদশ শতকে ইবন সিনার আবির্ভাব আরব চিকিৎসা জগতে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় চোখের চিকিৎসা নিয়েও গবেষণা করেন। তিনি চোখের ছানি, অক্ষিপ্রদাহ, অক্ষিঝিল্লী প্রদাহ, অক্ষিপল্লব বহিরাবর্তন, গ্লোকোমা, কেরাটাইটিস, লিউকোমা, রাতকানা, টেরা চোখ, টাফাইলাম, ট্রাকোমা, স্টাইস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা ও তার ঔষধ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করেছেন। চোখের ছানি বিষয়ে ইবন সিনার মতামত হলো, চোখে ছানি দেখা দেয়ার পূর্বে মাথাধরা, আধকপালে মাথাধরা, চোখের সামনে কতকগুলো কালো কালো দাগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এ সকল সমস্যা হলে বুঝতে হবে চোখে ছানি পড়বে। কানের উপরের দিকে পশ্চাতে চুলের লাইনে ৩টি শিরা রয়েছে। এ ৩টি শিরার মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত বড় শিরা থেকে রক্তমোক্ষণ[৪৯] করলে উপকার পাওয়া যায়।[৫০] তিনি কানূন গ্রন্থে উপরে বর্ণিত চক্ষু রোগের চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনিই চক্ষু রোগের আরোগ্যকরণের নতুন পদ্ধতির সূচনা করেন।[৫১]

ক্যান্সার

ক্যান্সার রোগ বিষয়ে মধ্যযুগের আরব চিকিৎসাবিদগণ বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন বলে অনুমিত হয়। কারণ ইবন সিনার ক্যান্সার বিষয়ে তৎকালীন বর্ণনা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইবন সিনার মতে, ক্যান্সার থেকে আরোগ্য লাভের একমাত্র উপায় হলো রোগের সূত্রপাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। অপারেশন করে আক্রান্ত স্থানের যতদূর কেটে ফেলা সম্ভব ততটুকু কেটে ফেলা।[৫২] ক্যান্সার ও টিউমারে যত শিরা উপশিরাই থাকুক না কেন সবগুলোই অপারেশন করা। এক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখানো যাবে না। রোগ আক্রান্ত জায়গা পুড়িয়েও দিতে হবে। এসব ব্যবস্থার পরেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা খুবই কম।[৫৩]

হৃদরোগ

ইবন সিনার কানূন গ্রন্থে হৃদরোগের সমস্যা ও তার প্রতিকার বিষয়ে চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দিল্লীর জামিয়া মিল্লিয়া লাইব্রেরীতে এবং পাটনা বাঘপুর-এর ব্রিটিশ মিউজিয়ামে Al Adwiyh al Qalbi নামক গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।[৫৪] এ গ্রন্থে হৃদরোগও তার চিকিৎসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মৌলিক পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে Muslim Contribution to Science and Technology গ্রন্থে বলা হয়েছে- Though Qanun contains less original contribution of Ibn Sina, a recent discovery of a manuscript in Jamia Millia Library of Delhi, an original book of cardiac drugs 'Al-Adwiyh al Qalbi' proves that he made great original contribution in medicine.[৫৫]

ইবন সিনার মতে, মানুষের হার্টের দুর্বলতা ও অস্থিরতার দুটি পৃথক অবস্থা রয়েছে। এ দুটি অবস্থা মানুষের বুকের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। নিরীক্ষণ করলে এ সমস্যাটি দেখা যায়।[৫৬] এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি ঔষধের কাজ ও ব্যবহার পদ্ধতি এবং কতকগুলো ঔষধের নাম আল-কানূন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে মদ, মুক্তা, রেশমের গুটি, কাবুলী আমলকী, লাল কোরাল, কর্পূর, গোলাপ পানি, সুগন্ধি ও সুমিষ্টি

ভেষজ, রুবী ইত্যাদি।[৫৭] এ সমস্ত জিনিস ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করলে হৃদ রোগ বা জীবনী শক্তির কিছুটা উন্নতি হয়। Hakim Abdul latif বলেন, Avicenas researches on Heart drugs are most original and I believe are still capable of revolutionizing our ideas on Heart therapy.[৫৮]

শারীরতত্ত্ব

আরব চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শারীরতত্ত্ব (Anatomy) নিয়ে গ্যালেনের উপর বেশী নির্ভর করেছেন। এ বিষয়ে তারা বেশী অগ্রসর হতে পারেননি। তাদের অগ্রগতির পথে ধর্মীয় অনুশাসন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খলিফা আল-মানসূরের আমলে এ বিষয়ে গবেষণার অগ্রগতি দেখা যায়। চিকিৎসক ইউহান্নাকে সে সময়ের শারীরতত্ত্বের পথ প্রদর্শক বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানী গ্যালেন ও ইউহান্নার তথ্যের আলোকে ইবন সিনা তাঁর কানূন গ্রন্থে শারীরতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও তার শ্রেণী বিষয়ে তিনি বলেন, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি স্বাভাবিক রস থেকে গঠিত। এ রস মৌলিক উপাদান থেকে উৎপন্ন। অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি দু'শ্রেণীর (১) আজায়ে মুফরাদা (Simple organ) বা সরল অঙ্গ, (২) আজায়ে মুরাক্কাবা (Compound organ) বা যৌগিক অঙ্গ।[৫৯]

আজায়ে মুফরাদা হলো যেগুলোর দৃশ্য ও অনুভবযোগ্য অংশ একই নামে অভিহিত এবং সমজাতীয়। যেমন- হাড়, মাংস, স্নায়ু ইত্যাদি। আজায়ে মুফরাদা ৯টি হাড়, তরুনাস্থি, স্নায়ু, কণ্ডরা, সন্ধিবন্ধনী কলা, ধমনী, শিরা, ঝিল্লী এবং মাংস। তিনি এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো যে সব অঙ্গের সব অংশ একই নামে অভিহিত করা যায় না সেগুলো আজায়ে মুরাক্কাবা নামে পরিচিত। যেমন হাত, পা, মুখ ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, হাতের এক অংশের নাম করলেই হাতের সবটা বুঝায় না।[৬০]

মানব ভ্রূণ

মেডিসিনের জনক হিপোক্রেটিস (400 B.C)-এর সময় থেকে মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূণ সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং শতশত বছর ধরে তা চলতে থাকে। অবশেষে ইবন সিনা তাঁর কানূন গ্রন্থে এ বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা দান করেন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রারম্ভে শুক্রাণু (Sperm) ডিম্বাণু (Ovum)-এর মধ্যে প্রবেশ করে নিষেক (Fertilization) ঘটায়। এরপর ভ্রূণ কোষ (Zygote) সৃষ্টি হয়। এটি ভ্রূণ সৃষ্টির প্রথম পর্যায়। এ তত্ত্বটি ইবন সিনা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি কানূন গ্রন্থে শুক্রাণু কে 'আজযায়ে মানবিয়াত' এবং ডিম্বাণুকে 'বাইযায়ে উনসা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৬১] আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ইবন সিনার ভ্রূণ সৃষ্টির তত্ত্বকে সঠিক বলে মূল্যায়ন করেছেন। আল কুর'আন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

'নিশ্চয়ই আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত নুৎফা (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) থেকে।'[৬২]

হাড়জোড়

আরব চিকিৎসকগণ সার্জারীর অন্যান্য শাখার ন্যায় ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেয়ার ব্যাপারে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা তারাই ভাঙ্গা বা স্থানচ্যুত হাড়ের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইবন সিনা বলেন, ভাঙ্গা হাড়ের দু'দিক ঠিকভাবে বসিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হবে। পূর্ণ বিশ্রামের সঙ্গে নরম ও আঠাল জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, যেন দ্রুত কেলাস গড়ে উঠে হাড় জোড়া লেগে যায়। বয়স্কদের হাড়ও এভাবে জোড়া লাগে তবে পূর্বের অবস্থায় থাকে না।[৬৩]

দন্ত চিকিৎসা

ইবন সিনা তাঁর কানূন গ্রন্থে দন্ত বিষয়ে আলোচনা করলেও দাঁতের রোগ সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা করেন নি। দাঁত সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা হলো, প্রত্যেক দাঁতে অন্তত একটা শিকড় থাকে। আর দাঁতের নীচের চোয়ালে দু'টি এবং আক্কেল দাঁতের তিনটি শিকড় রয়েছে। উপরের চোয়ালে বেশী শিকড় রয়েছে যাতে মধ্যাকর্ষণের টানের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে ঝুলে থাকতে পারে। নিচের চোয়ালের জন্য বেশী শিকড়ের দরকার নেই।[৬৪]

ধাত্রীবিদ্যা

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত আরব চিকিৎসাবিদগণই ধাত্রীবিদ্যার পথিকৃত। কেননা তারাই বিভিন্ন গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। ইবন সিনা কানূন গ্রন্থে গর্ভাবস্থা ও ডাইসটোসিয়া (dystocia) সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রসব করানোর কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। প্রসব পদ্ধতিতে যদি সফল হওয়া না যায় তাহলে সাবধানে সাড়াশী (Forceps) ব্যবহার করে সন্তানকে প্রসব করাতে হবে।[৬৫] যদি যন্ত্র দিয়েও প্রসব করানো না যায় তাহলে ভ্রূণের মাথায় ছিদ্র করতে হবে এবং মৃত ভ্রূণ প্রসবের ব্যবস্থা করতে হবে।[৬৬] মৃত ভ্রূণ প্রসবেও তিনি জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ দিয়েছেন।

ক্যাথেটার ব্যবহার

ইবন সিনা মূত্রাশয়ের তীব্র প্রদাহে চামড়া ও রুপার তৈরী নরম নমনীয় ক্যাথেটার ব্যবহারের সুপারিশ করেন। বর্তমানে মূত্রাশয়ের জটিলতায় এ ক্যাথেটারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এম এইচ, হানাফী, এস এম সাদ, এম এল রিফাভিক ও এমএম আল গোরাব বলেন, He was the first to recommend the use of soft Malleable catheters made of leather and silver in acute inflammation of the bladder.[৬৭]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ইবন সিনা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল শাখায় দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি, অগ্রগতি ও পরিপূর্ণতা দানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এজন্যই বলা হয় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস কর্তৃক সৃষ্ট চিকিৎসা বিদ্যাকে গ্যালন পুনরুজ্জীবিত করেন, আল-রাযী একে সুসংবদ্ধ করেন এবং ইবন সিনা একে পরিপূর্ণতা দান করেন। যুগ যুগ ধরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর অবদান স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. বুতরুস আল-বুসতানী, *দা'য়িরাতুল মা'আরিফ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫; শারিল হালু, *মাওসূ'আতু আ'লামিল ফালসাফাহ* (বৈরূত: দারূল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯।

২. এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান* (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ১৯৮১ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪।

৩. George Sarton, *Introduction to the History of Science* (USA: Baltimore, 1927 A.D.), Vol. 1. p. 709.

৪. অধ্যাপক সাইদ নফিসির মতে, তাঁর তৃতীয় পূর্ব পুরুষের সিনা নাম থেকেই তাঁর এ নামের উৎপত্তি। কারো মতে, মারভের নিকট সিনান নামক একটি গ্রামে তাঁর জন্ম। ঐ গ্রামের নাম থেকেই তিনি সিনা নামে পরিচিত। কিন্তু উপরিউক্ত মতের পক্ষে অন্য কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। দ্র. এম আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান* (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ৫ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

[৫]. ইবন সিনার পিতার রাজকীয় পদমর্যাদা কোন পর্যায়ে ছিল তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আল কিফতির মতে, তিনি খারমাইছানের শাসনকর্তা ছিলেন। ইবন খাল্লিকানের মতে, তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার আমিল ছিলেন। ড. এলগুডের মতে, তিনি ছিলেন কর আদায়কারী। ডা. সোহেলের মতে, ইবন সিনার পিতা খারমাইছানের গভর্নর ছিলেন। দ্র. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭।

[৬]. Mohammad Sharif khan and Mohammad Anwar Saleem, *Muslim Philosophy and Philosophers* (Delhi: Ashish Publishing House, 1994 A.D.), p. 69.

[৭]. ইবন সিনা, *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫; *দা'য়িরাতুল মা'আরিফ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

[৮]. James Hastings (Edited), *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (Edin Burgh: 1958 A.D.), Vol. 2. p. 272; মনিরুল ইসলাম, *সেরা বিজ্ঞানীদের জীবন ও আবিষ্কার* (ঢাকা: নুসরাত প্রকাশনী, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৫৬।

[৯]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮।

[১০]. M. Zaki Kirmani, N.K. Singh (Edited) *Encyclopaedia of Islamic Science and Scientists* (New Delhi: Global Vision Publishing House, 2005 A.D.), Vol. 2. p.435.

[১১]. *The New Encyclopaedia Britannica* (USA: 15th edition, 1986 A.D.), Vol.1 p.739; ইবন খাল্লিকান, *ওআফায়াত আল-আইয়ান* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

[১২]. Paul Edwards (editor) *The Encyclopedia of Philosophy* (New York: The Macmillan Company & the free press, 1967 A.D.), Vol. 1.p. 226.

[১৩]. *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 2.p. 272.

[১৪]. *The Encyclopaedia of Islam* (London: Luzac & Co. 1965 A.D.), Vol. 3. p. 94.

[১৫]. Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan & Co Ltd: 1956 A.D.), p. 367; *মাওসূ'আতু আ'লামিল ফালসাফাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯; তাস কুবরা যাদাহ, *মিফতাহুস সা'আদাহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩।

[১৬]. *The New Encyclopaedia Britannica*, Vol. 1. p. 739.

[১৭]. *দা'য়িরাতুল মা'আরিফ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।

[১৮]. *Encyclopaedia of Islamic Science and Scientists*, Vol. 2.p. 435; *Muslim Philosophy and Philosophers*, p. .69-70; মুসা আনসারী, *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪৩৬।

[১৯]. *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 1. p. 226; মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৫০।

[২০]. *ওআফায়াত আল-আইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

[২১]. ইবন কাছীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ ১৯৯৪ খ্রি.), ১২ খণ্ড, পৃ. ৩৯।

[২২]. *ওআফায়াত আল-আইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮; *আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ*, ১২ খণ্ড, পৃ. ৩৯।

[২৩]. নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১২০।

[২৪]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫-২৭৪।

[২৫]. Syed Ashraf Ali, *Men of Letters Men of Science* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2004 A.D.), p. 42.

[২৬]. *মিফতাহুস সা'আদাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩; মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, *যুগ-যুগান্তরের মুসলিম মনীষা* (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২০।

[২৭]. R.M. Savory (Edited), *Introduction to Islamic Civilization* (Cambridge University press, 1977 A.D.). p. 116.

[২৮]. Thomas Arnold & Alfred Guillaume, *The Legacy of Islam* (London: Oxford University press, 1952 A.D.), p. 329.

[২৯]. *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১২৩; আখতার-উজ-জামান, *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আনোয়ারা বুক হাউস, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২২৪-২২৫।

[৩০]. *The New Encyclopaedia Britannica*, Vol. 1. p. 740.

[৩১]. William Osler, *The Evolution of Modern Medicine* (New Haven: 1922 A.D.), p. 98.

[৩২]. Colin A. Ronan, *The Cambridge illustrated History of the worlds Science* (USA: Cambridge University press, 1984 A.D.), p. 236.

[৩৩]. M. Ullmann, *Islamic Survey II, Islamic Medicine* (New york: Edinburgh University press, 1978 A.D.), p. 46; Board of Researchers, *Muslim Contribution to Science and Technology* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2012 A.D.) p. 268.

[৩৪]. মিযাজ (مزاج) শব্দটি একবচন এর বহুবচন امزجة। এর অর্থ মিশ্রণ, মিশ্রিত পদার্থ, সংমিশ্রণ, ইত্যাদি। মিযাজ শব্দটি আরবী, ফার্সী, তুর্কী ভাষায় এখনও স্বাস্থ্য এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীতে একে Temperament এবং আর্য়ুবেদ শাস্ত্রে ধাতু নামে অভিহিত করা হয়। আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানে মিযাজ হলো নানা বিষয়কে জড়িয়ে একটা তাত্ত্বিক ধারণা। এ নিয়ে ভর (Mass) এবং শক্তি (Energy) যেমন- তাপ, শীতলতা, শুষ্কতা ও আদ্রর্তার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা বুঝানো হয়। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১১শ সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯৩০; *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫-১৭৯।

[৩৫]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

[৩৬]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৩৭২; *Introduction to the History of Science*, p. 710.

[৩৭]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১১; আবু কায়সার, *ইবন সিনা* (ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২৪; *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 268.

[৩৮]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ.১০; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১১; *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 268.

[৩৯]. মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৭০।

[৪০]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।

[৪১]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১২।

[৪২]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০; *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 268.

[৪৩]. এম, আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান* (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খ্রি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ২।

[৪৪]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪-১৩।

[৪৫]. *তদেব*, পৃ. ৫।

[৪৬]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ১ম খণ্ড, পৃ.১৮৩-১৮৪; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯; *Muslim Contribution to Science and Technology*, p. 269; M.H Hanafy, SM Saad, M.H Rifavic and M.M Al-Ghorab, *Early Arabian Medicine* (Contribution to Urology) Urology Journal 1976.8 (53), pp. 63-67.

[৪৭]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭১।

[৪৮]. *Men of Letters Men of Science*, p. 45.

[৪৯]. রক্তমোক্ষণ: ইবন সিনার মতে রক্তমোক্ষণ হলো রস বের করে নেওয়া। এতে রক্তবহ শিরায় বিদ্যমান রস থেকে অনুপাত হারে রস বের করে নেওয়া। শরীরে রক্তাধিক্যের কারণে রোগের সম্ভাবনা থাকলে বা রোগ হলে রক্তমোক্ষণ করতে হয়।

শরীর থেকে অতিরিক্ত রস বা অস্বাভাবিক রস বের করে দেয়াই হলো রক্তমোক্ষণ। দ্র. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, তৃতীয় সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।

[৫০]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ২য় খণ্ড, পৃ.১৮৪; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৮০-২৮১।

[৫১]. He introduced new methods of curing eye diseases. Among them probing of the lacrimal fistula and syringing the lacrimal Sac stand out. cf. *Men of Letters men of Science*, p. 45.

[৫২]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

[৫৩]. *তদেব*, পৃ. ৭১।

[৫৪]. *Muslim Centribution to science and technology*, p. 270.

[৫৫]. *Ibid.*

[৫৬]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ১ম সংস্করণ ১৯৮১, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭।

[৫৭]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৭০-৩৭৯; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ.৪১৮; *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৭১।

[৫৮]. *Muslim Contribution to science and technology*, p. 270.

[৫৯]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৯।

[৬০]. *তদেব*।

[৬১]. মুহাম্মদ আবু তালেব, *বিজ্ঞানময় কোরআন* (চট্টগ্রাম: মদিনা একাডেমী, বি.আই. এ কমপ্লেক্স, ৪৩, ষষ্ঠ প্রকাশ ২০০৬ খ্রি.), পৃ.১৩০-১৩১; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২১।

[৬২]. সূরাহ দাহর, ৭৬:২।

[৬৩]. *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৪৪-২৮০; *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

[৬৪]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; *আল-কানূন ফিত তিব্ব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

[৬৫]. Ibn Sina did not dissect human body and described the Galenic anatomy with all its mistakes. Though he was more a physician than sergeon, Yet he used forceps for difficult labour and also performed operations. cf. *Muslim contribution to science and Technology*. p. 268.

[৬৬]. *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

[৬৭]. *Muslim contribution to science and Technology*.p. 269.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

রাসূল (স.)-এর নবুওয়াতপূর্ব জীবনে আদর্শ ও গুণাবলী

ড. মুহা. আ. হামিদ*

Abstract : There was the absence of peace and security in the society in which the great prophet Muhammad (Sm) appeared. Mankind was in the highest crisis of safety. The prophet came in such a terrible time. Before his prophethood an organisation named 'Hilf Al-Fudul' was set up to subdue the oppression of the oppressor. With the help of this humanitarian organisation and by the power of his honest ideals, he stopped all oppression. As a lover of humanity and as a kind and generous man, he protected the rights of man, behaved well with relatives, created earning opportunities for the poor, enterntained guests and helped people in danger. This essay attempts to present the ideals and virtues of the Prophet (Sm) before he attained prophethood.

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করে সম্মানিত করেছেন।[১] মানুষ সৃষ্টির পর তাদেরকে হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।[২] তন্মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স:) ছিলেন সর্বযুগ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল।[৩] কেননা রাসূল (স:) এর আদর্শ ছিলো সার্বজনীন ও চিরন্তন। যে সমাজ ও যুগে রাসূল (স:) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ও পাপাচারে কলুষিত।[৪] তিনি অসভ্য, বর্বর ও আত্মকলহে লিপ্ত জাতিকে সভ্য ও শান্তি প্রিয় জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তিনি তাঁর বৈচিত্রময় নবুওয়াতপূর্ব জীবনের বহু ঘটনা, শিক্ষা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও আদর্শ দিয়ে সমস্যার সমাধান করেন। আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَامُ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"[৫] ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত ও রাসূল (স.) এর উত্তম আদর্শ দ্বারা বাস্তবায়িত।
মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.) সম্পর্কে ঘোষণা করেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> "নিশ্চয় তোমাদের সকলের জন্য রাসূলুল্লাহ (স:) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যারা আল্লাহ ও পরকালীন জীবনে বিশ্বাসী এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করে থাকে।"[৬]

রাসূল (স:)-এর নবুওয়াতপূর্ব জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমে তার আদর্শ ও গুণাবলীর বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর শৈশব জীবনে ফিজার যুদ্ধে[৭] মানবাধিকার লংঘন ও অহেতুক রক্তপাত তাঁকে নিতান্তই ব্যথিত করেছিলো। এ যুদ্ধে শিশু নারী সহ বহু মানুষ হতাহত হয় এবং বহু সম্পদ ধ্বংস হয়। ভবিষ্যতে আরববাসী যেন আর এমন অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত না হয় সে জন্য বিশিষ্ট গোত্রপতিদের নিয়ে আল্লাহর নামে চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ফিজার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় মহানবীর (স:) চাচা যুবায়র বিন 'আব্দুল মুত্তালিবের উদ্যোগে আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের গৃহে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহানবীও (স:) এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনার পর হিলফুল ফুযূল[৮] নামে একটি সেবা সংঘ গঠিত হয়। মহানবী (স:) ও এ সংঘের অন্যান্য সদস্যগণ যে সমস্ত কাজ করার জন্য শপথ ও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার মূল প্রতিপাদ্য হলো:

১. আমরা দেশের অশান্তি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

---

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. বিদেশী লোকদের ধন, প্রাণ ও মান সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

৩. দরিদ্র, দুর্বল ও সহায়হীন লোকদের সাহায্য করবো।

৪. অত্যাচারীর অত্যাচার বন্ধ করতে এবং দুর্বল দেশবাসীকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।[৯]

রাসূল (স:)-এর সক্রিয় সহযোগিতায় এ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী "হিলফুল ফুযূলের" সদস্যগণ বহুদিন যাবৎ কাজ করতে থাকেন। তাদের প্রচেষ্টায় দেশের অত্যাচার-অবিচার বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং রাস্তাঘাটে চলাচল নিরাপদ হয়ে মানুষের সত্যিকার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (স:) এ প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব নবুওয়াত পরবর্তী জীবনেও বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন– 'আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের গৃহে শপথ করে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তার বিনিময়ে আমাকে রক্তবর্ণ উট দান করলেও আমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে সম্মত নই। আজও যদি কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তি 'হে ফুযূল প্রতিজ্ঞার সদস্যগণ বলে ডাক দেন তবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কারণ ইসলাম ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং মজলুমের সাহায্যের জন্যই এসেছে।[১০]

ইংল্যাণ্ডে 'অর্ডার অব নাইটহুড' নামক যে সমিতি গঠিত হয়েছিলো তার সদস্যগণ প্রায় এ ধরনের প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সমিতিটি 'হিলফুল ফুযূল' সমিতির কয়েক শতাব্দী পরে গঠিত হয়েছিলো।[১১]

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় বলা যেতে পারে যে, দেশে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করা, গরীব দুঃখীকে সাহায্য করা, সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিয়ে আপন-পর, দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সমভাবে সকলের সেবা করা, অত্যাচারীকে বাধা দেয়া, উৎপীড়িতদের সহায়তা করাই ছিলো মহানবী (স:) প্রতিষ্ঠিত উক্ত সেবা সংঘের সদস্যদের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জীবনের শুরু থেকে রাসূল (স.) এর মধ্যে সুন্দর আদর্শ ও সদগুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল। যা জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে বুঝা যায়।

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ.

হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, যখন কাবাঘরের নির্মাণ কাজ চলছিলো তখন রাসুলুল্লাহ (স.) আব্বাস (রা.) এর সঙ্গে পাথর বহন করে আনছিলেন। আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে বললেন পরণের কাপড় খুলে কাঁধে দিয়ে এর ওপর পাথর রেখে বহন করে নিয়ে যাও। তাহলে পাথরের ভারে কাঁধে ব্যাথা কম হবে। কিন্তু রাসূল (স.) তাতে রাজি না হওয়ায় জোর করে তার পরণের কাপড় খুলে নেয়া হলো। তৎক্ষনাৎ তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে গেল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তিনি সাথে সাথে চিৎকার করতে লাগলেন আমার কাপড়, আমর কাপড়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাপড় পরিয়ে দেয়া হলো।[১২]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় এ ঘটনার পর আর কখনো রাসূল (স.) এর লজ্জাস্থান কোনদিন দেখা যায় নি।[১৩] আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে নবওয়াতপূর্ব জীবনেও অনুপম মহান আদর্শের ধারক ও বাহক হিসাবে নির্চাচিত করেছিলেন।

খাদিজা (রা.) যখন মুহাম্মাদ (স.) এর সততা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্রের কথা অবগত হলেন, তখন তিনি তাঁকে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক কাফেলার দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান করেন।[১৪] অতঃপর মহানবী (স.) বিবি

খাদিজার (রা.) বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে খাদিজার (রা.) অপর ক্রীতদাস মাইসারাকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া যান। এ সফরে তিনি তার সততা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার দ্বারা ব্যবসায় পরিচালনার কারণে বিবি খাদিজার (রা.) পূর্ববর্তী এবং তার সঙ্গী যে কোন বাণিজ্য প্রতিনিধির তুলনায় অনেক বেশী লাভ করেন। সফরকালীন সময়ে মহানবীর সুন্দর চরিত্র, আদর্শ ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কথা সফর সঙ্গী মাইসারা বর্ণনা করেন।[১৫] মাইসারার নিকট থেকে মহানবীর (স:) সুন্দর চরিত্র ও দক্ষতার কথা শুনে তিনি তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে বান্ধবী নাফিসার মাধ্যমে রাসূল (স:) এর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। এ সময় উভয় পক্ষের অভিভাবকদের নিয়ে সকলের উপস্থিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১৬]

মহানবী (স:) নবুওয়াত প্রাপ্তির অনেক পূর্ব থেকেই তাঁর উত্তম চরিত্র, আদর্শ ও মানবিক গুণাবলীর জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা যে সময়কে 'জাহেলিয়াতের যুগ বা অন্ধকার যুগ' বলেছেন সে সময়ে জন্মলাভ করেও ঝগড়া-বিবাদ, নরহত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন, ব্যভিচার ইত্যাদি অকল্যাণকর, মানবতার জন্যে চরম অবমাননাকর কর্মকাণ্ডে তিনি কখনো জড়িত হননি অথচ তখনকার সমাজে যে কোন যুবকের জন্যে তা ছিলো স্বাভাবিক, বরং তিনি ছিলেন এতিম, অসহায়, নির্যাতিতদের একমাত্র সহায়, সান্ত্বনাদানকারী, ধন-সম্পদের আমানতরক্ষাকারী এবং অনেকক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভীত, আতঙ্কিত মানুষ তাঁর কাছে হাজির হয়ে তাদের মূল্যবান সম্পদ আমানত রেখে যেত, আর তিনি সে আমানতের যথাযথ হেফাযত করতেন এবং যথারীতি তা ফেরত দিতেন। রাসূল (স:) এর নবুওয়াত পরবর্তী ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মক্কার কাফিররা রাসূল (স:) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করেন। যখন রাসূল (স.) হিযরতের জন্য প্রস্তুত তখন মক্কার জনসাধারণের বহুমূল্যবান মাল তাঁর নিকট গচ্ছিত ছিল। এসকল মালগুলোকে মালিকদের ফেরৎ দেয়ার জন্য হযরত আলী (র:) কে রেখে যান এবং নির্দেশ দেন গচ্ছিত মাল ফেরত দিয়ে যেন মদিনায় হিযরত করেন।[১৭] এভাবে নবুওয়াত লাভের বহু পূর্বেই আরববাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বা 'পরম বিশ্বস্ত' খেতাবে ভূষিত করেছিলো।[১৮] নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে মহানবী (স:) ৩৫ বছর বয়সে পবিত্র ক্বাবা শরীফ মেরামতকালে সেখানকার কালো পাথর 'হাজরে আসওয়াদ' স্বস্থানে প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে যখন কলহ-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় এবং প্রত্যেক গোত্রই এ কাজ করে মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতায় যুদ্ধোন্মুখ হয়ে পড়ে তখন সে গুরুতর সমস্যায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি এমন একটি সমাধান দেন যাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছিলো।[১৯] সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে সে ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলো আর তা ছিলো একটি চাদরের মাঝখানে পাথরটি রেখে চারদিকে গোত্রপতিদের দিয়ে চাদরটি ধরে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া ও সবশেষে মহানবী (স:) নিজ হাতে সেটিকে প্রতিস্থাপন করা। সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার এ উদাহরণ তাঁর জীবনের শুরু থেকেই আজীবন নানাভাবে দেখা গিয়েছিলো।

নবুওয়াতপূর্ব মহানবীর (স:) জীবনে অনেক মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিলো, যার প্রমাণ পাওয়া যায় মহানবীর (স:) স্ত্রী হযরত খাদিজার (রা.) বক্তব্য থেকে। মহানবী (স:) নবুওয়াত লাভের পূর্বে হিরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একদিন মহানবীকে (স:) নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। জিব্রাঈল (আ.) মহানবীর (স:) আল্লাহর নামে পাঠ করতে বললেন কিন্তু মহানবী (স:) বললেন আমি পড়তে পারি না। তখন জিব্রাঈল (আ.) মহানবীকে (স:) তিনবার দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে ছেড়ে দেন এবং বলেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

"আপনার রব এর নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার রব সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।"[২০]

মহানবী (স:) এ আয়াতগুলো আয়ত্ব করে কম্পনরত অবস্থায় বাড়ি ফিরে হযরত খাদিজাকে (রা.) সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, زمّلونى زمّلونى "শিগ্গীর আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দাও"। আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত খাদিজা (রা.) অভয় দিয়ে বলেন–

فقالت خديجة كلا و الله ما يخزيك الله ابدًا إنك لتصل الرحم و تحمل الكل
و تكسب المعدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق

> "খাজিদা (রা.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, না, ভয় নেই, আল্লাহর কসম! তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুস্থ ও দুঃখীদের খেদমত করেন, বঞ্চিত অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদের অপ্যায়ন করেন এবং সত্য পথে বিপদগ্রস্থদের সাহায্য করেন।"[২১]

হযরত খাদিজার (রা.) বক্তব্য থেকে যে কয়েকটি বিষয় সহজেই অবহিত হওয়া যায় তাহলো, রাসূল (স:) আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। তাই তিনি মহানবীর (স:) উত্তম গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে لتصل الرحم কথাটি উল্লেখ করেন। যার অর্থ আপনি অবশ্যই আপনার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদাচরণ করেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদাচরণ উভয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়। কখনো সম্পদের মাধ্যমে হয়, কখনো খিদমতের মাধ্যমে হয়। আবার কখনো যিয়ারত এবং সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে।[২২] এ গুণটি মহানবীর (স:) চরিত্রের মধ্যে বর্তমান থাকায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বলে হযরত খাদিজা (রা.) উল্লেখ করেছেন। আর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদাচরণ করা অন্যতম মহৎ কাজ, যা মহানবী (স:) সর্বপ্রথম বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

রাসূল (স:) সর্বদা অভাব গ্রস্থদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। মহানবীর (স:) চরিত্রের আর একটি গুণ হলো تحمل الكل যার অর্থ, দুস্থদের বোঝা বহন করা। আপনি সম্পদহীন ও দুর্বলকে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। তথা মহানবী (স:) দূর্বল, ইয়াতিম, সর্বশান্ত ব্যক্তিদের সর্বদা সহায়তা করেছেন।[২৩] মহানবী (স:) এ সব ব্যক্তিদের পাশে থেকে সর্বদা সহায়তা করেছেন। কাজেই এসব আদর্শ ও গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান তিনি কখনো বিচলিত হতে পারেন না।

মহানবীর (স:) অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো تكسب المعدوم অর্থাৎ নিঃস্বদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন তথা আপনি অপরকে উপার্জক হিসেবে গড়ে তোলেন। এর দ্বিতীয় অর্থ হলো আপনি এমন উত্তম চরিত্র ও উন্নত গুণ বৈশিষ্ট্য দান করেন যা তারা আপনি ছাড়া অপর কারো নিকট থেকে প্রাপ্ত হয় না।[২৪] আবার কারো কারো মতে এর অর্থ আপনি সম্পদ উপার্জন করে এমন ব্যক্তিদের দান করেন যারা তা উপার্জনে অক্ষম। কাজেই মহানবী (স:) সম্পদ উপার্জন করে তা দান করে দিতেন এবং পূণ্য ও সৎ কার্যাবলীতে তা ব্যয় করতেন।

মেহমানদের সেবা ও আপ্যায়নের সুব্যবস্থা করা মহানবীর (স:) আর একটি চারিত্রিক গুণ তা হলো تقرى الضيف যার অর্থ আপনি অতিথিকে খাদ্য দিয়ে আতিথেয়তা বা মেহমানদারী করেন।[২৫] কাজেই অতিথিকে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা মহানবীর (স:) জীবনের একটি অন্যতম গুণাবলী যা নবুওয়াত পরবর্তী জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

রাসূল (স:) ঋণগ্রস্থদের ঋনের দায় মোচন করে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন। হযরত খাদিজা (রা.) মহানবীকে (স:) تعين على نوائب الحق বলে উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ, আপনি সত্যই, বিপদাপদে সাহায্য করেন।[২৬] কাজেই বিপদগ্রস্ত লোকদের সর্বদা সাহায্য ও সহযোগিতা করা মহানবীর (স:) চারিত্রিক

গুণাবলীর অন্যতম একটি গুণ। এ সকল আদর্শ ও গুণাবলী মানবজাতির জন্য পথের দিশারী, যা সকলের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থাকে সুন্দর করতে সক্ষম।

উপসংহার

রাসূল (স:)-এর নবুওয়াতপূর্ব জীবনে তাঁর উত্তম চরিত্রে সুন্দর আদর্শ ও গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিলো, যার মাধ্যমে তিনি আমানত রক্ষা, সমাজ থেকে কলহ-বিবাদ নির্মূল, আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, দূর্বলকে সহায়তা প্রদান, আতিথেয়তা, বিপদে-আপদে সর্বদা সাহায্যের হাত প্রসারিত করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রাসূল (স.) এর কর্ম, চরিত্র, আর্দশ, গুণাবলীর দ্বারা তিনি যে, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন তা অদ্যাবধি ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বর্তমান সংঘাতময় বিশ্বে মুসলমান ও বিশ্বের সকল জাতির শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً দ্র: আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০। "আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি"।

২. هُوَ الَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ দ্র: আল-কুরআন, সূরা আত-তওবা, আয়াত: ৩৩। "তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে"।

৩. مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً দ্র: আল-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০। "মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ"।

৪. আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.), *আর-রাহীকুল মাখতূম*, ১৩ তম সংস্করণ (কায়রো: দারু ইব্‌ন জাওযী, ১৪২৮ হি.) পৃ: ৫০।

৫. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৯।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১।

৭. হারবুল ফিজার অর্থ অন্যায় যুদ্ধ। রাসূল (স:) এর বয়স যখন পণের কিংবা বিশ বছর তখন ফিজার যুদ্ধ শুরু হয়। নিষিদ্ধ মাসে এ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিলো অথবা এ যুদ্ধের ফলে কাবার পবিত্রতা বিনিষ্ট হয় বলে একে হারবুল ফিজার বলা হয়। দ্র: আল্লামা খাদারীবিক, *নূরুল য়্যাকীন* (মিসর: মাতবা'আ মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১২। ফিজার যুদ্ধ চারবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ফিজার যুদ্ধ কিনানা ও হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যে, দ্বিতীয় ফিজার যুদ্ধ কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যে, তৃতীয় ফিজার যুদ্ধ কিনানা ও হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং চতুর্থ ফিজার যুদ্ধ কুরাইশ ও কায়েস আয়লানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ ফিজারেই মহানবী (স:) আপন চাচাদের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত হন। দ্র: শায়খ আলী ইবন বুরহানুদ্দীন আল-হালবী, *আসসীরাতুল হালাবিয়্যা*, ১ম খণ্ড (মিসর: মাতবা'আ মুস্তাফা বাবিল হলবী, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ১৪১।

৮. আরবী ভাষায় প্রতিজ্ঞাকে হিলফ এবং অত্যাচারীর নিকট অত্যাচারিতের প্রাপ্য অধিকারকে ফুযূল বলা হয়। এজন্যই এ সেবাসংঘ হিলফুল ফুযূল নামে বিখ্যাত। দ্র: *আসসীরাতুল হলবিয়্যা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

৯. কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী, *রহমাতুল্লিল 'আলামীন*, ১ম খণ্ড (লাহোর: শায়খ গোলাম 'আলী এণ্ড সন্স, তা.বি), পৃ. ৪৭; আ.খ.মু. ইয়াকুব আলী, *মহানবী ও ইসলাম* (রাজশাহী: ইউনিক প্রেস, ১৯৭৪ খ্রি:), পৃ. ৫।

[১০]. মুহাম্মদ ইব্ন সা'আদ, *আততাবাকাতুল কুবরা*, ১ম খণ্ড (লিডেনঃ মাতবা'আ ব্রিল, ১৩২২ হিজরী), পৃ.৮২; 'আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আল-হাকিম নিশাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক*, ২য় খণ্ড (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৪৫ হিজরী), পৃ. ২২০।

[১১]. *রহমাতুল্লিল 'আলামীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।

[১২]. আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদিযবাহ আল-জু'ফী আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (দেওবন্দঃ মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫ খ্রিঃ), পৃ. ৫৪০।

[১৩]. *আর-রাহীকুল মাখতূম*, ১৩ তম সংস্করণ, পৃঃ ১২৩।

[১৪]. W. Montogomery watt, *Muhammad at Mecca*, (Karachi: Oxford University Press, 1993), p-38.

[১৫]. ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, *মহানবীর (সা.) জীবন চরিত*, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রিঃ), পৃ. ১৫২-১৫৩।

[১৬]. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল- গালিব, *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)*, (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ), পৃ. ৭৭।

[১৭]. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, সম্পাদনাঃ ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, (ঢাকাঃ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ। ১৯৯৮ খ্রিঃ), পৃ. ৪০১।

[১৮]. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী* (সঃ) (ঢাকাঃ *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রিঃ), পৃ. ৭। Sayyed Amir ALi, *A short History of Saraccens* (Delhi: Kutub Khana Ishayat-ul-Islam, 1979), P-8.

[১৯]. ড. মোস্তফা হাসান, মানবাধিকার ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ): একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা*, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন, ২০০৮), পৃ. ৪৭।

[২০]. আল-কুরআন, সূরা আল-আলাক, আয়াতঃ ১-৩।

[২১]. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড (দেওবন্দঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১৪০৫ হিজরী), পৃ. ৩।

[২২]. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *সহীহুল বুখারী ব্যাখ্যা 'আওনুল-বারী*, ১ম খণ্ড (রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২০০৪ খ্রিঃ), পৃ. ১৭৪।

[২৩]. *তদেব*।

[২৪]. বদরুদ্দীন 'আয়নী, '*উমদাতুল-কারী*, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৫১।

[২৫]. *সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা 'আওনুল-বারী*, ১ম খণ্ড পৃ. ১৭৬।

[২৬]. *তদেব*।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

ইসলামী শরীআহর আলোকে বীমা

মোঃ হাফিজুর রহমান*

Abstract : Insurance is a very important organization in the modern economic system. It is a system based on mutual co operation, responsibility and welfare. According to the principles of Islam, the basic target of insurance is to ensure equality among different groups. Its basic aim is not to gain profit only but to help clients in their times of need and to share the destroyes of the poor. Insurance has been created to help people in times of damages to overcome the difficulties. It helps to create a better future for clients children. Insurance can help who suffer loss in business but the banks can not help people in the same way. Insurance at present seems to be an independent organization of saving money or property. But the current insurance is not properly based on Islamic Shariah. It contains interest for which money Muslims can not take part in it. That is why the Islamic thinkers say that the present general insurance policy is not acceptable to the Muslim. The general insurance based is based on selling and buying, where as the Islamic insurance is based on Muduraba and is known as Takaful. The main purpose of Islamic insurance is to help people to the part in Takaful avoiding interest and these create equal oppportunites for all. This Takaful has been the result of the Islamic thinkers' study and thinking about the Muslims' need for insurance within the view of Islamic Shariah.

ভূমিকা

ইসলাম মানবতার জন্য এক পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবন দর্শন। মানুষের জীবনাচার আয়-ব্যয়, কল্যাণ-অকল্যাণ, জাগতিক এবং পরলৌকিক প্রভৃতি ক্ষেত্রেই ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। মানুষের নৈতিক অবক্ষয়, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ- সব মিলিয়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান এখন সরকার ও রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু জীবনই নয়, মানুষের তৈরি সম্পদ, মিল, ফ্যাক্টরি, ইন্ডাষ্ট্রি সবকিছুই নানা কারণে হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে যে কোনো রকম দুর্ঘটনা। সেই দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের প্রচেষ্টায় বীমার উৎপত্তি ঘটে। মানুষের জীবন ও জীবিকা এবং সম্পদাদিঢ় বিভিন্ন রকম ঝুঁকির হাত হতে আর্থিকভাবে রক্ষার ব্যবস্থাই হল বীমা। ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শরীয়তের অর্থনৈতিক নীতিমালার উপর ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠিত এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তার যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত। মূলত ইসলামী বীমা কেবল আমানতকারীর আর্থিক লেনদেন নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ইসলামে অনুমোদিত মুনাফা লাভক্ষতির অংশীদারীত্বের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। আর অংশীদারীত্বের নীতিই হচ্ছে ইসলামী বীমা ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদ। এছাড়া তাকাফুলের মৌলিক ধারণা হলো 'তাবারাত' (দান) ও মুদারাবা (লাভ লোকসান ভাগাভাগি) চুক্তির সম্মিলন। প্রাথমিকভাবে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের একত্রিত করে তাবারাতের চুক্তি সম্পন্ন হয়, যার ফলশ্রুতিতে কোনো নির্দিষ্ট ঝুঁকিতে গ্রুপের যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যরা তাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে সম্মত হয়ে থাকে। আর তাকাফুল পদ্ধতির স্বাতন্ত্রমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চুক্তিটি হবে সহযোগিতা, পারস্পরিক সহায়তা, অংশীদারিত্বপূর্ণ দায়দায়িত্ব ও কল্যাণের ভিত্তিতে এবং চুক্তির বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে স্বচ্ছ থাকতে হবে। অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী তাকাফুলের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে 'সাম্য' প্রতিষ্ঠা করা। লাভ করা প্রধান উদ্দেশ্য হবে না, বরং দুঃসময়ে

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পলিসিহোল্ডারকে সহায়তা করা, দূর্ভাগ্যে পতিতদের কষ্ট ভাগাভাগি করে নেয়া। আর এভাবেই ইসলামের সামাজিক সুবিচার, সুষম অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিপদগ্রস্ত অবস্থায় পূর্ণ নিরাপত্তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বীমা পরিচিতি

বীমা শব্দটি উর্দূ থেকে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো insurance. যা insure শব্দটি থেকে এসেছে। এর অর্থ make sure or secure 'নিশ্চিত বা নিরাপদ করা'। To guarantee 'আবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করে বলা।[১] এক ধরনের ক্ষতিপূরণ চুক্তি ভবিষ্যৎ টাকা প্রাপ্তির আশায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টভাবে টাকা জমা রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা, পারস্পরিক দায়িত্ব, সমবায় সংহতি বা ঐক্য।[২]

পরিভাষায় বীমা হলো, দু'পক্ষের মধ্যে এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে এক পক্ষ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন ক্ষতিকর ঘটনায় অন্য পক্ষকে একটা অঙ্গীকার প্রদান করে।[৩]

M. N. Mishra বলেন, Insurance is co-operation deveice to spread loss caused by a particular risk over a number of persons who are exposed to it and agree to ensure themselves against that risk. 'নির্দিষ্ট কোন ঝুঁকিজনিত ক্ষয়ক্ষতিকে, উক্ত ঝুঁকির আওতায় যে সব ব্যক্তি থাকেন এবং যারা উক্ত ঝুঁকির বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা বা নিস্কৃত করতে চান, তাদের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টনের একটি সমবায় পন্থাকেই বীমা বলা হয়'।[৪]

ড. সোলায়মান ইবন ইবরাহীম বলেন, 'বীমা এমন একটি শিল্পকর্ম, যা কতিপয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত যাদের মৌলিক বিষয় হল পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ঝুঁকির চেয়ে বিরাট অংকের অর্থ সঞ্চয় করা। পরিসংখ্যান নীতি অনুযায়ী পরস্পর বিনিময় পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। এর ফলে বীমা গ্রহীতা কতিপয় আর্থিক বিনিময় অর্জন করে, যা বীমাকারী প্রতিষ্ঠান বীমা চুক্তি অনুযায়ী কিস্তি আকারে জমাকৃত অর্থের বিনিময়ে দিয়ে থাকেন'।[৫]

অথএব মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ও সম্ভাব্য বিপদ মোকাবেলা করার হাতিয়ার হিসেবে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম প্রদানের বিনিময়ে অপরপক্ষ কর্তৃক উক্ত নিশ্চয়তা ও ঝুঁকি গ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকারকেই বীমা বলে।[৬]

ইসলামী বীমা পরিচিতি

ইসলামী বীমার আরবী প্রতিশব্দ ألتامين। শব্দটি امن মূল ধাতু থেকে উৎপত্তি। 'লিসানুল আরব' প্রণেতা বলেন, الأمن ضد الخوف والأمانة ضد الخيانة والإيمان ضد الكفر والإيمان بمعني التصديق ضده التكذيب 'আমান শব্দটি খাওফ (ভীতি)-এর বিপরীতার্থক। তেমনিভাবে 'আমানত' খিয়ানত-এর বিপরীত, ঈমান শব্দটি কুফরের বিপরীত শব্দ। আল-ঈমান শব্দের অর্থ সত্যায়ন করা।[৭]

الأمانة অর্থ পূর্ণ করা, যা খেয়ানতের বিপরীত। এটি الوديعة অর্থাৎ গচ্ছিত সম্পদ বা যিম্মার অর্থেও ব্যবহার হয়। الإيمان এর অর্থ হল, সত্যায়ণ করা বা বিশ্বাস। المؤمن হল আল্লাহর একটি সিফাতী নাম। কেননা তিনি তার বান্দাদের যুলুম করা থেকে নিরাপদ। التامين এর অর্থ أمين বলা অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন।[৮]

পরিভাষায় তা'মীন বা বীমা ব্যবস্থা বলতে বুঝায় এমন একটি চুক্তি, যা مُؤمِنٌ তথা (যা বীমা কোম্পানীর কাছে আমানত রাখা হয়) এর কাছে চুক্তির চাহিদানুসারে সুস্পষ্ট কোন সমস্যার কবলে পড়লে অথবা নিরাপত্তাকালে চুক্তিকৃত মূল সম্পদকে অর্জিত লভ্যাংশ সহ مُؤمِنٌ لَهٌ (বীমাকারী)-এর কাছ থেকে যুক্তিসঙ্গত উপকৃত হওয়ার

যোগ্য এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়াকে অত্যাবশ্যক করে তোলে। নির্ধারিত প্রস্তাবকৃত সম্পদ সংক্রান্ত চাহিদার অন্তর্ভুক্তির পারস্পরিক বিনিময়, যা অনুরূপ অর্থব্যবস্থার পরিমাণকে হুমকি দেয়।[৯]

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন, ইসলামী বীমা তাকাফুল নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আরবী 'কাফালা' শব্দ থেকে এটি উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ যৌথ জামিন নামা বা সমধিক নিশ্চয়তা, অর্থাৎ পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ। 'তাকাফুল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সদস্য গ্রুপের যৌথ নিশ্চয়তার অঙ্গীকার, যা দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য বা সদস্যদের ক্ষতিপূরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। গ্রুপের সদস্যগণ এমন একটি যৌথ নিশ্চয়তার চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যাতে কোন সদস্য দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের শিকার হলে তার ক্ষতিপূরণের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ করতে পারেন। বস্তুত এটি হচ্ছে গ্রুপের সদস্যগণ তাদেরই একজনের বিপদে সাহায্য করার জন্যে সকলেই একযোগে সুনির্দিস্ট পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে আসেন। তাকাফুল ব্যবস্থার ভিত্তি হলো ভ্রাতৃত্ব (Brotherhood), সংহতি (Solidarity) ও পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual Assistance)। ইসলামী তাকাফুল তাই একই সঙ্গে একটি সহায়তামূলক ও কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং এক মুমিন ভাইয়ের আপদকাল তার সাহায্যে এগিয়ে আসার গোষ্ঠীবদ্ধ উপায়ই বটে'।[১০]

ইসলামী বীমা তাতক্ষণিক ধারণা গ্যারান্টি, জামিন, ওয়ারেন্ট বা তার প্রয়োজন সুরক্ষার একটি আইন। তাতক্ষণিক পদ্ধতি মূলত পারস্পরিক সুরক্ষার একটি সিস্টেম এবং শেয়ার্ড দায়িত্ব, যা একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেখানে একটি গ্রুপ পারস্পরিক ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ তহবিল প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করার জন্য সম্মত হন। উভয়ের মধ্যে একটি আর্থিক চুক্তি হয়, যে চুক্তির নামই বীমা।[১১]

ইসলামী বীমা বৈধতার শরঈ ভিত্তি

ইসলামী বীমার ধর্মীয় ভিত্তি সুস্পষ্ট। কেননা এখানে বৈধ পন্থায় বীমা ব্যবস্থার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রচলিত সূদভিত্তিক বীমা ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী শরী'আতে বৈধ উপায়ে বীমা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন :

কুরআন থেকে প্রমাণ

যে কোন বীমার মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক সহযোগিতা। আর ইসলামী বীমা ব্যবস্থা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

অর্থাৎ : 'তোমরা পরস্পরে তাকওয়া ও ন্যায়সঙ্গত কাজে সাহায্য করো, কিন্তু পাপ এবং সীমালংঘন কাজে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করো না'। এ আয়াতে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে, যা ইসলামী বীমার বৈধতা প্রমাণ করে।[১২]

হাদীস থেকে প্রমাণ

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

অর্থাৎ : 'দয়াশীল মানুষদের উপর দয়াময় আল্লাহ রহম করেন। সুতরাং তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া কর, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন'।[১৩]

নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

অর্থাৎ : 'পারস্পরিক ভালবাসা, দয়ার্দ্র এবং সহানুভূতিশীলতার ক্ষেত্রে গোটা মুমিন সম্প্রদায় একটি দেহের মত। দেহের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে তার জন্য পুরো দেহ অনিদ্র, জ্বর ও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে'।[১৪] বর্ণিত হাদীসদ্বয় দ্বারাও বীমা ব্যবস্থার ধারণা প্রমাণিত হয়।

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক ভিত্তি সমবায় ও পারস্পরিক নীতির সমতুল্য। আর সেই সমতুল্য সমবায় ও পারস্পরিক মডেলটিই একমাত্র ইসলামী আইন অনুযায়ী গৃহীত হয়।

প্রচলিত বীমা সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত: ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার ফিকহ একাডেমি (এছাড়াও এটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ একাডেমী নামেও পরিচিত) প্রচলিত বাণিজ্যিক (কিন্তু সামাজিক বীমা নয়) বীমা হারাম ঘোষণা করেছে। এর নবম রেজুলিউশনে উল্লেখিত হয়েছে যে, বাণিজ্যিক বীমা কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত একটি নির্দিষ্ট বীমা প্রিমিয়ামের সাথে বাণিজ্যিক বীমা চুক্তিটি রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধারার, যা চুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। ফলস্বরূপ, এটি আইনত নিষিদ্ধ।[১৫]

প্রচলিত বীমা সম্পর্কে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রচলিত বীমার বৈধতা নিয়ে আলিমগণের মধ্যে নানাবিধ মতামত পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য নিম্নোক্ত তিনটি মতামত উপস্থাপন করা যায়।

প্রথম মতামত

বীমা অবৈধ। এ মতের প্রবক্তা হলেন মিসরের সাবেক মুফতী মুহাম্মদ বাখইয়াত আল-মুতী'ঈ, মিসরের মুফতী আব্দুর রহমান কুরা'আ, আল-জাম'আতুল মিসরিয়ার আশ-শারী'আতুল ইসলামিয়্যাহ বিভাগের অধ্যাপক আহমাদ ইবরাহীম, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শায়খ আব্দুর রহমান তাজ প্রমুখ উল্লেখ যোগ্য।[১৬]

দ্বিতীয় মতামত

সকল প্রকার বীমাই শরী'আতে বৈধ। এ মতের প্রবক্তাগণ হলেন ইবন আবেদীন, মুহাম্মদ আব্দুহু, আলী আল-খাফীফ, ড. মুহাম্মাদ সালাম মাদকুর, ড. মুহাম্মদ আল-বাহী, ড. ইবরাহীম আত-তাহাবী, মুহাম্মদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকি এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনি প্রমুখ।[১৭]

তৃতীয় মতামত

প্রচলিত বীমা ও ইসলামী বীমার মধ্যে কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। তাই প্রচলিত বীমা শারঈ দৃষ্টিকোণে অবৈধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ইসলামী বীমা বৈধ। এ মতামতের প্রবক্তাগণ হলেন, ড. হুসায়ন হামিদ হাসসান, মুহাম্মাদ আবু যোহরা, আব্বাস হুসনী ও ড. মুহাম্মাদ আদ-দাসুকী প্রমুখ।[১৮]

উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালে ২১-২২ ফেব্রুয়ারী মাসে সঊদী আরবের মক্কাতে ইসলামী অর্থনীতিক আন্তর্জাতিক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনের কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, বর্তমানে প্রচলিত বাণিজ্যিক বীমায় শরী'আতের নীতিমালা অনুপস্থিত থাকায় তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। উক্ত সম্মেলনে এ মর্মে প্রস্তাব করা হয় যে, শরী'আহ বিশেষজ্ঞ আলিম ও বিশ্বের মুসলিম অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করতে হবে। যে বোর্ড প্রচলিত বীমার বিকল্প এমন একটি বীমা ব্যবস্থার

নীতিমালা প্রণয়ন করবে, যা সম্পূর্ণরূপে সূদ, প্রতারণা, ধোকাবাজি, জুয়া ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী উপাদান থেকে মুক্ত থাকবে।[১৯]

ইসলামী বীমার উৎপত্তি বিকাশ

ইসলামী বীমা ব্যবস্থা কখন কোথায় সহযোগিতামূলকভাবে শুরু হয়েছিল তা স্পষ্ট করে জানা যায় না। তবে ইসলামী বীমার ইতিহাস যতদূর জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেও এক প্রকার সহযোগিতামূলক বীমা ব্যবস্থা সমাজে চালু ছিল। যা বর্তমানে বীমা ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে মুসলিম ও অমুসলিম দেশে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সাফল্যের সাথে কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।[২০] ইসলামী বীমার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

১. আল-আকীলা পদ্ধতি : আধুনিক বীমা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছে প্রাচীন আরবের আল-আকীলা পদ্ধতি থেকে।[২১] আদীযুগে মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। গ্রোত্রের সকল প্রয়োজন বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাধান করত। তাদের গোত্রীয় সম্প্রীতি ও গোত্রপতির প্রতি আনুগত্য ইতিহাসে বিরল।[২২] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেও এ পদ্ধতির নজির পাওয়া যায়।[২৩]

২. বীমা সংক্রান্ত বিষয় মদীনা সনদে অন্তর্ভুক্তি : রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরতের পরপরই ৬২২ খ্রি. মুসলিম বিশ্বের সর্বপ্রথম যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, ইসলামের ইতিহাসে তা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। এটা মদীনাবাসী, মুহাজির, আনসার ও ইয়াহুদী সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। এ সনদে তিনটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা এক ধরনের সামাজিক বীমা হিসাবে অনুমেয় হয়।[২৪] তা হলো, (ক) আকীলার মাধ্যমে দিয়াত প্রদান।[২৫] (খ) যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ প্রসঙ্গ।[২৬] (গ) বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা প্রসঙ্গ।[২৭]

৩. মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণের কর্মপন্থা : ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকে বীমা প্রথার অস্তিত্ব ছিল। ইসলামী বীমা ব্যবস্থা দরিদ্র মুসলিম এবং যারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করত, তাদের সাহায্য করার জন্য ট্রেজারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হত। তাদের কারো মৃত্যুর পর নবী মুহাম্মদ (সা.) এর সঙ্গীদের প্রশাসনে, বিশেষ করে খলিফা উমারের সময়ে, স্পষ্টভাবে বীমার ধারণাটি বিদ্যমান ছিল এবং সুপ্রাচীনভাবে সংগঠিত হয়েছিল।[২৮] এছাড়া পঞ্চম খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের সময়ে ইসলামী বীমাও নথিভুক্ত ছিল। তিনি সর্বদা তার প্রজাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং বিভিন্ন উপায়ে দরিদ্রদের সাহায্য করতেন।[২৯]

৪. সূফী ফরমান : ১৪১৭ খ্রি. বীমা নতুনভাবে অগ্রগতি লাভ করে। 'এসময় কাজিরুনিয়া' নামক সুফী ফরমানের প্রসার ঘটে। এটি সামুদ্রিক ভ্রমণ বীমা কোম্পানী হিসেবে কাজ করতো। যে কোম্পানী সুফী আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন শাহরিয়ার (৯৩৬-১০৩৫ হি.) মাজার কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছিল। উক্ত মাজারের অনুদানই সমুদ্র ভ্রমণের সময় বিপদগ্রস্তদের সহযোগিতার কাজে ব্যয় করা হতো। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীকে সুফী ফরমান বলা হতো। এই ফরমান মোতাবেক চীন অথবা মালাবর সমুদ্র যাত্রার সময় বণিকদেরকে নির্দিষ্ট চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো এবং নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট আদেশ সাপেক্ষে চুক্তি মাফিক অর্থ পরিশোধের প্রতিজ্ঞা করতে হতো। বন্দরে জাহাজ পৌঁছানোর পর সুফী ফরমানের পক্ষে কেউ জাহাজে এসে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতো। চুক্তি মাফিক অর্থ পরিশোধ না করলে বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুফী ফরমানের পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করা হতো না। তবে হ্যাঁ যদি ঐ জাহাজ কোম্পানির কোন শেয়ার থাকত, তবে অর্থ প্রদানে বিলম্ব হলেও কিছু দায়ভার গ্রহণ করতো।[৩০]

৫. উনবিংশ শতাব্দীতে বীমার অগ্রগতি : এ শতাব্দীতে প্রখ্যাত হানাফী মুফতী ইবন আবেদীন আশ-শামী (১৭৮৪-১৮৩৬ খ্রি.) ইসলামী বীমার ধারণা ও আইনগত ভিত্তি আলোচনা করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রচলিত বীমা পদ্ধতির বাইরে ইসলামী বীমা ব্যবসাকে একটি আইনগত প্রতিষ্ঠানরূপে দাঁড় করান।[৩১] ক্লিংমুলার (Klingmullar) বলেন, মুসলমানরা শুধু বিদেশী ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েননি, বরং নিজেরাও বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে বীমার ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন।[৩২]

৬. বিংশ শতাব্দীতে মুহাম্মদ আব্দুহু-এর প্রচেষ্টা : ১৯০০ এবং ১৯০১ সালের দিকে প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদ মুহাম্মদ আব্দুহু ইসলামী বীমার বৈধতার ব্যাপারে দু'টি ফতোয়া প্রদান করেন। তিনি কেন বীমাকে বৈধ করেছেন এটা প্রমাণের জন্য তাঁর ফতোয়া পৃথক পৃথক দলীলসহ উপস্থাপন করেছেন। তিনি একটি ফতোয়াতে প্রচলিত বীমা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বীমা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অন্যটিতে বীমা বৃত্তির বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেন।[৩৩] অতঃপর ক্রমান্বয়ে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে শরী'আত ভিত্তিক ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রসার লাভ করতে থাকে। আর তা অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে প্রসার লাভ করে। এখান থেকেই সমাজে ইসলামী বীমার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রচারণা শুরু হয়।[৩৪]

ইসলামী বীমার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে প্রচলিত সূদী বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের জন্য মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজনীয় সব সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। যা বীমা গ্রহীতার স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে খুবই বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়েছে। এগুলোই ইসলামী তাকাফুল বা বীমা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। বৈশিষ্ট্যগুলো যথাক্রমে :

১. বীমা গ্রহীতাগণকে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের মতোই বিবেচনা করা হবে, যেন তারা কোম্পানীর মুনাফা বা নীট উদ্বৃত্তের অংশীদার হতে পারেন।

২. কোন নির্দিষ্ট বছরে বীমা গ্রহীতাগণ যে প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন তাতে যদি কোম্পানীতে তাদের অংশের লোকসান পূরণ না হয় তাহলে তারা অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

৩. কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেকটরস-এর বীমা গ্রহীতাগণের পক্ষ হতে পর্যাপ্ত প্রতিনিধি থাকবেন এবং তারা কোম্পানীর নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে সকল হিসাব পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা রাখবেন।

৪. কোম্পানী তার তহবীল শরীয়াহসম্মত উপায়ে বিনিয়োগ করবে। শরীয়াহতে নিষিদ্ধ ও সুদের সংশ্রব রয়েছে এমন কোন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য বা কার্যক্রমে কোন অর্থ বিনিয়োগ বা লেনদেন করা চলবে না।

৫. বীমা প্রতিষ্ঠানটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই একটি শরীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ড/কাউন্সিল থাকবে। ইসলামী শরীয়াতের আলোকে প্রতিটি কাজ তদারকী করা তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব বিবেচিত হবে।

৬. ইসলামী তাকাফুল ব্যবস্থায় পলিসি গ্রহীতা শরীয়াহর বিধান মোতাবেক নোমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি র্নিধারণ করবেন। শরীয়াহবিরোধী নোমিনী মনোনয়ন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৭. বীমা কোম্পানী দুটি পৃথক ও সুস্পষ্ট হিসাব রক্ষা করবেঃ (ক) শেয়ারহোল্ডারদের হিসাব ও (খ) পলিসি গ্রহীতাদের হিসাব। পলিসি গ্রহীতাদের হিসাবে তাদের জমাকৃত প্রিমিয়াম, চাঁদা এবং তাদের তহবিল বিনিয়োগ করার ফলে অর্জিত মুনাফায় তাদের যে অংশ সবই জমা হবে।

পলিসি গ্রহীতাদের হিসাব থেকে সার্ভিস চার্জ ও দাবী পূরণের পর উদ্বৃত্ত হতে প্রয়োজনীয় রিজার্ভ আলাদা রেখে অবশিষ্ট অর্থ তাদের মধ্যেই পুনঃবণ্টিত হবে। যদি কখনো কোন ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে তা সাধারণ রিজার্ভ তহবিল হতে পূরণ করা হবে। অবশ্য যদি কোন সাধারণ রিজার্ভ তহবিল না থেকে থাকে অথবা

থাকলেও সেই তহবিল ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত না হয়, তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের রিজার্ভ ও মূলধন হতে তা করযে হাসানা হিসেবে গ্রহণ করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ কোনক্রমেই পলিসি গ্রহীতাদের তহবিল বা উদ্বৃত্ত গ্রহণ করতে পারবে না। শেয়ার মূলধন বিনিয়োগ হতে উপার্জিত আয় শেয়ার হোল্ডারদের একাউন্টেই দেখানো হবে এবং চলতি ব্যয় ও অন্যান্য দাবী পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত অর্থ তাদের মধ্যেই বণ্টিত হবে।

৮. একটি যাকাত বা সাদাকা তহবিল গঠিত হতে হবে। শেয়ার মূলধন, রিজার্ভ ও মুনাফা হতে প্রতিবছর ২.৫% হারে গ্রহণ করে এই তহবিলে জমা করা হবে। পলিসি গ্রহীতাদের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের হিসাবের নীট উদ্বৃত্ত হতেও বার্ষিক ২.৫% হারে যাকাত আদায় করে এই তহবিলে জমা দেওয়া যেতে পারে। তহবিলটি কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেকটরসের গৃহীত উপবিধি অনুসারে বোর্ড অব ট্রাস্টি দ্বারা পরিচালিত হবে।[৩৫]

ইসলামী বীমার প্রকারভেদ

ইসলামী বীমা দুই প্রকার। যথা : ক. পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা, খ. সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমা।[৩৬] নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে দুই প্রকার বীমার পরিচয় উল্লেখ করা হলো :

ক. পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা

পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা মূলত একটি বিনিয়োগ কর্মসূচী যে বিনিয়োগ বীমা গ্রহীতাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রম পরিচালিত হয় দীর্ঘমেয়াদী মুদারাবা নীতি অনুসারে। এর আওতায় কোন ব্যক্তি নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করেন। এই সঞ্চয় লাভজনক কাজে নিয়োজিত হয় এবং মুনাফা তার হিসাবে জমা হয়। সমুদয় অর্থই বীমা গ্রহীতা ও তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার কাজে আসে। উপরন্তু এই কর্মসূচীর আওতায় বীমা গ্রহীতাদের কারো মৃত্যু ঘটলে ঐ সদস্যের পরিবারবর্গ বীমা চুক্তির সমুদয় অর্থ ও অর্জিত মুনাফা পেয়ে থাকে।[৩৭]

খ. সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমা

সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমার আওতায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ একক বা দলবদ্ধভাবে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের (কল-কারখানা, গুদামঘর, পণ্য, যানবাহন ইত্যাদি) সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডজনিত কারণে ক্ষয়-ক্ষতি বা ধ্বংসের বিপরীতে বীমা সম্পাদন করতে পারে। ইসলামী জীবন বীমার অনুরূপ এ বীমার চুক্তি ও শর্তাবলী নির্ধারিত হয় মুদারাবা নীতির উপর ভিত্তি করে। সাধারণ তাকাফুলের মেয়াদকাল সাধারণত এক বছর। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় নবায়ন করা যায়।[৩৮]

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা ইসলাম সম্মত না হওয়ার কারণ

প্রচলিত বীমায় এমন পাঁচটি মৌলিক শরী‘আহ বিরোধী উপাদান রয়েছে, যা ইসলামী অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। যে মৌলিক ধারাগুলোর অপনোদন না ঘটলে মুসলমানদের পক্ষে ঈমান-আকীদা বজায় রেখে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্যতম মাধ্যম এই বীমা পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শরী‘আহ বিরোধী উপাদানগুলো হলো, (১) আল-গারার বা অজ্ঞতা, (২) আল-মাইসির বা জুয়া (৩) আল-রিবা বা সূদ (৪) শরী‘আহ বিরোধী নোমিনী মনোয়ন এবং (৫) প্রিমিয়াম প্রদানের বিদ্যমান শর্ত। যেমন :

১. আল্-গারার (অজ্ঞতা)

গারার শরী‘আতের একটি পরিভাষা। শরী‘আতে সুস্পষ্টভাবে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। গারার বলা হয় বিনিময় চুক্তির এমন অজ্ঞতা-অস্পষ্টতা ও অনিশ্চিত অবস্থা, যার ফলে লেনদেনের কোন বুনিয়াদী বিষয় অজ্ঞতা ও অনিশ্চিত অবস্থার শিকার হয়ে যায়। এ অস্পষ্টতা ও দোদুল্যমান অবস্থা পণ্যে, মূল্যে, বাকী

বিক্রয়ের মেয়াদ বা এগুলোর পরিমাণ ইত্যাকার বিভিন্ন বিষয়ে হতে পারে। যেমন মালিকানা বা দখল লাভের পূর্বে কোন বস্তু বিক্রি করার কারণে বিক্রিত পণ্যের হস্তান্তর অনিশ্চিত হওয়া, পন্যের পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়া ইত্যাদি। তাই কোন লেনদেন চুক্তিতে এমন 'গারার' উপস্থিতি থাকলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা অবৈধ সাব্যস্ত হবে।[৩৯] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) পাথরের টুকরা নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[৪০]

ইন্স্যুরেন্স পলিসি হোল্ডার যে আশংকায় বীমা করে তা সংঘটিত হওয়া অনিশ্চিত। অথচ পলিসি হোল্ডারের প্রিমিয়াম পরিশোধ নিশ্চিত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কত প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হতো তাও অনিশ্চিত। জীবন বীমাতে উভয়পক্ষের পরিশোধ নিশ্চিত। কিন্তু তার পরিমাণ অজানা-অনিশ্চিত।[৪১]

প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান এ ব্যাপারে বলেছেন, প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় বীমা গ্রহীতা বীমা কোম্পানীর (সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই) সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার পলিসি গ্রহণের চুক্তি সম্পন্ন করার পর সেই টাকা অনেকগুলো সমান কিস্তিতে প্রিমিয়াম হিসেবে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে জমা দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পর বীমা গ্রহীতা দুর্ঘটনা কবলিত হলে বা মৃত্যুবরণ করলে বীমা কোম্পানী পলিসির চুক্তি মোতাবেক পুরো টাকাটাই বীমা গ্রহীতা বা তার নোমিনীকে প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই টাকা কোথা থেকে কিভাবে প্রদান করা হলো তা বীমা গ্রহণকারীর কাছে অজানা বা অজ্ঞাত থাকে। প্রচলিত সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা উভয় ক্ষেত্রেই এই অজ্ঞতা বা অনিশ্চয়তার উপাদান বিদ্যমান। শরীয়াহর পরিভাষায় একে বলা হয় আল-গারার।[৪২]

২. আল্-মাইসির (জুয়া)

জুয়া ইসলামী শরী'আতে হারাম।[৪৩] আর বীমার ক্ষেত্রে বিশেষ করে জীবন বীমার ক্ষেত্রে আল-গারার বিদ্যমান থাকার কারণেই জুয়া বা আল-মাইসির-এর উদ্ভব ঘটে। উদাহরণত যখন জীবন বীমার কোন পলিসি গ্রহীতা তার বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন তখন চুক্তিবদ্ধ প্রিমিয়ামের আংশিক পরিশোধ করা হলে তার নোমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অর্থের পুরোটাই পেয়ে থাকেন। শরী'আহর দৃষ্টিতে এটা জুয়া।[৪৪]

৩. আল-রিবা (সুদ)

আল-রিবা বা সুদ ইসলামী শরী'আতে পরিষ্কার হারাম। এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৪৫] প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলোর কার্যক্রমে সুদের লেনদেন, সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে, যা শরী'আহ আইন ও অনুশাসনের পরিপন্থী বলে ফকীহ্গণ সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন।[৪৬]

৪. শরীয়াহবিরোধী নোমিনী মনোনয়ন

ইসলামী শরী'আতে উত্তরাধিকারী কে হবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত এবং তাদের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন।[৪৭] কিন্তু প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় বীমা গ্রহীতা তার ইচ্ছামাফিক যে কোন ব্যক্তিকে নোমিনী নির্ধারণ করতে পারে। সকল ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে এই নোমিনীই বীমার পুরো অর্থ পাবে, যা শরী'আহর সুস্পষ্ট বরখেলাপ। এটা আদল ও ইহসানবিরোধী।[৪৮]

৫. প্রিমিয়াম প্রদানের বিদ্যমান শর্ত

বিদ্যমান বীমা আইনে (জীবনবীমা ব্যতীত) বীমা পলিসি কার্যকর হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। ঐ মেয়াদের মধ্যে একটি কিস্তিও যদি অনাদায়ী থাকে, তাহলে বীমা গ্রহীতা ঐ সময় পর্যন্ত যত টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে দিয়েছেন তার পুরোটাই মার যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত সাধারণ বীমা ব্যবস্থায় বীমা কার্যকর হওয়ার জন্যে নুন্যতম দুই বছর প্রিমিয়াম দেওয়া বাধ্যতামূলক। কোন বীমা গ্রহীতা যদি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম দেন, তাহলে তাকে দু'বছর মোট আটটি কিস্তি দিতে হবে। কিন্তু তিনি যদি সাতটি কিস্তি জমা দেওয়ার পর বাকী কিস্তিটি কোন কারণে দিতে না পারেন, তাহলে ঐ পলিসিটি কার্যকর বলে গণ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট বীমা গ্রহীতা বা তার নোমিনী কিছুই পাবেন না। অর্থাৎ, বীমা গ্রহীতার মূলধনই খোয়া যাবে। এটা আদল ও ইহসানের পরিপন্থী।[৪৯]

সাধারণ বীমা ও ইসলামী বীমার মধ্যে পার্থক্য

১. প্রচলিত জীবনবীমা সুদভিত্তিক। কিন্তু ইসলামী জীবন বীমার সাথে সুদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামী জীবন বীমা পরিচালিত হয় বীমার অংশীদারিত্ব ও মুদারাবা তথা লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে।

২. প্রচলিত বীমায় অস্বচ্ছতা এমনকি জুয়ার উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইসলামী জীবন বীমা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

৩. প্রচলিত বীমা পরিচালিত হয় মূলত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। কিন্তু ইসলামী জীবন বীমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- পারস্পরিক সহযোগিতা, লাভ-ক্ষতির অংশিদারিত্ব তথা মানব কল্যাণ।

৪. ইসলামী জীবন বীমা শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত। তাই শরীয়াহ সংক্রান্ত বিষয় দেখার জন্য কোম্পানীতে একটি শক্তিশালী শরীয়াহ কাউন্সিল থাকে। কিন্তু প্রচলিত বীমায় এর কোন অস্তিত্ব নেই।

৫. প্রচলিত বীমা পদ্ধতিতে বীমার উপকারিতা পাবেন পলিসি হোল্ডার নিজে, যদি তিনি জীবিত থাকেন অথবা যাকে/যাদেরকে তিনি তার নমিনী করেন। কিন্তু ইসলামী জীবন বীমায় উপরিউক্ত সুবিধা ছাড়াও বীমা গ্রহিতা মারা গেলে ইসলামী মিরাস অনুসারে মৃত ব্যক্তির নমীনী সহ উত্তরাধিকারীগণ বীমার অর্থ পাবেন, যদি বীমা গ্রহিতা জীবদ্দশায় কোন নির্দেশ (অসিয়ত) না দিয়ে থাকেন।[৫০]

৬. ইসলামী বীমা পলিসিতে জুয়ার কোন উপাদান থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রচলিত বীমা পলিসিতে জুয়ার উপাদান থাকতে পারে বলে মনে করা হয়।

৭. ইসলামী বীমা মুদারাবা নীতিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সদস্যগণ লাভ-লোকসানের অংশীদার হন। অথচ প্রচলিত বীমায় অংশীদারিত্বের কোন বালাই নেই। সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে মালিকগণই লাভ ভোগ করে এবং লোকসান গ্রহণ করে।

৮. ইসলামী বীমায় মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে যাকাত বা সাদাকাহ তহবিল গঠন করা হয়। সাধারণ বীমায় ঐ ধরনের কোন তহবিল গঠনের বিধান নেই।

৯. শরীয়াহ পরিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য ইসলামী বীমাতে একটি শরীয়াহ কাউন্সিল থাকে। অথচ এ ধরনের কোন প্রকার কাউন্সিল সাধারণ বীমাতে লক্ষ্য করা যায় না।[৫১]

১০. প্রচলিত বীমায় নমিনী নির্ধারণে কোন আইনী বাধ্যবাধকতা ছিল না। ব্যক্তির ইচ্ছা মাফিক নমিনী নির্ধারণ করা হতো। এমনকি পাশ্চাত্য জগতে ন্যায় সঙ্গত উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করে কুকুর বিড়ালকে পর্যন্ত নমিনী করে যাওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যদিও বর্তমান বীমা ব্যবস্থায় উন্নয়নের দলে উক্ত পদ্ধতি কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।[৫২] পক্ষান্তরে ইসলামী বীমায় নমিনী নির্ধারণ করা একটা প্রয়োজনীয় বিষয়।[৫৩]

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, পৃথিবীতে বসবাসকারী জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ বেকার, ভূমিহীন, কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ। এদের আর্থিক নিরাপত্তার পাশাপাশি দুঃসময়ে আশার আলো দেখাবার জন্য ইসলামী বীমা প্রবর্তন এখন সময়ের দাবী। উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, একটি পরিবারকে অনিশ্চয়তার মৃত্যুকূপে ফেলে দিতে পারে। এমতাবস্থায় শরী'আহ ভিত্তিক জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা ও সাধারণ বীমা গ্রহণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ণ জরুরী। বিশ্বে আদিকাল থেকে ইসলামী বীমার ধারণা থাকলেও পূর্ণাঙ্গভাবে তা চালু হয়নি। এখন পর্যন্ত, ইসলামী বীমা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিশ্বব্যাপী সরকারীভাবে ইসলামী বীমার জন্য পৃথক বিধান প্রণয়ন করা উচিত। তবে আশার কথা হলো বর্তমান বিশ্বে ইসলামী বীমা একটি গতিশীল অর্থনৈতিক সংগঠন যা দ্রুত বর্ধমান শিল্প হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এমন গবেষণার প্রস্তাবিত পরামর্শগুলো, ইসলামী বীমা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং ইসলামী বীমার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ইসলামী বীমা সম্পর্কে বিশ্বে বেশী বেশী গবেষণা প্রয়োজন। ইসলামী বীমার সুফল প্রত্যেকটি মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারলেই কেবল বীমা শিল্প সার্থক ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

তথ্যনির্দেশ

[১]. *Samsad English Bangali Dictionary* (Calcutta : Shaitaya Samsad, 9 August 1980), P.569.

[২]. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, *ইসলামী জীবন বীমা বর্তমান প্রেক্ষিত* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২১; সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.) পৃ. ৮৯১; মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) ও মুফতী ওলী হাসান (র), *বীমায়ে জিন্দেগী*, অনুবাদ : শরী'আতের দৃষ্টিতে বীমা শিল্প, অনুবাদক মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ (ঢাকা : ইসলামী বীমা তাকাফুল প্রকল্প হোমল্যান্ড লাইফ ইন্সুরেন্স কো. লি. ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৫; এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী ইন্সুরেন্স (তাকাফুল)* (ঢাকা : মাম্মী প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২১

[৩]. Chorales J. Woelfel, *Encyclopedia of Banking and Finance* (New dilhi : India S. Chand and com Pany Lit, 10th ed., 1994), P. 599; জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *জীবন বীমা পরিচয়* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৬

[৪]. M. N. Mishra, *Insurnce Principles and Practice* (New Delhi : S. Chand and com. Ltd, 1997), P. 3

[৫]. ড. সোলায়মান ইবন ইবরাহীম, *আত-তা'মীন ওয়া আহকামুহু* (বৈরূত : কারা ইবন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৮

[৬]. https://eshikhon.com/বীমা

[৭]. ড. আলী আহমাদ আস-সালূস, *মাওসু'আতুল কাযায়া আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মু'আসিয়া ওয়াল ইকতিসাদুল ইসলামী*, ১৯শ খণ্ড (কাতার : দারুছ ছাকাফাহ, ১০ম সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫

[৮]. আবুল ফজল জামালুদ্দীন ইবন মুকাররম ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব*, ১৩ খণ্ড (বৈরূত : দারুস সাদির, তা.বি.), পৃ. ২১; আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু ফারিস ইবন যাকারিয়া, *মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ*, ১ম খণ্ড, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ১৩৩

[৯]. *আত-তা'মীন ওয়া আহকামুহু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯; ফ্রান্স বুশনার ওয়াযিরিট ফিল্টার, *উসুসুত তামীন আয-যাতী* (কার্লযোর: ইকতিসাদিয়াতুত্তামীন, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১৮

[১০]. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ২য় ও ৪র্থ সংস্করণ ২০০০ ও ২০০৫ খ্রি.), পৃ.১৪৬-৪৭

[১১]. আবু হুসাইন এম.এফ, এন.এ.এন মুহাম্মাদ, সি.এম হুসেন, *মালয়েশিয়া এবং আরব উপসাগরীয় দেশগুলির মধ্যে তাসফুল (ইসলামী বীমা) শিল্প : চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ দিক* (প্রকাশ স্থান : এশীয় সমাজ বিজ্ঞান ২০১৪,), পৃ. ২৬

[১২]. আল-কুরআন, সূরাহ আল-মায়িদাহ : আয়াত নং ২

[১৩]. সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আবুদাউদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড (প্রকাশস্থান বিহীন : দারুল ফিকর, তা.বি), হাদীস নং-৪৯৪১, পৃ. ৭০৩

[১৪]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশায়রী আন-নায়সাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-২৫৮৬, পৃ. ১৯৯৯

[১৫]. এ মাহমুদ এল-গামাল, *ইসলামী অর্থব্যবস্থা: আইন, অর্থনীতি এবং অনুশীলন* (নিউ ইয়র্ক : ক্যামব্রিজ, ২০০৬), পৃ. ৪৭ ও ৬১)

[১৬]. আশ-শায়খ আল-মুতী'ঈ, *রিসালাতু আহকামিস সোকারতাহ*, মুজাল্লাতুল আযহার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭

[১৭]. *ইসলামী বীমা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

[১৮]. *প্রাগুক্ত*

[১৯]. ড. মুহাম্মদ বালতাজী, *উক্বদুত তা'মীন মিন বিজহাতিল ফিকহিল ইসলামী* (কায়রো : দারুস সালাম, ২য় সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ১১

[২০]. মুহাম্মদ ফজলুল করীম, *ইসলামী বীমা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪২

[২১]. ড. মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, "তাকাফুল (ইসলামী বীমা) ধারণাগত কাঠামো এবং কার্যক্রম পদ্ধতি" (প্রবন্ধ) অনুবাদঃ হাসান শারীফ, *ইসলামী বীমা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পৃ. ৪২

[২২]. *ইসলামী বীমা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

[২৩]. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *বুখারী শরীফ*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), অনুচ্ছেদ-২৮৯০, বাবু জানীনিল মার'আতি, হাদীস নং- ২৮৯১, ৬৪৪১-৬৪৪২২, পৃ. ২৭৭-২৭৮।

[২৪]. *ইসলামী বীমা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

[২৫]. Muhammad hamidullah, *The first written constitution in the world*, sh. Muhammad Ashraf (Lahore, 1981), Art. 3, P. 55

[২৬]. *Ibid*

[২৭]. *ইসলামী বীমা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬

[২৮]. এম.এম. হোসেন ও এ.টি. জেনারেল পাসা, *তাকাফুল বীমা ও প্রচলিত ইন্সুরেন্সের মধ্যে ধারণামূলক ও কার্যকরী পার্থক্য*, (প্রকাশ স্থান বিহীন : প্রকাশক বিহীন, ২০১১; পৃ. ২৩-২৮

[২৯]. প্রাইম ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড (আরিফিল ২০১২) *বার্ষিক প্রতিবেদন*

[৩০]. *ইসলামী বীমা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[৩১]. E. Klingmullar, *The concePt and Development of Insurance in Islamic contries in Islamic culture,* Vol. XLIII, 1969, P.30

[৩২]. *Ibid*

[৩৩]. *ইসলামী বীমা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পৃ.৪৮

[৩৪]. *প্রাগুক্ত*

[৩৫]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭-৪৮

[৩৬]. *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

[৩৭]. *প্রাগুক্ত*

[৩৮]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

[৩৯]. শায়খুল ইসলাম জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *বীমা তাকাফুল প্রচলিত পদ্ধতি ও শরয়ী রূপরেখা*, অনুবাদক: শাব্বীর আহমাদ (ঢাকা : মাকতাবাতুল হেরা, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ৯, টীকা-১

[৪০]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশায়রী আন-নিসাপুরী, সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১১৫৩, হাদীস নং-১৪১৩

[৪১]. *বীমা তাকাফুল প্রচলিত পদ্ধতি ও শরয়ী রূপরেখা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯, টীকা-১

[৪২]. *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

[৪৩]. সূরাহ আল-মায়িদাহ : আয়াত নং ৯০

[৪৪]. *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫-৪৬

[৪৫]. সূরাহ আল-বাকারাহ : আয়াত নং ২৭৫, ২৭৮-৭৯

[৪৬]. *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

[৪৭]. সূরাহ আন-নিসা : আয়াত নং ৭-৯

[৪৮]. *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

[৪৯]. *প্রাগুক্ত*

[৫০]. https://bdtiger71.blogspot.com/2016/09/blog-post_18.html

[৫১]. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা: জেরিন পাবলিশার্স, জানুয়ারী, ২০১৩), পৃ. ৩৮৬

[৫২]. *ইসলামী বীমা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

[৫৩]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

বক্তৃতা : একটি স্বতন্ত্র পরিবেশনা-শিল্প

ড. মো. আতাউর রহমান*

Abstract : It is indispensable for a human being to express his mood in everyday life. Along with different communicative media 'speech' is a very important one. This verbal communication style varies from individual to individual. 'Lecture' is a noteworthy tributary to convey oneself in everyday life. Unquestionably it is one sort of vocal performance. We feel fondness for somebody's lecture and somebody's not. We feel annoy to the second kind of speakers and they formulate us in sleep. It is a momentous occurrence in performance-art. What are the methodologies of a speaker to attract the audience that they should listen him unreservedly? Such an observed analysis of 'a speaker' and 'a lecture' has been introduced in this piece of writing.

ভূমিকা:

যাপিত জীবনের প্রয়োজনে মানুষকে নিয়তই তার ভাব প্রকাশ করতে হয়। ভাব বিনিময়ের নানারকম মাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো কথা। কথা বলার ঢঙ প্রত্যেক মানুষের আলাদা। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কথা বলার এক স্বতন্ত্র শাখার নাম বক্তৃতা। এ এক বাচিক পরিবেশনা। আমরা কারো কারো বক্তৃতা শুনে বিমোহিত হই আবার কারো কারো বক্তৃতায় আমাদের বিরক্তি চলে আসে; ঘুম পায়। আসলে বক্তৃতা পরিবেশনা-শিল্পের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই বক্তৃতা উপস্থাপনায় কী কৌশল অবলম্বন করলে শ্রোতা সে বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে? কখন তা হয়ে ওঠে শিল্প? এ অনুসন্ধানটি প্রয়োজনীয়। এটা তো সত্যি যে, আমরা নিয়তই নিজেকে প্রকাশ করতে চাই। এই প্রকাশাকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। আসলে 'প্রাণের প্রধান শর্ত আত্মপ্রকাশ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা।'[১] নানারূপে তা বিকশিত হয়। আত্মপ্রকাশ যখন অপরের মন জয় করতে সক্ষম হয় তখন তা শিল্পমানে উত্তীর্ণ হবার দাবি রাখে। মুখের কথা পরিবেশনার গুণে হয়ে উঠতে পারে শিল্পিত সুন্দর। বক্তৃতা তেমনরূপেই বিবেচ্য।

বক্তৃতাকে পরিবেশনাশিল্পের শাখা বলাই সঙ্গত। মানুষমাত্রেই এক ধরনের পরিবেশনাশিল্পী। জগতে ও জীবনে প্রতিনিয়ত তাকে নানা চরিত্রে নিজেকে পরিবেশন করতে হয়। এই পরিবেশনা যত নিখুঁত হয় তত গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। এমনকি জনমনে দ্রুত জারিত করতে তা পারঙ্গম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিজেকে পরিবেশন করতে হয় স্বমহিমায়। এ গুণটিতেই যোগ হয় স্বতন্ত্র মাত্রা। Erving Goffman তাঁর *The Presentation of self in Everyday Life* গ্রন্থে পরিবেশনার সংজ্ঞা দেন এভাবে, 'A "performance" may be defined as all the activity of a given participant on a given occasion which serves to influence in any way any of the other participants.'[২] এটি প্রদর্শিত হবার ব্যাপার। নানারূপ ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটতে পারে। বাচিক তার মধ্যে অন্যতম। বক্তা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'একজন সুবক্তা হলো সেইরূপ একজন সুব্যবসায়ীর ন্যায় যে তার পণ্যরূপ বক্তব্যের মুখ্য বিষয়গুলিকে ক্রেতারূপ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অতি সহজে ও সর্বোত্তমভাবে বিক্রয় করতে সক্ষম।'[৩] একথা সত্যি যে, 'সুন্দর করে কথা বলা একটি আর্ট।'[৪] আমাদের মনে রাখতে হয়, 'অর্থ যদি শব্দে বিকশিত না হয়, ভাব যদি ভাষায় প্রকাশিত না হয়, চিন্তা যদি বাক্যে রূপ না পায়-তবে তাদের সার্থকতা কোথায়?'[৫] অর্থ-ভাব ও চিন্তার সমন্বিত সুন্দর প্রকাশে বক্তৃতা শিল্পমান্য হয়ে ওঠে। কী এই বক্তৃতা—

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> সংস্কৃত বচ্ ধাতুর অর্থ কথা বলা। ঐ ধাতুর সঙ্গে তৃচ্ প্রত্যয় যোগ করে পাওয়া গেছে 'বক্তৃ' শব্দ। এর প্রথমার একবচনে যে শব্দ পাওয়া যায় তা হলো বক্তা। অর্থ, যে বলে। মূল বক্তৃ শব্দের সঙ্গে ভাব অর্থবোধক তা প্রত্যয় যোগ করলে 'বক্তৃতা' শব্দ পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে দেখলে বক্তৃতা কথাটির অর্থ বক্তৃভাব, বাগ্মিতা বা বাক্পটুতা। কিন্তু বাঙলায় এসে বক্তৃতা শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা বুঝি 'কোন জনমণ্ডলীর সামনে কোন বক্তার অভিভাষণ'-কে।[৬]

বক্তৃতার ক্ষেত্রে বক্তার সঙ্গে জনমণ্ডলী বা শ্রোতা অনিবার্য সম্পর্কে সম্পৃক্ত। সাধারণত সভা-সমিতি-সেমিনার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়; বক্তা-শ্রোতার একটি ভাবের আবেশ তৈরি করা হয়। উপস্থিত জনতা শুধু কথা শুনবার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে। তাদের প্রত্যাশার খোরাক মেটাতে হয় তথ্য-চিন্তা ও পরিবেশনা দিয়ে। কণ্ঠের জাদুকরি উপস্থাপনায় শ্রোতাকে বিমোহিত করতে হয় একজন বক্তাকে। 'কথকের কথা সুন্দর হয়ে ওঠে প্রথমত দুটি কারণে। একটি কথকের ভাষা অন্যটি কথকের কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বর আর ভাষাবোধ, দুদিকই সমান উন্নত না হলে কথা বলাও সার্থক হয় না।'[৭] ভাষার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গির যৌথমিলনে বক্তৃতা তার আয়ু নির্মাণ করে। সম্পূরকভাবে একজন বক্তাকে নানাবিধ দিকে নজর রাখতে হয়। সৎভাবনা ও আত্মপ্রত্যয়ী না হলে বক্তার বক্তৃতা প্রাণ পায় না। সে বক্তৃতা হতে পারে সাংস্কৃতিক বিষয়ে, সমকালীন বাস্তবতা ঘিরে, সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে, আধ্যাত্মিক ভাবনায়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিযুক্ততায়, সাহিত্যভাবনায়, শিক্ষামূলক কিংবা রাজনৈতিক। যে মঞ্চই হোক না কেন বক্তাকে অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। সুশৃঙ্খল ও চমকপ্রদ পরিবশেনাকৌশলে বক্তৃতা গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। বক্তাকে তাই মেনে চলতে হয় নানারকম সৌজন্য-প্রস্তুতি-সতর্কতা ও কৌশল।

বক্তৃতা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বক্তার ব্যক্তিত্ব প্রথম বিবেচ্য। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত বিনয়। প্রজ্ঞা ও মননের সৌকর্যের সঙ্গে বিনয়যুক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উপস্থাপনা বক্তৃতাকে সমৃদ্ধ করে; শুদ্ধ উচ্চারণে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ক্রিয়াশীল অনুষঙ্গ হিসেবে। পরিমিতিবোধ শ্রোতার ধৈর্যচ্যূতি রোধ করে। মনে রাখতে হয় 'একজন মানুষ তার রুচি ও ভাবনা, প্রবণতা ও আবেগ, সীমাবদ্ধতা ও সমুন্নতি নিয়ে কখনই আর একজনের সঙ্গে হুবহু এক হতে পারে না।'[৮] সুতরাং বক্তার সামগ্রিক বিন্যাস হতে হয় পরিশীলিত। ব্যক্তিত্ব আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শুদ্ধ উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরভঙ্গি, পরিমিতিবোধ ও প্রজ্ঞাই হতে পারে শিল্পিত বক্তৃতার অনিবার্য উপাদান। এসব উপাদান সহযোগে একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে শ্রোতার পরিতৃপ্তি আনতে সক্ষম হলে সে বক্তৃতা মানসপটে রয়ে যায়। শ্রোতার তাতে কিছু অর্জন হয়। সময় নষ্ট করে শ্রোতা বক্তৃতায় যদি বিরক্ত হয়ে পড়ে তো সে বক্তৃতার দরকার কী? বক্তৃতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রস্তুতিই প্রয়োজন হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী বাচিক, সাত্ত্বিক, আহার্য এ তিনের সমন্বয়ে বক্তৃতা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র পরিবেশনাশিল্প। আলোচনার এ পর্বে আমরা বক্তৃতার দ্বিবিধ ভাগ দেখাতে পারি। ক. প্রাকমঞ্চপর্ব এবং খ.মঞ্চপর্ব। প্রসঙ্গত বলা দরকার বক্তৃতা শুধু মঞ্চে বা প্রত্যক্ষ শ্রোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবনযাত্রায় পরিবেশনার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাকমঞ্চ ও মঞ্চপর্বকে প্রতীকীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক. প্রাকমঞ্চপর্ব

প্রাক অর্থাৎ পূর্ব। বক্তৃতা উপস্থাপনের পূর্ব-প্রস্তুতিই এ পর্বে বিবেচিত। আমরা জানি বক্তৃতা মূলত দুধরনের। এক. নির্ধারিত, দুই. তাৎক্ষণিক। পূর্বপ্রস্তুতি নির্ধারিত বক্তৃতার ক্ষেত্রে অনিবার্য। তাৎক্ষণিকে থাকলেও তা তাৎক্ষণিক প্রস্তুতির আওতায় পড়ে। সংক্ষিপ্ত সময়ে হলেও মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রস্তুতিই বক্তৃতার পূর্ব প্রস্তুতি। বক্তৃতার প্রয়োজনে একজন বক্তার প্রাকমঞ্চ-প্রস্তুতিকে দ্বিবিধ দিক থেকে দেখা যেতে পারে। ক. প্রাথমিক প্রস্তুতি, খ.মাধ্যমিক প্রস্তুতি। প্রাথমিক প্রস্তুতির আওতায় বিবেচ্য হতে পারে ১. বক্তৃতায় কী বলা হবে? ২. বক্তৃতাটি কোথায় উপস্থাপিত হবে? ৩. বক্তৃতার সময় কখন? ৪. বক্তৃতাটি কার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত? এ চতুর্বিধ ভাবনা প্রাথমিকভাবে বক্তৃতার সহায়ক। অর্থাৎ কী, কোথায়, কখন, কার উদ্দেশ্যে? আর মাধ্যমিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যেসব ভাবনা যুক্ত হতে পারে তা হলো ১. কী পোশাক পরা হবে?, ২.

কীভাবে দাঁড়াতে হবে? ৩. কেমন হবে দেহভঙ্গি, ৪. কোথায় থাকবে হাত? ৫. কোথায় থাকবে চোখ? ৬. কতক্ষণই বা বলতে হবে? ৭. মাইক্রোফোন ব্যবহার হবে কীরূপে? ৮. সমাপনীটা কেমন হবে? ইত্যাদি। এতদ্বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ধারণা নেয়া যাক।

কী?

বক্তৃতার বিষয় কী হবে? তা কি সাংস্কৃতিক নাকি রাজনৈতিক নাকি তার বাইরে অন্যকিছু। বক্তৃতা যে বিষয়ে উপস্থাপিত হবে সে বিষয়ে বক্তার সম্যক ধারণা না থাকলে সারশূন্য আলোচনায় পর্যবসিত হবে। ফলে কী বিষয়ে বলা হবে সেটাই প্রথম প্রস্তুতি। কেননা বক্তা ও শ্রোতার মধ্যকার সংযোগসেতু হলো বিষয়। বক্তৃতার বিষয়টি সম্পর্কে শ্রোতার আগ্রহ তৈরি না হলে কেনই বা তিনি বসে বসে সময় নষ্ট করবেন? বিষয়ের আগ্রহ থেকেই শ্রোতা হাজির হয় আর বক্তাকেও তাই বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হয়। একটি বক্তৃতামালায় নানারকম ফুল যুক্ত হতেই পারে কিন্তু মূলত মালা হয়ে উঠতে হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।

> যে কোন বক্তৃতার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকে। বিষয়হীন বক্তৃতা সম্ভব নয়, তেমনি এক বক্তৃতায় নানা বিষয়ের আলোচনাও চলে না। বক্তার কৌশলে কখনও এক বক্তৃতায় নানা বিষয়ের আলোচনা চলতে পারে কিন্তু সেখানেও এক অন্তর্লীন ঐক্য থাকে–তা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনে। বিষয়কে অতিক্রম করলে বক্তৃতার প্রাথমিক শর্ত লঙ্ঘন করা হয়। একটি নিটোল প্রবন্ধের মতো একটি বক্তৃতাও বহুবিস্তৃত তথ্যে সমৃদ্ধ হলেও হয় একলক্ষে ধাবিত।[৯]

কোথায়?

বক্তৃতাটি কোথায় উপস্থাপিত হবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা। শ্রেণিকক্ষে নাকি কোনো মিলনায়তনে নাকি উন্মুক্ত মাঠে নাকি জনতার মঞ্চে? বক্তৃতার প্রস্তুতি এর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কেননা জনতার মঞ্চে উপস্থিত থাকে সবধরনের অগণিত শ্রোতা। মিলনায়তনে তার চেয়ে কম আর শ্রেণিকক্ষে হয়তো তারও চেয়ে কম। কণ্ঠস্বরভঙ্গি, স্বরক্ষেপণের মাত্রা, বিষয়ের বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিবেচিত হয় স্থানভাবনায়। শ্রেণিকক্ষে বলার ঢঙ আর জনতার মঞ্চে বলার ঢঙ যেমন এক হবে না ঠিক তেমনি গ্রাম নাকি শহর সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে নিতে হয়। একই বক্তৃতা স্থানভেদে পরিবেশনায় ভিন্নমাত্রা পেয়ে থাকে। ফলে বক্তৃতার আগে বক্তাকে জেনে নিতে হয় যে, তা কোথায় পরিবেশিত হবে?

কখন?

বিষয় ও স্থানের মতোই সময়টাও বক্তৃতার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবক। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত কিংবা সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত যাই হোক না কেন সময়টা নিশ্চিত হওয়া জরুরি। কেননা সময়ের রথে সারথি হয়ে যাত্রা করলে শ্রোতা সমকালীনতার স্বাদ পেয়ে প্রস্তুত হতে থাকে বিষয়গর্ভের জন্য। বক্তৃতার শুরুপর্বে সেই ক্ষণের বন্দনার মতো উপস্থাপনা একটি বাড়তি আমেজ তৈরি করে। এক্ষেত্রে অবশ্য বক্তাকে ইম্প্রোভাইজেশনের আশ্রয় নিতে হয়। বক্তৃতা শুরুর প্রাক্কালে যদি হঠাৎ-ই বৃষ্টি নামে তখন বৃষ্টিস্নাত শুভেচ্ছাজ্ঞাপন শ্রোতাকে প্রস্তুত করে। বক্তৃতার প্রস্তুতিতে তাই সময়টা জেনে নেয়া জরুরি।

কার উদ্দেশ্যে?

বক্তৃতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হলো কার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা উপস্থাপন করা হবে? সামগ্রিক প্রস্তুতিকে পূর্ণতা এনে দিতে এ ভাবনা অত্যন্ত সহায়ক। শ্রোতারা কারা? সংখ্যাধিক শ্রোতার বিপক্ষে যায় এমনতর বক্তৃতা মান্য হয় না। বরং যারা সামনে থাকেন কিংবা শোনেন তাদেরকে সম্পৃক্ত করেই বক্তৃতা পরিবেশিত হওয়া জরুরি। নয়তো হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে জাতীয় কবি কাজী ইসলামের "যৌবনের গান" প্রবন্ধের কথা। তা ছিল মূলত একটি বক্তৃতা। সিরাজগঞ্জের মুসলিম যুব সমাজের আমন্ত্রণে মুসলিম যুবকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতারূপে তিনি "যৌবনের গান" উপস্থাপন করেন। তাকে মনে রাখতে হয়েছে তার সামনে বসে আছে মুসলিম যুব সম্প্রদায়। বিধায় পুরো বক্তৃতায় যৌবনের স্বরূপ ও

মুসলিম যুবকদের কার্যক্রম কী হতে পারে এতদ্বিষয়ক আলোচনা প্রযুক্ত। সমাবর্তন বক্তৃতায় যেমন শিক্ষা-সমাপনকারীদের উদ্দেশ্যে বলতে হয় তেমনি উদ্দিষ্ট শ্রোতা সম্পর্কে পূর্ব-ধারণা বক্তৃতা-প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনিবার্য।

কী পোশাক পরা হবে?

অনুষ্ঠানের ধরন বুঝে পোশাক পরিধান করা জরুরি। কেননা বক্তার পোশাক তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে স্ববিরোধী পোশাক পরিধান দর্শক শ্রোতার নিকট হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকই শুধু নয়, ধরন বুঝে পোশাক নির্বাচন করতে হয়। ধরা যাক ওয়াজ মাহফিলের কথা। যেখানে কিনা বক্তাকে অবশ্যই ফরজ-সুন্নত বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়। সেখানে যদি বক্তা জিন্স প্যান্ট ও টি শার্ট পরিধান করে বক্তৃতায় হাজির হন তখন শুরুতেই শ্রোতার গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারেন। সুতরাং অনুষ্ঠানের ধরন বুঝে পোশাক নির্বাচন বক্তৃতার পূর্বশর্ত হিসেবে পরিগণিত। এতদ্বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন মনে করা যেতে পারে। তিনি তাঁর "পোশাক" কবিতায় বলেন:

> অনেকদিন হলো
> পরব না পরব না করেও পোশাক পরা হলো অনেক রকম।
>
> কথা হলো, তুমি ঠিক কেমন ভাবে
> তোমার মত হবে।[১০]

ঠিক কেমনভাবে নিজের মতো হতে হবে এ বোধ পোশাক নির্বাচনে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে।

কীভাবে দাঁড়াতে হবে?

দাঁড়ানোর ভঙ্গির উপর নির্ভর করে শরীরের ভারসাম্য। বক্তা যদি ভারসাম্যহীন অবস্থায় শরীর নিয়ে সমস্যায় থাকেন তবে বক্তৃতার ব্যাঘাত ঘটবে। ফলে দাঁড়াতে হয় ভারসাম্য রক্ষা করে। এক্ষেত্রে বক্তা তার পা দুটোকে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারেন যাতে করে তিনি আরামে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। পা দুটো সামান্য বাঁকা করে এবং একটু আগুপিছু করে দাঁড়ালে ভারসাম্য রক্ষা হয়। দু'পা কখনোই একসাথে করা যাবে না। পা দুটোর দূরত্ব হওয়া উচিত বক্তার উচ্চতা ও শরীরের উপর নির্ভর করে ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুট পর্যন্ত দূরত্বে। এটাও ঠিক যে একভাবে স্থির হয়ে থাকারও কিছু নেই। বক্তৃতা চলাকালে কখনো বাম পা আগে আর কখনো ডান পা আগে নেয়া যেতে পারে। স্বাভাবিক থাকতে পা যেরূপে থাকা বাঞ্ছনীয় ঠিক সেরূপে প্রতিস্থাপন করাটাই শ্রেয়।

কেমন হবে দেহভঙ্গি?

বক্তৃতার কালে কি দেহ স্থির হয়ে থাকবে? অনেকেই মনে করেন নড়াচড়া না করেই স্থির হয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বরং দর্শক-শ্রোতার নিকট তা বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে। বক্তৃতায় দেহভঙ্গির প্রয়োগ আঙ্গিক অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে। অঙ্গচালনা এখানে কার্যকর। বক্তৃতা যারা শোনে তারা একইসঙ্গে দেখেও বটে। চোখের একঘেয়েমিতা দূর করার জন্য ঈষৎ বাঁকা হয়ে, কখনো ডানে, কখনোবা বামে বাঁক নেয়া যেতে পারে। ঘাড়-মাথা অভিব্যক্তির সঙ্গে ঘুরবে। কখনো কখনো ভাবের অভিব্যাক্তি প্রকাশে শরীরের ভঙ্গিও দৃশ্যত করতে হবে।

> লেখার সঙ্গে ছবি যেমন লেখার গৌরব বাড়ায় তেমনি কোথাও কোথাও বক্তৃতার সঙ্গে ভঙ্গিমা তাকে আরও জোরদার করে তোলে। প্রশ্ন বোঝাতে হাত দুটো ছড়িয়ে দেওয়া বা অভিভূত হওয়া বা অনিবার্যকে মেনে নেওয়া বোঝাতে কাঁধ দুটো একটুখানি ঝাঁকুনি দেওয়া বা হতাশা বোঝাতে হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই শ্রোতার চোখে বক্তার ছবিটাকে সমুজ্জ্বল করে তোলে। গল্প বলতে বলতে চশমাটা ঠিক করে নেওয়া, বা একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নেওয়াও ভঙ্গির মধ্যে পড়ে। সত্য বলতে এমন সব সাধারণ ভঙ্গি বক্তৃতার বৈচিত্র্য সম্পাদন করে বক্তব্যের গুরুত্ব বাড়ায়।[১১]

শিল্পিত দেহভঙ্গি বক্তৃতার সৌকর্য বাড়ায়। বক্তৃতায় দেহভঙ্গি সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ।

কোথায় থাকবে হাত?

হাত নিয়ে আমাদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। কোথায় থাকবে হাত? অসহায়ের মতো ঝুলবে নাকি পেছনে বাধা থাকবে নাকি পকেটে ঢুকিয়ে রাখা হবে? কিন্তু না। হাতকে ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে কখনো মুষ্ঠিবদ্ধ, কখনো তর্জনি উচিয়ে, কখনো হাতা গোটোনোর ভান করে, কখনো লেখার অভিনয় করে, কখনো মাইক্রোফোন ধরে এরূপ নানা ভঙ্গিতে হাতকে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে হাতটাকে বাড়তি মনে হবে না। ভাবের নানা অভিব্যক্তি প্রকাশে হাতের চলন গুরুত্বপূর্ণ। হাতকে নানাক্রিয়ায় ব্যস্ত রাখতে পারলে হাত নিয়ে বিড়ম্বনা যেমন কমে, বক্তৃতাও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কোথায় থাকবে চোখ?

বক্তৃতার মঞ্চে উঠে বক্তা কার দিকে তাকাবেন? কীইবা হবে সে দৃষ্টির অভিব্যক্তি। এমন একটি সমস্যা সহসাই এসে হাজির হয়। কিন্তু 'চোখ যে মনের প্রতীক। দৃষ্টির ভিতর দিয়ে মনের ভাব ফুটে ওঠে এটাই প্রাণের ধর্ম–এটাই স্বভাব। বক্তা তাঁর বক্তৃতাকে প্রাণবন্ত করতে চোখকে একাজে ব্যবহার করবেন।'[১২] তা না হলে বক্তৃতা নিরস মনে হতে পারে। একজন নতুন বক্তা প্রথমদিকে এতদ্বিষয়ে দক্ষ নাও হতে পারেন। সেক্ষেত্রে দর্শক-শ্রোতার শেষ সারির কোনো একজনকে লক্ষ করে বক্তৃতা উপস্থাপন করলে সকল দর্শক মনে করবে যে তার দিকে তাকিয়েই কথা বলছেন বক্তা। সামগ্রিক পরিবেশ তাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কতক্ষণই বা বলতে হবে?

একটি প্রাথমিক ধারণা নিয়ে মঞ্চে উঠতে হবে যে, বক্তৃতা কতক্ষণ হবে? কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া সময় থেকেও একটু আগে শেষ করতে হবে। তাতে শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। বক্তৃতার কোনো পর্যায়ে যদি বক্তাকে নির্দেশ করে সভাপতি কোনো শব্দ করেন কিংবা চিরকুট দেন সেটা বক্তার ক্ষেত্রে মোটেই ভালো ব্যাপার নয়। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বক্তব্য শেষ করা সৌজন্যের আওতায় পড়ে। শ্রোতার পিপাসা থাকলে ইম্প্রোভাইজ করে আরও কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তবে যথাসময় মাথায় নিয়ে যথাসময়ে বক্তৃতা শেষের প্রস্তুতি থাকতে হয়। সেটিই উত্তম।

মাইক্রোফোন ব্যবহার হবে কীরূপে?

সম্প্রতি মাইক্রোফোন ব্যবহার ছাড়া বক্তৃতার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু একজন বক্তার আগে থেকেই মাইক্রোফোন ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। 'Micro–যার অর্থ হল small এবং Phone যার মানে হল voice অর্থাৎ এটি এমন একটি যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র বা অল্পশব্দ তীব্রতর হয়।'[১৩] অনেক সময় নতুন বক্তা অনভিজ্ঞতার কারণে মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে কথা বলেন। তাতে শব্দদূষণ হয়। মাইক্রোফোনের খুব কাছ থেকে কথা বললে অনেক সময় নিঃশ্বাসের শব্দ ঝামেলার তৈরি করে। সেক্ষেত্রে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ বাঁকা হয়ে কথা বললে এ জাতীয় বিড়ম্বনা থেকে বিরত থাকা যায়। অবশ্যই মাইক্রোফোনের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাইক্রোফোনেরও রকমফের রয়েছে। বক্তাকে এতদ্বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখতে হয়।

সমাপনীটা কেমন হবে?

কী জাতীয় কথা দিয়ে বক্তৃতার ইতি টানবেন বক্তা তা আগে থেকেই একটা প্রস্তুতি দরকার। বক্তৃতার শুরু ও শেষটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। চমক দিয়ে শেষ করতে পারা একজন বক্তার মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ বক্তা কারো কাছে যেন বিরক্তিকর হয়ে না ওঠেন সেদিকে তার দৃষ্টি থাকতে হয়। মজার কোনো স্মৃতিকথা কিংবা কোনো গল্প অথবা কোনো কবিতার লাইন দিয়ে শেষ করতে পারলে ভালো হয়। এ জাতীয় প্রস্তুতি মঞ্চে উঠবার আগেই ভেবে নিতে হয়।

খ. মঞ্চপর্ব

অতঃপর বক্তা যখন মঞ্চে তখন তাকে বেশ কিছু বিষয় অনুসরণ করে চলতে হয়। যতক্ষণ তিনি মঞ্চে তখন মূলত তাকে বুদ্ধিদীপ্ত অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। বিষয়গর্ভে থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতার যথেষ্ট সুযোগ তার থাকে বটে। অন্তরালে কিছু ব্যাকরণ মেনে চলতে হয়। সেগুলো প্রজ্ঞার সঙ্গে সাত্ত্বিকের যোগ। সামনে দর্শক কিংবা শ্রোতা, বিষয় নির্ধারিত কিংবা তাৎক্ষণিক। বক্তৃতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গাঁথুনি বক্তৃতার সার্থকতা এনে দেয়। বক্তৃতায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে সৌজন্যপ্রকাশ, আত্মপ্রত্যয়, শুদ্ধ উচ্চারণ, ভাষার গাঁথুনি, তথ্যযোগ ও সহজবোধ্যতা, হিউমার-উইট ও গল্পযোগ, শ্রোতা-বক্তার যোগসূত্র, আবেগময়তা, বৈচিত্র্যপূর্ণতা, সমকালীনতা, উপভাষাপ্রয়োগ, ইতিবাচকতা, তাৎক্ষণিকতা, চমক ও পরিমিতিবোধ।

সৌজন্যপ্রকাশ

বক্তৃতার ক্ষেত্রে শুরুতেই বক্তাকে মনে রাখতে হয় সৌজন্যপ্রকাশের কথা। মঞ্চে নিশ্চয় একজন সভাপতি থাকেন, অন্যান্য অতিথি থাকেন, সামনে দৃশ্যত অথবা অনতিদূরে নানা বয়স-লিঙ্গ-শ্রেণি-পেশার দর্শক-শ্রোতা থাকেন। যাদের উপস্থিতিতে বক্তৃতার আয়োজন তাদের প্রতি বক্তার সৌজন্যপ্রকাশ প্রয়োজন। বক্তাকে মনে রাখতে হয় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা। আয়োজকদের প্রতি, মঞ্চে সভাপতি ও অতিথিদের প্রতি, সুধিজনের প্রতি, মহিলাদের প্রতি, তরুণদের প্রতি সর্বোপরি নিজের মেজাজ শান্ত রাখবার প্রতি। বিনয় মানুষকে ছোট করে না বরং মহৎ করে। সবার প্রতি সৌজন্যপ্রকাশের বিনয় একজন সুবক্তার চারিত্রিক গুণাবলীর আওতায় পড়ে। বক্তৃতায় সৌজন্যপ্রকাশ এক ধরনের অলঙ্কারও বটে।

আত্মপ্রত্যয়

বক্তৃতায় বক্তার আত্মপ্রত্যয় অপরিহার্য। নিজের প্রতি যদি সম্যক ধারণার প্রত্যয় না থাকে তবে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। নিজের অর্জিত জ্ঞান ও চিন্তা মিলিয়ে প্রত্যয়সৃজন একজন বক্তাকে প্রতিশ্রুতিশীল বক্তায় রূপান্তরিত করে। বিশ্বাস রাখতে হয় নিজের প্রতি। সমৃদ্ধ থাকতে হয় বিষয়গৌরবে। হালকা কথার উপর ভর করে আর যাই হোক প্রত্যয় নির্মিত হতে পারে না। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ও দর্শনের প্রগাঢ় জ্ঞান ব্যক্তিকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। বক্তার প্রত্যয় শ্রোতার উপর জারিত হয়। শ্রোতাগণ বক্তাকে যে গুণে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে তা হলো আত্মপ্রত্যয়। মঞ্চে বক্তৃতার কালে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠতে হয়।

শুদ্ধ উচ্চারণ

যত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই হোক না কেন বক্তৃতা যেহেতু বাচিক পরিবেশনা সেহেতু বক্তার উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পাওে উচ্চারণের অশুদ্ধতার কারণে। ভুল উচ্চারণের কারণে শব্দ ও বাক্যেও অর্থ পাল্টে যাবার সম্ভাবনা থাকে তেমনি শ্রোতার তা বোধগম্যতার বাইরেও চলে যেতে পারে। বিরক্তির উদ্রেক হতে পাওে এবং আয়োজকসহ সবাই হয়ে উঠবে প্রশ্নবিদ্ধ। ইতিহাসের পাতায় যারা বাগ্মী বলে সবিশেষ পরিচিত তারা সকলেই শুদ্ধ উচ্চারণে পারঙ্গম। কথায় যেন মুক্তা ঝরে। মঞ্চে অবশ্যই সর্বজনমান্য শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা উচিত। বক্তৃতার শিল্প-পরিচয়ে শুদ্ধ উচ্চারণ অপরিহার্য।

ভাষার গাঁথুনি

চমৎকার ভাষা-প্রয়োগ করে বক্তৃতা উপস্থাপন করতে হয়। নানা শব্দের প্রতিশব্দ ও সমার্থক জানা সেক্ষেত্রে জরুরি। যার শব্দভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ তিনি ততবেশি বাকপটু। শব্দের মালা গেঁথেই যেহেতু বাক্যের নির্মাণ সেহেতু গাঁথুনি হতে হয় মজবুত। বক্তৃতায় আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা মেনে চলতে হয়। এ তিনের

সমন্বয়ে শব্দের যথার্থ প্রয়োগে যে ভাষার গাঁথুনি শ্রোতার সামনে পরিবেশিত হয় তা হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। এলোমেলো শব্দভাণ্ডারে অগোছালো বাক্যে পরিবেশিত গতানুগতিক বক্তৃতা কোনো আয়ু পায় না। অসম্ভব ভালো বক্তব্য শ্রুতিকটু হলে তা বক্তৃতার সঙ্গে যায় না। পরিবেশনাশিল্পে শ্রুতিমধুরতাও বিচার্য।

তথ্যযোগ ও সহজবোধ্যতা

গতানুগতিক বক্তৃতা মানুষ প্রত্যাশা করে না। বক্তৃতায় বাড়তি কিছুর যোগ প্রত্যাশা করে শ্রোতা। সুতরাং প্রাসঙ্গিক তথ্য যুক্ত করে বক্তৃতার বস্তুনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা জরুরি। তথ্য একটি প্রামাণিক ব্যাপার। তথ্য যুক্ত হলে বক্তব্যের ভর বাড়ে। একইসঙ্গে সতর্ক থাকতে হয় তা যেন দুর্বোধ্য না হয়ে ওঠে। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা দাবি করে বক্তৃতা স্বয়ং। শ্রোতার সঙ্গে কোনোরূপ প্রতারণা না করে তথ্যযোগে তা সহজ করে পরিবেশন করা বাঞ্ছনীয়। তথ্য যেমন নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায় সহজবোধ্যতা তেমনি প্রিয়তা বাড়ায়। বক্তৃতায় দুইয়েরই মনিকাঞ্চন যোগ থাকা চাই।

হিউমার-উইট ও গল্পযোগ

শ্রোতার যাতে কোনো ক্লান্তি না আসে সেদিকে নজর রাখতে হয় একজন সুবক্তাকে। মূল বক্তৃতার অভ্যন্তরে প্রসঙ্গ বুঝে হিউমার বা উইটের ব্যবহার কিংবা সপ্রসঙ্গঁ কোনো মজাদার গল্প বক্তৃতাকে সমৃদ্ধ করে। জ্ঞানগর্ভ কথা একটানা কখনো কখনো ভালো নাও লাগতে পারে। শ্রোতাকে সে সুযোগ না দিয়ে একজন আদর্শ সুবক্তা সুযোগ বুঝে একটু ভিন্নস্বাদে পরিভ্রমণ করাতে সক্ষম হন। বক্তৃতা রসপূর্ণ হয়ে ওঠে হিউমার-উইট ও গল্পযোগে।

শ্রোতা-বক্তা যোগসূত্র

বক্তৃতায় আবশ্যিক ভূমিকায় রয়েছে শ্রোতা-বক্তা যোগসূত্র। বক্তা বলবেন শ্রোতা শুনবেন। কমিউনিকেটিভ আর্ট হিসেবে শ্রোতাদের সম্পৃক্ত করে বক্তৃতা উপস্থাপন করা শ্রেয়। অর্থাৎ উদ্দিষ্ট শ্রোতার মর্যাদাগুণকে বাড়িয়ে বক্তা যদি বক্তব্য উপস্থাপন করেন তবে শ্রোতা যেমন নিজেকে মূল্যবান মনে করেন তেমনি বক্তাও ধন্য হতে পারেন। বক্তৃতাকালে শ্রোতার উচিত বক্তাকে সাহায্য করা আর বক্তার উচিত শ্রোতার পিপাসা নিবৃত্ত করা। উভয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বক্তৃতার সুতায় রাখিবন্ধন হওয়া উচিত। অবশ্য বক্তার পরিবেশনার স্বাতন্ত্র্য সেটাকে নিশ্চিত করবে। বক্তৃতা দ্বিপাক্ষিক। অপর পক্ষকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলে এ পরিবেশনাশিল্পের পূর্ণতা আসতে পারে।

আবেগময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপন

বক্তৃতা সবসময় যুক্তিনির্ভর ও ভাবগম্ভীর হতে হয় না। আবেগ দিয়েও কখনো কখনো পরিবেশ তৈরি করতে হয়। শুধু তাই নয় গল্প, কবিতা, উদ্ধৃতি, যুক্তি ইত্যাদির সংযোগে বৈচিত্র্যময়ও করে তুলতে হয়। পরিবেশনায় যত বেশি ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায় ততই তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। টক-ঝাল-মিষ্টির মতোই বৈচিত্র্য প্রয়োজন হয়। ভেতরের আবেগ যদি অভিব্যক্তি সহকারে প্রকাশিত হয় তা একধরনের বৈচিত্র্য আনে বৈকি। বক্তার আবেগ প্রকাশে পরিবেশনা হতে হয় নিখুঁত যাতে করে শ্রোতা সমান আবেগে জারিত হয়। কখনো হাস্যরসে আর কখনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা প্রয়োগ করেও বৈচিত্র্য আনয়ন করা যায়। নিশ্চয় পরিবেশনার বৈচিত্র্য আর আবেগের মিশ্রণে বক্তৃতা প্রাণপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সমকালীন- ইতিবাচকতা

বক্তৃতায় সমকালীন বিষয় উদাহরণরূপে যুক্ত হতে হয়। কেননা সাম্প্রতিকতার যোগে শ্রোতা দ্রুত সংযোগ স্থাপন করতে পারে। অতীত কোনো উদাহরণের চেয়ে সমকালীন কোনো উদাহরণ অধিক গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। সম্ভব হলে সবচেয়ে নিকট উদারহণ যুক্ত করে তা উপস্থাপন করা উচিত। কেননা কেবলই ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে বক্তৃতাকে মিলিয়ে নেয় যায় তাড়াতাড়ি। তখন তা যুগোপযোগী বক্তৃতায় রূপান্তরিত হয়।

একইসঙ্গে বক্তাকে মনে রাখতে হয় যে, পরিসমাপ্তি যেন নেতিবাচক না হয়। অর্থাৎ বক্তৃতার বিষয়বিশ্লেষণ সমাজ ও রাষ্ট্রে এমনকি ব্যক্তিজীবনেও যেন কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। একটি বক্তৃতা মানুষের নানা প্রশ্ন থেকে উত্তরণের একটি ধাপ বটে। যুক্তিনিষ্ঠ এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বক্তৃতাকে গ্রহণীয় করে তুলতে সহায়ক হয়। একদিকে যেমন সর্বশেষ তথ্য যোগ করবার বিষয় থাকে ঠিক তেমনি বক্তৃতার দর্শনও হতে হয় ইতিবাচক।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চমক

বক্তৃতা পরিবেশনকারীকে বক্তা বলা হয়। অসাধারণ বক্তাকে বলা হয় বাগ্মী। এ বাগ্মিতার অন্তরালে বক্তার যেসব বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল থাকে তন্মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চমক সৃষ্টির ক্ষমতা অনিবার্য। বাচিকের সব দিক মান্য করেও অনেকেই সুবক্তা কিংবা বাগ্মী হতে পারেন না এ দুয়ের অভাবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি, আয়োজকদের দাবি, শ্রোতার প্রত্যাশা, উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা, শ্রোতাকে বিমোহিত করার ক্ষেত্রে এ দুটি বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কখনো কখনো শ্রোতার প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। তাৎক্ষণিক বুদ্ধি খাটিয়ে বক্তা সে উত্তর প্রদান করেন। অবশ্যই বক্তৃতার শুরু ও শেষটায় এক ধরনের চমক সৃষ্টি করতে হয়। শুরুটা যদি তেমন হয় তো শ্রোতা সে চমকটির জন্য অপেক্ষা করেন। বক্তৃতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে বক্তাকে এটাও স্থির করে নিতে হয় যে, বক্তৃতার ভূমিকাপর্ব কতখানি, মূলপর্ব কতখানি আর সমাপনী পর্ব কতখানি হবে। অনেকেই বলেন ভূমিকা হওয়া উচিত শতকরা পঁচিশ ভাগ, মূলপর্ব হওয়া উচিত পঞ্চাশ ভাগ আর সমাপনীপর্ব হওয়া উচিত পঁচিশ ভাগ। এটি একটি সাধারণ ধারণা। বরং পরিস্থিতি বুঝে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে ভাবনাকে সম্পাদনা করে বক্তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে হ্যাঁ কোনো অবস্থাতেই যেন ভূমিকা ও সমাপনী কথা মূলের চেয়ে বেশি না হয়ে যায়। শুরু ও শেষ যদি শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ হয় সেই বরং ভালো। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও চমক দিয়ে শ্রোতাকে ধরে রাখতে পারলে বক্তা যেমন জিতে যায় বক্তৃতাটাও তেমনি হয়ে ওঠে ফলপ্রসূ।

উপসংহার

বক্তৃতা— স্বতন্ত্র উপস্থাপনা-গুণের কারণে হয়ে উঠেছে শিল্প। একজন সুবক্তা তার মগজ ও মননের সমন্বয়ে বাচিক পরিবেশনারূপে তা প্রতিষ্ঠিত করেন। বক্তৃতা— একটি পারফরমিং আর্টস। বহু নিয়মের শাসনে থেকেও আপনরূপে তা মানুষকে জয় করতে শিখেছে। একমাত্র পরিবেশনার কারণেই শিল্পরূপে তা আপন পরিচয় নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশে বক্তৃতার সম্ভাবনা পেশাদারিত্বের দিকে ধাবিত হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ আলোচনায় শুধু মঞ্চবক্তৃতা আলোচিত হলেও জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পৃথ্বীরাজ সেনের কথার সমর্থনে উপসংহারে একথা বলা সঙ্গত যে-

> ভাষণ মানে শুধু জনসমক্ষে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করা নয়, ভালো সেলসম্যান হতে গেলে আপনাকে বক্তৃতা দেবার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। অনেকে বলে থাকেন যে, সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে হলেও আপনাকে ভালোভাবে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে হবে। অর্থাৎ জীবনের প্রতি মুহূর্তে আপনাকে বক্তা হিসেবে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হয়। কখনও আপনার উপর হাজার মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, আবার কখনও শুধু একটি মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য আপনি ভাষণ দান করেন। তাই ভাষণ অর্থে আমরা শুধু বৃহত্তর পটভূমিকার কথা ভাবব না। প্রতিনিয়ত প্রতিদিন আমাদের যে অসংখ্য ভাষণ দিতে হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। তাই ভাষণদানের গুরুত্ব মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করতে পারছে।[১৪]

এবং বক্তৃতা পেয়েছে স্বতন্ত্র পরিবেশনাশিল্পের পরিচয়।

তথ্যনির্দেশ

[১]. ড. নীরদবরণ হাজরা, *ভাষণ কোষ*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা ৩

[২]. উদ্ধৃত, Richard Schechner, *Performance Studies An introduction*, (London and New York : Routledge, 2003), Page 23

[৩]. মোহাম্মদ বশীরউদ্দীন, *সুবক্তা হওয়ার কৌশল*, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ১৫

[৪]. শিমুল পারভীন, *বাচিক শিল্পের প্রথম পাঠ*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১১), পৃষ্ঠা ৪৯

[৫]. শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙালির বাক্-শিল্পচর্চা*, (হুগলী: মৃন্ময়ী প্রকাশনী ১৯৯৯) পৃষ্ঠা ৮

[৬]. ড. নীরদবরণ হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭

[৭]. রবিশঙ্কর মৈত্রী, *সুন্দর কথা বলবেন কীভাবে*, (ঢাকা: শব্দশৈলী, ২০১৩), পৃষ্ঠা ১১

[৮]. ড. নীরদবরণ হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩

[৯]. রবিশঙ্কর মৈত্রী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫

[১০]. উদ্ধৃত, অন্বেষা আচার্য, "বাচিক শিল্পে পোশাক", *কাব্যপথিক* , প্রীতিশেখর সম্পাদিত, (কলকাতা: কাব্যপথিক ২০১৫) পৃষ্ঠা ১২৬

[১১]. ড. নীরদবরণ হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১

[১২]. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৪

[১৩]. জগন্নাথ বসু, "মাইক্রোফোন ও তার ব্যবহার", *কাব্যপথিক* , প্রীতিশেখর সম্পাদিত, (কলকাতা: কাব্যপথিক ২০১৫) পৃষ্ঠা ৯১

[১৪]. পৃথ্বীরাজ সেন, *মঞ্চ সঞ্চালন ও বক্তৃতা রাখার পদ্ধতি*, (কলিকাতা: লতিকা প্রকাশনী, ২০১৬) পৃষ্ঠা ৫৭

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

বাংলা উপন্যাসে চরদখল প্রসঙ্গ (১৯৪০-১৯৮৮)

মুহম্মদ আলমগীর পিএইচডি*

Abstract : The article is a modest attempt to discuss the rising and development of the newly created chars, the role of the government in occupaing the chars and the different groups related to this occupation, the process of occupaing the chars and keeping them under control, as they are found in the Bengali novels. Moreover, along with the occupation of the chars, the struggle of the brave people of Bengal and many other things like these as reflected in the Bengali novels have influenced the people of Bengal who are dependent on the rivers for their livelihood in many ways. Rivers and river-affected people's life sketches are widely available in Bengali novels. One of the major reasons of this reality is erosion of these rivers and newly risen chars on it. Newly risen char grabbing activities have added different distinctions to the novel. Clashes for possession of chars, behavior of administration and power practice are vividly presented in this article.

ভূমিকা

বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশ নিয়ে গঠিত বাংলা অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গকিলোমিটার। নদীমাতৃক বাংলার মানুষের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ নদী। কাজেই নদী ছাড়া বাংলার মানুষের জীবন অর্থহীন। বাংলা উপন্যাসে এই নদী ও নদীনির্ভর জনজীবনের প্রতিফলন ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আর এই নদীনির্ভর জনজীবনের অন্যতম প্রধান অনুঘটক চরদখল। চরদখলজনিত সংঘাত বাংলা উপন্যাসকে একটি ভিন্নমাত্রা দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসে বাংলার চর জীবনের মূল অনুষঙ্গ–চরদখল, ফসলসহ বাড়িঘর লুটপাট, মারামারি ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।[১] কিন্তু বাংলার চরদখলের কূটকৌশল, পেশাদারিত্ব অর্থাৎ সামগ্রিক ব্যঞ্জনা এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) 'কালিন্দী' (১৯৪০) উপন্যাসে চরদখলের ক্ষেত্রে বাংলার জনজীবনের গন্ধ অনেকটাই উপস্থিত। সংগত কারণে এই প্রবন্ধের পরিধি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) 'কালিন্দী' থেকে দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-) 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী', হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) 'নদী ও নারী' (১৯৪৫), অমরেন্দ্র ঘোষের (১৯০৭-১৯৬২) 'চরকাশেম' (১৯৪৭), কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদের (১৯২১-১৯৭৫) 'চর-ভাঙ্গা চর' (১৯৫১), অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), অবিনাশ সাহার 'প্রাণগঙ্গা' (১৯৫৭), কাজী মাসুমের (১৯২০-?) 'ঢেউ জাগে পদ্মায়' (১৯৫৮), সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) 'এ কূল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে' (১৯৭১), আবুল বাশারের (১৯৫১-?) 'ভোরের প্রসূতি' (১৯৮১), জয়ন্ত জোয়ারদারের 'ভূতনি দিয়ারা' (১৯৮২), আবুল খায়ের মুসলেহ্‌ উদ্দিনের 'চর আতরজান' (১৯৮৫), আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬), দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-) 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) ইত্যাদি উপন্যাসে চরদখল ও সংশ্লিষ্ট বিষয় লক্ষ করা যায়।

বাংলা উপন্যাসের উক্ত প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধিৎসু মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন- বাংলার মানুষ চর জাগার খরব কীভাবে পেয়ে থাকে? চরের দখল প্রক্রিয়ার সঙ্গে পেশাদারিত্ব কতটা

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পর্কিত? চর দখলের সঙ্গে প্রশাসন কতটা এবং কীভাবে জড়িত? চর দখলের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অর্থাৎ পুলিশের ভূমিকা কী? চরের দখল বজায় রাখার পন্থা কী? চরদখল প্রক্রিয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ইত্যাদি। বাংলা উপন্যাসের গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সার্বিক কোনো পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয় না। সংগত কারণে বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে এবং বাংলা উপন্যাসে যেহেতু বাংলার সমাজমানসের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী—সেহেতু বাংলা উপন্যাসের নিবিড় পঠন-পাঠন ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

চরদখল প্রক্রিয়া

বাংলার নদ-নদীর ভাঙা-গড়ার নিত্য বহমান খেলা বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। চরের ভাঙা-গড়া যেন পানি আর মাটির চুক্তি। সেই চুক্তি অনুযায়ী নদী তার বুকে চরের স্থায়িত্ব কিছুদিনের জন্য মেনে নেয় এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্র সেই চরকে তার বুকে টেনে নেয়। সংগত কারণে চরের বসত প্রায় স্থায়ী হতে পারে না। চরে বসত নিয়ে তাই প্রবাদ রয়েছে– 'চরের বাড়ি মাটির হাঁড়ি, আয়ু তার দিন চারি।'[২] তাই এখনো বছরে বা দুএক বছরে দুএকবার মানুষ আর নদীর দখলের লড়াই চলে।[৩] কোনো কোনো উপন্যাসে দেখা যায় ভাঙন কবলিত মানুষ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদীর বুকে চর দেখতে চায়। কিন্তু চাইলে তো আর হবে না– তাই তারা স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করে– মানত করে– মৌলভী ডেকে কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করে।[৪] নদীর সঙ্গে বসবাসকারী মানুষ স্রোতের গতিবিধি লক্ষ করেই প্রথমত চরের অস্তিত্ব টের পায়– যে চর তখনো পর্যন্ত পানির ওপর থেকে দেখা যায় না।[৫] নতুন চর জাগলে যারা আগে টের পায় তারাই দখল করে নেয় বলে চর জেগে ওঠার কথা যতটা গোপন রাখা যায় ততটাই মঙ্গল। নদী তীরের মানুষ জানে নদীতে চর জাগলে আর তা জানাজানি হলে ক্ষতি হয়।[৬] 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে ফজল নদীর বুকে বক বসা দেখে চরের অস্তিত্ব টের পায় এবং অন্য কেউ যেন তা বুঝতে না পারে সেজন্য বক তাড়িয়ে দেয়। ফজল তার শ্বশুরবাড়িতে ভাইপো নূরুকে পাঠানোর সময় স্মরণ করিয়ে দেয় নূরু যেন চর জাগার কথা কোথাও না বলে। চর জাগার কথা ফজল তার বাবা ইরফান মাতব্বরকে জানালে মাতব্বর অন্যদের কানে কানে চর জাগার কথা জানিয়ে দিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে সাবধান করে সে যেন ঢোলে বাড়ি না দেয়।[৭]

দেশের ভূমি সংক্রান্ত কাগজাদি ও আইনে জমির নির্দিষ্ট সীমা আছে। তাই জমির ওপর পানি থাকলেও জমির সীমানা নির্দিষ্টই থাকে– নড়চড় হয় না। উক্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্ষমতাধরেরা তাদের জমি নদীর পানির তলায় চলে গেলেও দখল ধরে রাখতে চেষ্টা করে। চর পড়ার প্রথম দিকে চরের জমির ওপর সরকারের সাধারণ আইনকানুন খাটে না।[৮] কাজেই প্রাথমিকভাবে চরের জমির কোনো মালিক নেই– তা স্রষ্টার জমি এবং যে আগে যতটা দখল নিতে পারবে ততটাই তার জমি।[৯] 'কালিন্দী' উপন্যাসে দেখা যায় নতুন চর দেখা দিলে বেশ কয়েকপক্ষ চর দাবি করে এবং প্রত্যেকেরই দাবির পক্ষে কোনো না কোনো যুক্তি থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রায় সমান শক্তির দুটি পক্ষ তাদের দাবির পক্ষে অনড় থাকে এবং অন্যরা সুযোগমতো ঐ দুই পক্ষের যে কোনো একদিকে যোগদান করে। এক পক্ষ আইনের আশ্রয় নিতে চাইলেও অন্য পক্ষ 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের' আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করে লাঠির সাহায্যে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মারামারির এক পর্যায়ে প্রশাসনের হাতে দুদলই ধরা পড়ে এবং অর্থের প্রাচুর্যে ও তদ্বিরের কারিশমায় বিচারের রায় সেই পক্ষের অনুকূলে যায়– যারা অন্যায়কারী ও চরের অবৈধ দাবিদার।[১০] 'নদী ও নারী' উপন্যাসে দেখা যায় বিস্তৃত চরে জমির প্রাচুর্য থাকলে সমঝোতার ভিত্তিতে চর ভাগ হয়– যদিও কোনো কোনো প্রভাবশালী এককভাবে চরের দখল নিতে চায় এ কারণে যে নতুন চরের দাবি ছেড়ে দিলে প্রতিপক্ষ তাকে দুর্বল মনে করে তার ভাগের পুরনো চরও দখলে নিতে চাইবে। অন্যদিকে চাষ অযোগ্য চর নিয়ে কোনো বিবাদই হয়

না। বরং জমিদার প্রথম বছরের খাজনা মাফসহ আবাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রজাকে দিয়ে থাকে– পরের বছর থেকে খাজনা আদায় হয়।[১১]

ক্ষেত্র বিশেষে পূর্ব পুরুষের কাগজপত্রের জোরে উত্তর পুরুষ জেগে ওঠা চরের মালিকানা লাভ করে।[১২] অনেক সময় দূরবর্তী ও দুর্গমচরের জমি সমঝোতার ভিত্তিতেই ভাগ করা হয়।[১৩] যে নদীতে ভাঙা-গড়া স্বাভাবিক নয়– সে নদীতে চর জাগলে অল্প মারামারিতেই চর দুদলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।[১৪] কিন্তু যে সকল নদীতে নিত্য ভাঙা-গড়া চলে সে সকল নদীর জেগে ওঠা চর নিয়ে বিবাদ চরমে পৌঁছে– যা বংশানুক্রমে চলতে থাকে এবং রক্তপাত এমনকি খুন-জখম ছাড়া জমির দখল নেওয়া যায় না।[১৫] বাংলা উপন্যাসে চরের জমি সম্পর্কে তাই বলা হয়ে থাকে–

> মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের।[১৬]
>
> সর্বনাশা চর। উহার বুকের মধ্যে কোথাও যেন লুকাইয়া আছে রক্তবিপ্লবের বীজ।[১৭]
>
> পদ্মার বুকে চর। নূতন স্বপ্ন নয়– নূতন আশাও নয়– পদ্মার বুকে পাপ দেখা দিয়াছে।[১৮]
>
> চরের জমি গোলমালের বাসা।[১৯]
>
> লাড়ি যার মাড়ি তার।[২০]
>
> লাঠির জোরে মাটিরে ভাই/লাঠির জোরে মাটি/লাঠালাঠি কাটাকাটি/আদালতে হাঁটাহাঁটি/এই না হলে চরের মাটি/হয় কবে খাটিরে।[২১]
>
> জোর যার চর তার/জোর কার, চর কার?/হাতিয়ার সাথী যার।[২২]

সংগত কারণে চরাঞ্চলে সম্পত্তি রাখতে হয় লাঠির জোরে।[২৩] অর্থ ও ক্ষমতার জোরের সঙ্গে প্রশাসন যন্ত্রের সহযোগিতা যে লাভ করে সেই শেষ পর্যন্ত চরের দখল নিতে পারে। এক্ষেত্রে মহাজনেরা অনেক সময় কিছু সুবিধা পায়– চরের লোকজন মহাজনের খাতক বলে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না।[২৪] এজন্য বলা হয়েছে নতুন চরের মানুষ মহাজনের খাতক হলে অবশেষে চর হাতছাড়া হয়।[২৫] চর দখলের পর সামনে থাকে দুটো কাজ– চরের দখল বজায় রাখা এবং জমিদারকে খাজনা দিয়ে দখল আইনসিদ্ধ করা।

চরদখল ও সংঘাত

বাংলার চর দখলের ক্ষেত্রে সংঘাত অনিবার্য। সত্যেন সেনের 'একূল ভাঙে ওকূল গড়ে' ও আবু ইসহাকের 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে চরদখল প্রক্রিয়ার বিস্তারিত চালচিত্র পাওয়া যায়। 'একূল ভাঙে ওকূল গড়ে' উপন্যাসে সাধারণ চাষী কেবল বাধ্য হয়েই মামলা করে না– কখনো কখনো 'গায়ের ঝাল' মেটানোর জন্যও মামলা করে। আবার মারামারির সময় প্রবল প্রতিপক্ষ না থাকলে মারামারি করে সুখ পাওয়া যায় না– জয়ের আনন্দ পানসে হয়ে যায়।[২৬]

'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' উপন্যাসে দেখা যায় কালী নদীর একপারের মিঠাপুকুর, হাড়িদিয়া ও চরহায়দ্রাবাদের লোকের সঙ্গে চর নিয়ে কালী নদীর অপর পারের কনকসার গ্রামের লোকদের সংঘাত চলে আসছে বহুদিন। চরের জমি পালাক্রমে উভয় পারের মানুষের কাছে হাতবদল হয়। গত মারামারিতে কনকসারের মানুষ চরদখল নিয়েছিল। এবার প্রতিপক্ষ তিন গ্রামের মানুষ সংগঠিত হয়ে এক সপ্তাহ সময় দিয়ে শিঙা ফুঁকে বুধবার চরদখলের ঘোষণা দেয়– কারণ তারা চোর বা ডাকাত নয়– কাজেই বীরদর্পে এক সপ্তাহ আগেই দখলের তারিখ ঘোষণা করে। কনকসারের মানুষ পুরাতন অস্ত্রগুলি 'সারাই, ঝালাই, ঘসাই, মাজাই' করে ব্যবহার উপযোগী করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অস্ত্র-শস্ত্র আমদানি করে। কনকসারের অস্ত্র মেরামতরত বুড়ো কামার হরলাল বহুদিন পর মনের মতো কাজ পেয়ে খুশি হয়। তার জবানিতে জানা যায় যে, ইদানীং আইন আদালতের মাধ্যমে জমির দখল বা ভাগাভাগি হয় বলে মারামারি অনেক কমে গেছে। চর অঞ্চলের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো কোনো ব্যক্তি মারামারি সংক্রান্ত মামলা, হাজতবাস, জেল,

জরিমানা, মামলা চালাতে গিয়ে ভিটেমাটি হারিয়ে পথে বসা ইত্যাদি বিষয় অবগত করে প্রতিপক্ষদ্বয়কে মারামারি না করে আপোসে মীমাংসার কথা বললে তাকে শুনতে হয়–

> নদীভাঙ্গা চরের ব্যাপার হচ্ছে আলাদা। এখানে শালিসীও চলে না, মামলা মোকর্দমায়ও কাজ হয় না। এখানে গায়ের জোর থাকলে জমি তোমার, না থাকলে নয়। একথা গবর্ণমেন্টও বোঝে, জমীদারও বোঝে, চাষীরাও বোঝে। চিরদিনই এই নিয়ম চলে আসছে। যেখানকার যেই নিয়ম।[২৭]

কাজেই কালী নদী চিরদিন ভাঙবে এবং চিরদিনই নদীর দুপারের মানুষ চর নিয়ে মারামারি করবে। মারামারিতে থাকে তিনটি পক্ষ– যে দু'দল মারামারি করে তাদের সঙ্গে থাকে আরও একটি দল– দর্শক– যারা কেবল মজা দেখে। তাই মারামারির নির্ধারিত দিনে আশেপাশের বহুলোক লড়াই দেখতে জমা হয়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। দর্শকদের কাছে চর নিয়ে মারামারি একটা খেলা– যে খেলা তাদের একঘেয়ে জীবনে উত্তেজনা নিয়ে আসে এবং এই খেলায় দুএকটা লাশ যদি না পড়ে তবে খেলাকে আর খেলা মনে হয় না। মিঠাপুকুর ইত্যাদি গ্রামের ধনবল বেশি, অন্যদিকে কনকসারের জনবল বেশি। মিঠাপুকুরের মাতব্বররা জেলার বিখ্যাত লেঠেল রুস্তম সর্দার ও তার শিষ্য মন্নাফ সর্দারকে ভাড়া করে আনে– যে রুস্তম সর্দারের নামে জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কাহিনি ছড়িয়ে আছে। অবশ্য উক্ত খবরে কনকসারের মানুষ দমে যায় না। কারণ তারা বিশ্বাস করে ভাড়াটে লোক জীবনের মায়া ছেড়ে লড়াই করে না এবং মারামারির সময় প্রবল প্রতিপক্ষ না থাকলে মারামারি করাই বৃথা। শেষ পর্যন্ত রুস্তম সর্দার ও তার শিষ্য মন্নাফ সর্দারের অনুপস্থিতিতে কনকসার জয়ী হয়েছে। মারামারিতে কনকসারের দুজন ও প্রতিপক্ষের পাঁচজন জখম হয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছে– রুস্তম সর্দারের শিষ্য জব্বর সর্দার মারাত্মকভাবে জখম হয়ে কনকসারের মানুষের হাতে বন্দি হয়েছে। বন্দি অবস্থায় জব্বর সর্দারের মনে হয়েছে বন্দি হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশি শ্রেয়– তাতে অন্তত বীরের মর্যাদা থাকে।[২৮]

পরাজিত মিঠাপুকুরের দল শেষ পর্যন্ত রুস্তম সর্দার ও তার চাচাতো ভাই মন্নাফ সর্দারকে দলে ভিড়াতে পারে। চারপুরুষ ধরে লাঠিয়াল রুস্তম সর্দার টাকার প্রলোভনে নয়– মিঠাপুকুরে বাসরত তার ছেলেবেলার এক বন্ধুর কথায় দলভুক্ত হয়। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত রুস্তম সর্দারের জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ সে নিজে এবং তার চাচাতো ভাই মন্নাফ ছাড়া তার বংশে এখন কেউ আর লেঠেল নেই। এমনকি তার তিন ছেলেও তার লেখাপড়া জানা স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে লাঠিয়ালগিরির দিকে পা দেয়নি। অর্থাৎ তার নিজের জোয়ান ছেলেদের শরীরে রক্তের জোর নেই– ঠাণ্ডা ভদ্রলোক ছেলেরা লাঠালাঠি তো দূরের কথা শখ করেও লাঠি ধরতে আসে না। অথচ দূরবর্তী অঞ্চলের অনেকেই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সমগ্র জেলাময় তার সুনাম ছড়িয়েছে। কাজেই রুস্তম সর্দারের ভাষায় সে 'একটা ছেলেকেও মানুষ করে তুলতে পারল না।'[২৯]

যথারীতি প্রতিপক্ষদ্বয় সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেলো এবং রুস্তম সর্দারকে দেখে কনকসারের সামনের সারির পাঁচজন জোয়ান হাতের অস্ত্র মাটিতে রেখে সামনে নুয়ে পড়ে রুস্তম সর্দারকে সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সামনের সারির পাঁচ সাতজনের সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন দেখে কনকসারের বাকি লেঠেলরাও একইভাবে রুস্তম সর্দারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রুস্তম সর্দার আন্দাজ করে কনকসারের দলে তার সাক্ষাৎ শিষ্য কেউ না থাকলেও শিষ্যের শিষ্য দুএকজন নিশ্চয় আছে এবং সে অনুরূপ শ্রদ্ধা পেতে অভ্যস্ত। কনকসারে কয়েকজন ওস্তাদ রুস্তম সর্দারকে লড়াই থেকে সরে যাবার পরামর্শ দিলে তা কাজে আসে না। সুতরাং প্রথম দিকে কথা চালাচালি– তারপর খিস্তি খেউড় এবং শেষ পর্যায়ে তুমুল মারামারি। চর দখলের মারামারির অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী মন্নাফ সর্দার প্রতিপক্ষ কনকসারের লেঠেলদের নদীর পানিতে নামিয়ে দিয়ে জয়ী হতে চেয়েছে, কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। 'সাফল্যের আনন্দে আর উৎসাহের ঝোঁকে কিছুটা অসতর্ক' মন্নাফকে প্রতিপক্ষ ইনতাজ বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে ল্যাজার ঘায়ে ধরাশায়ী করে। মন্নাফ সর্দারকে ধরাশায়ী হতে দেখে স্নেহাধিক্যে রুস্তম সর্দার নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে সম্পূর্ণ বেখেয়াল হয়ে মন্নাফকে পাঁজাকোলা করে তুলে

আনতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বাচ্চুর সড়কির আঘাতে ধরাশায়ী হয় এবং আরও কয়েকজনের অস্ত্রের আঘাতে লেঠেলদের জীবন্ত কিংবদন্তি কেবল কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। মারামারি শেষে অকুস্থলে পুলিশের দ্রুত আগমনে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মারামারি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় পুলিশ কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয় ছিল। পুলিশ এসে পুলিশী তদন্ত শেষে চলেও যায়। অভিজ্ঞজন জানে– 'ওদের (পুলিশের) পেট ভরানো কি সহজ কথা'। তারা জানে মারামারির পরিবর্তে আইনের মাধ্যমে বা নিজেরাই সালিশ বসিয়ে গোলমাল মিটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু নিয়তি এই যে, কালী নদীর দুই পারের মানুষের মধ্যে যখন জমি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়– 'তখন তাদের মাথার সমস্ত খুন যেন কলজের মধ্যে এসে জড় হয়। তখন আর হিতাহিত বিবেচনা করবার সময় থাকে না।' কাজেই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে দখল– পাল্টা দখলের খেলা– যার সাক্ষী কালী নদী স্বয়ং।[৩০]

আবু ইসহাকের 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে নদীর বুকে বক বসে থাকতে দেখে ফজল চরের অস্তিত্ব টের পায় এবং সজাগ থাকে যেন অন্য কেউ চরের অস্তিত্ব টের না পায়। চর জাগার খবর পেয়েই এরফান মাতব্বর তার অসুস্থতা ভুলে গিয়ে হারানো যৌবন যেন ফিরে পায়। কারণ উক্ত চরের সঙ্গে এরফান মাতব্বরের হাহাকার জড়িয়ে আছে। এখন যেখানে চর উঠছে সেইখানে পূর্বে যে চর ছিল তার নাম ছিল 'খুনের চর'– তারও আগে 'চর লটাবনিয়া।' দশ বছর আগে 'চর লটাবনিয়া' এরফান মাতব্বরের দখলে ছিল। একটানা দুমাস ধরে পাহারা দিতে দিতে পাহারাদারদের মধ্যে অবহেলার ভাব এসে গিয়েছিল। বিপদের আশঙ্কা না থাকায় তারা অনেকেই 'ভাওর' ঘরে (পাহারার ঘর) বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার পেতেছিল। এমন সময় দীঘিরপারের হাটের দিন যখন সত্তরটি ভাওরঘরের প্রায় অর্ধেকের ঝাঁপ বন্ধ ছিল এবং যুবকেরা হাটে গিয়েছিল তখন চেরাগ আলী সর্দারের লোকজন আক্রমণ করে চর দখলে নেয়। এই সময় মারামারিতে এরফান মাতব্বরের ছেলে রশিদসহ তার দলের দুজন এবং প্রতিপক্ষের তিনজন খুন হয়– চরের নাম হয় 'খুনের চর।' চর দখলের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী দখলের সময় প্রতিপক্ষকে তাড়িয়ে দিয়ে চরদখল করতে হয়– নিতান্ত বাধ্য না হলে খুন-খারাপি হয় না। চর লটাবনিয়া দখলের সময় অলিখিত নিয়ম কাজ করেনি বলেই খুনের ঘটনা ঘটে এবং যথারীতি পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। পুলিশি তৎপরতায় উভয়পক্ষের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রতিপক্ষদ্বয় একটি চুক্তিতে আসে এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী চেরাগ আলী সর্দার চরের দখল ছেড়ে দেয়। এরফান মাতব্বরের দখলপ্রাপ্ত চর কিন্তু তিন বছর বেঁচেছিল। এখন সেই ভেঙ্গে যাওয়া চর পুনরায় জেগে উঠলে তা দখলের পরবর্তী কর্মপন্থাও এরফান মাতব্বর ঠিক করে ফেলে। ছেলে ফজলের মাধ্যমে নিজ দলের লোকজনের কানে কানে চর জাগার খবর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানানো হয় দুপুরের মধ্যে যার যার অস্ত্র নিয়ে মাতব্বরের উঠানে জমায়েত হতে হবে। দুপুরে লোকজন জমায়েত হবার পর নৌকা যোগে নতুন চরে উপস্থিত হয়ে চরের অবস্থান বুঝে নিয়ে লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এরফান মাতব্বর তার নিজের অবস্থান থেকে 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজ তুলতেই অন্যরা প্রতিধ্বনি করে। বার বার তিনবার আওয়াজ তোলার পর সকলে এক সঙ্গে 'বিসমিল্লাহ' বলে বাঁশ পুঁতে চরের দখল কায়েম করে– যা 'বাঁশগাড়ি' নামে পরিচিত।[৩১]

'বাঁশগাড়ি' করার পর খাজনা পাতি মিটিয়ে চরের দখল বজায় রাখার জন্য মাতব্বর তার পুলকি মাতব্বর ও কোল শরিকদের নিয়ে চর পাহারার ব্যবস্থা করে এবং নানা ভাবে তার মাতব্বরি ঠাঁট বজায় রাখতে চেষ্টা করে। এরফান মাতব্বর তার মাতব্বরি কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য যত দ্রুত সম্ভব চর দখলের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। উক্ত উপন্যাসে খুন ইত্যাদির অজুহাতে মা ছেলেকে চর দখলে যেতে বাধা দিলে মাতব্বর স্মরণ করিয়ে দেয় তার মৃত্যুর পর ছেলেকেই তো মাতব্বরি করতে হবে– কাজেই মাতব্বরের সন্তানকে মানুষের আগে আগেই চলতে হবে। নইলে 'বাঘের ঘরে মেকুর পয়দা' হয়েছে টিটকারি দিতে দিতে অনেকেই দল ছেড়ে চলে যাবে। চর দখলের পর ঠাঁট বজায় রাখতে গিয়ে এরফান মাতব্বরকে মহাজনের

দেনার কিস্তি শোধ করতে হয়, বন্ধক দেওয়া গয়নাপত্র ছাড়িয়ে আনতে হয়– পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন কাপড় কিনতে হয় এবং ঘাসি ও অন্যান্য নৌকাসহ অন্তত একটি পানসি নৌকা রাখতেই হয়।[৩২] নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সে ভাড়াটে লাঠিয়াল সংগ্রহ করে। ভাড়াটে লাঠিয়ালরা প্রতিপক্ষ না থাকায় চরে কাল্পনিক মারপিটের মহড়া দেয়। মাতব্বর ভাড়াটেদের চাকরি বজায় রাখার কৌশল বুঝতে পেরেও কিছু বলে না। কারণ প্রয়োজনের সময় লেঠেলদের উপস্থিতির মর্যাদা মাতব্বর জানে। অবশ্য কিছুদিন পর কৌশলে সর্দারের দৈনিক হাজিরা বাড়িয়ে সাধারণ লেঠেলদের অনেককে ছাঁটাই করা হয়।[৩৩]

ভাড়াটে লেঠেলদের জীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। নতুন চর জেগে উঠলে লেঠেলদের কদর অকস্মাৎ বেড়ে যায়।[৩৪] 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে জানা যায় যে অস্ত্র নিয়ে লেঠেলরা লড়াই করে কখনো কখনো সেই অস্ত্রের সঙ্গে তাদের নামকরণ হয়। যেমন রামদয়াল সর্দারের আসল নাম পাঁচকড়ি মণ্ডল। চর দখলের লড়াইয়ে তার দল রামদা নিয়ে লড়াই করে– রামদাওয়ালা সর্দারই ক্রমে লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে রামদয়াল সর্দার হয়েছে। এ পরিচিতি এতই ব্যাপক যে অন্যে দূরে থাক রামদয়াল সর্দার হয়ত নিজেই তার প্রকৃত নাম ভুলে গেছে। উক্ত রামদয়াল সর্দারের জবানিতে তৎকালীন ভাড়াটে লেঠেলদের অবস্থান বোঝা যায়। কিছুদিন পূর্বেও আশ্বিন- কার্তিক মাসে লেঠেলদের ব্যাপক কদর ছিল এবং হাত পা ধরে তাদেরকে ডাকা হয়েছে। সেই সময় তারা মেঘনা- আড়িয়ালখাঁ নদী তীরবর্তী বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, মেহেন্দীগঞ্জ, হিজলা ইত্যাদি স্থানে চর দখলে গিয়েছে। বর্তমানে তেমন কাজ নেই এবং যদিও বা দুএকটা কাজ পাওয়া যায়– পয়সার পরিমাণ অত্যন্ত কম। কাজেই তার দলের লেঠেলরা কেউ আসামে চলে গেছে। যারা দেশে আছে তাদের অনেকেই করাত, কুড়াল বা কোদালের কাজে; যুদ্ধে, নৌকায়, হাটে তরকারি কেনাবেচা ইত্যাদিতে যুক্ত রয়েছে।[৩৫]

চর দখলের ক্ষেত্রে এবার এরফান মাতব্বরের প্রবল প্রতিপক্ষ বালিগাঁয়ের জঙ্গুরুল্লা চৌধুরী– যে নিজেই চৌধুরী খেতাব নিয়েছে এবং এখনো যাকে আড়ালে আবডালে লোকে 'পা-না-ধোয়া' জঙ্গুরুল্লা বলে থাকে। বাপ-মা মরা জঙ্গুরুল্লা এ চরে ও চরে পেটের ধান্দায় ঘুরে ঘোপের চরে পৈতৃক ভিটেয় থিতু হবার সময় এক বিয়ের আসরে পা না ধুয়েই ময়লা পায়ে ফরাস নষ্ট করলে তার নাম হয়ে যায় 'পা-না-ধোয়া' জঙ্গুরুল্লা। পরে ঘড়িশার নায়েবের নেক নজরে পড়ে সে কাছারির পেয়াদার পদ লাভ করে এবং অল্প দিনের মধ্যে জমি-জমার সুলুক-সন্ধান জেনে যায়। আরও পরে সে বালিগাঁয়ে বাস করে টাকা-মাটি-লাঠির জোরে চর অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। এ হেন জঙ্গুরুল্লা এরফান মাতব্বর কর্তৃক দখলকৃত চর হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং চরের ধান যখন প্রায় পেকে উঠেছে তখনই কৌশলে জঙ্গুরুল্লার দলবল চরের দখল নেয়।[৩৬]

চর হারানোর শোকে এরফান মাতব্বর মারা যায়। জঙ্গুরুল্লার কৌশলে এরফান মাতব্বরের ছেলে ফজল ফেরারি হয় এবং অবশেষে ধরা পড়ে। হাজতখানায় স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে ফজলের দেখা হয় এবং তাদের সঙ্গে জেল ভেঙে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে সে আত্মসমর্পণ করে এবং ডাকাতির মামলায় খালাস পেলেও জেল ভেঙে পালানোর দায়ে তার তিন মাস জেল হয়। তিন মাস জেল হলেও ২৪ (চব্বিশ) দিন আগেই ফজল জেল থেকে ছাড়া পায়। ফজল ফেরারি অবস্থায় থাকাকালীন তার বাবা মারা যায় বলে সে বাবার শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারেনি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ফজল বাবার কবর জিয়ারত করে এবং মৃত বাবার উদ্দেশ্যে চর পুনর্দখলের প্রত্যয় ব্যক্ত করে।[৩৭] ফজলের হাজতবাস– জেল থেকে পলায়ন– পুনরায় জেল– এই চক্রকে কেন্দ্র করে জঙ্গুরুল্লা চর পাহারার ক্ষেত্রে পাহারাদারের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে। কাজেই ফজল নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই জেল থেকে যখন ছাড়া পায় তখন চরের পাহারা তেমন শক্তিশালী ছিল না। ইতোমধ্যে হাজতবাস কালে ফজল চর পুনর্দখলের বিষয়ে অনেক কিছু ভেবেছে। ফলে তার উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই সে তার সকল কৌশল প্রয়োগ করে দলবল নিয়ে রক্তপাত ছাড়াই চর পুনর্দখল করে। জঙ্গুরুল্লা নানা ফন্দি ফিকির করেও চরের দখল নিতে পারে না। ফলে

চর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তার সম্মানহানি হয়– জঙ্গুরুল্লার স্বনির্বাচিত 'চৌধুরী' খেতাবটি তার নামের সঙ্গে উচ্চারিত না হয়ে লোকে বরং 'পা-না-ধোয়া' বিশেষণটি তার নামে বেশি ব্যবহার করে। অন্যদিকে চর পুনর্দখলের পর ফজলের মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়।[৩৮]

চর দখলের পর আসে পাড়া বিন্যাসের প্রশ্ন। এটাই স্বাভাবিক যে যারা সম্মিলিতভাবে চরদখল করে তারা স্থায়ীভাবে অন্যকে জমি দেয় না। 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসে কয়েকজন 'পাতনা' ছেড়ে চরে আসতে চাইলে তাদের কেবল ঘরের/বাড়ির জায়গা দেওয়া হয়– তারা অন্নসংস্থান করবে মাছ ধরে বা অন্য কোনো কাজ করে।[৩৯] সাধারণত কাশ, ছন, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে চরে প্রথমে ছোট ছোট ঘর ওঠে। কৃচিৎ দু'একখানা টিনের ঘর। ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মীয় পরিচয়ে জমি ভাগ হয়।[৪০] আবার কর্ম অনুযায়ীও চরে পাড়া বিন্যাস হয়ে থাকে– গোয়ালপাড়া– শেখপাড়া– তাঁতি পাড়া– কাপালিক পাড়া ইত্যাদি।[৪১] কোনো কোনো চরে মোড়লদের নাম অনুযায়ী পাড়ার নাম হয়– মণ্ডলপাড়া– বিশ্বাসপাড়া– ফকির পাড়া– বৈরাগী পাড়া ইত্যাদি।[৪২] নতুন চরে বসত করার সূচনায় পূর্ব পুরুষকে অর্থাৎ ভাঙনের আগে ঐ স্থানে যারা বাস করত তাদের সালাম ও শ্রদ্ধা জানানো হয়– অনেকটা পূর্ব-পুরুষ পূজার মতো।[৪৩]

সীমান্ত বাংলার চরদখল

দুই বাংলার সীমান্ত সংলগ্ন চরাঞ্চলের চর দখলের ক্ষেত্রে ভিন্নমাত্রা লক্ষণীয়। আবুল বাশারের 'ভোরের প্রসূতি' উপন্যাসে দেখা যায় পদ্মার পশ্চিম তীরের ভারতীয় অংশের ফরিয়াদীর চরে আশ্রয় নেওয়া অধিকাংশ মানুষকে ফেরারি ও দাগি বলে মনে করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশের লোক। তাই জীবনের বাঁকে বাঁকে তাড়া খাওয়া চরের মানুষকে ঠিক মানুষ বলে গণ্য করে না অনেকেই। তাদের ভাষায়– চরের মানুষ দুনম্বরি– কাজেই তাদের কোনো সম্মান থাকতে পারে না। যদিও ফরিয়াদীর চরের সবাই যে দাগি তা নাও হতে পারে– তাদের অনেকেই হয়তো ভাগ্যের ফেরে নিতান্ত বাধ্য হয়েই চরে আশ্রয় নিয়েছে।[৪৪]

চরের 'খাস্তা নাস্তা' জমি পদ্মায় খায় মানুষেও খায় বটে কিন্তু চরের জমির কড়াকড়ি হিসাব চরের মহাজন মাতব্বরদের কাছে থাকে। সীমান্ত অঞ্চল বলে জমির কাগজপত্রে প্রচুর ফাঁকফোকর থাকলেও মহাজন মাতব্বররা সেই ফাঁক ফোকরের কোনো সুযোগ অন্যকে দিতে নারাজ। তারা সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে চরে আসা মানুষকে ঘর তুলতে দেয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধানও করে– জীবন যেন সেখানে গেঁড়ে না বসে। অথচ নিঃসন্দেহে জমি আজকের শ্রমজীবী মানুষের পূর্ব-পুরুষের—যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চাষ অযোগ্য জমিকে চাষের আওতায় এনেছে। সুতরাং সাধারণভাবে মনে হতে পারে 'ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে, এই অধিকার ভূমিহীনদের পূর্ব-পুরুষের অধিকার।'[৪৫]

'ভূতনি দিয়ারা' উপন্যাসে ভারতবর্ষ ভাগের (১৯৪৭) পর ভারত থেকে জমিদারি প্রথা উঠে গেলেও পাকে প্রকারান্তরে প্রাক্তন জমিদারের বংশধররাই জমির মালিক থেকে যায়। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না নদী সংলগ্ন জমি সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত। কেননা যে জমিদারকে দেশভাগের পূর্বে খাজনা দেওয়া হয়েছে– দেশভাগের পর সেই জমিদারকেই ফসলের অর্ধেক দিতে হয় অর্থাৎ সাধারণ মানুষ প্রজা থেকে আধিয়ারে রূপান্তরিত হয়। 'কিষাণ সভা'র সদস্যদের মাধ্যমে খাস জমির বিষয়টি পরিষ্কার হলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধে এবং নানা ঝামেলার পর কিছু জমি সাধারণ মানুষের হস্তগত হয়। কিন্তু অই পর্যন্তই। জনগণ জমিদারের প্রজার বদলে ভারতের নাগরিক হয়– কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হলেও নাগরিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। কেননা সরকার বদলে গেলেও 'পুলিশ বদলায় না, আমলা বদলায় না, আইন কোর্ট বদলায় না।' তার পরেও যথার্থ স্বাধিকার পাওয়া ও নিজ অধিকার সংরক্ষণের জন্য মানুষকে লড়াই বা সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হয়।[৪৬]

মহাজন ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ সীমান্তবর্তী চরে বাইরে থেকে আসা কাউকে স্থায়ী হতে দিতে চায় না– তারা চায় দুনম্বরি ব্যবসার স্বার্থে যারা চরে আসে তারা ব্যবসার কোনো এক পর্যায়ে যেন চর ছেড়ে চলে যায়। শোষণের প্রায় সবগুলো পদ্ধতি প্রয়োগ করে মহাজন ভাসমান মানুষকে শোষণ করে। এমন মহাজনকে রাজনৈতিক পার্টির লোকজন পর্যন্ত সমীহ করে চলে কেননা তারা জানে মহাজন এমনকি পুরো চর উচ্ছেদ করে দিতে পারে। সংগত কারণে মহাজনের শোষণ ও দাপট নিয়ে সীমান্তবর্তী চরাঞ্চলে পয়ার রচিত হয়েছে।[৪৭]

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন চরের ভাসমান মানুষদের নাগরিকত্বের সুবিধা ও সংকট উভয়ই রয়েছে। নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে তাদের সুবিধা এই যে, তারা যখন তখন বাংলাদেশ ও ভারত দুটি দেশেরই নাগরিকত্ব লাভ করে। নাগরিকত্বের বিষয়টি ভোটের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাজনৈতিক দল মনে করে লোকটি যেই হোক না কেন– ভোটার তালিকায় তার নাম তুলে একখানা রেশন কার্ড তার হাতে ধরিয়ে দিতে পারলেই ভোটটি তার দলের প্রতীকে যাবে। সুতরাং দলের লোকজন চরের মানুষকে পত্তনির লোভের ফাঁদে ফেলে– ফরিয়াদীর চরকে ভারতের মানচিত্রে স্থান দেওয়ার কথা বলে তাদের নিজ দলের পতাকাতলে টানার চেষ্টা করে। চরের অনেকের মধ্যে নাগরিকত্ব নিয়ে কোনো কৌতূহল না থাকলেও ভোটের বিষয়ে একধরনের ইতিবাচক মনোভব গড়ে ওঠে– কেউ কেউ ভোটকে কেন্দ্র করেই চরে স্থায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ভোটার তালিকায় নাম ওঠার পর কেউ কেউ দুদেশের নাগরিক হয়ে যায় যদিও মহাজনের পরামর্শ ছাড়া নতুন ভোটার ভোট দিতে পারে না। সুতরাং দলের নেতৃবর্গ চরের মহাজনকে হাতে রেখেই ক্ষমতারোহণের ব্যবস্থা পাকা করে, যদিও তখনো তাদের মুখে থাকে চরকে ভারতের মানচিত্রে স্থায়ী করার ঘোষণা। ভোট হয়– দলের প্রতিনিধি কলকাতায় যায়– নেতাদের চালচলনের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতাসীন দলের নেতা যে নারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার শয্যায় নিয়মিত ছিল সেই নারীকে বিয়ে করতে এই বলে এড়িয়ে যায় যে– বিয়েতে দলের নেতৃবর্গের মতামত লাগবে। ফলে সেই নারীকে সিফিলিসের ইঞ্জেকশন পুনরায় নিতে হয়। আর একদা প্রেমিক দেড়পেয়ে পঙ্গু নেতা ক্ষমতায় গিয়ে মন্ত্রী হয়ে চিকিৎসা করে দুপায়ে উঠে দাঁড়ায় এবং বুর্জোয়া ও প্রতিপক্ষের পত্রপত্রিকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মন্ত্রীর চিকিৎসার খরচ নিয়ে শোরগোল তোলে।[৪৮]

যারা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় দেশের নাগরিক তাদের নাগরিকত্বের সংকটের মূলে রয়েছে উচ্ছেদ। ভোটের রাজনীতিতে মহাজনকে দলের লোক এ কারণে হাতে রাখে যে তাকে চটালে সে কোনো সময় চর উচ্ছেদ করে দিতে পারে। ভোটের পর জয়ী পক্ষের মহাজন চর উচ্ছেদ না করলেও কখনো কখনো পরাজিত পক্ষের মহাজন চর গুড়িয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে জয়ী পক্ষের পঞ্চায়েত বা দলের ছোটখাট নেতাসহ মন্ত্রী পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ করে না। ফলে চরের অস্থায়ী নিবাসের সদ্য ভোটার হওয়া লোকজন শরণার্থী শিবিরের মতো কয়েকদিন অপেক্ষা করে যে যেদিকে পারে চলে যায়। চরের নতুন ভোটার যে মানুষটি সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের সকল প্রয়োজনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে সে যখন প্রতিপক্ষের গুলিতে মরে– তখন তার কোনো পরিচয় থাকে না। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া দুএকজন সেই গুলিবিদ্ধ লাশ সৎকারের চেষ্টা করে কিন্তু বিষয়টি অত সহজ নয়। কারণ ভাসমান কেউ (যে চরের স্থায়ী বাসিন্দা নয়) মারা গেলে চরে তার মৃতদেহ কবর দিতে দেওয়া হয় না। চরের মহাজন বা জোতদার বিশ্বাস করে 'মরণ থায়ী (স্থায়ী) হলে মানুষের বাস্তু থায়ী হয়।' অথচ তারা চায় না চরে মানুষের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তাদের ক্ষমতায় ভাগ বসাক। তাই তারা ভাসমান মানুষের মৃতদেহ হয় দূরের গোরস্থানে দাফন করে অথবা প্রায় জোর করে মৃতদেহ ছিনিয়ে নিয়ে কাছাকাছি কোনো খাড়ির নিচে পুঁতে দেয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সেই মৃতদেহ কুকুর শেয়ালে খায়। অন্যদিকে ভাসমান মানুষের দল চরে মৃতদেহ দাফনের চেষ্টা করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে কবরের জন্য সাড়ে তিনহাত জমি যদি তারা দখল করতে না পারে তবে চরে স্থায়ী হওয়া তাদের জন্য সহজ হবে

না। মহাজনদের মতো ভাসমান মানুষও বিশ্বাস করে– চরের জমিতে তাদের মৃতদেহ কবরস্থ করতে পারলে চরের মহাজনও ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা হারাতে বাধ্য হবে। সংগত কারণে 'মুর্দার দখলদারী জিন্দা মহাজন সহে না।' ফলে বাঁচার এবং সৎকারের চেষ্টা ব্যর্থ হলে কেউ কেউ যে চর তার বিনষ্টির প্রধান কারণ তা ছেড়ে সদর্পে নিজ বাসভূমে (?) ফিরে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।[৪৯]

চরদখল ও প্রশাসন

চরদখল প্রক্রিয়া ও চরের দখল বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রশাসনের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া চরের ক্ষমতাধরদের সুষ্ঠুভাবে বসবাস করা সম্ভবপর নয়। বাংলা উপন্যাসে নদী ভাঙ্গন ও চরদখল প্রসঙ্গে দেখা যায় জমিদারের সকল কীর্তির মূলে তার নায়েব। সে ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না– তার খাজনা পেলেই হলো। প্রজা সাধারণ ফসলহানি ও অন্যান্য কারণে (অনেক সময় অকারণে– স্রেফ গায়ের জোরে) খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের দেখভালকারী মোড়লের সমস্যা হয়। কিন্তু নায়েব কিছুই শুনতে চায় না। সে বরং জমিদারের সেলামি এবং নিজের প্রাপ্যের বিনিময়ে একের জমি অন্যের নামে লিখে দেবার প্রস্তাব করে।[৫০] যে কোনো অজুহাতে নায়েব প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করে। মাত্র কয়েক দিন খাজনা দিতে দেরি করলে জমি 'খাস' হয়ে যায় বা অন্যের নামে পত্তনি দেওয়া হয়। জমি খাস হওয়া বা অন্যের নামে পত্তনি এড়াতে জমিদারের পাওনা মিটিয়ে নায়েবকে আলাদাভাবে খুশি করতে হয় এবং এজন্য অনেক সময় খাজনার চেয়ে বাজনাই বেশি হয়েছে।[৫১] জমিদারের আদর্শ নায়েব হতে পারে 'চর-ভাঙা চর' উপন্যাসের নায়েব গণেশ গোয়ালা।[৫২]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে যে মুহুরির (নিজামত মুহুরি) পরিচয় পাওয়া যায় সে মিথ্যা মামলা ও ঘুষে এতই অভ্যস্ত যে, তার বেহাই কাদির মন্তব্য করেছে, নিজাম মুহুরি 'শাশুড়ীর বিছানায় বউকে ও বউয়ের বিছানায় শাশুড়ীকে শোয়াইয়া দিয়া দূরে সরিয়া ঘুষের পয়সা গুণি'তে পারে।[৫৩] কাজী মাসুমের 'ঢেউ জাগে পদ্মায়' উপন্যাসে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের কন্যা আনোয়ারা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে সমাজের তাড়া খেয়ে ভগ্নিপতির বাড়িতে মেয়ের জন্ম দেয় এবং ভগ্নিপতি দ্বারা ধর্ষিত হয়ে গ্রামে এসে সমাজের চাপে আত্মহত্যা করে। তার মেয়েকে শিয়ালে খায়। লক্ষণীয় যে, আনোয়ারার আত্মহত্যার পর হাঙ্গামার ভয়ে কেউ পুলিশকে খবর দেয়নি।[৫৪] প্রভাবশালী জমির কাশীনাথ মণ্ডলের বিধবা মেয়ে বৃন্দাদাসীকে জোর করে ঘরে তুললে কাশীনাথ চেষ্টা করেও মেয়েকে ঘরে আনতে ব্যর্থ হয়। পরিণতিতে বৃন্দাদাসী আত্মহত্যা করলেও কোনো মামলা হয় না– উল্টো পুলিশ গন্ধ শুকে শুকে এসে হাজির হলে জমির তাদের সেলামি দিয়ে 'ঠাণ্ডা' করে বিদায় দেয়।[৫৫] দেখা যায় বিয়ে করতে বদ্ধপরিকর ছেলের বিয়ে বাপ পুলিশের সাহায্যে বন্ধ করতে চাইলে পুলিশ প্রথমে মাথা ঘামায় না কিন্তু 'একটু অর্থপূর্ণ ইংগিত ও অস্ফুট আলাপের' পর দারোগা স্বয়ং সেখানে যেতে রাজি হয়।[৫৬] রমেশচন্দ্র সেনের (১৮৯৪-১৯৬২) 'কুরপালা' (১৯৪৬) উপন্যাসে দেখা যায় জমিদার সেলামি নিয়ে গ্রামের এক দল লোককে জমি পত্তনি দেবার পর বেশি টাকা পেয়ে প্রভাবশালী অন্য কাউকে জমি পুনরায় পত্তনি দেয় এবং সংগত কারণে থানা-পুলিশ-ঘুষ-পীড়ন-ধরপাকড়-সুবিধাবাদ ইত্যাদির সহযোগিতায় প্রভাবশালী দ্বিতীয় পক্ষ জমির অধিকার লাভ করে।[৫৭] 'ঢেউ জাগে পদ্মায়' উপন্যাসে অবশ্য ব্যতিক্রমী দারোগাও দেখা যায়– কোনো প্রলোভনেই যে তার কর্তব্যে অবহেলা করে না।[৫৮] 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' উপন্যাসে চরের জমির দখল নিয়ে দারোগা দু'পক্ষের মারামারি–ধমক-ধামক–টাকা পয়সা আদায়–দুচার জনকে মারধোর–কয়েকজনকে ধরে চালানের মাধ্যমে তার কর্তব্য শেষ করে। প্রধান আসামিসহ আরও কয়েকজন আসামি নিখোঁজ থাকে।[৫৯]

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে দেখা যায় কখনো কখনো দুর্নীতিবাজ সার্কেল অফিসার ও তহশিলদারকে জনতা মার দিয়ে এলাকা থেকে বিতাড়ন করে। সরকারি কর্মচারী থানা পুলিশ বা মিলিটারির সাহায্যে চরের জনতাকে শাস্তি দিতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় যে চরের বা নদীর দুপাড়ের যে সব

মাতব্বর প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থেকে দুর্নীতি করে সেই কয়েকজনকে সাবাড় করে দিলে প্রশাসন যমুনার বিস্তৃত চরে আশ্রয় না পেয়ে খুব বেশি সফল হবে না।[৬০]

উপসংহার

বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত বাংলার নদীনির্ভর জনজীবন বিশ্লেষণে দেখা যায় চরদখল, চরের দখল বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলার মানুষের সাহস, কৌশল, উদ্যম ও ধৈর্য অতুলনীয়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই বাংলার মানুষ চরদখল ও তা বজায় রাখার জন্য তাদের অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করে এবং সে জানে প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হওয়া মানেই বিনষ্টির অতলে তলিয়ে যাওয়া। সংগত কারণে বাংলায় চর দখলের জন্য ভাড়াটে দখলদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে– যাদের জীবন বড়ই অনিশ্চিত ও বৈচিত্র্যময়। চর দখলের ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী যে রাজনৈতিক মেরুকরণ, স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিকতা অর্থাৎ পক্ষপাতের বেড়ায় বন্দি তা বাংলা উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট। চরের দখলকে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে চরদখল নদীনির্ভর জনগোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ না থেকে তা ক্রমশ বিত্তশালী শিল্পপতিদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে পেশিশক্তির সঙ্গে আইনের মারপ্যাঁচ যুক্ত হয়েছে। ফলে চরের যারা প্রকৃত মালিক তারা সব অর্থেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত নবসৃষ্ট চরের দখল সংক্রান্ত অনিয়মগুলোকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণের মাধ্যমে জনজীবনের বিপর্যয় এড়ানো এবং এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করে চরের সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

তথ্য নির্দেশ

[১]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গোরা, রবীন্দ্র রচনাবলী*, *৩য় খণ্ড* (সুলভ সংস্করণ; ১৯৮৬, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫), পৃ. ৪৮২।

[২]. আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ১৩-৪।

[৩]. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (নবম সংস্করণ; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭), পৃ. ২৩২।

[৪]. অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম* (কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৮৬), পৃ. ১৬৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*, তারাশঙ্কর রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৯৭৩), পৃ. ৩৩।

[৫]. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম* (কলকাতা: পুথিঘর, ১৯৯৮), পৃ. ৩২৯।

[৬]. অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৩০।

[৭]. আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ১৭-২১।

[৮]. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ. ৫৮ ও ২২০ । কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ, *চর-ভাঙ্গা চর*, পৃ. ২৪২-৪৩ । চরের জমির মালিকানা ঠিক করার একটা নিয়ম আমরা নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিয়েছি। "কেদার মণ্ডলের নদী কথা' *একটি সাক্ষাৎকার*", বিতর্কিকা (বিষয়: নদী), সম্পাদনা- অভ্র ঘোষ, মিলন দত্ত ও তপস্যা ঘোষ, পৃ. ১১।

[৯]. দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*, পৃ. ২৩১। বর্তমানে বাংলার দক্ষিণে জেগে উঠা আস্ত একটি দ্বীপ ক্ষমতাধররা ১৫ বছর দখলে রাখার পর সরকার তা উদ্ধার করে। দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৯শে জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১।

[১০]. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালিন্দী*, পৃ. ৮১, ১১৬-২৩ ও ১৮৭।

[১১]. হুমায়ুন কবির, *নদী ও নারী*, পৃ. ৬৩-৮ ও ১৯৬। জঙ্গল ও নতুন গঠিত চর এলাকার জমি প্রথম বছরে বিনা খাজনায় দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বছরে অল্প খাজনা ধরা হয়ে থাকে এবং তা' চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় পূর্ণ খাজনা ধার্য করা হয়। জেমস্ টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১০৮।

[১২]. অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৩৮।

[১৩]. হুমায়ুন কবির, *নদী ও নারী* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান্স, প্রকাশকাল নেই), পৃ. ৬৭-৮, ১৯৬।

[১৪]. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পৃ. ৩৩১।

[১৫]. কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ, *চর-ভাঙ্গা চর*, পৃ. ২০৪-০৫। 'চারঘাটে চর দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত ১০', *দৈনিক সোনার দেশ*, ২৬শে জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৩।

[১৬]. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালিন্দী*, পৃ. ১১৬।

[১৭]. তদেব, পৃ. ১৮৭।

[১৮]. কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ, *চর-ভাঙ্গা চর*, পৃ. ৩৩।

[১৯]. সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে* (ঢাকা: আনিছ ব্রাদার্স, প্রকাশকাল নেই), পৃ. ২৯৭।

[২০]. আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৪৭।

[২১]. আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, *চর আতরজান* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৫), পৃ. ২৭।

[২২]. আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ২২৮।

[২৩]. হুমায়ুন কবির, *নদী ও নারী*, পৃ. ১৬২।

[২৪]. কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ, *চর-ভাঙ্গা চর*, পৃ.৫৯।

[২৫]. অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৪৯। সাম্প্রতিক সময়ে ভিন্নভাবে নদী দখল করা হয়। নদীর তীর দখল করে স্থাপনা নির্মাণ (বরিশালের কীর্তিনখোলা নদীর) ৩০৬ দখলদার চিহ্নিত। *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ই মার্চ ২০১৬, পৃ. ৫। রংপুরের ঘাঘট নদের ১০ স্থানে বালু ও মাটির অবৈধ ব্যবসা। *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ই মার্চ ২০১৬, পৃ. ৫। ব্রহ্মপুত্র নদের 'চার কিলোমিটারে অবৈধ স্থাপনা।' *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ই মার্চ ২০১৬, পৃ. ৫। 'মেঘনায় বালু খেকোদের থাবা', প্রভাবশালী চক্র পাল্টাল কৌশল। *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৭ই জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১৮। রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধ, বারবার নোটিশেও সরছে না স্থাপনা। *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭শে জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৫। অবৈধ মাটি খনন, বালু উত্তোলন ও দখলের কারণে 'ঘাঘট নদের দুঃখ মোচন হয় না।' *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৫। 'গোমতীর মৃত্যু ঘণ্টা।' *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৮।

[২৬]. সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে*, পৃ. ২৯ ও ১২২।

[২৭]. সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে*, পৃ. ২০১।

[২৮]. তদেব, পৃ. ১৯৯-২০৭।

[২৯]. তদেব, পৃ. ২০৭-০৮।

[৩০]. তদেব, পৃ. ২৩৭-৪২।

[৩১]. আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ১৭-২১, ২৩-৭ ও ৩৭ ।

[৩২]. তদেব, পৃ. ৩৫ ও ৯৫। 'চরকাশেম' উপন্যাসে চর দখলের পর কাশেম 'পাছ দুয়ারে' হাত-পা পরিষ্কার করে এবং নাপিত তার চুল আধুনিক কেতায় ছেঁটে দেয়। অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৫২।

[৩৩]. তদেব, পৃ. ১১১-১২।

[৩৪]. কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ, *চর-ভাঙ্গা চর*, পৃ. ৫৬-৭।

[৩৫]. আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ২৩৬-৩৭।

[৩৬]. তদেব, পৃ. ৩৮-৪৫ ও ১১৯।

[৩৭]. তদেব, পৃ. ২১৮-২২।

[৩৮]. তদেব, পৃ. ২০৭-০৮, ২১৮-২২, ২২৮-৫৮, ২৮৭-৮৮ ও ৩০২-০৩।

[৩৯]. তদেব, পৃ. ২৭-৮।

[৪০]. অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৬০।

[৪১]. কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ, *চর-ভাঙ্গা চর*, পৃ. ৫৫-৬।

[৪২]. অবিনাশ সাহা, *প্রাণগঙ্গা* (কলকাতাঃ ভারতী লাইব্রেরী, ১৯৫৯), পৃ. ৬৬।

[৪৩]. অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৫১।

[৪৪]. আবুল বাশার, *ভোরের প্রসূতি* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৪), পৃ. ৩, ৯ ও ৯১।

[৪৫]. তদেব, পৃ. ১২ ও ১৪১।

[৪৬]. জয়ন্ত জোয়ারদার, *ভূতনি দিয়ারা* (কলকাতাঃ বুকমার্ক, ১৯৮২), পৃ. ২৯-৩০ ও ৯৪-৫।

[৪৭]. আবুল বাশার, *ভোরের প্রসূতি*, পৃ. ২২, ৫২, ৯৯, ১২৯, ১৫৩ ও ১৫৫।

[৪৮]. তদেব, পৃ. ৮৬, ৮৯, ৯৭, ১০৩, ১০৫, ১০৭-০৮, ১৫৬ ও ১৭২।

[৪৯]. তদেব, পৃ. ১১২-১৬, ১৫৫, ১৫৭, ১৭০-৭১ ও ১৭৫-৭৬। খাস জমির বণ্টনের প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রার্থনার প্রসঙ্গটি *তৃণভূমি* উপন্যাসেও দেখা যায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *তৃণভূমি* (দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ১৭০।

[৫০]. হুমায়ুন কবির, *নদী ও নারী*, পৃ. ১২৯-৩০।

[৫১]. অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৪২-৫০। ...কর ব্যবস্থা প্রদেশের নায়েব ও দেওয়ানের যৌথনিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং তারা যা যথার্থ মনে করতেন সেই ভাবে এই রাজস্বের সংশোধন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা তারা ব্যবহার করতেন। ...কর-নির্ধারণের হার ও উহা সংগ্রাহের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো সঠিক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাড়াটে ও তাদের অধীনস্থদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাধীনে ছেড়ে দেয়ায়, এ সকল কর সাধারণতঃ একতরফা ও উৎপীড়-মূলক হতো। জেমস্‌ টেলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১৫০।

[৫২]. কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ, *চর-ভাঙ্গা চর*, পৃ. ৩৯-৪০।

[৫৩]. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম*, পৃ. ২৭৮।

[৫৪]. কাজী মাসুম, *ঢেউ জাগে পদ্মায়* (ঢাকাঃ গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৫৮), পৃ. ২১-৬।

[৫৫]. তদেব, পৃ. ৪৮।

[৫৬]. সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে*, পৃ. ২৮৫।

[৫৭]. রমেশচন্দ্র সেন, *কুরপালা* (প্রথম সংস্করণ; কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ১২৯-৩০।

[৫৮]. আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৩০৩-০৪।

[৫৯]. সত্যেন সেন, *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে*, পৃ. ২৪৬।

[৬০]. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *চিলেকোঠার সেপাই* (ষষ্ঠ মুদ্রণ; ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮), পৃ. ২০৫-০৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

চলচ্চিত্রে ঋতু : সত্যজিৎ রায়

ড. কৌশিক সরকার*

[**সার-সংক্ষেপ:** বাঙালির মননে ঋতু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ঋতুকে উপজীব্য করে কবি-সাহিত্যিকরা রচনা করেছেন কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস। ঋতুর বৈচিত্র্যময়তাকে সাংকেতিক হিসেবে ব্যবহার করেছেন চলচ্চিত্র পরিচালকেরা। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রগুলোতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তার সুষ্ঠু ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতি মানব জীবনে পট পরিবর্তনে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মানব সমাজের রূপরেখার পরিবর্তন ঘটেছে যা মানব জীবনের পট পরিবর্তন করেছে। এক কথায় প্রকৃতি সর্বদা মানব জীবনে নিয়তি নির্ধারক হিসেবে বিদ্যমান। বাস্তবতার নীরিখে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে ঋতুর আগমন ঘটলেও ঋতুর ব্যবহারে সাংকেতিকতার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর চলচ্চিত্রে এক একটি ঋতু হয়ে উঠেছে এক একটি চরিত্র। বর্তমান প্রবন্ধে তারই প্রতিফলন অনিবার্য হয়ে ওঠেছে।]

Abstract : Season plays an important role in the mind of Bengali people. Based on season poets and literary laureates have written poem, song, story and novel. Film directors have use season as a symbol in their films. In the films of Satyajit Ray we can observe proper and proportionate uses of characteristics of nature. Nature plays special role to change the spectacle of human life. If we look through the history we will see that due to natural calamity colossal changes occurred in human society. So it may say that nature always became the fate confirmatory of mankind. Satyajit Ray uses season in his different films very emblematically. In his films he portrayed different season as different character. Such a reflection has been implemented in this article.

বাংলা সাহিত্যে ঋতুকে কেন্দ্র করে অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান রচনা হয়েছে। শিল্পীরা ভাববাদী তাই তাঁদের সৃষ্টির একটি জায়গা জুড়ে আছে প্রকৃতি। ঋতু (Seasons) শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ বৎসরের প্রাকৃতিক বিভাগ।[১] গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয়টি ঋতুর বৈচিত্র্যময়তা বাংলা তথা বাঙালির মননে জায়গা করে নিয়েছে। প্রকৃতির ভাবের সাথে সঙ্গীতের ভাবের সংযোগ ঘটতে পারে কেবলমাত্র মিলনের মাধুর্যে, সামঞ্জস্যের সুষমায়। প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্যে ও সংগীত রচনায় এই ভাব বিরাজমান। সাহিত্যের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণেও ঋতু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রে অনেক গুণী পরিচালকের আগমন ঘটলেও ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬), মৃণাল সেন (১৯২৩-) এবং সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২) এর ভূমিকা অপরিসীম। তাঁদের সকলের লক্ষ্য ভালো ছবি তৈরি করা যা আমাদের চারপাশের জগৎ-জীবনের বাস্তব চিত্রটাকে শিল্পোন্নত আঙ্গিকে সিনেমার নিজস্ব ভাষায় অগণিত মানুষের কাছে প্রতীয়মান করে তুলেছে। প্রবাহমান বাংলা ও বাঙালির জীবন-জীবিকা, চাওয়া-পাওয়া, হতাশা-বেদনা ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্রমপরিবর্তনের চেহারা সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে বিশ্বস্ততার প্রকাশ ঘটায়। আর এর মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ বা বাস্তবসম্মত বাকপ্রতিমা সৃজন।

গ্রামের বৃষ্টিভেজা মাটির পথ, বৃষ্টির ধারা, বাঁশবনের শ্যামল ছায়া, ডোবা, নরম কাশফুল ইত্যাদি গ্রাম বাংলার সকল সৌন্দর্য ও স্বরূপ তাঁর চলচ্চিত্রে উপস্থিত। চলচ্চিত্রে সময় বা কাল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সময়কে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রে ঘটনা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। সময়ের বিবর্তনের ফলে চলচ্চিত্রে পরিবেশ, চরিত্রের মানসিকতা এবং ঘটনার পরিবর্তন ঘটে থাকে। চলচ্চিত্রের কথা ভাবলে দর্শকের

---

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মনে এক বা একাধিক ইমেজের সৃষ্টি হয়। সত্যজিৎ রায়ের গভীর কল্পনা শক্তি ও সুগভীর শিল্পবোধ তাঁর চলচ্চিত্রে বাস্তবরূপ সৃষ্টিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। ঋতুর সঠিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি চলচ্চিত্রে ঘটনার আবেগময়তা সৃষ্টি করেছেন। বাক্য যখন আর নিছক বাক্য না থেকে হয়ে ওঠে চিত্র বা ভাব, পাঠকের সামনে তুলে ধরে এক একটি ভাবের বা চিত্রের রূপকল্প তখন তাকে বলা হয় বাকপ্রতিমা বা ইমেজ।[২] সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রে ক্যামেরার ভাষা সৃষ্টি করে এই বাকপ্রতিমাকে চিত্র- প্রতিমায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর চলচ্চিত্রের পাণ্ডুলিপি ও নির্মাণ শৈলির মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য রয়েছে। পাণ্ডুলিপির বিষাদময়তা যা তিনি ক্যামেরার ফ্রেমে প্রকাশ করেন। আর এই বিষদময়তা তিনি মেঘলা আকাশের দ্বারা দেখিয়েছেন। আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায় এর কথায় সত্যজিৎ রায়ের ঋতু ব্যবহার বিষয়টি প্রকাশ পায়-

> মানিকদার ছবির ফোটোগ্রাফি করার সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা ছিল, সেটা এই যে ছবির মূল নাট্যরসের কথা মাথায় রেখেই উনি শুটিংয়ের জন্য বিশেষ ঋতু বেছে নিতেন। ছবি সাদা-কালোই হোক, রঙিনই হোক- এইভাবে বিশেষ গল্পের জন্যে বিশেষ ঋতু বেছে নেওয়াটা উনি সব ছবিতেই বজায় রাখতেন। পোস্ট মাস্টার ছবিতে মূল সুর ছিল বিষাদ। সেই মুড ফুটে ওঠে, সেই উদ্দেশ্যে বর্ষাকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল শুটিংয়ের সময় হিসেবে। তাই বিষাদের সুরটা খুব সহজেই সঞ্চারিত হয় দর্শকের মনে। সেই সঙ্গে ক্যামেরাম্যানেরও কাজ করতে সুবিধা হয়। কারণ আলোর একটি বিশেষ অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলার দিকেই অবিচ্ছিন্নভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়। . . .[৩]

ঋতুর ব্যবহারের পারঙ্গমতা তাঁর চলচ্চিত্রে ঘটনার আবেগময়তা সৃষ্টি করেছে। চলচ্চিত্র তৈরির চল্লিশ বছরের জীবনে সত্যজিৎ রায় ২৮টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র, টেলিভিশনের জন্য তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং পাঁচটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন।[৪] আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫), *তিন কন্যা* (১৯৬১), *চারুলতা* (১৯৬৪), *অশনী সংকেত* (১৯৭৩) এই চারটি চলচ্চিত্রের ঋতুর ব্যবহার বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

শিল্পের গভীর তাগিদ থেকে মানুষকে সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) পথের পাঁচালী। যেখানে অপু-দূর্গা, সর্বজয়া-হরিহর, ইন্দিরা-বিমলা এবং অনঙ্গ বোও এর গল্প বলা হয়েছে। পরিবেশ সৃষ্টিতে উপাদান সমূহের সুষম ব্যবহার পথের পাঁচালীতে সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করেছে। যে আবেদন ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দেশী-বিদেশী, পৃথিবীর যেকোন দেশের যেকোন শ্রেণীর যেকোন মনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। নির্মম ও স্বাভাবিক বাস্তবতাকে কাব্যের ললিত ছন্দে, শিল্পের সুকুমার ভঙ্গীতে এবং নাটকের আবেগময়তায় এমন একটি সৃষ্টি যা *পথের পাঁচালী*কে দর্শকের বাঙালি মননে মানবতার মহাত্ম্যকে উপলব্ধি করিয়ে দেয়।[৫]

পথের পাঁচালী চরচ্চিত্রটির কথা মনে হলে চোখের সামনে কাশবনের অপু-দূর্গার দৌড়ানোর দৃশ্যের কথা মনে হয়। শরতের কাশফুলের যে সৌন্দর্যতে যে আবেগময় তা পরিচালক এই একটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যার বাস্তবতা মানব মনে নান্দনিক স্থান তৈরি করেছে। অপু-দূর্গার গ্রাম্য শিশু চরিত্র দুটির মনের উচ্ছলতা এবং যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে তার পরিচয় ঘটানোর জন্য পরিচালক শরৎকালকে বেছে নিয়েছেন, তাইতো শরতের কাশফুলের গ্রহণযোগ্যতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। শরতের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য তিনি এক বছর শুটিং বন্ধ করেছিলেন। এই দৃশ্যটি ধারণ করার জন্য সত্যজিৎ রায় এই স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন কিন্তু শুটিং করতে এসে দেখেন যে কাশফুল কাটা হয়ে গেছে। ফলে শুটিং বন্ধ করে এক বছর পর দৃশ্যটা শুটিং করা হয়। শিল্পকর্মে ইমেজ বা প্রতিমা হচ্ছে চিত্রের বা ভাবের রূপকল্প সৃষ্টি করে মূর্ত রূপের মধ্যদিয়ে বিমূর্ত অনুভবে পৌঁছাবার উপায়।[৬] দর্শকের মনে এই বিমূর্ত অনুভূতি তৈরি করার জন্য শরৎ এর কাশফুলের অবদান সব থেকে বেশি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কাশফুল চলচ্চিত্রে ট্রেন ও বাঁশঝাড় বিষয় দুটির ব্যাঞ্জনাকে বাড়িতে তুলেছে। দুটি বিষয়ই গভীর ভূমিকা পালন করেছে অপু-দূর্গার জীবনে। কাশবনের মধ্যে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে লোহার বিশালাকার ট্রেনটি দর্শক মনে নান্দনিক ইমেজ সৃষ্টি

করলেও অপুর জীবনে ট্রেনটি নগর সভ্যতায় প্রথম স্বাদ বয়ে এনেছিল। আর বাঁশঝাড়ে অপু-দূর্গা জীবনের প্রথম মৃত্যু দেখেছিল- ইন্দির ঠাকুরুণের মৃত্যু। তাই পরিচালকের উদ্দেশ্য ছিল ট্রেন আর বাঁশঝাড়কে দর্শকের অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া। কাশফুলের দৃশ্য দেখার পর দর্শক কখনো মনে করতে পারেননি যে তার পরের দৃশ্যে মৃত্যু লুকিয়ে আছে। এই দৃশ্যের মৃত্যুর অনুভূতি দর্শকের মনে স্থায়ীভাবে বিরাজ করানোর জন্যই শরতের কাশফুল। কালো ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেনটি যখন কাশবনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন ট্রেনটিকে সাদা কাশফুলের তুলনায় অনেক ভারী ও বলীয়ান মনে হয়। তুলনা করার মতো সামনে কিছু না থাকলে ট্রেনের কালো রূপটি প্রকাশ পেতনা। আবার অন্যভাবে যদি দেখা যায় অর্থাৎ কাশফুলকে অপু-দূর্গার শুভ্র গ্রাম্য জীবন বা মন এবং ট্রেনটিকে নগর যন্ত্রসভ্যতার কঠিন রূপ যা ভবিষ্যতে অর্থাৎ অপরাজিত (১৯৫৬) ও অপুর সংসার (১৯৫৯)-এ বালক অপুর জন্য অপেক্ষমান।[৭] সেই মূহুর্তে অপুর কোমল মনে শহর জীবনের বীজ রোপিত হয়। গ্রামীণ জীবন তার মনে মরতে শুরু করে। ঠিক সেই মুহুর্তে পরিচালক মৃত্যু দেখিয়ে গ্রাম্যজীবনের মৃত্যু সূচিত করেছেন। মূল উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- 'ইন্দির ঠাকুরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।'[৮] আর এই দুটি দৃশ্যের তাৎপর্য দর্শকের সামনে তুলে ধরার জন্য কাশফুলের অবদান সবচেয়ে বেশি।

*পথের পাঁচালী*তে ইন্দিরের মৃত্যুলগ্নে সত্যজিৎ মনে করিয়ে দেন দূর্গার শৈশবকে। এই লক্ষ্য পূরণে তাকে সাহায্য করেছে বাঁশগাছের দৃশ্যকল্পের পুণরুজ্জীবন। সত্যজিৎ রায়ের পিসিমা লীলা মজুমদার এর ভাষ্যমতে- 'প্রকৃতিকে নিয়ে কৌতুহল যে ছোটবেলায় ওর ছিল তা আমার মনে হয় না। মানিক প্রকৃতি ভালবাসত ঠিকই, কিন্তু প্রচণ্ড ভালবাসত- এমন কিছু লক্ষ্য করিনি। সাধারণভাবে ভালোবাসত যেমন সবাই বাসে।'[৯] কিন্তু *পথের পাঁচালী*তে প্রকৃতি প্রেমী একজন পরিচালকের পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের নির্দিষ্ট সময়ের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বর্ণিত। উপন্যাসের জন্য একটি পটভূমি ও বিভিন্ন চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর সেজন্য তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে যুগ, কাল, সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি। *পথের পাঁচালী* সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চলচ্চিত্র। তাই তিনি সাহিত্যের ডিটেল ছবিতে প্রকাশ করেছেন। বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করা বা সমৃদ্ধ করাই ডিটেলের উদ্দেশ্য। স্থান, কাল, পাত্র, ঘটনা, মনের ভাব সবকিছুর বর্ণনাতেই ডিটেলের প্রয়োজন হয়।[১০] এই ডিটেলের প্রয়োগ ঘটানোর জন্য ঋতুর আগমন। *পথের পাঁচালী*তে দুটি মৃত্যু দেখানো হয়- ইন্দির ঠাকুরণ এবং দূর্গা। এই দুটি মৃত্যুর ভয়াবহতা দেখাতে পরিচালক ডিটেলের আরেকটি প্রয়োগ দেখিয়েছেন চৈত্রের প্রথম বৃষ্টির সময়। চৈত্রের প্রথম বৃষ্টি পৃথিবীর আদি চিত্র প্রতিমার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে পরিচালক বাঙালির হারানো সংস্কৃতিকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। বৃষ্টিতে ভিজে দূর্গার মৃত্যু দৃশ্যটি ধীরে ধীরে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে একটি অসাধারণ সূক্ষ্ম শৈল্পিক ও সাংগীতিক কাঠামোর আদল পাওয়া যায়। দুর্গার চারা গাছ পুঁতে জল ঢালা কুমারী ব্রত (পূণ্যিপুকুর ব্রত) পালন। চারিদিকে ঘন মেঘের জমাট। দুর্গা ব্রত পালনের ছড়া বলে–

> পূণ্যিপুকুর পুষ্পমালা / কে পূজেরে দুপুরবেলা
> আমি সতী লীলাবতী / ভায়ের বোন ভগবতী
> স্বামীর কোলে পুত্র রেখে / মরণ হয় গো যেন গঙ্গাজলে।[১১]

ব্রত পালনের এই চিত্রকল্পগুলো দর্শককে লুপ্তপ্রায় মেয়েলি সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করায়। এই ছড়ায় কুমারী মেয়ে স্বামী কোলে মাথা রেখে মৃত্যু কামনার বিষয়টি মূর্ত। যা অবচেতনভাবে দূর্গার মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করার করুণ পরিহাসের প্রথম ধাপ।[১২]

অতুলনীয় এক বর্ষার দৃশ্য- মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়, ঝড় উঠল অপু আর দূর্গা ছুটছে। বর্ষার আভাসে ব্যাঙের দল জলে সাঁতরাচ্ছে। এক টাক মাথার বুড়ো ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিল টুপ করে এক ফোঁটা জল তার

টাকের ওপর পড়ে, পদ্মপাতার ওপর টুপটাপ জল পড়ে দেখতে দেখতে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সেই প্রচণ্ড ঝর ঝর ধারায় দূর্গার চুল এলো করে ভেজার দৃশ্য অপূর্ব! তারপর দূর্গার অসুখ ও মৃত্যু। রাতের ঝড়-বাদলে জানালার চটটা উড়ে খুলে পড়তে চায়, ওদিকে দরজার আগলও ঝড়ের দাপটে ভাঙ্গে ভাঙ্গে অবস্থা। একা সর্বজয়া রুগ্ন মেয়ে কোলের পাশে অপু শুয়ে। প্রকৃতির এই প্রচণ্ড দাপাদাপি তার মাঝে সর্বজয়ার মুখে আশঙ্কার সঙ্গে জীবন রক্ষার দুর্জয় প্রচেষ্টা একটা দারুণ নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলে। দর্শক বুঝতে পারে না কি ঘটতে চলেছে। পরদিন সকালে জলকাদা, উড়োচালা, মরা ব্যাঙ উঠানের দৃশ্যকরুণতাকে বাড়িয়ে দেয়। হরিহরের বাড়ি ফেরার পর দূর্গার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। দূর্গার এই অসুখে পরা দৃশ্যটি পরিচালক চৈত্র মাসের বৃষ্টিতে ভেজা না দেখিয়ে যদি শীত-গ্রীষ্মের সময় দেখাতেন তাহলে দূর্গার মৃত্যুর সময়টি এতোটা হৃদয় বিদারক হতো না। শীতে কনকনে ঠাণ্ডা জল বা কনকনে শীতে দূর্গার মৃত্যু হলে অথবা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে দূর্গার মৃত্যু হলে প্রকৃতি প্রেমী উচ্ছ্বল দূর্গাকে দেখতে পাওয়া যেত না। প্রকৃতির ভালোবাসার পরশ গায়ে মাখতে সে কখনও পিছপা হয়নি তাইতো ঠাণ্ডা লাগা সত্ত্বেও বৃষ্টিতে সে ভিজেছিল। আবার বৃষ্টিতে ভিজে দূর্গার মৃত্যুর অপুর ওপর দারুণ প্রভাব ফেলে। দিদি ও মায়ের উপর নির্ভরশীল অপু স্বাবলম্বী হয়। তাইতো বৃষ্টির ফোটাকে আর গায়ে পড়তে দেয়নি। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য ছাতাটি সঙ্গে করে সে বাড়ি থেকে বেড় হয়। পরিবেশ সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ কালের ব্যবহার ঘটিয়েছেন কিন্তু পরিচালক শরৎ ও চৈত্রের বৃষ্টির মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে সার্বজনীন আবেদন গড়ে তুলেছেন।

পোস্ট মাস্টার, *সমাপ্তি* ও *মণিহার* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই তিনটি ছোটগল্পের তিন নারী চরিত্র নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের তিনকন্যা চলচ্চিত্রটি। তিনটি গল্পের স্বাদের ভিন্নতা তিন রকম। *মণিহার*- ব্যর্থ প্রেমের, *সমাপ্তি*- সফল প্রেমের তাই অবশিষ্ট পর্বটির জন্য সত্যজিৎ রায় এমন একটি গল্প খুঁজছিলেন যেখানে প্রেম থাকবে না থাকবে স্নেহ। তাহলে অন্য দুটি পর্বের সাথে এর বৈপরীত্য তৈরি হবে। আর সেজন্য তিনি *পোস্ট মাস্টার* গল্পটি বাছাই করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পোস্ট মাস্টার* গল্পে রতনের বয়স ও পোস্ট মাস্টার নন্দ বাবুর বয়সের ব্যবধান খুব একটা বেশি ছিল না যেখানে সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে তাদের বয়সের ব্যবধান অনেক দেখিয়েছেন। যাতে দর্শকের না মনে হয় যে এটি একটি সূক্ষ্ম প্রেমের গল্প। পোস্ট মাস্টার ছবিতে পরিচালক রতনের সাহস, নন্দবাবুর প্রতি রতনের ভালবাসা এবং রতনের প্রতি নন্দবাবুর স্নেহ জন্মানোর ঘটনা দেখানোর জন্য বর্ষকালের একটি দুর্যোগপূর্ণ রাতের আশ্রয় নিয়েছেন। গল্পের শুরুতে দেখা যায় পূর্বের পোস্টমাস্টার নন্দবাবুকে ডাকঘরের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার সময় রতনের সাথে নন্দবাবুর পরিচয় করিয়ে দেন যেখানে রতনের প্রতি তার (পূর্বের পোস্ট মাস্টারের) শাসনের অভিব্যক্তি দেখা যায়। তার পরের দৃশ্যে দেখা যায় নন্দবাবু পুকুরে স্নান করতে যাবার সময় রতনের জন্য তার মাণি ব্যাগটি সুটকেসের ভেতর রেখে যায়। এ থেকে রতনের প্রতি নন্দবাবুর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির হস্তক্ষেপে রতনের চরিত্রটি নন্দবাবু ও দর্শকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। নন্দবাবু ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কাতরালে রতনই তার সেবা শুশ্রষা করে। ঝড় বৃষ্টির প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ রাত ছোট্ট রতনের মনে ভীতির সঞ্চার করেনি যার জন্য সে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাইরে গিয়ে তার গরম কাঁথাটা নিয়ে আসে। এখানে বর্ষাকালের ঝড়ের রাতের দৃশ্যটি না দেখালে রতন চরিত্রটির পরিপূর্ণ নারী রূপ উদঘাটন করা সম্ভবপর ছিল না। মানুষ সর্বদা প্রকৃতির কাছে অসহায়, ভীত অন্ধকারের কাছেও। যা আমরা নন্দবাবুর মধ্যে দেখতে পাই। একটি নারীর ভিতরে তিনটি সত্ত্বা অবস্থান করে- মা, বোন এবং প্রেমিকা। রবীন্দ্রনাথের মূল গল্পে লেখক রতনের সাথে নন্দবাবুর সূক্ষ্ম প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায় রতনের সাথে নন্দবাবুর ভাই-বোনের ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। নন্দবাবুর মার নিকট থেকে চিঠি পাবার দৃশ্যে দেখা যায় গ্রুপ ফটোর মধ্যে রতন নন্দবাবুর বোনের ছবি দেখে। বোনের পরিচয় পেয়ে রতনের মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে।

কথা প্রসঙ্গের এ পর্যায়ে নন্দবাবু তার বোনের সাথে রতনের গুণের তুলনা করতে চায় না। এই দৃশ্যে নন্দবাবু রতনকে বোনের স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির রাতে অসুস্থ নন্দবাবুর প্রতি রতনের শুশ্রূষা রতন নন্দবাবুর নিকট বোনের স্থান লাভ করে যা রতনকে নিয়ে লেখা নন্দবাবু ছড়া থেকে পাওয়া যায়- রতন আমার রতন / তার কাজে বড়ই যতন / সে আমার বোনের মতন।

দাদা-বোনের সম্পর্কের বন্ধনটি সত্যজিৎ রায় স্থাপন করেছিলেন। পোস্ট মাস্টার নন্দবাবুর চলে যাওয়া সেই স্নেহের বন্ধনের বিচ্যুতির একটি ট্র্যাজিক ঘটনা। এখানে রতনের কাছে নন্দবাবু নিজের দাদা হয়ে ওঠেছিল। আত্মীয়হীনা রতনের কাছে হয়ে ওঠেছিল পরম আত্মীয়। কিন্তু নন্দবাবুর রতনের আত্মার আত্মীয়তা উপলব্ধি করতে পারেননি। যার জন্য রতনকে রেখেই সে চলে যায়। রতন বুঝতে পারে সে নন্দবাবুর বোন হয়ে ওঠেনি, কাজের মেয়ে হিসেবেই রয়ে গেছে। প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কটি শেষ পর্যন্ত ভাই-বোনের সম্পর্কে রূপ নেয় না।[১৩] পাস্টমাস্টার ছবিটিকে সত্যজিৎ রায় স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন। মূল কাহিনিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা করেননি। এই অনুভূতিই *পোস্টমাস্টার* চিত্রনাট্যে সত্যজিৎ রায়ের গভীরতম মৌলিক অবদান। আর এই চিত্রনাট্যের যে অন্তিম ট্র্যাজিডি তা এই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হবার ট্র্যাজেডি। তাই বর্ষাকালের ঝড়-বৃষ্টির রাতের দৃশ্যটি ছাড়া এর গভীরতার আবেদনটা অপূর্ণ থেকে যেতো।

সমাপ্তি চলচ্চিত্রটি মূল দুটি চরিত্র অমূল্য আর মৃন্ময়ী যাদের শ্রেণীর অবস্থান স্বতন্ত্র। শ্রেণীর বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও এই দুটি নারী-পুরুষ চরিত্র তাদের অত্যন্ত প্রিয় দুটি হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে পেয়েছে একে অন্যের কাছ থেকে। কিশোর প্রেমের কাহিনীর মধ্য দিয়ে পরিচালক সত্যজিৎ রায় দর্শকের নিকট গল্পে লুকায়িত ভাবার্থটি চিত্রায়িত করেছেন। *সমাপ্তি* চলচ্চিত্রটি এমন একটি কিশোরীকে নিয়ে যে সারাদিন গ্রামের মাঠে নদীর তীরে ঘুরে বেড়ায়। সারাদিন ঘরের বাইরে থাকে। আর ছবির নায়ক অমূল্য সদ্য কোলকাতা থেকে আসা। মৃন্ময়ী ও অমূল্যর প্রেম, মায়ের অপছন্দ মৃন্ময়ীকে বিয়ে, সংসার ও স্বামীর প্রতি অমনোযোগী মৃন্ময়ীর বাড়ি থেকে পালানো, মৃন্ময়ীর প্রতি অমূল্যর অভিমান, অবশেষে মিল ইত্যাদি ঘটনার আবর্তে সমাপ্তি চলচ্চিত্রটি গড়ে ওঠেছে। যেখানে পরিচালক ঋতু হিসেবে বর্ষাকালকে বেছে নিয়েছেন এবং এ ছবির সমস্ত শুটিংটি বর্ষকালেই করা হয়েছে। বর্ষাকাল চলচ্চিত্রটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যা শুধু মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণ হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল না তা ঐতিহাসিক কারণ হিসেবেও দেখানো হয়েছে। দামাল কিশোরীর ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ানোর হেতু হিসেবে সত্যজিৎ রায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নিজেকে সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে তুলে ধরেছেন। অমূল্যর সাথে মৃন্ময়ীর প্রথম দেখা বর্ষার কাদাভেজা নদীর পারে, নৌকা থেকে নামতে গিয়ে অমূল্য পড়ে গেলে মৃন্ময়ী সরবে হাসে। দ্বিতীয় দেখা কিশোরী চ্যাটার্জীদের বাড়িতে পাত্রী দেখতে গিয়ে এবং তৃতীয় দেখা পাত্রী দেখে ফেরার কাদামাখা পথে। পরিচালকের কৃতিত্বটা এইখানে। কৌতুক ঘটনাপূর্ণ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিচালক নেপোলিয়ন ও কাদার পেলারেন্সটা অমূল্যর সম্মানহানির সাথে এমনভাবে জুড়ে দিলেন যা *সমাপ্তি* চলচ্চিত্রকে একটি ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যায়। সত্যজিৎ রায়ের ব্যবস্থাপক ভানু ঘোষের ভাষা- 'মানিকদা পরাজিত নেপোলিয়ন এর রেফারেন্সটা আনতে চেয়েছিলেন অমূল্যর বিপর্যস্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে। তাই অমূল্যর ঘরে নেপোলিয়নের ছবি রাখা হয়েছিল।'[১৪] বর্ষাকালকে পরিচালক শুধু নাটকীয়তা রস আনার জন্য ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু তা না করে সেই সাথে ঐতিহাসিক ঘটনার আনয়ন করে ছবিটিকে একটি শিল্পোত্তীর্ণ স্থানে নিয়ে গেছেন।

মণিহার চলচ্চিত্রটি ধনী পাট ব্যবসায়ী ফণিভূষণ সাহা ও স্ত্রী মণিমালিকার সাংসারিক জীবনের ব্যর্থ প্রেমের গল্প। সন্তানহীনা মণিমালিকার গহণার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাদের সাংসারিক জীবনের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী-স্ত্রীর এই দ্বন্দ্বের আবর্তে মণিহার চলচ্চিত্রটি একটি ভৌতিক কাঠামোতে তৈরি। এখানে শীতের শেষের দিকের সময়ের কথা বলা হয়েছে। শীতের কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিচালক এখানে তুলে

ধরেননি। তিনি সূত্রধরের মুখ দিয়ে কাল চিহ্নিত করেছেন। ভৌতিক গল্প কোন বাস্তব প্রেক্ষাপটের না। দর্শকের কাছে এটা সর্বদা কাল্পনিক থাকে। তাই শীত ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশের ব্যাপকতা এই চলচ্চিত্রে রাখা হয়নি। রাখা হলে চলচ্চিত্রটি ভৌতিক মেজাজ হারাত।

চারুলতা চলচ্চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *নষ্টনীড়* গল্প অবলম্বনে গঠিত। চারুলতার প্রধান সম্পদ হলো এর চারটি প্রধান চরিত্রের মনোভাব ও পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও দরদী বিশ্লেষণ। যার আবর্তে গড়ে উঠেছে দেবরের প্রতি বৌদির প্রেম। যা একটি সংসারের জন্য অভিশাপ। পরিচালক এখানে বৈশাখ ঋতুর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। চলচ্চিত্রটির একটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে তিনি সারকথা ব্যক্ত করেছেন।

কাহিনির শুরুতে দেখা যায় স্বামী ভূপতির সংসারে চারুলতা একাকীত্ব অনুভব করে। ভূপতি তার কাগজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে যার ফলে চারুকে সে সময় দিতে পারে না। নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য চারু দূরবীণ দিয়ে পথচারীদের যাতায়াত লক্ষ্য করে। এর মধ্যে কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হলে চারুসহ বাড়ির দাসীরা বাড়ি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর এই সময় অমলের আগমন। একটি ঘটনার পূর্বাভাসের মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে ইমেজ সৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তবতার রুঢ় রূপটিকে সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করেছেন সত্যজিৎ রায়। যা আমরা প্রথম দৃশ্যটির মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি। কালবৈশাখীর ঝড় মানুষের ঘরবাড়ি, ফসল, গাছ-পালা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। সেজন্য পরিচালক বৈশাখের এই ঝড়টি ব্যবহার করেছেন। যার প্রতীকীরূপ অমল। যা ছবিটির পরবর্তী ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।[১৫]

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে মানুষ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। আলোচ্য ছবিতে অমল ও চারুকে বাগানে কবিতা লিখতে দেখা যায়। যেখানে চারুর দোলনায় দোল খাওয়া ও অমলের কবিতা লেখার দৃশ্যটি একটি রোমান্টিক পরিবেশের আবহ তৈরি করে।

অশনি সংকেত এর বাংলা আভিধানিক অর্থ বজ্র ইঙ্গিত বা বৃক্ষাদি বিনাশক মেঘোৎপন্ন শক্তির ইশারা।[১৬] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকরা উপন্যাসের মধ্যে *অশনি সংকেত* (১৯৫৯) অন্যতম। কোন সচেতন লেখক সমাজ বিচ্ছিন্ন নন। বিভূতিভূষণ ও এঁদের বাইরে নন তাইতো তাঁর লেখাতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসে একটি পটভূমিও বিভিন্ন চরিত্র নির্মাণ করার পাশাপাশি নিজস্ব বক্তব্য তিনি তুলে ধরেন। তাই তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে যুগ-কাল ও জীবনের প্রতিচ্ছবি।

অশনি সংকেত চলচ্চিত্রটি সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন ১৯৭৩ সনে। গ্রামের একটি ব্রাহ্মণ পরিবার ও অন্যান্য চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ বাস্তবতার যে রুঢ় রূপটি দেখিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় তাতে নিজের প্রতিভার অন্বেষণ ঘটিয়েছেন। চলচ্চিত্রটির সমস্ত শুটিং তিনি বর্ষাকালে সম্পন্ন করেছিলেন। দারিদ্র্যের মানসিক দিকটা বিশ্লেষণ করাই ছিল *অশনি সংকেত* চলচ্চিত্রর প্রধান উদ্দেশ্য। দারিদ্র্যের নির্মমতা অনেক সময় এই দিকটাকে আবৃত করে ফেলে। চরিত্রদের বাইরের রূপ এই চলচ্চিত্রে প্রায় দেখানোই হয়নি। ফলে দারিদ্র্যের বাহ্যিক নির্মমতায় দর্শকের মনে বিহ্বল হলে পড়েনি, আর সেজন্য দারিদ্র্যের মানসিক দিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই চলচ্চিত্রে। মেয়ের ছায়ায় একটা সহজাত বিষাদ আছে। যার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যের মানসিক বিষাদের প্রকাশ ঘটে। অবসন্ন দুর্ভিক্ষের অপেক্ষায় গঙ্গাচরণের মন ক্রমেই বিষাদে ভরে ছিল। শুধুমাত্র এই শৈল্পিক কারণের জন্য মেঘের ব্যবহার দেখানো হয়নি। এখানে একটি ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। ১৯৪৩ সালে খাদ্য সংকটের মধ্য দিয়ে যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল তার সময়কাল ছিল বর্ষকাল। চলচ্চিত্রটির অধিকাংশ দৃশ্য মেঘের ছায়া থাকার আসল কারণ এই বর্ষা।

অশনি সংকেত এ একটি মানুষের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর ব্যাপকতা এই চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু নয়। এর মূল বিষয় ছিল অপ্রত্যাশিত এক খাদ্য সংকট। আর এই সংকটের তিন-চার মাসে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভাঙ্গন। যেহেতু খাদ্য সংকটের বাস্তব সময়কে চলচ্চিত্রে ধরা হয়েছে তাই পুরো চলচ্চিত্রটি ধারণ

করা হয়েছিল মেঘলা আলোয়। সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র দুটি জিনিস কাজ করত- এক. উনি দেখতেন পরিস্থিতি যেন ইতিহাসের বিচারে সত্যি হয়, দুই. আবার সেই পরিস্থিতি যেন ছবির চরিত্রদের মানসিক অবস্থাটাও ফুটিয়ে তোলে। যে প্রতিবেশ এই দুটি শর্ত পূরণ করতে পারে একমাত্র সেই পরিস্থিতিকে তিনি বেছে নিতেন চলচ্চিত্রের পটভূমির জন্য। *অশনি সংকেত* এর '৪৩ এর খাদ্য সংকট বর্ষায় না হয়ে বাস্তবে যদি শীতকালে ঘটত তাহলে শুধুই বিষাদময় আবেগ তৈরির জন্য ছবিতে তিনি মেঘের ব্যবহার করতেন না। বাস্তব জীবনে এমন ঘটেছিল বলেই চলচ্চিত্রে তিনি মেঘ এনেছন।

চলচ্চিত্রের শিরোনাম (টাইটেল) দৃশ্যের আগেই দেখানো হয়েছিল ক্ষেত ভরা সবুজ ধান, গ্রামের ক্ষেতে লাঙ্গল টেনে চাষের জন্য জমি তৈরি করেছেন বাংলার কৃষক। তারপর দেখানো হয়েছিল আউশ ধান, রোদে ভরা স্থির ধানক্ষেত। ঝড়ের হাওয়া দোল খেয়ে নুয়ে পড়া ধানক্ষেত। এইসব শটের মধ্য দিয়ে বর্ষকালের সবুজ গ্রাম বাংলার চিত্র ফুটে ওঠেছে। কিন্তু আরেকটি শটে সবুজ ধানের উপর কালো মেঘের ছায়া দেখানো হয়েছে। সত্যজিৎ রায় বাস্তব রূপটি তুলে ধরতেন দক্ষ শিল্পীর ন্যায়। এই দৃশ্যটির মধ্য দিয়ে '৪৩ এর দুর্ভিক্ষের মূল কারণটি উদঘাটন করেছেন। বর্ষকালে আউশ ধানের ফলন ভাল ছিল তার পর দুর্ভিক্ষ হলো যা ছিলো শাসকগোষ্ঠীর তৈরি করা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। বর্ষার কালো মেঘটি এই শাসক শ্রেণীর একটি প্রতীকীরূপ।[১৭]

বর্ষায় উচ্ছ্বল প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর শোভা পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের ক্লান্তি রিমঝিম বৃষ্টির ফোটায় দূর হয়। জমিতে সবুজ শস্যের ফলন, বাসাতে সবুজ ফসলের দোলা লাগার দৃশ্য মানুষের মনে স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দেয়। কিন্তু পরিচালক বর্ষার বৈচিত্র্যতাকে সেভাবে দেখাননি। সেটা দেখালে চলচ্চিত্রটি তার মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যেত, হারিয়ে ফেলতো তার মূল সুর। পরিচালক মেঘের কালো ছায়া সমস্ত চলচ্চিত্র এটির মধ্যে রেখেছিল। আর তা বজায় রাখতে চলচ্চিত্রটির শুটিং করেছেন কম আলোতে। অর্থাৎ একেবারে খুব সকালে আর পরন্ত বিকেলে।[১৮]

পরিচালক শুধু সবুজ ফসলের উপর কালো মেঘের ছায়া ফেলে অশনি সংকেতের আভাস দেননি। তিনি চরিত্রের মধ্যে সেই প্রভাবটা বজায় রেখেছিলেন। ছবির শুরুতে আমরা অনঙ্গকে নদীতে স্নান করতে দেখি। নদীর জলে তার হাতের যে নান্দনিক খেলা তা দর্শকের মনে প্রশান্তির ভাব সৃষ্টি করে। কিন্তু আস্তে আস্তে সেই চরিত্রটির মুখের হাসি মলিন হয়ে যায়, চোখের নিচে মেঘের মতো কালো কালি পড়ে, যা মেঘেরই সাংকেতিক রূপ।

সত্যজিৎ রায়ের এই চারটি চলচ্চিত্রের মধ্যে বাংলা ঋতুর রূপের বৈচিত্র্যতার পাশাপাশি চরিত্রগুলোর অবস্থানগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্ষার সাথে বাংলার মানুষের মনের সম্পর্কটা বেশি গভীর সেজন্য চলচ্চিত্রগুলোতে বর্ষকালের প্রাধান্য বেশি পরিলক্ষিত। এছাড়াও শরৎ ও শীতকাল এসেছে। সত্যজিৎ রায় বাস্তবনির্ভর শিল্পী। বাস্তবতার নিরীখে ঋতুর আগমন এবং এর সাংকেতিকতা চলচ্চিত্রগুলোতে তিনি তুলে ধরেছেন। বস্তুত প্রত্যেকটি ঋতুকে তিনি একটি চরিত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। *পথের পাঁচালী*র সাদা কাশফুল যেন অপু-দূর্গার নিজস্বরূপ। আবার চৈত্রের বৃষ্টি যেন দূর্গার মৃত্যুর নিয়তি নির্ধারক। *তিনকন্যা*য় বর্ষার ব্রজপাত যেমন রতনের সেই রাতের একটি প্রধান প্রতিপক্ষ তেমনি সমাপ্তি মৃন্ময়ী ও অমূল্যের জীবনে বর্ষা একজন অভিভাবক এবং প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা অঙ্গন, ছুটকী ও গঙ্গাচরণের জীবনের কালো মেঘ। পরিচালক একজন স্বতন্ত্র শিল্পী। যে তাঁর মননশীল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পচেতনাকে তুলে ধরেন। সত্যজিতের এই শিল্প মানসিকতায় প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কটি বার বার প্রকাশ পেয়েছে। যার দক্ষ পরিচালনায় প্রকৃতি হয়েছে তাঁর চলচ্চিত্রগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

তথ্যনির্দেশঃ

[১]. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (প্রধান সম্পাদক), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০০), পৃ. ১১৭।

[২]. ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমায় ইমেজ*, (কলকাতা : বানীশিল্প, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ১১।

[৩]. চণ্ডী মুখোপাধ্যায়, *সিনেমায় রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সিনেমা*, (কলকাতা : প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০১৫), পৃ. ১১৩-১১৪।

[৪]. অসীম সোম, সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা, *শতবর্ষে চলচ্চিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, নির্মাল্য আচার্য ও দিবেন্দু পালিত সম্পাদিত, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্সস প্রা.লি., ২য় সংস্করণ, মে ২০০৫), পৃ. ৪৪১।

[৫]. পংকজ দত্ত, পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি : পথের পাঁচালী, *চলচ্চিত্র সমালোচনা*, অনুপম হায়াৎ সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কেন্দ্র, ১ম প্রকাশ ২০০৬), পৃ. ১৭।

[৬]. ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমায় ইমেজ*, (কলকাতা : বানীশিল্প, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ১৭।

[৭]. উজ্জ্বল চক্রবর্ত্তী, "অস্কার থেকে পাঁচালী" নতুন করে দেখা পথের পাঁচালী, *সানন্দা*, অপর্ণা সেনা সম্পাদিত, (কলকাতা : সানন্দা, ১৯৯৩), পৃ. ১২১।

[৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

[৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

[১০]. সত্যজিৎ রায়, *বিষয় চলচ্চিত্র*, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ১৯৯৭), পৃ. ১২১।

[১১]. সত্যজিৎ রায় পরিচালিত, *পথের পাঁচালী* (ডি.ভি.ডি), (কলকাতা : এঞ্জেল ডিজিটাল লিমিটেড), ২০১০।

[১২]. অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, *চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়*, (কলকাতা : প্রতিভাস, জুলাই ২০১২), পৃ. ৭৩।

[১৩]. অনিরুদ্ধ ধর, "অস্কার থেকে পাঁচালী", *সানন্দা*, অপর্ণা সেনা সম্পাদিত, (কোলকাতা : সানন্দা, ১৬ এপ্রিল ১৯৯৩), পৃ. ৮৮।

[১৪]. প্রাগুক্ত, (কোলকাতা : সানন্দা, ১৬ এপ্রিল ১৯৯৩), পৃ. ১০১।

[১৫]. অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, *চলচ্চিত্র সমাজ ও সত্যজিৎ রায়*, (কলকাতা : প্রতিভাস, জুলাই ২০১২), পৃ. ২৮৬।

[১৬]. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (প্রধান সম্পাদক), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.৬৭।

[১৭]. অনিরুদ্ধ ধর, অস্কার থেকে পাঁচালী, *সানন্দা* , অপর্ণা সেনা সম্পাদিত, কোলকাতা : সানন্দা, ৩১ মার্চ ১৯৯৫, পৃ. ৯১।

[১৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

শিক্ষায় নাট্যের ধারাপথ : প্রায়োগিক নির্মিতি

ড. মীর মেহবুব আলম*

Abstract : Joyful education merely gets a perfect form through teacher-students interactions and sharing experiences in both ways. In every processof education like formal, informal and non-formal dialogic and mirthful education system gets fullness and helpful for blooming humanity. In the teaching process of various philosophers of different ages were directly subsistent to create the joyful environment through dance-music-theatre. A trend has been observed presently in school and colleges to take opportunity of Theatre in Education [TIE] process to create a joyful and effective education for students. Theatre is capable to put a positive role on education considering its basic implementation characteristics. It may concuss and inspire both actors and teachers equally. Importantly it makes a way of meaningful connecting bridge between theatre and education. Its successful implementation can be able to put a positive role in the society, so alternative teaching process would be as an ineluctable part in the class room. Theoretical analysis, observation and empirical experiences are compiled in this article through examining the effectiveness and positivity of theatre in education in Bangladesh.

ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এ দু'য়ের পারস্পরিক চালিকাশক্তি রূপে 'শিক্ষা' পরিগণিত। শিক্ষা গ্রহণের ফলে সময়ের চলমানতায় মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারের যাবতীয় সঞ্চিতি তার সামনে উন্মোচিত হয়, তার চিন্তন বিকশিত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা তৈরি হয়। শিক্ষা জীবন ও জগত সম্পর্কে ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। এর ফলে ব্যক্তি নিজেও আলোকিত হয় ও তার মধ্যে উৎসারিত মানবীয় গুণাবলী ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর চিন্তা জাগরুক হয়। কেবল তখন কল্যাণকর রাষ্ট্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারে।

শিক্ষার গুণগত মান বিবেচনায় একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভরশীল। 'শিক্ষা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Learning, study, knowledge, art, skill, education, instruction, lesson, percept।'[১] আর 'Education এর অর্থ হচ্ছে Educe করা-প্রকাশ করা। ব্যক্তির মধ্যে যেসব ক্ষমতা সুপ্তভাবে আছে সেগুলোর সম্যক বিকাশ সাধন করা। এই হচ্ছে Education এর চরম আদর্শ।'[২] নিম্নরূপ উদ্ধৃতি থেকে শিক্ষার সংজ্ঞা পাওয়া যেতে পারে—

> Generally, by education we mean systematic training and instruction to the young in a school, college or any other recognized institute. To educate means to impart knowledge and abilities, development of character and mental powers resulting from teaching or training.[৩]

শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। 'একদল মনে করেন শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি, অপর দলের অভিমত হল শিক্ষার কেন্দ্রীয় স্থান দখল করবে সমাজ।'[৪] আবার কেউ কেউ এ রকম অভিমত দিয়ে থাকেন যে '[...] কেবল সংসারের প্রয়োজন মেটানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য।'[৫] শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বার্ট্রান্ড রাসেল [১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ] কর্তৃক নির্দেশিত শিক্ষার তিনটি তত্ত্ব প্রণিধানযোগ্য—

---

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> প্রথম তত্ত্বটি অনুসারে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হলো ক্রমোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা, আর উক্ত সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রভাব দূর করা। দ্বিতীয়টি অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য প্রতিটি ব্যক্তিকে সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা এবং ব্যক্তির দক্ষতার সর্বোচ্চ বিকাশ। তৃতীয়টি অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, গোটা সম্প্রদায় এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে কেজো নাগরিক তৈরী করা।[৬]

শুধু পাঠমুখস্থ করা ও পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনেও শিক্ষায় অপূর্ণতা থেকে যায় এবং 'জীবনের' বিশাল দিকটি অনাবিষ্কৃত থাকে। 'যে কারণে কিশোর রবীন্দ্রনাথ [১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ] একদিন স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্ক্যান্ডিনেভীয় শিক্ষাবিদ নিকোলাই সেভেরিন গ্রুন্ডভিগ [১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ] এ ধরনের মুখস্থ বিদ্যার স্কুলকে আখ্যায়িত করেছিলেন "*কৃষ্ণ স্কুল*" (*The Black School*) নামে [...]।'[৭] একই সাথে এ ধরনের স্কুল 'শিক্ষার যা মূল উদ্দেশ্য মানুষকে কৌতূহলী করে তোলা, তা এ শিক্ষা দিতে সক্ষম ছিল না। গ্রুন্ডভিগ এ ধরনের শিক্ষাকে তাই আখ্যায়িত করলেন "*মৃতের স্কুল*" (*School for Death*) বলে [...]।'[৮] তিনি *ফোক হাই স্কুল* (*Folk High School*) বা এক ধরনের গণবিদ্যায়ের ধারণা সামনে আনলেন যেখানে ছাত্রদের চেতনাবৃদ্ধিই হবে মূল কাজ, পরীক্ষাগ্রহণ বা সার্টিফিকেট প্রদান নয়। তিনি ফোক হাই স্কুলগুলোকে এমনভাবে দেখতে চেয়েছিলেন যে কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে যথার্থভাবে শিক্ষার আলো প্রদান করে তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা হবে এবং তারা সমাজের অন্যান্য শ্রেণির সঙ্গে সমপর্যায়ে চলাফেরার উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে। ডেনমার্কে প্রথম গণবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৪৪ সালে। পরবর্তীতে তা নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানি, আমেরিকা, তানজানিয়া, ফিলিপাইন, ভারত ও বাংলাদেশে প্রসার লাভ করে। গ্রুন্ডভিগ ও তাঁর গণবিদ্যালয়ের সাথে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তা বিষয়ক উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যেতে পারে—

> রবীন্দ্র শিক্ষা ভাবনায় মূল কথা হলো বিদ্যায়তনের দেয়ালে আবদ্ধ শিক্ষাদান আনন্দময় ও সৃষ্টিশীল হতে পারে না...এবং সমগ্র মানব সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে বিশ্বমানবকে ধারণ না করে প্রকৃত সত্য বা জ্ঞানকে স্পষ্ট করে চেনা যায় না।... আনন্দময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিদ্যাচর্চার ও শিক্ষার যে ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যাচর্চা ও জীবনচর্চাকে একাত্ম করে তোলা। তাঁর কাছে বিদ্যাচর্চা হলো জীবন চর্চার নামান্তর- তাই শান্তিনিকেতনকে ঘিরে তিনি এক জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন- যে জীবন থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রছাত্রীরাই উপকৃত হবে না, শিক্ষকরাও শিখবে।[৯]

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষকরাও শিখবে', গ্রুন্ডভিগ এর 'dialogue' কিংবা ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরের [১৯২১ খ্রিস্টাব্দ-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ] 'dialogic process of education' একই দিককে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত মানুষের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা। একটি সভ্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌল দায়িত্ব হওয়ার কথা ছিলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মেধা বিকাশের যে কার্যক্রম চালু রয়েছে তাতে সকল শিশুকে বিকাশের সমান সুযোগ করে দেয়ার। অর্থনীতিবিদ থমাস রবার্ট ম্যালথাসের [১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ] চাহিদার সূত্রের সাথে সমাজ ও সমাজের চাহিদার সম্মিলন ইতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যায়িত। তেমনি করে শিক্ষা প্রদানের সনাতন প্রাইমারি স্কুল থেকে উদ্ভব হয়েছে কিন্ডার গার্টেন, ফ্রবেল কিংবা মন্তেসরি স্কুল, শিশুকানন কিংবা ক্ষুদে পন্ডিতদের পাঠশালার মতো শিক্ষায়তন। কিন্ডার গার্টেন ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যায়িত করা হয় নিম্নরূপে—

> কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা পদ্ধতির মূল কথা হলো- শিশুর সার্বিক, সর্বাঙ্গীন ও সাবলীল বিকাশ সাধন। শিশুরা নিজ হাতে কাজ করবে, ছন্দের আনন্দে গান করবে, তাদের শরীর ও মনের বিকাশ ঘটবে এক সঙ্গে। শিশুদের এই Psycnomotor activities কে ফ্রবেলের [১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ-১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ] ভাষায় বলা হয় Occupations। প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য ফ্রবেলের এ পদ্ধতির অন্য একটি উদ্দেশ্য হল, শিশুদেরকে বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। ফ্রবেলের এই পদ্ধতিকে একটু পরিবর্তন সাধন করে পরে শিক্ষা পদ্ধতিতে যে নতুন ধারা আসে তার নাম মন্তেসরি [১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ] পদ্ধতি।[১০]

কিন্তু গবেষকগণের অভিমত কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলো মূলত ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে তার কার্যক্রম পরিচালিত করছে। শিক্ষাকে আনন্দপ্রদ করার ক্ষেত্রে বার্ট্রান্ড রাসেলের চিন্তা এখানে উল্লেখ করা যায়—

> আমি বিশ্বাস করি যে, ব্যাপক সৌন্দর্যবোধ সম্বলিত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের শেখানো যায়। যেমন-নাচ ও গান। [...] শিশুদের স্কুল জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরে নৃত্য অনুশীলনের জন্য কিছুটা সময় রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, নৃত্য অনুশীলন শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো এবং নৃত্য শিশুদেরকে প্রচুর আনন্দ দেয়ার বাইরেও তাদের মনে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করে। [...] এ ধরণের ব্যবস্থা গান গাওয়ার ক্ষেত্রেও নেয়া যেতে পারে।[১১]

বলা প্রয়োজন যে '[...] শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে গ্রুন্ডভিগ আরেকটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন, তা হচ্ছে সঙ্গীত। [...] ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে শিক্ষার অভিজ্ঞতাটা হওয়া উচিৎ একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা।'[১২] এ প্রসঙ্গে জার্মান নাট্যকার, নির্দেশক ও নাট্যতাত্ত্বিক ইউজিন বার্টোল্ট ফ্রেডেরিক ব্রেখটের [১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ] গ্রহণযোগ্য ভাবনা— শিক্ষা হতে হবে আনন্দদানের মাধ্যমে আমাদেরকে সমভাবে ভাবিয়ে তুলে।

জীবনের প্রথম কটি বছর শিশুর মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'যদি পাঁচ থেকে ছয় বৎসর পর্যন্ত কোনো শিশু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী জীবনে যে কোনো ভালো শিক্ষকই তার শিক্ষার আগ্রহকে উদ্দীপিত করতে পারবেন।'[১৩] শিশুর এই ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার প্রথম পর্যায় পরিবারকে কেন্দ্র করে এবং দ্বিতীয় পর্যায় প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মানুষের জীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করলে দেখতে পাবো এর প্রথম স্তরে আছে পারিবারিক জীবন, দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষাজীবন এবং সর্বশেষ কর্মজীবন। শিশুরা তার জীবনের প্রথম চার বছরে তার পরিবার এবং আশপাশ থেকে যা শেখে পরবর্তী বারো বছরেও তা শিখতে পারে না। একটি শিশুর জীবনের প্রথম পাঠ শুরু হয় তার জীবনকে ঘিরে থাকা তার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন এদের কাছ থেকে। পরবর্তীতে একটি শিশু যখন শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করে তখন গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষা ও পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর সাথে সুবিধা বঞ্চিত শিশুর পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সৃষ্টিলগ্ন থেকে পারিবারিক পরিমণ্ডলই ছিলো শিশুর শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান; শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হতে স্কুলে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার যে সময়টুকু তার গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। এই শিক্ষা পরবর্তী একজন মানুষের শিক্ষাজীবন-কর্মজীবন এক অর্থে সারাজীবন প্রভাব ফেলে। যেমন এ ক্ষেত্রে গ্রিকের সমাজ সম্পর্কে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যে— 'গ্রিকেরা কেতাব পড়িয়া অতি অল্প শিখিত। কথাবার্তা, নাট্যশালা, সভাগৃহ প্রভৃতি হইতে তাহাদের শিক্ষা হইত। [...] তাহাদের নাটক, তাহাদের কাব্য, তাহাদের ভাস্কর কার্য, তাহাদের রুচি শিক্ষার উৎকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে।'[১৪]

শিক্ষার দুটি প্রধান লক্ষ্য। প্রথমটি ব্যবহারিক ও জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা এবং দ্বিতীয়টি জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা। জীবনের দ্বিতীয় স্তরে একজন মানুষকে পরিবারের গণ্ডি ছেড়ে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, এর নিয়মনীতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়। তার প্রথম সোপান 'স্কুল'। 'এই transition period এ স্কুলকেই শিশুর অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। [...] স্কুলের নির্দিষ্ট আইন কানুনকে মেনে চলতে শেখার মাধ্যমে শিশু বৃহত্তর সমাজের নিয়ম নীতিকেই শ্রদ্ধা করতে শিখে।'[১৫] এভাবে শিশু মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে শুরু করে, তার মধ্যে নৈতিকতা, চরিত্র ও বৃহৎ অর্থে মূল্যবোধ সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা পুঞ্জীভূত হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এই পর্ব শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত ইঙ্গিতবহ। কারণ ভবিষ্যতের চলার পথে শিক্ষায়তনের এই শিক্ষাই একজন শিক্ষার্থীর সাফল্য ও ব্যর্থতার ভিত্তি নির্মাণ করে। মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয় তা হলো 'মূল্যবোধ'। সামাজিক জীব হিসেবে রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের লেখাপড়া ও হিসাব নিকাশের পাশাপাশি তার রাষ্ট্রীয় পরিচালনা নীতি, সামাজিক অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সুন্দর জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান এ ধরণের শিক্ষা কার্যক্রমে ভূমিকা থাকে।

যে কোনো ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষার নানা বিষয়, উপকরণ, উপাদান ব্যক্তিকে আলোকিত করে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক এবং জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এ শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যে কোনো বয়সে হতে পারে এবং নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য এই শিক্ষা অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষার মূল কথা হলো প্রয়োগ ধর্মিতা। M. Miravalis এর বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশে Formal, Informal এবং Non-formal Education ব্যবস্থা নিম্নরূপ—

> Government of Bangladesh, focuses on non-formal education, which it defines as an organized educational program outside the purview of formal education undertaken for special section of the population. The directorate defines formal education as that imparted at various grades in different levels of educational institutions. On the other hand, informal education is knowledge, skill or behavior, which every person learns all through his/her life.[১৬]

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় শিশুর কাছে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করলে, সে নিজের পছন্দমত কাজ করার সুযোগ পেলে তখন শিক্ষা তার উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সেক্ষেত্রে বলা যায় শিক্ষকের পাঠদানে কৌশলের অভাবই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। শিশুরা যেখানে আনন্দ পায় সেখানে তারা বারবার ফিরে যায়। তাই শিক্ষাকে আনন্দদায়ক উপায়ে বিনিময় [Dialogic] করলে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলবে। Dialogue এর আভিধানিক অর্থ 'সংলাপ, কথোপকথন বা মতবিনিময়'।[১৭] গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল [৩৮৪ খ্রিস্টপূর্ব-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব] নাটকের ছয়টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে 'সংলাপ' চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে।[১৮] শ্রেণি কক্ষে বা পাঠদানের ক্ষেত্রে উন্নয়ননাট্য [Theatre for Development] শৃঙ্খলার 'সংলাপ' প্রক্রিয়াকে এখানে প্রয়োগ এর দৃষ্টান্ত তৈরি করা যায় এভাবে—"এই সংলাপ একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বাস্তবতায় কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে একাধিক মানুষের 'কথন'। যার মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়ের পুংখানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ঐ নির্দিষ্ট বাস্তবতায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট মানুষের নিজস্ব বোধকে জাগ্রত করা এবং তাকে কার্যকরী ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা।"[১৯] পাওলো ফ্রেইরের মতে dialogue—'is the encounter between men, mediated by the world.'[২০] তাঁর Dialogic process of education বা সমস্যা চিহ্নায়ন শিক্ষা পদ্ধতিকে তিনি একে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করেছেন—

> [...] problem-posing education, breaking the vertical patterns characteristic of banking education...Through dialogue, the teacher-of-the-students and the students-of-the-teacher cease to exist and a new term emerges: teacher-student with students-teachers. The teacher is no longer merely the-one-who-teaches, but one who is himself taught in dialogue with the students, who in their turn while being taught also teach. They become jointly responsible for a process in which all grow....Men teach each other, mediated by the world, by the cognizable objects, which in banking education are 'owned' by the teacher.[২১]

শিক্ষা প্রদান বা শিক্ষাকে আনন্দদায়কভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সময়ে একপ্রকার শিল্প বললে অত্যুক্তি হবে না। গ্রুন্ডভিগ যেভাবে ভেবেছেন তা হলো—

> তাঁর শিক্ষাচিন্তায় যে জিনিসটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনলেন তা হচ্ছে সংলাপ [dialogue]। [...] শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিৎ পারস্পরিক সংলাপ। শিক্ষার বাহন হবে দ্বিমুখী-ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ঘটবে পারস্পরিক চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান। এক ধরণের অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা পদ্ধতি [Participatory method of education], যে পদ্ধতিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের উভয়েরই

> সক্রিয় অংশগ্রহণ রইবে। আর এজন্যে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শিক্ষক ছাত্রদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত যে উর্ধ্বতনতা- অধস্তনতা [hierarchy] রয়েছে তা পুরোপুরি ভেঙ্গে ফেলা। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে এ ধরণের অধস্তনতা মোটেই কাম্য নয় বলে গ্রুন্ডভিগ মনে করতেন।[২২]

শিক্ষা প্রসারকল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০ খ্রিস্টাব্দ-১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ] অবহেলিত জনগণকে নিয়ে কাজ করেছেন। '[...] শিক্ষা সম্পর্কে [...] আধুনিক যেসব ধ্যান ধারণা বা নতুন চিন্তার কথা আমরা শুনতে পাই তার অনেক কিছুই হয়তো আমাদের কাছে নতুন নয়।'[২৩] ফ্রেইরের education of liberation "বা 'মুক্তির ধর্মতত্ত্ব'র [liberation theology] যে ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তা দেশে দেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা গ্রুন্ডভিগ নামক স্ক্যান্ডিনেভীয় এই ধর্মযাজকটির শিক্ষাচিন্তার অনেক উপাদানই ধারন করে বিকশিত হয়েছে।"[২৪]

শিক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে মারিয়া মন্তেশ্বরী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার সামঞ্জস্য বিদ্যমান সুইজারল্যান্ডের Johann Heinrich Pestalozzi [১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দ-১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ], ফ্রান্সের Jean Marc Gaspard Itard [১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ-১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ], অস্ট্রিয়ার Sigmund Freud [১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ] এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের John Dewey [১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ]- এর ভাবনার মধ্যে। মন্তেশ্বরী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিটি শিশুর মধ্যে অনন্য ব্যক্তিত্বের উদ্ভবের প্রচেষ্টায় শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা প্রদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। দুজন শিক্ষাবিদই শিশুর আত্মপ্রকাশ, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং মানসিক স্বায়ত্তশাসন বা বিকাশে শিশু অধিকার স্বীকৃত নতুন শিক্ষণ প্রণালীর সুপারিশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যুক্তিভিত্তিক অনুষদগুলিকে বিশ্বজগতের স্বাধীনতার আলোকে সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে লালন করা, বিশ্বে বিরাজমান শিল্পের আলোকে কল্পনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা এবং মানব সম্পর্কের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আনন্দচিত্তে শিক্ষার পরিপোষণ করা জরুরি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'Among other subjects learnt in the open air under the shade of trees they had their music and picture-making; they had their dramatic performances, activities that were the expressions of life.'[২৫] তাঁর শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য পঠিত বিষয়ের মতো খোলা পরিবেশে, বৃক্ষের ছায়ায় মুক্ত বায়ুতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গীত চর্চা, ছবি আঁকার অভ্যাস আয়ত্ত করা এবং নাটকীয় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জীবনের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ১৯০২ সালের শিক্ষা ভাবনায় শিশুর মানসিক বিকাশের প্রয়োজনে মুক্ত মনে মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ এবং আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলতে নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে পাঠদান কৌশলকে সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এখানে তাঁর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে— 'I should think the tradition of play-acting at Santiniketan had its beginning … when *Visarjan* was staged by the Asrama in the winter of 1902. We had at that time […] compensated for by ardour and enthusiasm.'[২৬] স্কুলে পাঠদান কার্যকলাপে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি তরুণ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল আত্ম-প্রকাশকে উৎসাহিত করেছে। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার মূলনীতিগুলোর অন্যতম ছিলো শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত নাটকসমূহ মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে অবচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণে আকৃষ্ট করা। পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ তাঁর স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত অংশ বলে বিবেচ্য। অর্থাৎ—

> […] aspect of the school activity, which fostered creative self-expression of the young children. […] staging of plays facilitated the subconscious assimilation of ideas which was one of the root-principles of Rabindranath's method of education. Play-acting was an inherent part of education at the school.[২৭]

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হওয়া উচিত; যেখানে জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সুর এবং ছন্দ তৈরি হবে। শিক্ষা বিষয়টি শ্রেণিকক্ষ নামক খাঁচাবন্দি বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে না। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সম্পূর্ণ মানুষ', 'শাশ্বত মানুষ' এবং 'সার্বজনীন মানুষ'—একের মাঝে সকল সত্তার উপস্থিতির উপলব্ধি সম্পন্ন মানুষ। সমসাময়িক শিক্ষাবিদদের আধুনিকতাবাদী এবং উত্তরাধুনিকতাবাদী তাত্ত্বিকেরা যেখানে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধারণা, প্রকৃতির সাথে জীবন সম্পৃক্ততা এবং জীবন সম্পৃক্ত শাশ্বত-আনন্দদায়ক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। বিষয় সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্র গবেষকের উক্তি—'The modernists and post-modernists of contemporary education continue their battles on the theoretical field, while Tagore […] his ideas with reality, people with nature and education with life.'[২৮]

অষ্ট্রিয়ার তাত্ত্বিক-দার্শনিক আইভান ইলিচের [১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ-২০০২ খ্রিস্টাব্দ] শিক্ষা প্রদানকারী 'ডি-স্কুলিং'[২৯] ভাবনা এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। একই বিষয়ে সমার্থক চিন্তা উপস্থাপন করেছেন Paul Goodman [১৯১১ খ্রিস্টাব্দ-১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ], John Caldwell Holt [১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ], George Dennison [১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ], Richard Farson [১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ] Neil Postman [১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ], John Taylor Gatto [১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ-] প্রমুখ। ডি-স্কুলিং বা 'বিকল্প' কিংবা 'অনুকল্প' শিক্ষা ভাবনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতায় পাঠ্যক্রমবিহীন শিক্ষাগ্রহণ পর্ব—'the transfer of education to non-institutional systems'[৩০] অর্থাৎ 'to separate education from the institution of school and operate through the pupil's life experience as opposed to a set curriculum.'[৩১]

শিক্ষা প্রসঙ্গে ইলিচের লক্ষ্য ছিলো পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোগত বিশ্লেষণ ও এর কঠোর সমালোচনা করা।[৩২] তিনি বলেছেন স্কুলগুলোতে পাঠদান প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের মাঝে ভালোভাবে জ্ঞান বিতরণ করতে পারেনা, তাদের মাঝে নতুন কোনো চিন্তা যোগায় না। বরং তাদের সন্দিহান ও বিশৃঙ্খল করে তোলে আর শিক্ষার্থীদের কেবল ভালো ফলাফল ও উন্নতির পথ দেখায়। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে শিক্ষণের এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা অধিকতর স্বাধীনভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। যেমন বলা হয়েছে—'The action or process of transferring the function of education within a society from conventional schools to non-institutional systems of learning which are held to allow the student to develop more freely.'[৩৩] তিনি ডি-স্কুলিং বা অনুকল্প শিক্ষা ভাবনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছেন প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদান প্রকৃতির পরিবর্তন, আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বতঃস্ফূর্ত সেবার মাধ্যমে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার তিনটি উদ্দেশ্য। যথা—সীমিত সম্পদের মধ্য থেকে আগ্রহী সবার জন্য তাদের জীবদ্দশায় শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া; শিক্ষার জ্ঞান বিতরণ ও বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণে আগ্রহী সকলকে শিক্ষালোকিত করে ক্ষমতায়ন করা এবং নির্দিষ্ট কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে যারা জনসাধারণের জন্য কিছু করতে চায়, তাদের সেই করতে চাওয়া বিষয়কে যথাযথ মূল্যায়ন করবার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়া। আইভান ইলিচ বলেছেন—

> […] it should provide all who want to learn with access to available resources at any time in their lives; empower all who want to share what they know to find those who want to learn it from them; and, finally, furnish all who want to present an issue to the public with the opportunity to make their challenge known.[৩৪]

আইভান ইলিচের মূল ভাবনাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে যে, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় গড়ে উঠা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মানুষ নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়। স্কুলও এর বাইরে নয়। স্কুলের সাথে সম্পৃক্ততার ফলে

মানুষের আত্মবিশ্বাসের পথ সংকীর্ণ হতে শুরু করে এবং জীবনের আনন্দদায়ক পথগুলো সংকীর্ণ হতে হতে তার সমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ হয়। এবং একসময় সে একপ্রকার যন্ত্রের রূপ ধারন করে। এরূপ অবস্থা নিরসনের জন্য পারস্পরিক বিনিময় প্রয়োজন। শিক্ষা কেবল আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পারস্পরিক যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে পরিপূর্ণ রূপ পায়। ইলিচের ভাবনার 'লার্নিং ওয়েবস', 'ফ্রি স্কুলিং', 'ফরমাল-ইনফরমাল-ননফরমাল এডুকেশন' কিংবা 'ডি-স্কুলিং'— সকল পদ্ধতিতে সংলাপাত্মক ও আনন্দদায়ক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা পূর্ণতা পায় এবং মানুষকে বিকশিত হতে সাহায্য করে।

'Homeschooling' অর্থাৎ 'গৃহশিক্ষণ বা পারিবারিক শিক্ষায়তন'। গৃহশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির অংশ 'শিশুদের স্কুলে প্রেরণ না করে শিক্ষণ প্রক্রিয়া' [unschooling][৩৫]। শিক্ষণ দার্শনিক জন হল্ট ১৯৭০ সালে এই শব্দটি প্রয়োগ করেন। এটি এমন একটি শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষা দর্শন যা শেখার জন্য প্রাথমিক উপায়ে নির্বাচিত উপকরণ ও মাধ্যমগুলির উপদেশ দেয়। সে সময় জনসাধারণের মধ্যে গৃহশিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা প্রসঙ্গে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুদের উৎসাহিত করে নিজেদের দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমগুলির গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করবার এবং বিশ্বাস করায় যে প্রয়োগকৃত পদ্ধতিতে তাদের ব্যক্তিগত শিক্ষণ হচ্ছে, যা অধিক অর্থপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল। এটি এমন এক ধরনের জীবনপ্রণালী যা শিশুর জন্য সত্যিকারে উপযোগী। কিন্তু এ পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত বিষয় গ্রহণ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের ব্যবহার, প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ এবং শিশুদের প্রথাগত স্কুলে পড়ানোর অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাগুলো সম্পর্কে অনিবার্যভাবে প্রশ্ন থেকে যায়।

সমালোচকরা এই শিক্ষণ পদ্ধতিকে একটি প্রান্তবর্তী শিক্ষাদর্শনরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাদের অভিমত এ পদ্ধতির শিক্ষাগ্রহণকারী শিশুদের সামাজিক কাঠামো, দক্ষতা এবং অনুপ্রেরণা শিক্ষায়তনে শিক্ষাগ্রহণকারীদের থেকে সংকীর্ণ থাকবে। অন্যদিকে এই শিক্ষণ পদ্ধতির সমর্থক এবং প্রবক্তাগণ একেবারেই বিপরীত কথা বলেন যা সত্যতায় পর্যবসিত। তাদের অভিমত: একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে স্ব-পরিচালিত শিক্ষা শিশুকে 'বাস্তব জগৎ' পরিচালনা করার জন্য নিজেকে উন্নত করে তোলে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্টের মতে- '[…] self-directed education in a natural environment better equips a child to handle the æreal world".'[৩৬]

Unschooling এর অর্থ না শেখা নয় এটি এমন এক শিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে স্কুলের ফাঁদে আটকানো ছকবাঁধা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে কোনো কিছু ভুলে যাওয়া কিংবা শিক্ষাদীক্ষাহীন অশিক্ষিত থাকা নয়। এটি কেবল স্কুলে পাঠানো হয়নি এমন শিক্ষণ পদ্ধতি যা গতানুগতিক শিক্ষার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ শেখার প্রবণতাকে ইঙ্গিত করে। শিশুরা যখন অধিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন তারা আরো স্বাধীনতা লাভ করে। এভাবে তারা পরিপক্ক হয়ে বেড়ে ওঠে এবং ভালো সিদ্ধান্ত নিতে শেখে। এটাই জীবন। এটাই এই পদ্ধতির অগ্রগতির পথনির্দেশ।

শিশু তথা প্রত্যেক মানুষ অমিত সম্ভাবনাময়। এই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিবাচক বিবেচনায় প্রত্যেকের সীমাহীন-অপরিমিত সম্ভাবনাকে উদঘাটন ও প্রকাশ করবার জন্য শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলমুক্ত করে ছেড়ে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। Unschooling শিক্ষণ পদ্ধতিতে বলা হয় 'শিশু নেতৃত্বাধীন শেখার' [child-led learning][৩৭]। শিরোনামটি সুপারিশ হিসেবে প্রাপ্তবয়স্কদের নির্দেশ ছাড়া শিশুদের নিজের আগ্রহে, নিজের গতিতে নিজেদের স্বার্থ অনুসরণ করতে অনুমতি দেয়। এই অর্থে বাবা-মায়েরা শিক্ষকদের মতো না হয়ে, শিশুদের কি কি বিষয় আগ্রহী করে তোলে সেগুলোর পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের আলোকে শিশুদের আগ্রহের পরিপূর্ণ বিকাশে সেই পরিবেশ এবং সম্পদের যোগান দিতে সহায়তাকারী হিসেবে অবতীর্ণ হন। এই পদ্ধতির শিক্ষার্থীরা শিক্ষিত বা প্রশিক্ষিত নয়; খুব সামান্য বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণও নয়।

শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জীবনাভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু হয় যেখানে সম্পৃক্ত নাটক, ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং কৌতূহল, কর্মঅভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, বইপত্র, ঐচ্ছিক পাঠগ্রহণ, বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতার সংস্পর্শ, পারিবারিক নানা দায়িত্ব পালন এবং সামাজিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। দেখা যাচ্ছে, জন হল্টের বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেও আনন্দদানকারী পন্থায় পাঠদান তথা নাটকের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান ছিলো। উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী '[…] students learn through their natural life experiences including play, […].'[৩৮]

শিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করার জন্য বর্তমানে স্কুল কলেজে নাটকের মাধ্যমে শিক্ষাদান করবার একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টাটিকে extra curricular activities হিসেবে চর্চা না করিয়ে যদি co-curricular activities হিসেবে চর্চা করা যায় তাহলে এর মাধ্যমে বেশ সুফল আনয়ন করা যেতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই থিয়েটার প্রক্রিয়াকে Theater in Education [TIE][৩৯] নামাঙ্কিত করে ইংল্যান্ডে বেলগ্রেড থিয়েটার ১৯৬৫ সালে[৪০] এই কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। পরবর্তীতে এই ধারণার প্রয়োগ প্রসার লাভ করে।

'শিক্ষায় নাট্য' [TIE] একটি নাট্যান্দোলন এবং নাট্যিক পদ্ধতি যা সমসাময়িক নাট্যের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বকারী উন্নয়ন বলে বিবেচিত। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে দেখা যায়, এটি অভিনেতা ও শিক্ষক পরস্পরকে সমরূপে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করেছে, কিংবা কখনও কখনও বিচলিত করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এটি 'নাট্য' এবং 'শিক্ষার' মাঝে গূঢ়-অর্থপূর্ণ সেতু নির্মাণের একটি উপায় তৈরি করে দিয়েছে। প্রয়োগ কৌশল আর সম্ভাব্যতা বিবেচনায় শিক্ষায় নাট্য গভীর চিত্তাকর্ষক ও সংপ্রশ্ন উপায় অবলম্বনের অভিজ্ঞতা দেয় এবং নাট্যের জন্য যেকোনো একটি মনোনীত বিষয়ে তদতিরিক্ত কর্মপ্রেরণার যোগান দেয় সেগুলো হতে পারে স্থানীয় ইতিহাস, বর্ণবাদ, পরিবেশ, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বা ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে। শিক্ষায় নাট্য অপরিহার্যরূপে শিক্ষা পরিষেবায় নাট্যের কাল্পনিক ক্ষমতা, কৌশল ও কার্যকারিতাকে অনুধাবন এবং উদ্ভাবন করতে চায়। এই নাট্য প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান এবং সবচেয়ে কার্যকর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নাটকীয়ভাবে শিশুদের কাঠামোবদ্ধ সক্রিয় অংশগ্রহণ। নাট্য ঘটনায় বারংবার তাদের অংশগ্রহণ করানো যেন তারা উপস্থাপিত বিষয়ে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে পারে; চলমান নাটকের সংকটকালীন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে চরিত্রগুলোর সাথে পারস্পরিক 'সংলাপ' বা 'মতবিনিময়' করার অভ্যস্থতা অনুশীলন করতে পারে। এমনকি শিশুদের সামনে উপস্থাপিত পূর্বোক্ত নাট্য ঘটনার বয়স্ক বয়সের চরিত্রের জন্য কোনো পরামর্শ পর্যন্ত এই নাট্যের অনুশীলনের অংশ বলে বিবেচ্য। দেখা যাচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নাট্য তথা নাট্যের ব্যবহারের অনুসন্ধান এবং শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত দর্শকের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াও জড়িত। অর্থাৎ শিক্ষায় নাট্য '[…] to the exploration of theatre's use as an educational medium, and to ways of actively engaging in the learning process.'[৪১]

শিক্ষায় নাট্য কর্মপ্রক্রিয়া কোনো স্কুল আয়তনে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকের প্রদর্শনী নয়। কিংবা এটি এমন কোনো নাট্যপ্রদর্শনী নয় যে আজ এখানে আর আগামীকাল ভিন্ন কোনো স্থানে এর প্রদর্শনী হবে। সাধারণত কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সযত্নে গঠিত কর্মকাঠামো, সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত গবেষণার দ্বারা শিশুদের পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট বা তাদের জীবনঘনিষ্ঠ প্রাসঙ্গিক বিষয়কে কেন্দ্র করে স্কুল আয়তনে শিক্ষার্থীদের সরাসরি সম্পৃক্ত করে নাট্য ঘটনার উপস্থাপিত অবস্থা বা বিষয়ের চিহ্নিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাদের অভিজ্ঞতার অর্জন হয়। এটি সাধারণত নাট্যের বিভিন্ন উপাদানের সঠিক বিন্যাস ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তার ব্যবহার করে। প্রচলিত নাট্যের যেসব উপাদান যেমন চরিত্রাভিনয়, সংলাপ, পোশাকের ব্যবহার, দৃশ্যসজ্জা এবং আবহসঙ্গীতের প্রয়োগ থাকে। শিক্ষাদান-সংক্রান্ত নাট্যে শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, চরিত্রের প্রবেশ বা প্রস্থান, তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত নাট্যিক কার্যকলাপ যার মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থানগত স্তর, ধারণা ও চিন্তার

বহিপ্রকাশ ঘটে। সর্বশেষ, অনুকরণের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত চরিত্রের ভূমিকা উপস্থাপন এবং বাস্তব জীবনের কোনো পরিস্থিতির অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়াটি চলমান থাকে। 'শিক্ষায় নাট্য' বৃহত্তর নাট্যকলা বিষয়ের প্রায়োগিক একটি শাখা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। আর তাই তাত্ত্বিক নির্মিতির পাশাপাশি শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভাবনায় শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষাবিদগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সফলভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগে সমাজ কাঠামোতে নাট্য যেমন ভূমিকা রাখতে পারবে, তেমনি করে শ্রেণি আয়তনে বিকল্প ধারার পাঠদান প্রক্রিয়ায় 'শিক্ষণ নাট্য' অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষক Tony Jackson এর অভিমত তুলে ধরা যায়—

> TIE has appeared increasingly as a subject on drama and education syllabuses in higher education, offering as it does a valuable way in, practicallyand theoretically, to the study of key questions about the role of theatre in society, as well as alternative approach to educational drama in the classroom.[৪২]

পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা-১। 'প্রতিজ্ঞা পরিষদ' কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানটির কর্ম এলাকা। ২০০৩ সালের ৮ মার্চ থেকে এর মূল [mother] সংস্থার বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী সুবিধাবঞ্চিত স্কুল থেকে ঝরে পরা তরুণ-তরুণীদের সাথে প্রথম ধাপে পরীক্ষামূলকভাবে তিন মাসের নাট্য প্রশিক্ষণ পর্ব পরিচালনা করে। এই প্রশিক্ষণের সম্ভাব্যতা ও ইতিবাচক ফলাফলের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ও দাতা সংস্থা 'ডানিডার' আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয় এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান [sister concern] 'স্পেইস' [School of Performing Arts for Community Empowerment]। পরবর্তীতে সংস্থার চলমান শিক্ষার্থীদের সাথে ও নাট্য প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু করা হয়। দু'ভাগে বিভক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞান বিবেচনায় পাঠ পরিকল্পনা [module] তৈরি হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের দিয়ে 'ক্লাস প্রেজেন্টেশন থিয়েটার' কিংবা বাছাইকৃত বিষয়কে নিয়ে নির্মাণ করা হয় নাট্য প্রযোজনা। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *প্রভাতী*, *গল্পগাঁথা*, *বিয়ের আসরে*, *প্রতিবিম্ব*, *মানুষের পালা* এবং *নির্বাচন বচন*। প্রযোজনাগুলো সংস্থার শ্রেণি কক্ষে, কর্ম পরিধির বিভিন্ন স্কুলে, বাড়ির আঙ্গিনায় ও খোলা মাঠে শতাধিক প্রদর্শনীর আয়োজনসহ পরবর্তীতে অভিনেতাদের দিয়েই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 'ফলো-আপ' কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়।[৪৩] ২০১৮ সালে পর্যবেক্ষণের আলোকে দেখা যায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী থিয়েটার শিল্পের পাঠগ্রহণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও সফলতার গল্পও কম নয়। কেউ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঙ্গীত বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, কেউ কেউ সঙ্গীত কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন, বহুজন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এস.সি., এইচ.এস.সি., ও স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে উল্লিখিত সংস্থায় এবং সংস্থার কর্ম এলাকায় সম্মানজনক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত, প্রতিষ্ঠিত ও আলোকিত নাগরিক। নির্দ্বিধায় বলা যায় সুবিধাবঞ্চিত ঝরে পরা স্কুল তরুণ-তরুণীদের পক্ষে এসব সম্ভব হয়েছে নাটকের আলোকিত শিক্ষাদর্শনে নিজেকে উৎসর্গ করবার ফলে।

পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা-২। ঢাকার প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'পালাকার'। নাট্যকলা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তিনজন প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যকর্মীর উদ্যোগে ২০০২ সালের ১৪ এপ্রিল দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নাট্যদলটি নানারকম পরীক্ষামূলক কাজের উদ্যোগ নেয়। ২০০৩ সালে গৃহীত 'ক্লাস এ্যাক্ট' কার্যক্রম এগুলোর অন্যতম। নামকরণ থেকেই ধারণা পাওয়া যায় শ্রেণি মধ্যে শিক্ষকের পাঠদানের প্রয়োগগত কৌশল এবং বিশ্লেষণমূলক ও সহজবোধ্যভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন এর মূল লক্ষ্য। সেভাবেই পালাকার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত গল্প বেছে নিয়ে কেবল দুইজন করে অভিনেতাকে দিয়ে নাটক নির্মাণ করে শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকক্ষে, আবার কখনও কখনও

সম্মিলিত শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শনী করা হয়। আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যিক দেশজ নাট্যাঙ্গিক *পুতুলনাট্য*[৪৪] কিংবা *পটগান*[৪৫] নাট্যাঙ্গিককে প্রযোজনা নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হতো। দুজন অভিনেতার সমন্বয়ে গল্পবলার আদলে যেহেতু অভিনয় হতো তাই 'স্টোরি বক্সে' রক্ষিত অভিনয়ের জন্য চরিত্রানুগ নানা উপাদান-উপকরণ বের করে উক্ত দুজন অভিনেতা একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতেন। এভাবে নির্মিত প্রযোজনাগুলো হলো *দৈত্য হলো খেলার সাথী*, *হ্যামিলনের বাঁশীওয়ালা*, *টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ* এবং *দ্য অনারেবল টাইগার*। প্রযোজনাগুলো পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা, কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রামের একাধিক স্কুলে প্রদর্শনী পরবর্তী শিক্ষার্থীদের মাঝে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেলেও 'শিক্ষায় নাট্যের প্রয়োগ সম্ভাবনা' বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দের যথেষ্ট তথ্য ও জ্ঞানের অভাব এবং স্কুল পরিচালনা পর্ষদের অনীহা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের দোহাই দিয়ে 'শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতির প্রয়োগকে' তারা গ্রহণ করতে রাজি হননি। ২০১৮ সালে জুন মাসে পালাকার কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত তথ্যমতে তারা পুনর্বার বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা-৩। ইতিহাসের সত্যতার ছায়ায় রচিত নাটকে ইতিহাসের উপস্থাপন ও প্রদর্শনী। অভিজ্ঞতাটি নাট্যকলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের *গণনায়ক* প্রযোজনার নির্মাণ পর্বের ২১ দিন এবং ২ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের প্রদর্শনী পর্ব। নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক [১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ] নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে গণনায়ক চরিত্রকে যেভাবে সাহিত্যের ছত্রছায়ায় অংকন করেছেন, তার থেকে অধিক সত্যাশ্রয়ী এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে [১৯২০ খ্রিস্টাব্দ-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ] গণনায়ক হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং ইতিহাসের সত্যতাকে অভিনেতা দলের সামনে নাট্যনির্মাণ পর্বে অধ্যয়ন, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন এবং ১৯৭৫ সালে তাঁর হত্যাকারীদের সচিত্র সাক্ষাৎকার তুলে ধরা থেকে শুরু করে প্রযোজনা নির্মাণের জন্য যাবতীয় নির্দেশনা কৌশল প্রয়োগ করে প্রযোজনা সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে যে অভিনব পরিবর্তন আনয়ন করা গেছে, সেভাবে শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন ফলপ্রসূ হতোনা, সম্ভবও হতোনা। প্রদর্শনী পরবর্তী আলোচনা থেকে জানা যায় প্রদর্শনীর সময়কালে উপস্থিত ৬৫০ জন দর্শকের [প্রদর্শনীতে টিকিট বিক্রির তথ্যমতে] মাঝে একইরূপ আবেগের ভাব বিমোক্ষণ [catharsis][৪৬] ঘটেছে। নাট্যকাহিনির সাথে সম্পৃক্ত করে এক ঝাঁক তরুণের মাঝে বাঙালি জাতির জনকের জীবনগাঁথাকে *গণনায়ক* প্রযোজনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি নির্দেশক সজ্ঞানে শিক্ষাদানে নাট্যপদ্ধতির প্রয়োগ কৌশলকেই চর্চা করেছেন। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার তিনটি অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষায় নাট্যের প্রয়োগধর্মিতার ধারাপথ এবং এর প্রায়োগিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে সমুজ্জ্বল করে।

আমাদের ঘরে ঘরে বর্তমানে সাদা মনের মানুষ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনায় সঙ্গীত, গান, নাটকাভিনয়, শিল্প ও প্রকৃতির ধ্যান এবং সামাজিক সেবা দ্বারা সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্বাকে প্রকাশ করতে সক্ষম। রবীন্দ্র গবেষকের মতে—'Rabindranath Tagore's ideas of education […] to unfold the entire personality through music, songs, dance, theatre, art, contemplation of nature, meditation and social service.'[৪৭] শিক্ষাবিদগণের ভাবনা এবং প্রয়োগের আলোকে বলা যায় শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান এবং শিক্ষার মৌলিক কাঠামোগত প্রয়োগধর্মিতার বৈশিষ্ট্য বিচারে নাটক [থিয়েটার] ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

শিক্ষার্থীদের সামনে তাদের পঠিত কোনো বিষয় যদি মুখস্থ করার পরিবর্তে তাদের সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে, দৃশ্যায়নের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় তাহলে উপস্থাপনার পর সে ঘটনা শিক্ষার্থীরা অতি দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলে এবং দীর্ঘদিন তা মনে ধরে রাখতে পারে। অভিনয়ের মাধ্যমে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যেতে পারে— কেননা শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অভিনয় করতে ভালবাসে এবং তিন বৎসর বয়স থেকেই তারা

অভিনয়ে আনন্দ পায়। আর অভিনয়ে সাজসজ্জার সংযোজন থাকে বলে তারা আরও বেশি আনন্দ লাভ করে। নাটকে অভিনয়ের জন্য তারা যে কেবল নিজেদের চরিত্রের অংশটুকুই মুখস্থ করে তা নয়, অপরের চরিত্রের অংশগুলোও প্রায় সবটাই মুখস্থ করে ফেলে। তাই শিশুদেরকে অভিনয়ের মাধ্যমে পড়ানোর কৌশল অবলম্বন করালে তাদের আগ্রহ বাড়বে বলে প্রতীয়মান হয়। এই পদ্ধতি বর্তমানে পরীক্ষিত যে, পাঠ আয়ত্ত করার জন্য এবং একই সাথে সেই পাঠকে আনন্দদায়ক করার জন্য নাচ, গান এবং নাটকের মত সাংস্কৃতিক আয়োজন সমৃদ্ধ বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্য নির্দেশ

১. Edited by Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman and Jahangir Tareque, *Bengali-English Dictionary*, (Dhaka: Bangla Academy, 1994), p. 752

২. এস. ওয়াজেদ আলি, "শিক্ষার আদর্শ", *বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, সম্পাদনা ড. তপন বাগচী ও মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০৬), পৃ. ১০৪।

৩. A.S.M. Abdul Halim, Basic Education for the "Hard to Reach", *Mass Education: Half Yearly Newsletter, Directorate of Non-Formal Education*, 2nd Issue, July-December, 1999, p. 5.

৪. বার্ট্রান্ড রাসেল, *শিক্ষা ও সমাজকাঠামো*, অনুবাদ আরশাদ আজিজ, (ঢাকা: অবসর, ২০০৭), পৃ. ১১।

৫. বার্ট্রান্ড রাসেল, *শিক্ষা প্রসঙ্গে*, অনুবাদ শেখ মাসুদ কামাল, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃ. ২৩।

৬. বার্ট্রান্ড রাসেল, *শিক্ষা ও সমাজকাঠামো*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০।

৭. তানভীর মোকাম্মেল, *গ্রুন্ডভিগ ও গণশিক্ষা*, (ঢাকা: তানভীর মোকাম্মেল, ১৯৯৭), পৃ. ১৭।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৯. অজয় রায়, "শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষানীতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা: কিছু অনিয়মিত ভাবনা", *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা*, সম্পাদনা হোসনে আরা শাহেদ, (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০০২), পৃ. ৩৭।

১০. শফিউল আলম, "প্রাথমিক শিক্ষায় ভিন্ন ধারা", *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

১১. বার্ট্রান্ড রাসেল, *শিক্ষা প্রসঙ্গে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৯।

১২. তানভীর মোকাম্মেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২-৬৩।

১৩. বার্ট্রান্ড রাসেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।

১৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "কালেজি শিক্ষা", *বাঙলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।

১৫. ফাহিম হাসান শাহেদ, "স্কুলের বিরূপ পরিবেশে শিশু", *বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩।

১৬. Lemuel M. Miravalis, "Upanusthanik Siksa: Laksya, uddesya o-darsan", *Sabar Janya Siksa*, (Dhaka: Directorate of Non-Formal Education, 1998), p. 4

১৭. Edited by Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary, Eng-Beng*, (Dhaka: Bangla Academy, 2005), p. 209।

১৮. Oscar G. Brockett, *The Theatre an Introduction*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1974), p. 34।

১৯. মীর মেহবুব আলম, *উন্নয়ন নাট্যচর্চা ও শিল্পভাবনা*, (ঢাকা ও কুমিল্লা: টিমওয়ার্ক ও প্রতিজ্ঞা পরিষদ, ২০০৭), পৃ. ৩২।

২০. Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, translated by Myra Bergman Ramos, (Great Britain: Penguin Books, 1972), p. 61.

২১. Ibid. p. 53.

[২২]. তানভীর মোকাম্মেল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

[২৩]. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

[২৪]. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

[২৫]. Rabindranath Tagore, "A POET'S SCHOOL", *Journal of World Education*, edited by Dr. Sujit Kumar Paul, (India: Sriniktan, Visva-Bharati University, 2004), p. 9 [Also published in the *Visva-Bharati Quarterly*, Vol. IV, No. 3, October, 1926]

[২৬]. Supriya Roy, "HUNDRED YEARS OF A POET'S SCHOOL" *Journal of World Education*, ibid, p. 21.

[২৭]. Ibid.

[২৮]. Nikolay Nikolaev, "RABINDRANATH TAGORE- THE LEGACY OF A PROPHET EDUCATOR", *Journal of World Education*, ibid, p. 29.

[২৯]. A movement associated with the writings of Ivan Illich (Deschooling Society, 1971) and Paulo Freire (Pedagogy of the Oppressed, 1970), although critiques of the role of the educational system in the development process had been presented earlier, by René Dumont (False Start in Africa, 1962) among others. The movement was influential during the 1970s, especially in the United States, although Illich and Freire both wrote from a Latin American perspective. The central ideas are that education and learning permeate all life-experiences and social relationships, and are not the monopoly of the formal educational system; that in the Third World it is essential for the curriculum to build on pupils' own experiences and provide relevant knowledge and skills; and that conventional educational systems serve in practice to demean and exclude many social groups (for example the poor) and to create institutional dependence. Wider political arguments are developed from this position.

-https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/deschooling (Accessed on 05.06.2018 at 5.38 pm)

- According to the mentioned link also found in *A Dictionary of Sociology*, originally published by Oxford University Press in 1998, page not mentioned there.

[৩০]. http://www.dictionary.com/browse/deschooling (Accessed on 05.06.2018 at 5.31 pm)
- According to the mentioned link also found in *Online Etymology Dictionary*, 2010, Douglas Harper, page not mentioned there.

[৩১]. http://www.dictionary.com/browse/deschooling (Accessed on 05.06.2018 at 5.31 pm)
- According to the mentioned link also found in*Collins English Dictionary - Complete & Unabridged*, 2012 Digital Edition, William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986, HarperCollins Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, page not mentioned there.

[৩২]. আব্দুল হালিম প্রামানিক সম্রাট, *বাংলাদেশে শিক্ষাদানে নাট্য পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভাবনা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৫৪।

[৩৩]. https://en.oxforddictionaries.com/definition/deschooling (Accessed on 05.o6.2018 at 5.27 pm)

[৩৪]. Ivan Illich, *Descholling Society*, (Cuernavaca, Mexico: CIDOC, 1970), p-33.

[৩৫]. Unschooling doesn't mean not learning— it means learning without the trappings of school. It's not unlearning or uneducating. It's only unschooling— it points out a contrast in approaches to learning.

-http://sandradodd.com/unschool/moredefinitions (Accessed on 08.06.2018 at 6.13 pm)

[৩৬]. https://en.wikipedia.org/wiki/Unscholing (Accssed on 08.06.2018 at 6.08 p.m.).

[৩৭]. https://www.educationcorner.com/what-is-unschooling.html (Accessed on 08.06.2018, at 6.16 pm)

[৩৮]. https://en.wikipedia.org/wiki/Unscholing (Accssed on 08.06.2018 at 6.08 pm).

৩৯. Theatre in Education (TIE) as a definable movement began in Britain in the mid-1960s in direct response to the needs of both theatre and schools.

- Edited by Tony Jackson, *Learning Through Theatre New Perspectives on Theatre in Education*, (London and New York: Routledge, 2002), p.1. Ibid,

৪০. Ibid, p. 3.

৪১. Ibid.

৪২. Ibid, p. 10.

৪৩. 'স্পেইস'-এর কর্মপ্রক্রিয়া এবং উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন মীর মেহবুব আলম, *উন্নয়ন নাট্যচর্চা ও শিল্পভাবনা*, পূর্বোক্ত।

৪৪. কাঠ, মাটি, কাপড়, কাগজ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ও সঞ্চালনযোগ্য পশু, পাখি বা মানব মূর্তি দ্বারা পরিবেশিত নাট্য। [...] পুতুল নাচে পুতুলের সংলাপ ও গীত নেপথ্যচারী গানের মাষ্টার ও দোহারদের দ্বারা পরিবেশিত হয়।

-সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, (ঢাকা : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র, ১৯৯৮), পৃ. ২২১, ২২২।

৪৫. পটে অঙ্কিত কোন পালা, পাঁচালি বা কাহিনীর চিত্র অবলম্বনে, এককভাবে কোন গায়েন, বা দোহার সহযোগে গায়েন যে নাট্য পরিবেশন করে। ধারণা করা যায়, বাংলাদেশের পুতুলনাচ, (যাদুবিদ্যা ও দেবতার বিগ্রহ দুভাবে) এবং চিত্রনাট সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। ১৪৮। [...] মধ্যযুগে কৃপ্য ও প্রণয়কথার ধারায় পটচিত্রের প্রচলন ছিল। মঙ্গল ও ব্রতকথা ধরনের পাঁচালিতে দেবদেবীর চিত্র ঘট বা পটে আঁকা হত। সঙ্গে থাকত নৃত্যগীত কথা। অনেক সময় এই চিত্র মাটির সরা বা অনুরূপ কোন পোড়ামাটির ফলকেও চিত্রিত হত। [...] একালে কাগজে চিত্র এঁকে গীতের সাহায্যে তা বর্ণনা করার রীতি পশ্চিম বঙ্গে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে।

- তদেব, পৃ. ১৪৮, ২১০।

৪৬. A term coined by Aristotle to define the "purgation" or cleansing of terror and pity which the audience experiences during the climax of a tragedy.

- Robert Cohen, *Theatre*, (California: Mayfield Publishing Company, 1983), p. 231.

৪৭. Martin Kampchen, "RABINDRANATH TAGORE IN GERMANY", *Journal of World Education*, ibid, p. 51.

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

শেখ সা'দীর কাব্যে নৈতিক উপাদান: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. ওসমান গনী*

Abstract : Shaikh Sadi was the most brilliant, distinguished, acknowledged and popular ethical poet in Persian literature. He is also called the 'Master of both prose and verse'. The epical works of Sadi such as the *Bustan* (1257) and the *Gulistan* (1258) are deal with ethics, politics, state administration and sociology. His book *Bustan* is the ethical mirror of a political, social and family life. Sadi discussed about the duty to Allah, duty of a ruler to his citizens, duty to parents, to marry, to look after the children and their education, good behavior to orphans, neighbors, and dependents, to leave up greedy, to take good companion etc the moral ideas in his poetry. The moral themes in the light of Shaikh Sadi's poetry will be deficted in this article.

ভূমিকা:

শেখ সা'দী (১১৯১-১২৯১) ছিলেন ফারসি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ নৈতিক কবি। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয়ধারায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। *বুস্তান* (১২৫৭) ও *গুলিস্তান* (১২৫৮) গ্রন্থদ্বয় কবিকে অমর করে রেখেছে। শেখ সা'দীর *বুস্তান* (بوستان) কাব্যগ্রন্থটি ফারসি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে সা'দী নৈতিক শিক্ষাকে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় কাব্যিক রূপ দিয়েছেন। তিনি গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যার দিক তুলে ধরেছেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে একাধিক গল্প বর্ণনা করে তা সমাধানের পন্থা নির্দেশ করেছেন। শেখ সা'দী *বুস্তান* গ্রন্থে যে সকল বিষয়ে নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন তা হলো- রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রজার প্রতি শাসক শ্রেণির দায়িত্ব-কর্তব্য, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, দান-খয়রাত করা, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার, চরিত্র সংশোধন, স্ত্রী গ্রহণ ও প্রতিপালন, সন্তান প্রতিপালন, সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন, অল্পে তুষ্ট থাকা, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রভৃতি। সর্বোপরি রয়েছে কু-প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি পরিহার করার উপদেশ। আলোচ্য প্রবন্ধে শেখ সা'দীর *বুস্তান* গ্রন্থে বর্ণিত নৈতিক বিষয়সমূহকে বিভিন্ন শিরোনামে পর্যালোচনা করা হল।

খোদাভীরুতা

কবি শেখ সা'দী *বুস্তান* গ্রন্থের শুরুতেই রাজা-বাদশাহদের জন্য খোদাভীরুতাকে নৈতিক কৃচ্ছতা সাধনের প্রধান অবলম্বন রূপে চিহ্নিত করেছেন। কারণ বিশ্ব জাহানের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন রাজত্ব দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছে করেন রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। সম্মান ও অসম্মানের মালিক তিনিই। আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র কোরআন কারীমে বলেছেন-

قل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير.[১]

অর্থাৎ- '(হে নবী (সা.) আপনি বলুন, আল্লাহ রাজাধিরাজ। তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান কর এবং যাকে চাও রাজত্ব ছিনিয়ে নেও। যাকে চাও সম্মানিত কর এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। তোমার হাতেই রয়েছে সকল কল্যাণ ও সফলতা। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণ যে যত বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি হোক না কেন, তারা সকলেই বিশ্বের রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কেননা তিনি বাদশাহ-ফকীর, ধনী-গরীব সকলেরই স্রষ্টা এবং প্রতিপালক। সৃষ্টিগত দিক থেকে বাদশাহ-ফকীরে কোন তারতম্য নেই। যিনি মহান স্রষ্টার কৃপায় রাজমুকুট লাভ করেন। তাই এ ব্যাপারে গর্ব বা অহংকার করার কিছুই নেই। কারণ এ ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল না। আল্লাহ ইচ্ছে করলে যে কোন সময় তার শাহীমুকুট ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই দুনিয়ার সকল রাজা-বাদশাহর উচিৎ অবনত মস্তকে স্রষ্টার এবাদতে আত্মনিয়োগ করা ।

কবি শেখ সা'দী বলেন-

اگر بنده   ای سر برین در بنه   کلاه خداوندی از سر بنه
بدرگاه فرمانده ذو الجلال   چو درویش پیش توانگر بنال
چو طاعت کنی بس شاهی مپوش   چو درویش مخلص برآور خروش
که پروردگارا توانگر تویی   توانا و درویش پرور تویی
نه کشور خدایم نه فرماندهم   یکی از گدایان این در گهم. [২]

'যদি তুমি তাঁর বান্দা হয়ে থাক, তবে মস্তক কর নত
শাহী মুকুটের গর্ব ও অহংকার মাথা হতে ফেল।
ফকির-দরবেশের ন্যায় নম্রভাবে কান্নাকাটি কর,
এবাদতের সময় শাহী পোশাক ছাড়, দরবেশী বেশ ধর।
বল, হে প্রভু, তুমিই ধনী, বাদশাহ-ফকির সকলকে পালন কর
আমি রাজ্যের মালিকও নই, নির্দেশদাতাও নই, তোমার মুখাপেক্ষী।'

ন্যায়পরায়ণতা

নৈতিক কবি শেখ সা'দী রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসকশ্রেণীকে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি ন্যায়পরায়ণতার সুফল এবং অত্যাচারী শাসকের কুফলও বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, একজন শাসককে অবশ্যই ন্যায় পরায়ন হতে হবে। যিনি সর্বদা প্রজার কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সকল অন্যায়-অবিচারকে কঠোর হস্তে দমন করবেন। একজন ন্যায়বান ব্যক্তি কখনও খারাপ কাজ পছন্দ করে না; বরং প্রাণের দুশমন মনে করে। এ প্রকৃতির শাসকগণ প্রজার কল্যাণের জন্য রাস্তা, পোল, পুকুর, মুসাফিরখানা ও লঙ্গরখানা প্রভৃতি নির্মাণ করে যায়। সৎ ও ন্যায়বান শাসক দুনিয়া হতে বিদায় নিলে প্রজারা তার জন্য ফাতেহা পাঠ করে এবং দোয়া পাঠায়। তিনি দুনিয়াতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। কবির ভাষায়-

نیامد کس اندر جهان کو بماند   مگر آن کزو نام نیکو بماند
نمرد آنکه ماند پس ازوی بجای   پل و خانی و خان و مهمانسرای. [৩]

'পৃথিবীতে কেহ চিরদিন বেঁচে নাহি রয়
সুনাম রেখে গিয়ে চিরস্মরণীয় সে হয়।

মৃত নয়, সে রয়েছে জীবন্ত স্বীয় স্থলে
পুল-পুকুর, পান্থশালা ও লঙ্গরখানা যে রেখেছে খুলে।'

পক্ষান্তরে যে শাসক অন্যায়ের বীজ বপন করে, তার অত্যাচারে প্রজা-সাধারণ দেশ ছাড়তে থাকে। শিশু-বাচ্চা, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।[৪] এমন অত্যাচারী শাসক দুনিয়া হতে বিদায় নিলে কেউ তাকে স্মরণ করে না। কেউ তার জন্য ফাতেহা পাঠ করার মতও থাকে না। শিশু-বাচ্চা, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে তাকে অভিশাপ করতে থাকে। এ প্রকৃতির লোককে শাসনভার দেওয়া উচিৎ নয়। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

ریاست به دست کسانی خطاست　　　　که از دستشان دستها بر خداست. [৫]

'যার অত্যাচারে প্রজার হাত উঠে খোদার দরবারে
হয় গুনাহর কাজ, শাসনভার দিলে তারে।'

তাই বলা যায় যে, দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা নির্বাচনের বিকল্প নেই।

প্রজার সেবা

নৈতিক কবি শেখ সা'দী প্রজাসাধারণের প্রতি শাসকশ্রেণীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, বাদশাহ হচ্ছেন একটি রাজ্যের রক্ষক এবং প্রজাদের আশ্রয়স্থল ও অভিভাবক। তিনি কখনও নিজের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের চিন্তায় মত্ত থাকতে পারেন না। আর যদি তিনি নিজের শান্তি ও আরামের চিন্তায় বিভোর থাকেন, তবে তার রাজ্যের প্রজারা কখনও সুখ-শান্তি পাবেনা। কবি দায়িত্ববোধের দিক থেকে বাদশাহকে একজন রাখালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেননা, একজন রাখালের দায়িত্ব হচ্ছে মেষ পালের রক্ষণাবেক্ষণ করা। আর সেই রাখাল যদি নিজের শান্তির জন্য সুখের নিদ্রায় বিভোর থাকে, তবে সে মেষপালে হিংস্র বাঘের থাবা পড়বে এবং মেষপাল উজার হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে কোন রাজ্যের বাদশাহ যদি গরীব প্রজাদের সুখ-শান্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, তবে সে রাজ্যে শান্তি আসেনা এবং বাদশাহর রাজত্বও বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কারণ, প্রজারাই হচ্ছে রাজ্যের মূল চালিকা শক্তি। সাসানী যুগের বাদশাহ নওশিরওয়ান[৬] তার পুত্র হরমুজকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন- কবির ভাষায়:

نیاساید اندر دیار تو کس　　　　چو آسایش خویش جویی و بس
نیاید بنزدیک دانا پسند　　　　شبان خفته و گرگ در گوسفند
برو پاس درویش محتاج دار　　　　که شاه از رعیت بود تاجدار. [৭]

'তোমার রাজ্যে প্রজারা শান্তি পাবে না কখনো
যদি নিজের শান্তি তালাশে থাক রত।
জ্ঞানীজনে এ কথা কখনো পছন্দ না করিবে
রাখাল থাকিবে ঘুমের ঘরে, বাঘ মেষপালে পড়িবে।
মুখাপেক্ষী গরীব প্রজার প্রতি নজর রাখিবে যবে
তোমার রাজমুকুট স্থায়ী করিবে প্রজায় তবে।'

এ পৃথিবীতে কেউই চিরদিন জীবিত থাকে না। বাদশাহ-ফকীর, ধনী-গরীব সবাইকে এক সময় এ দুনিয়া ছাড়তে হয়। তাই সকলের উচিত সৎকাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর অর্থ এই নয় যে, জঙ্গলে গিয়ে নির্জনে আল্লাহর এবাদত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শেখ সা'দী বলেছেন-

طریقت بجز خدمت خلق نیست
بتسبیح و سجاده و دلق نیست. [৮]

'সৃষ্টির সেবা ছাড়া সম্ভব নয় তরিকত,
তসবিহ, জায়নামাজ ও ছিঁড়া পোশাকে হবে না কাজ।'

তাই বলা যায় যে, মানব সেবার ন্যায় শ্রেষ্ঠ কাজ আর নেই। সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টার সন্ধান করা ভন্ডামী মাত্র।[৯]

দয়া-দাক্ষিণ্যতা

الدنیا مزرعة الاخرة 'দুনিয়া পরকালের শস্যক্ষেত্র'। বাদশাহ-ফকীর, ধনী-গরীব কেউ চিরদিন এখানে বেঁচে থাকে না। এ পৃথিবীতে কারো বাসনা পূর্ণ হবে না। এখানে যে যেমন কর্ম করবে, পরকালে সে তেমন প্রতিফল ভোগ করবে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সকল কর্ম ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। মৃত্যুর সময় সে যত মাল-সম্পদ এবং রাজত্ব রেখে যাক না কেন, তা কোন কাজে আসে না। সে রেখে যাওয়া সম্পদ এবং অনর্থক নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়গুলোর জন্য আফসোস করতে থাকে। কবি শেখ সা'দী ভাল-মন্দ, ধার্মিক-অধার্মিক সকল শ্রেণীর অসহায় গরীব-দুঃখীকে দান করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কবি মনে করেন যে, প্রত্যেক মানুষকে জীবিতাবস্থায় দান-খয়রাত করে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।[১০] নতুবা মৃত্যুর পরে তার রেখে যাওয়া সম্পদের জন্য আফসোস করতে হবে।

কবি মনে করেন যে, উত্তম ঐ ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ উপার্জন করে দান-খয়রাত করেছে এবং নিজেও ভোগ করেছে। কারণ, মৃত্যুর পরে রেখে যাওয়া সম্পদের জন্য তার কোন আফসোস থাকবে না এবং তাকে আল্লাহর কাছে কৈফিয়তও দিতে হবে না। কবির ভাষায়-

پسندیده رایی که بخشید و خورد   جهان از پی خویشتن گرد کرد
در این کوش تا با تو ماند مقیم   که هرچ از تو ماند دریغ است و بیم. [১১]

'যে ব্যক্তি দান করে ও খায়, সে উত্তম নিশ্চয়;
ইহলোকে করে পরলোকের পাথেয় সঞ্চয়।
চেষ্টা কর হেথায়, সদা করিবে দান-খয়রাত
নতুবা, মরণে করিবে আফসোস, দিতে হবে কৈফিয়ত।'

সৎকর্মশীলতা

পৃথিবীতে দুই শ্রেণির লোক বাস করে। এক শ্রেণির লোকের জীবনের ব্রতীই হচ্ছে, অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। আরেক শ্রেণির লোকের ব্রতী হচ্ছে, যে কোন উপায়ে অন্যের ক্ষতি সাধন করা। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা পৃথিবীতে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকে। সকলে তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কদাচিৎ তারা বিপদে আপতিত হলে সকলে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। কিন্তু, দ্বিতীয় শ্রেণির লোক পৃথিবীতে ঘৃণা

নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা কখনও কোন বিপদে পড়লে কেউ তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে না। সকলে ঘৃণা করে দূরে সড়ে যায়।[১২] তাই কবি বলেছেন-

نکوکار مردم نباشد بدش   نورزد کسی بد که نیک افتدش.[১৩]

'ভাল কাজের জন্য খারাপ ফল নেই,
পাপীর জন্য উত্তম পুরস্কার নেই।'

সুতরাং মানুষ যে বীজ বপন করবে তার ফসলই তাকে কাটতে হবে। অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল।[১৪]

আধ্যাত্মিক প্রেম

শেখ সা'দী *বুস্তান* (بوستان) কাব্যগ্রন্থে পার্থিব প্রেমের উপমা পেশ করে স্রষ্টার প্রেমের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এ জগতে মানুষ যখন কোন পরমা সুন্দরীর প্রেমে পড়ে, তখন সে তার নিজের আরাম-আয়েশের কথা ভুলে যায়। প্রেমিকার জন্য পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলেও কষ্টকর বলে মনে হয় না। একজন মানুষ যেমন মাশুকের প্রেমে পড়ে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, ঠিক তেমনিভাবে একজন খোদা প্রেমিকও আল্লাহর প্রেমে মত্ত হয়ে পার্থিব সুখ-শান্তির কথা ভুলে যায়। সে খোদার প্রেমের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে দিন-রাতের কোন পার্থক্য করতে পারে না। কারণ, সে 'আলমে আরওয়াহ' (রূহের জগৎ) হতে 'আলাছতু বিরাব্বিকুম'[১৫](الست بربکم) 'আমি কি তোমাদের রব নই?' ডাক শুনেছে এবং তার প্রতিত্তোরে 'বালা' (হ্যাঁ) স্বীকারোক্তি দিয়ে এসেছে। ফলে সে আল্লাহর সৌন্দর্যের প্রতি এত আকৃষ্ট থাকে যে, বাইরের কোন সৌন্দর্যের প্রতি নজর দিতে সময় পায় না। কীট-পতঙ্গ যেমন মোমবাতির প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে নিজের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে এবং প্রেমের দহণে নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে একজন আল্লাহ প্রেমিকও স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য নিজের ব্যক্তি সত্তাকে বিলিয়ে দেয়।[১৬] যেমন কবি শেখ সা'দী একজন আল্লাহ প্রেমিকের স্বরূপ তুলে ধরে বলেছেন-

می صرف وحدت کسی نوش کرد   که دنیا عقبی فراموش کرد.[১৭]

'আল্লাহর খাঁটি প্রেম ঐ ব্যক্তি লাভ করতে পেরেছে,
যে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি ভুলে গেছে।'

বিনয় ও নম্রতা

নৈতিক কবি শেখ সা'দী বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে মানুষের সম্মান ও মর্যাদার চাবিকাঠি। পৃথিবীতে যারা অহংকার বর্জন করে বিনয়ী হয়েছে, তারা সম্মানিত হয়েছে।[১৮] এ প্রসঙ্গে কবি উপমা পেশ করে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা মাটি ও আগুনকে ভিন্ন দুটি স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরী করেছেন। মাটির স্বভাব হচ্ছে, বিনম্রভাবে মস্তক নত করে থাকা। আর আগুনের স্বভাব হচ্ছে অংহকারের সাথে উর্ধ্বমুখি হয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করা। তাই আল্লাহ তায়ালা মাটিকে সম্মানিত করে মাটি দ্বারা 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর আগুনকে অভিশপ্ত করে পাপিষ্ঠ শয়তানকে আগুন দ্বারা তৈরী করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে মেঘ হতে এক ফোঁটা বৃষ্টি সমুদ্রে পতিত হয়ে সমুদ্রের বিশালতা দেখে নিজেকে তুচ্ছ মনে করল। ফলে ঝিনুক তাকে আদর করে নিজের কোলে তুলে নিয়ে প্রতিপালন করল। আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি খুশী হয়ে তাকে রাজা-বাদশাহদের অতি মূল্যবান ও প্রিয় বস্তুতে পরিণত করলেন।[১৯] তাই কবি শেখ সা'দী বলেছেন, ঐ ব্যক্তি

অধিক সম্মান লাভ করতে পেরেছে, যে প্রথমে নিজেকে ছোট করে দেখেছে। ফলে কবি বিনয় ও নম্রতাকে মানুষের সম্মান ও মর্যাদার সিঁড়ি বা সোপানরূপে চিহ্নিত করে বলেছেন -

بلندیت باید تواضع گزین که آن بام را نیست سلم جز این.[২০]

'বিনম্র হও, যদি তুমি পেতে চাও সু-উচ্চ সম্মান,
কেননা, বিনম্র হওয়া ছাড়া পাবে না সে সোপান।'

চরিত্র সংশোধন

কবি শেখ সা'দী *বুস্তান* (بوستان) কাব্যগ্রন্থে মানবিক স্বভাব-চরিত্রকে পরিমার্জিত করে সমুন্নত ও উত্তম চরিত্রে বলিয়ান হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মানুষের দেহাবয়বকে একটি শহরের সাথে তুলনা করেছেন। সেখানে ভাল-মন্দ গুণরূপী নানারূপ বাসিন্দার বসবাস। মানুষের আত্মা সেই শহরের বাদশাহ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক তার উজির স্বরূপ। মানুষের কু-রিপুগুলো যেমন- হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ লালসা, রাগ ও অহংকার তার অসৎসঙ্গী। আর পরহেজগারীতা, সততা ও সত্যবাদিতা তার সৎসঙ্গী।[২১] কিন্তু লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও আত্মার কু-প্রবৃত্তি মানুষের দেহে শিরা-উপশিরার ন্যায় মিশে রয়েছে। যদি ঐ সব অসৎ-স্বভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে সৎ-স্বভাব সেখানে অবস্থান করতে পারে না। আর যদি জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক ঐ সব অসৎ-স্বভাবকে কঠোর হস্তে দমন করে, তবে সৎগুণাবলি মানব জীবনকে অলংকৃত করে। কবি আত্মার কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখাকে মহাবীর রুস্তম ও সামের বীরত্বের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বীরত্বের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। কবির ভাষায়-

عنان باز پیچان نفس از حرام بمردی زرستم گذشتند و سام.[২২]

'আত্মার কু-প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখা
রুস্তম ও সামের বীরত্ব হতেও শ্রেষ্ঠ বীরত্ব।'

শেখ সা'দী কথা বলার ক্ষেত্রে সংযত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, কথা বেশী বললে জনসমাবেশে লজ্জিত হওয়ার ভয় থাকে। তাই অনর্থক একশত কথা বলার চেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ও মূল্যবান একটি কথা বলা উত্তম। তিনি কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, কিয়ামতের আদালতে মানুষের কথারও হিসাব গ্রহণ করা হবে। কবির ভাষায়-

زبان در کش ای مرد بسیاردان که فردا قلم نیست بربی زبان.[২৩]

'হে জ্ঞানী! তোমার জিহ্বাকে সদা সংযত রাখিবে
কিয়ামতে বাকহীনের হিসাব না থাকিবে'

এ ছাড়াও সা'দী পরনিন্দা ও চোগলখোরীর মত ধ্বংসাত্মক কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, চোগলখোর মৃত শত্রুতাকে জীবিত করে তুলে। সে উভয়পক্ষের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করতে ইন্ধন যোগায়। সা'দী চোগলখোরীর বিধ্বংসী স্বরূপ তুলে ধরে বলেন-

سخن چین کند تازه جنگ قدیم بخشم آورد نیکمرد سلیم.[২৪]

'চোগলখোরী পুরাতন শত্রুতাকে জাগিয়ে তোলে,
শান্ত মনের মানুষের মাঝেও ক্রোধের সঞ্চার করে।'

স্ত্রী গ্রহণ ও প্রতিপালন

কবি শেখ সা'দী মানুষের পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র বিন্দু স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ককে দুনিয়াতে জান্নাতের সুখ-শান্তি এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের দূরত্বকে দোযখের শাস্তির চেয়েও দূর্বিসহ কষ্টকর বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ঘরে স্বামীভক্ত, বাধ্যগত সৎ-স্ত্রী থাকলে গরীব স্বামীও বাদশাহী জীবন লাভ করে। যার স্বামীভক্ত স্ত্রী আছে, সে আনন্দের সাথে ঘরের দরজায় কড়া বাজায়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করলেও মনে কোন প্রকার দুঃখ ক্লেশ থাকে না। কারণ, সে তার প্রাণ-প্রিয়সী স্ত্রীর আদর ও সেবা নিয়ে বিশ্রাম নিতে পারে। যার সংসার ও ঘরে বাধ্যগত স্ত্রী থাকে, তার ওপর আল্লাহর শুভ দৃষ্টি থাকে। ফলে স্বামী জান্নাতী সুখ লাভ করে। তাই কবি বলেছেন-

اگر پارسا باشد و خوش سخن　　نگه در نکویی وزشتی مکن.[২৫]

'স্ত্রী যদি স্বামীভক্ত ও সুমিষ্টভাষী হয়,
চেহারার ভাল-মন্দ দেখা উচিত নয়।'

পক্ষান্তরে যার ঘরে খারাপ চরিত্রের স্ত্রী থাকে, তার সংসারে শান্তি থাকে না। যে স্ত্রীলোক সামান্য জিনিসের খিয়ানত করে, সে বেশী টাকার জিনিসও নষ্ট করে ফেলতে পারে। যখন স্ত্রী অন্য পুরুষের সামনে মিষ্টি হাসিতে ফেঁটে পড়ে, তখন স্বামীকে তার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বেগানা পুরুষ যেন স্ত্রীকে দেখতে না পায়। আর যখন কোন স্ত্রীলোক বাজারে যেতে চায়, তখন তাকে যথা সম্ভব বাধা দেয়া এবং বিরত রাখা উচিত। বাইরে বের হতে হলে দেহাবয়বকে আচ্ছাদিত করে বের হবে। কোন স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় থাকে না। তাদের দাম্পত্য জীবন অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেছেন-

یکی گفت کس را زن بد مباد　　دگر گفت زن در جهان خود مباد.[২৬]

'দুনিয়ায় কারো স্ত্রী যেন খারাপ না হয়, বলে এক লোকে
অন্যেরা বলে, আল্লাহ যেন মন্দ মেয়েলোক না পাঠায় ইহলোকে।'

সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষ-দীক্ষা

কবি শেখ সা'দী সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দার প্রতি পিতা-মাতার সজাগ দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন।[২৭] সন্তানকে সৎ, জ্ঞানী ও পরহেজগার করে গড়ে তুলতে হবে। সন্তানের সুশাসনের জন্য মাঝে মাঝে মৃদু মার-ধোর করা ভাল। এতে তারা পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠে। এ প্রসংঙ্গে কবি শৈশবকালের স্মৃতিচারণ করে বলেন-

به خردی بخورد از بزرگان قفا　　خدا دادش اندر بزرگی صفا.[২৮]

'শৈশবে বুযুর্গ ব্যক্তিদের মার খেয়েছি যবে,
খোদার পক্ষ হতে খাঁটি বুযুর্গী পেয়েছি তবে।'

কবি শেখ সা'দী পিতা-মাতাকে উপদেশ দিয়ে বলেন- সন্তানদের জন্য যথাসম্ভব ভাল খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আবাসনের ব্যবস্থা করা উচিত। তা হলে তারা অন্যের ধন-সম্পদের দিকে তাকাবে না। এছাড়া সন্তানের চলা-ফিরা ও আচার-আচরণের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে শাসন করতে হবে। নতুবা অন্য লোকে পিতামাতাকে ভর্ৎসনা করবে। বন্ধুদের সঙ্গ সম্পর্কেও পিতা-মাতাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে তারা অসৎ সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে না যায়। কবির ভাষায়-

پسر را نکودار و راحت رسان   که چشمش نماند به دست کسان
هر آنکس که فرزند را غم نخورد   دگر کس غمش خورد و بدنام کرد
نگه دار از آمیزگار بدش   که بدبخت وبی ره کند چون خودش.[২৯]

'সন্তানকে ভাল আহার ও আবাসন দিবে,
নতুবা, সে অন্যের হাতের দিকে তাকাবে।
যে ব্যক্তি সন্তানকে শাসন করে না,
লোকে তার ব্যাপারে করে ভর্ৎসনা।
অসৎ সঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে,
নতুবা, সে নষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হবে।'

অতএব, সন্তান-সন্ততিকে সৎচরিত্রবান করে গড়ে তোলা এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রত্যেক পিতামাতার জন্য একান্ত কর্তব্য।

ইয়াতিমের সাথে সদ্ব্যবহার

শেখ সা'দী নিজে একজন পিতৃ-মাতৃহীন লোক ছিলেন। তাই ইয়াতিমের প্রতি সামান্য আঘাত কবির হৃদয় পটে বিরাট বেদনার সঞ্চার করত। কেননা পৃথিবীতে তারা আশ্রয়হীন এবং তাদের মাঝে সর্বদাই পিতা-মাতার স্নেহের শূণ্যতা রয়েছে।[৩০] শিকড় ছাড়া যেমন কোন বৃক্ষ তাজা থাকতে পারে না; ঠিক তেমনিভাবে মাথার উপর কোন আশ্রয়দাতা না থাকলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। এ পৃথিবীতে ইয়াতিমরা থাকে অবহেলিত ও বঞ্চিত। ফলে তারা সব সময়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই তাদের সামনে এমন কাজ-কর্ম করা উচিত নয়, যাতে তারা কষ্ট পায়।[৩১] কবি বলেন-

چو بینی یتیمی سر افکنده پیش   مده بوسه بر روی فرزند خویش
الا تا نگرید، که عرش عظیم   بلرزد همی چون بگرید یتیم.[৩২]

'তুমি যদি ইয়াতিমকে দেখ তোমার সামনে শির নত
তবে তোমার নিজের সন্তানকে চুম্বন কর না তো।
সাবধান! আল্লাহর আরশ যেন না কাঁপে
কারণ ইয়াতিমের কান্নায় আরশ কাঁপে অবিরত।'

প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ

নৈতিক কবি শেখ সা'দী প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হয়ে পাশে দাঁড়ানোকে নফল নামাজের চেয়ে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি হেজাযের পথে যেতে প্রতি কদমে দুই রাকাত করে নফল নামাজ আদায় করত। আল্লাহর প্রেমে এতটা বেহুশ ছিল যে, যদি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হত তবুও সে অনুভব করতে পারত না। অবশেষে সে শয়তানের ধোকায় পড়ে নিজেকে একজন বড় আবেদ বলে মনে করতে লাগল। ফলে সে গোমরাহীর মধ্যে পড়ল। গায়েব হতে এক ফেরেশতা তাকে আওয়াজ দিয়ে শুনালেন, 'হে নেক বান্দা! তুমি মনে কর না যে, আল্লাহর দরবারে অনেক এবাদত করেছ। প্রকৃত পক্ষে তুমি কিছুই করতে পারনি। তুমি জেনে রেখ যে, সদাচারণ দ্বারা তোমার প্রতিবেশীর মনকে সন্তুষ্ট করা, প্রতি মঞ্জিলে এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়ার চেয়েও উত্তম। কবির ভাষায়-

باحسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت بهر منزلی.[৩৩]

'সদাচরণ দ্বারা একটি মানুষের মন সন্তুষ্ট করা
প্রতি মঞ্জিলে হাজার রাকাত নামাজ হতে উত্তম।'

সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন

শেখ সা'দী *বুস্তান* (بوستان) কাব্যে মানব সেবার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি কুকুর বিড়াল এমনকি পিপীলিকার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করতে বলেছেন। তাই কবি বলেছেন-

توبا خلق سهلی کن ای نیکبخت فردا نگیرد خدا بر توسخت.[৩৪]

'সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া কর ইহলোকে
দয়া করবেন খোদা তোমায় পরলোকে।'

কবির দৃষ্টিতে, সৃষ্টিজীবের সেবার ন্যায় শ্রেষ্ঠ কাজ আর নেই। তাঁর মতে, সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টার সন্ধান করা ভন্ডামী মাত্র।[৩৫] সৃষ্টিজীবের সেবা ছাড়া মানুষের নামাজ, রোযাও কোন কাজে আসবে না। কবির ভাষায়-

طریقت بجز خدمت خلق نیست
بتسبیح و سجاده و دلق نیست.[৩৬]

'সৃষ্টির সেবা ছাড়া সম্ভব নয় তরিকত,
তসবিহ, জায়নামাজ ও ছিঁড়া পোশাকে হবে না কাজ।'

অল্পে তুষ্ট থাকা

কবি শেখ সা'দী *বুস্তান* কাব্যগ্রন্থে মানুষকে অল্পে তুষ্টির প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অল্পে তুষ্ট হলে বড় হওয়া যায়। কারণ লালসাপূর্ণ মাথা সবসময় নীচু থাকে। লোভ মানুষের মান-সম্মান নষ্ট করে ফেলে। লোভের তাড়নায় পড়ে পশু-পাখি শিকারীর জালে আটকে যায়। বাঘ ও সিংহ হিংস্র জন্তুদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু

তারাও খাবারের লোভে শিকারীর জালে আটকা পড়ে। অল্প তুষ্টি মানুষকে সাবলম্বী করে তোলে। অন্তরে প্রশান্তি দান করে। কিন্তু লোভী মানুষ কখনও অন্তরে শান্তি পায় না। লোভের তাড়নায় দুনিয়াব্যাপী ঘুরে বেড়ায়। লোভীর দু'চোখ এবং পেট কিছুতেই ভরে না। লোভ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে নানারূপ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনে। [৩৭]শেখ সা'দীর মতে, প্রকৃত বাদশাহ ঐ ব্যক্তি যে অন্তরের দিক থেকে চিন্তামুক্ত। আর প্রকৃত ফকীর ঐ ব্যক্তি, যে রাজ্য ও ধন-সম্পদ থাকার পরও চিন্তায় ঘুমাতে পারে না। কারণ, মৃত্যুর পূর্বে মানুষের চাহিদা পূরণ হবে না। কবরের মাটিই কেবল লোভী ব্যক্তির পেটের চাহিদা পূরণ করতে পারবে। কবির ভাষায়-

برو اندرونی بدست آرپاک　　شکم پر نخواهد شد الاّ به خاک. [৩৮]

'লোভ- লালসা হতে অন্তরকে পবিত্র কর
কবরের মাটি ছাড়া পেট পূর্ণ হবার আশা ছাড়।'

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

এ মহাবিশ্বের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। মানুষের জীবন, মৃত্যু, রুজী-রোজগার ও সম্পদের ফয়সালা তাঁর হাতে। আল্লাহ দয়া করে কাউকে সম্পদ দান না করলে, কেউ তীরের জোড়ে সম্পদ লাভ করতে পারে না। ক্ষুদ্র পিপীলিকা দূর্বল হলেও তার আহার যোগাতে সমস্যা হয় না। পাক-পাখালীও আল্লাহর কৃপায় অনাহারে থাকে না। বাঘ শক্তিশালী বলে শক্তির দাপটে খাদ্য যোগাড় করতে পারে না। প্রত্যেককেই আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। যখন আল্লাহর হুকুমের বাইরে কারও শক্তি চলে না, তখন তাঁর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা বান্দার জন্য একান্ত কর্তব্য। কারণ 'রাখে আল্লাহ মারে কে, আর মারে আল্লাহ রাখে কে?' কবির ভাষায় বলা হয়েছে-

گرت زندگانی نبشته ست دیر　　نه مارت گزاید نه شمشیر و شیر
وگر در حیاتت نمانده ست بهر　　چنانت کشد نوشدار و که زهر. [৩৯]

'যদি তকদিরে দীর্ঘায়ু লিখেন মালিক সাই
সাপ, তরবারি ও বাঘের মারার সাধ্য নাই।
যদি তোমার আয়ু না লিখেন তাই,
মরিবেই তুমি, বিষধর সাপের দরকার নাই।'

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ মানুষকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক, প্রাণ ও মন দান করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কোরআনুল কারীমে বলেছেন- لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم[৪০] অর্থাৎ 'আমি মানুষকে সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি'। মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দান অপরিসীম। কবি আল্লাহর সেই অপরিসীম দানের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাথে সাথে স্রষ্টার শুকরিয়া আদায় করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষের শান্তির জন্য দিনে সূর্যের আলো ও রাতে চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন। আলো, বায়ু ও পানি মানুষের জন্য নানা রকম খাদ্য-শস্য উৎপাদন করে। তিনি সবুজ বৃক্ষ-লতা ও ফুলে-ফলে পৃথিবীকে সুশোভিত করে রেখেছেন। হরিণের নাভিতে কস্তুরী এবং খনীতে স্বর্ণ-রৌপ্য গচ্ছিত

রেখেছেন। আল্লাহ মানুষকে চোখ, কান ও মুখ দিয়েছেন। যাতে তারা তাঁর সৃষ্টি দেখে-শুনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[৪১] তাই কবি বলেছেন-

زبان آمد از بهر شکر و سپاس   به غیبت نگرداندش حق شناس
گذرگاه قرآن و پندست گوش   به بهتان و باطل شنیدن مکوش
دو چشم از پی صنع باری نکوست   ز عیب برادر فروگیر و دوستی.[৪২]

'মুখ দিয়েছেন কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার তরে,
খোদা ভক্ত কভু বদনাম নাহি করে।
কান কোরআন ও নছিহত শ্রবণের জন্য,
পরনিন্দা ও মিথ্যাচার শুন না কোন দিনও।
দু'চোখ মেলে দেখ খোদার অপরূপ সৃষ্টি
ভাই-বন্ধুর দোষের প্রতি কর না দৃষ্টি।

তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন-মাজীদে এরশাদ করেছেন- [৪৩] كل نفس ذائقة الموت অর্থাৎ- 'প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে'। যখন প্রাণ পাখি দেহ খাঁচা হতে বের হয়ে যায়, তখন শত চেষ্টা করেও তা আর ফিরেয়ে আনা যায় না। সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও একটি প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ জগতের সকল মানুষ একই পথের যাত্রী। এ পৃথিবী-কাননে আমাদের পরেও পাখী গান করবে, বাগানে ফুল ফুটবে। কিন্তু, আমাদের প্রাণ ফিরে আসবে না। মাটির দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে। চোখ পিঁপড়ায় খেয়ে ফেলবে। হাত, পা ও আঙ্গুলের জোড়াগুলো খুলে যাবে। তাই কবি সেই দিন আসার আগেই আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা করে সকল গুনাহের জন্য চোখের পাানি ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কবির ভাষায়-

پس ای خاکسار گنه، عن قریب   سفر کرد خواهی بشهری غریب
بران از دو سرپشمهء دیده جوی   ور آلایشی داری، از خود بشوی.[৪৪]

'তুমি অতি শীঘ্রই হে গুনাহগার!
ভ্রমণ করবে অচেনা-অজানা শহর।
দু'চোখের পানিতে ঝর্ণা বয়ে দাও,
জানা গুনাহগুলো ধুয়ে মুছে নাও।

তাই এ পৃথিবী যখন একদিন ছাড়তেই হবে এবং সে যাত্রার সুনির্দিষ্ট কোন দিনক্ষণও নেই, তখন জীবন থাকতে গুনাহ হতে তওবা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করা সকলের কর্তব্য ও বুদ্ধিমানের কাজ।

উপসংহার

নৈতিক শিক্ষা ছাড়া সৎ, আদর্শ ও নান্দনিক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। শুধু আইনের ভয় দেখিয়ে আদর্শ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরী এবং তাদের মধ্যে কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, মানবতাবোধ ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা সম্ভব নয়। সা'দীর নৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারা একজন মানুষকে সত্যিকারের আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁর নৈতিক শিক্ষা মানবজীবনে দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, নীতিবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে মানুষকে সৎ, আদর্শ ও নান্দনিক জীবন দান করতে পারে- যা মানুষের ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনের সুশৃঙ্খল ও সমুন্নত পথ নির্দেশ। এর যথার্থ অনুসরণ মুসলিম সমাজকে সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে সহায়তা করবে এবং পরকালীন জীবনে মুক্তির পথকে সহজ করবে। তাই সা'দীর কাব্যের নৈতিক উপাদান পাঠকদেরকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তথ্য নির্দেশ

১. আল কোরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত -২৬।

২. মোহাম্মদ আলী ফরূগী, *কুল্লিয়াতে সা'দী* (তেহরান: এনতেশারাতে আমীর কাবীর, ১৩৮৩ হি.শা.), পৃ. ২০৯।

৩. মোহাম্মদ আলী ফরূগী, *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পূর্বোক্ত, ২১৪।

৪. ড. ইবরাহীম শাকূর যাদে, *মাওয়ায়েজ ওয়া হেকামে সা'দী* (মাশহাদ: এনতেশারাতে আস্তানে কুদ্স, ১৩৬৫ হি.শা.), পৃ. ৭।

৫. গোলাম হোসাইন ইউসুফী (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী* (তেহরান: এনতেশারাতে খাওয়ারেজমী, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯ হি.শা.), পৃ. ৪৩।

৬. **নওশিরওয়ান:** তিনি সাসানী বংশের একজন খ্যাতিমান বাদশাহ (শাসনকাল- ৫৩১-৫৭৯ খ্রী.) ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে সর্বসাধারণের নিকট প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছেন। এ মহান বাদশাহর শাসনকালে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) জন্ম (৫৭০ খ্রী.) গ্রহণ করেন। [দ্র. মির্যা আব্দুল আযীম খান গারীব গুরগানী (সম্পা.), *গুলিস্তানে সা'দী* (তেহরান: এনতেশারাতে ইরান মেহের, ১৩৮০ হি.শা.), পৃ. ২৬৬।]

৭. গোলাম হোসাইন ইউসুফী (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।

৮. তদেব. পৃ. ৫৫।

৯. আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯৪), পৃ. ১৯৮।

১০. Donaldson, D wight. M, *Studies in Muslim Ethics,* (London: S.P.C.K. Great Britain, 1953) P. 236.

১১. মোহাম্মদ আলী ফরূগী (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

১২. *মাওয়ায়েজ ওয়া হেকামে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৬।

১৩. মোহাম্মদ আলী ফরূগী (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩।

১৪. মোস্তাফিজুর রহমান খান, মাওলানা, *গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁর সহজ বঙ্গানুবাদ*, ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ১ম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রী. পৃ. ১৯৭।

১৫. আল কোরআন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত-১২।

১৬. গোলাম হোসাইন ইউসুফী (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

১৭. *তদেব*, পৃ. ২৮০।

১৮. *গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁর সহজ বঙ্গানুবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

[১৯]. মনসুর মেহরাঙ্গ (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী*, (তেহরানঃ এনতেশারাতে দাস্তান, চাপে দোওয়ম,১৩৮৬ হি.শা.) পৃ. ২১৫।

[২০]. *তদেব*, পৃ. ১১৬।

[২১]. *মাওয়ায়েজ ওয়া হেকামে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৮।

[২২]. *তদেব*, পৃ. ৩৪২।

[২৩]. *তদেব*, পৃ. ১৫৩।

[২৪]. *তদেব*, পৃ. ১৬২।

[২৫]. মোহাম্মদ আলী ফরুগী (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫।

[২৬]. ড. মোহাম্মদ খাযায়েলী, *শারহে বুস্তানে সা'দী* (তেহরানঃ চাপখানেয়ে মোহাম্মদ হাসান ইলমী, ৯ম সং. ১৩৭২ হি.শা.), পৃ. ৩২৮।

[২৭]. *মাওয়ায়েজ ওয়া হেকামে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯।

[২৮]. মনসুর মেহরাঙ্গ (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১।

[২৯]. *তদেব*, পৃ. ৩১২।

[৩০]. *মুসলিম মনীষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬।

[৩১]. *মাওয়ায়েজ ওয়া হেকামে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৯।

[৩২]. গোলাম হোসাইন ইউসুফী (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

[৩৩]. *তদেব*, পৃ. ১৭২।

[৩৪]. *তদেব*, পৃ. ৮৫।

[৩৫]. *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১৯৮।

[৩৬]. গোলাম হোসাইন ইউসুফী (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫।

[৩৭]. তদেব, পৃ. ১৪৫।

[৩৮]. *তদেব*, পৃ. ১৪৮।

[৩৯]. মোহাম্মদ আলী ফরুগী (সম্পা.), *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২।

[৪০]. আল কুরআন, সূরা আত্‌তীন, আয়াত নং -৫।

[৪১]. *শরহে বুস্তানে সা'দী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯।

[৪২]. গোলাম হোসাইন ইউসুফী (সম্পা.), *বুস্তানে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।

[৪৩]. আল কুরআন, সূরা আরাফা, আয়াত - ৩২।

৪৪, শরহে বুস্তানে সা'দী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

ইমাম খোমেনীর রচিত ফারসি গ্রন্থাবলি: একটি পর্যালোচনা

ড. সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ*

Abstract : Ayatollah Ruhollah Al-Mūsavi, known as a Imam Khomeini a man who was a leader of truth and demonstrator of the path of love and religion. He was an Iranian religious leader of Shiaite doctrine, philosopher, politician and poet. He was the founder of Islamic republic of Iran and leader of Revolution in Iran which was established in 1979 C. E. He presented to humanity, by his pen and tongue. He wrote books, delivered sermons, wrote messages and, in his everlasting will and testament, he penned the final chapter of his guiding life. He wrote several works which treated mystical topics, or which treated topics in a way characteristic of the mystical tradition. He also wrote a lot of mystic Persian poetry. The poetry of Imam Khomeini is a compendium of all the qualities and aspects of his personality.

ভূমিকা

ফারসি হলো সহজ, সাবলীল ও মিষ্টি ভাষা। এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে অনেকে খ্যাতিমান হয়েছেন। আবার অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গও ফারসি সাহিত্যচর্চায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। এমনি একজন বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম খোমেনী- যিনি ছিলেন একাধারে একজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, কবি, আদর্শ শিক্ষক, বিশিষ্ট গবেষক ও সফল রাজনীতিবিদ। তিনি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের মূল ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সাহিত্যচর্চায় সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় উসুলে হাদিস, ফিকাহশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, অধ্যাত্মবাদ, চারিত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইমাম খোমেনীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

ইমাম খোমেনীর আসল নাম রুহুল্লাহ। উপাধি হলো আল মুসাভী। পূর্ণনাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল মুসাভী আল খোমেনী। তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরান হতে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে আরাক প্রদেশের খোমেইন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আর এজন্যই তিনি খোমেনী নামে পরিচিত। পিতার নাম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুস্তফা মুসাভি- যিনি একজন বড় মাপের ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। খোমেনীর বয়স যখন ৬ মাস তখন তাঁর পিতা দস্যুদের হাতে নিহত হন।[১] তাঁর মায়ের নাম হাজেরা- যিনি ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্ব আগা মীর্জা আহমাদ মুজতাহিদ খানসারির মেয়ে। তিন ভাই-বোনের মধ্যে খোমেনী ছিলেন সবার ছোট। বাল্যকালে পিতৃহারা খোমেনী মা হাজেরা ও ফুফু সাহিবার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। খোমেনীর বয়স যখন ৬ বছর তখন মা হাজেরা ও ফুফু সাহিবা উভয়েই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মা ও ফুফুর মৃত্যুর পর খোমেনীর দেখাশুনা করেন বড় ভাই আয়াতুল্লাহ পাসানদিদে। খোমেনী বাল্যকাল হতে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি মীর্জা মাহমুদ নামক একজন গৃহশিক্ষকের নিকট নিজ গৃহে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি শিক্ষাজীবনের শুরুতে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। ১৯ বছর বয়সে তৎকালীন বিখ্যাত ইসলামি ব্যক্তিত্ব আব্দুল করিম হায়েরির নিকট আরাকে গমন করেন। পরবর্তীকালে খোমেনী ও তাঁর শিক্ষক আব্দুল করীম হায়েরি কোমে আসেন। তিনি কুরআন, তাফসির, হাদিস, উসুলে হাদিস, ফিকাহ, ধর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মবাদ, আইনশাস্ত্র, আরবি সাহিত্য, আরবি ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শনসহ প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণ করেন। তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সে যোগ্য মুজতাহিদ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(ধর্মতত্ত্ব গবেষণায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি এখানকার ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রে ছাত্রদের ইসলামি আইনশাস্ত্র শিক্ষা দেন। প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ বছর বয়সে বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্ব আয়াতুল্লাহ সাকাফির ১৫ বছরের মেয়ে খাদিজাকে বিবাহ করেন। তাঁরা তাঁদের দাম্পত্য জীবনে দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তান লাভ করেন। যখন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাস্ট্রীয়ভাবে পর্দাপ্রথা উচ্ছেদের প্রতিবাদ শুরু হয় তখন রেজা খান আলেম সমাজের উপর কঠিন নির্যাতন চালায়। ইমাম খোমেনী এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং রাজতন্ত্র উৎখাতের ডাক দেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শিক্ষক আব্দুল করিম হায়েরি মৃত্যুবরণ করলে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে দেশের সামগ্রিক বিষয়ে গভীর মনোযোগের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সিআইএ-এর চক্রান্তে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও ইমাম খোমেনীর প্রিয় শিক্ষক বুরুজারদির ইন্তেকালের পর ইরানী জনগণ ইমাম খোমেনীকে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রীসভার সংবিধানের একটি ধারা বাতিল করে বিল পাশের বিরোধিতা এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারির গণভোট বয়কটের আহ্বান করার কারণে তিনি প্রথমবারের মতো গ্রেফতার হন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নামের সাথে ইমাম শব্দটি যুক্ত করা হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর শাহের 'ক্যাপিচুলাসিউন' (উপনিবেশবাদীর দ্বারা গঠিত একটি অবিবেচনামূলক আইন) আইনের বিরোধিতা করেন। ফলে তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর দ্বিতীয়বারের মত গ্রেফতার হন এবং দেশ থেকে নির্বাসিত হন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁকে ইরাকের নাজাফে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পাহলাভি রাজবংশের ৫০তম ব্যয়বহুল বার্ষিকী উদ্‌যাপনের তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে রেজাশাহ ইরানি পঞ্জিকাকে শাহেনশাহি পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করেন। ইমাম এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং একে হারাম বলে আখ্যায়িত করেন। ফলে রেজা শাহ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে শাহেনশাহি পঞ্জিকা বাতিল করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে রেজাশাহ ইমামের বড় ছেলে সাইয়েদ মুস্তফা খোমেনীকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটকে রেখে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর ইমাম তুরস্কে নির্বাসিত হন। তিনি নির্বাসনে থাকাকালীন অনেকগুলো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শাহ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইমাম বিশিষ্ট আলেমগণের সমন্বয়ে একটি ইসলামি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি শাহ দেশ থেকে পলায়ন করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ ১৪ বছর পর ইমাম খোমেনী বিজয়ের বেশে ৫০ জন উপদেষ্টা ও ১৫০ জন সাংবাদিকসহ ইরানের মেহেরাবাদ বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী ইরানে ইসলামি বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শুরার প্রথম অধিবেশনে ইমামের লিখিত বাণী পড়ে শুনানো হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরানে জঙ্গী বিমান হামলা চালায়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় চাপিয়ে দেয়া ইরাক-ইরান যুদ্ধ যা ৮ বছরব্যাপী চলে। এ যুদ্ধে উভয় দেশই বড় ধরনের ক্ষতির সম্মূখীন হয়। ইমাম খোমেনীর জন্য ইরাকের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া এ যুদ্ধ মোকাবেলা করা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি ১৯৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের আহ্বান জানান। ইমাম খোমেনী ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামি শরিয়া মোতাবেক দক্ষতার সাথে ইরানকে রাস্ট্রীয়ভাবে পরিচালনা করেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি ১১ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন ৩ জুন মস্তিস্কের রক্তক্ষরণে ইরানের স্থানীয় সময় রাত ১০টা ২০ মিনিটে মৃত্যুবরণ করেন।[২] তাঁর জানাযার নামাজে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। রাজধানী তেহরানের দক্ষিণে 'বেহশতি জাহরায়' তাঁকে দাফন করা হয়। বর্তমানে তাঁর মাযার পর্যটকদের জন্য একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুউচ্চ চারটি মিনার, সোনা দিয়ে মোড়ানো বিরাট গম্বুজ, দেওয়াল ও মেঝে মার্বেল পাথরে মোড়া বিশাল

মাযার কমপ্লেক্স। তাঁর কবরকে রূপার তৈরী জালি দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে। তাঁর কবরের সাথে রয়েছে দ্বিতীয় ছেলে সাইয়্যেদ আহমদ খোমেনীর, সাবেক প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ্ আলি আকবর হাশেমি রাফসানজানির, ইমামের স্ত্রী খাদিজা সাকাফির, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট হাসান হাবিবির, সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল আলি সাইয়্যেদ শিরাজির, ইসলামি বিপ্লবের অন্যতম প্রাণপুরুষ আয়াতুল্লাহ্ সাদেক তাবাতাবায়ির এবং সাবেক এমপি মারজিয়ে হাদিদচির কবর।[৩]

ইমাম খোমেনীর রচিত ফারসি গ্রন্থাবলি

ইমাম খোমেনী ছিলেন একজন দক্ষ আলেম, সুলেখক, আদর্শবান শিক্ষক, আল্লাহর ওলি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সচেতন মুসলমান এবং উচ্চ পর্যায়ের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক কবি। তিনি পারস্যের বিখ্যাত কবিগণ যেমন: শেখ সাদি, মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি ও হাফিয শিরাজির কবিতা ও কাব্য ভাবধারা আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজেও রচনা করেছিলেন অসাধারণ আধ্যাত্মিক কবিতা- যা আত্ম-শুদ্ধি ও ব্যক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে শক্তিশালী সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তিনি ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে বর্ণাঢ্য ঘটনাবহুল শিক্ষকতা জীবন ও বিশাল রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যেও ইরানী জাতি তথা সমগ্র মুসলিম জাতির মুক্তির জন্য বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ছাড়াও ফারসি ও আরবি ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম খোমেনীর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ *হাদিসে বিদারিতে* ইমামের সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, উসুলে হাদিস, ফিকাহ বিষয়ক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর লিখিত প্রায় ৪৫ টি গ্রন্থের আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৪] ইমাম খোমেনীর দ্বিতীয় ছেলে সাইয়্যেদ আহমদ খোমেনী তাঁর পিতার সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, উসুলে হাদিস, ফিকাহ বিষয়ক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর লিখিত প্রায় ২৪ টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[৫] ইমামের মেয়ে জোহরা মুসাভি খোমেনী তাঁর পিতার সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, উসুলে হাদিস, ফিকাহ বিষয়ক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর লিখিত অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্য হতে মাত্র গুরুত্বপূর্ণ ৭টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। ওস্তাদ মুতাহ্হারি শাহিদ অগাহি ইমামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত প্রায় ৩৮ টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[৬] কোন কোন গবেষক ইমাম খোমেনীর গ্রন্থের সংখ্যা ৮৫টি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে গবেষকগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশতাধিক- যেগুলো তিনি নির্বাসিত জীবনে রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হল: ১. *চেহেল হাদিস*, ২. *সেররুস সলাত*, ৩. *আদাবুস সলাত*, ৪. *শারহে হাদিসে জুনুদে আল আকল ওয়াল জাহাল*, ৫. *কাশফুল আসরা'র*, ৬. *রা'হে এশ্ক*, ৭. *মেসবা'হুল হেদা'য়াত ইলা'ল খেলা'ফাত ওয়া'ল বেলা'য়াত*, ৮. *রেসা'লাহ ফিত তাকিয়েহ*, ৯. *শারহে দোয়া'য়ে সাহার*, ১০. *মাকা'সেবে মোহাররেমে*, ১১. *তাহরিরুল ওয়াসিলে*, ১২. *কিতাবুত তাহারাত*, ১৩. *কিতাবুল বাই*, ১৪. *তাওজিহুল মাসা'য়েল*, ১৫. *বাদা'য়েউদ দারার ফি কা'য়েদাতু নাফিয যারার*, ১৬. *তালিকাতু আলাল উরওয়াতুল ওস্কা*, ১৭. *রেসালা'তে ফিত তালাব ওয়াল এরাদা*, ১৮. *রেসালেয়ে আল-এসতেসহা'ব*, ১৯. *রেসালা'তু ফিত তাআ'দোল ওয়াত তারা'জিহ*, ২০. *তাকরিরাতে উসুলিয়ে*, ২১. *আনওয়া'রুল হেদা'য়াত ফিত তালিকাত আলাল কেফায়াত*, ২২. *আল-ইজতেহাদ ওয়াত তাকলীদ*, ২৩. *মানা'হেজুল উসুল ইলা এলমিল উসুল*, ২৪. *শারহে হাদিসে রা'সুল জালুত*, ২৫. *রেসালাতু ফি কায়েদাতু মিন মুলক*, ২৬. *হা'শিয়ে বার মেসাবাহুল উন্স*, ২৭. *হা'শিয়ে ইমাম বার শারহে হাদিসে রা'সুল জালুত*, ২৮. *হা'শিয়ে বার শারহে ফাওয়া'য়েদুর রাজাভিয়ে*, ২৯. *রেসালেয়ে লেকাইল্লাহ*, ৩০. *হা'শিয়ে বার আসফা'র*, ৩১. *রেসালাতু ফি তায়াইনুল ফাজার ফি লায়া'লিল মোক্কাম্মারে*, ৩২. *তালিকাতু আলা ওয়াসিলাতুন নাজাহ*, ৩৩. *রেসালেয়ে নাজাতুল ইবাদ*, ৩৪. *হা'শিয়ে বার রেসালে এর্স*, ৩৫. *মানাসেকে হজ্ব*, ৩৬. *তাকরিরা'তে দুরুসে ইমাম খোমেনী*, ৩৭. *কেতাবুল খেলাল ফিস সলাত*, ৩৮. *হুকুমাতে এসলা'মিহে ইয়া বেলা'য়েতে ফাকিহ*, ৩৯. *জেহা'দে আকবার ইয়া মোবা'রেযে ব নাফ্স*, ৪০. *তাফসিরে সুরেয়ে হাম্দ*, ৪১. *এস্তেফতা'য়া'ত*, ৪২. *দিভা'নে ইমাম খোমেনী*, ৪৩. *ব'দেহ*

এশ্‌ক, ৪৪. সহিফে নুর, ৪৫. কাওছার, ৪৬. অসিয়াত না'মে সিয়া'সিয়েএলাহি প্রভৃতি। নিম্নে ইমাম খোমেনীর ফারসি গ্রন্থসমূহের আলোচনা করা হল।

১. *দিভা'নে ইমাম খোমেনী (دیوان امام خمنی)*

দিভা'নে ইমাম খোমেনী গ্রন্থটি তাঁর রচিত একটি আধ্যাত্মিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি সমগ্র জীবনে যে সকল কবিতা রচনা করেছিলেন সে সকল কবিতাকে তাঁর মৃত্যুর ৪ বছর পর একত্র করে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে *দিভা'নে ইমাম* অথবা *সুরুদেহা'য়ে ইমাম খোমেনী* নামে মোয়াস্‌সেসেয়ে তানযিম ওয়া নাশরে আ'সারে ইমাম খোমেনী কর্তৃক তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থে সর্বমোট ১৫৬৩ টি বেইত বা পংক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ৯৮৮ টি পংক্তির সমন্বয়ে ১৪৯ টি গযল (গীতি কবিতা), ২৩২ টি পংক্তির সমন্বয়ে ৯৮ টি রুবায়ী (চতুস্পদী কবিতা), ১৩৪ টি পংক্তির সমন্বয়ে ৩ টি কাসিদা (প্রশংসামূলক কবিতা), ৮৫ টি পংক্তির সমন্বয়ে ২ টি মুসাম্মাৎ (চার স্তবকের বিশেষ কবিতা), ৪৯ টি পংক্তির সমন্বয়ে ১ টি তারজীবান্দ (এক ধরনের বিশেষ কবিতা), ৭৫ টি পংক্তির সমন্বয়ে ২১ টি কেতয়া (খণ্ড কবিতা) স্থান লাভ করেছে।[৭] নিম্নে *দিভা'নে ইমাম খোমেনী* হতে কয়েকটি শ্লোক তুলে ধরা হল:

باد نوروز وزیده است به کوه و صحرا

جامه عید بپوشند، چه شاه و چه گدا

بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست

نازم آن مطرب مجلس که بود قبله نما.[৮]

পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমিতে নববর্ষের বাতাস প্রবাহিত হয়েছে ,
রাজা-প্রজা সকলেই ঈদের পোশাক পরিধান করেছে,
বাগানের বুলবুলির তো বন্ধুর পথ জানা নেই,
আমার নাজুক চাহনী মজলিসের নর্তকীর প্রতি নিবন্ধ হল।'

২. *কাশফুল আসরার (كشف الاسرار)*

কাশফুল আসরার গ্রন্থটি ইমাম খোমেনীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলিকে কেন্দ্র করে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে রচিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি তৎকালীন স্বৈরশাসক রেজা শাহের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি ইউরোপীয় প্রাচীন দর্শন, ইসলামি দর্শন ও পাশ্চাত্যের তৎকালীন প্রচলিত দর্শন নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন। এছাড়াও এতে তিনি তাওহীদের গুরুত্ব, নবুয়তের যৌক্তিকতা, ইমামতের প্রয়োজনীয়তা, বেলায়েতে ফকিহর যথার্থতা, শিরক, বিদআত ও মূর্তিপূজার ভয়াবহতা, মোজেজার বিবরণ, শাফাআত ও জিহাদের গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রহীভাবে উপস্থাপন করেছেন। ৩৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি রাজধানী তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম খোমেনী নিজেই বলেন,'শেখ মাহদী নামে কোমের একজন পথভ্রষ্ট আলেম শাহ সরকারের নিকট থেকে অর্থ প্রাপ্তির লোভে ইসলামের অবমাননামূলক '*আসরারে হেযার সালে*'নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে। আমি তার প্রতিবাদে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে *কাশফুল আসরার* গ্রন্থটি রচনা করি।[৯]

৩. *চেহেল হাদিস (چهل حدیث)*

চেহেল হাদিস গ্রন্থটি ইমাম খোমেনীর রচিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গ্রন্থ- যা চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে রচিত। এ গ্রন্থটি *হাদিসে আরবাইন* তথা *চল্লিশ হাদিস* নামেও সমধিক পরিচিত। এ গ্রন্থটি ১৯৩৭-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রচনা করেন, যখন সমগ্র ইরানে রেজা শাহের দুঃশাসন চলছিল। ইমাম খোমেনী রেজা শাহের বিভিন্ন অপকর্মের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করায় শাহ কর্তৃক ফায়জিয়ে মাদ্রাসার ক্লাস বন্ধের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইমাম খোমেনী রেজা শাহের সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে ফায়জিয়ে মাদ্রাসার ক্লাস চালু রাখেন। ইমাম খোমেনী এ গ্রন্থে এ সকল বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এরূপ দুঃসময়ে সাধারণ মানুষ যেন ভুল পথে পরিচালিত না হয়, এ জন্য ইমাম খোমেনী একদিকে অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, পার্থিব প্রেম-ভালবাসা, রিয়া বা দৈত চরিত্র বা লোক দেখানো এবাদত, মোনাফেকি আচরণ বা কপটতা, গিবত বা পরচর্চা ও পরনিন্দা প্রভৃতি হতে বেঁচে থাকা অপরদিকে আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহভীতি বৃদ্ধি ও আল্লাহর রহমতের আশা, ধৈর্য ধারণ, কৃত পাপের অনুশোচনা, আল্লাহর স্মরণ বৃদ্ধি, ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, এবাদত-বন্দেগিতে নিজেকে সম্পৃক্তকরণ, সামগ্রিকভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে পুরোপুরি সজাগ থাকা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ৪০ টি হাদিসের ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। তাঁর ইন্তেকালের ৪ বছর পর ৯০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়।[১০]

৪. *সেররুস সলাত (سر الصلواة)*

সলাতের আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে লিখিত *সেররুস সলাত* গ্রন্থটি ইমাম খোমেনীর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি *সলাতুল আ'রেফিন ওয়া মেরাজুস সালেকিন* তথা আরেফ ও সালেকদের নামায নামেও সমধিক পরিচিত। এ গ্রন্থটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্যবর্তী সময়ে রচনা করেন। ২৬৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত ২৬ টি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত এ গ্রন্থটি ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়।

৫. *আ'দা'বুস সলাত (آداب الصلواة)*

এ গ্রন্থটিও ইমাম খোমেনীর সলাতের আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে লিখিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি *সেররুস সলাত* গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। এ গ্রন্থটি তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি সলাতের বিভিন্ন আদব ও গোপন রহস্যাবলী আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় রচিত।[১১]

৬. *রা'হে এশক (راه عشق)*

এ গ্রন্থটি ইমাম খোমেনীর একটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। এটি *না'মেহায়ে এরফানি ও নুকতে আতফ* শিরোনামেও পরিচিত। এটি মূলত একটি পত্র-সংকলন। এ গ্রন্থটি ইমাম খোমেনী তাঁর পুত্র আহমদ খোমেনী এবং পুত্রবধু ফাতেমা তাবাতাবাঈর অনুরোধে পত্রাকারে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ইমামের কীর্তি সংরক্ষণ ও প্রচার ফাউন্ডেশন কর্তৃক তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়।[১২] এ গ্রন্থে বর্ণিত ইমামের বক্তব্যের কিছু অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল:

فاطی عزیزم!

بالأخره بر من نوشتن چند سطر را تحمیل کردی و عُذر پی.ری و رنجوری و گرفتاری‌ها را نپذیرفتی. اکنون از آفات پیری و جوانی سخن را آغاز می کنم که من هر دو مرحله را درک کرده یا بگو به پایان رسانده ام.[১৩]

'প্রিয় ফাতি! তুমি আমাকে শেষ পর্যন্ত কিছু লিখতে বাধ্যই করলে, বৃদ্ধ বয়সের ব্যস্ততা ও অসুস্থতা কোন কিছুই তোমাকে নিবৃত করতে পারল না। বউ মা আমার! তুমি এখনো আমার এই অবস্থা হতে অনেক দূরে অবস্থান করছো, বার্ধক্যের স্বাদ তুমি গ্রহণ করনি। আমার এমন দূরাবস্থায় তুমি আমার নিকট থেকে কিছু লেখা কামনা করছো।'

৭. *রেসা'লে লেকা'ইল্লাহ (رساله لقاءالله)*

এ গ্রন্থটি ইমাম খোমেনীর একটি সংক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি নাফসের পরিশুদ্ধতা, আধ্যাত্মিক রুহ ও আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের উপায় সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। আয়াতুল্লাহ মীর্জা কাশানি জাওয়াদ মিলকি এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ফায়েজ কাশানি কর্তৃক তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, ইমাম খোমেনীর এ গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠকদের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ।[১৪]

৮. *রেসা'লে নাজা'তুল এবা'দ(رساله نجاة العباد)*

এ গ্রন্থটি ইমাম খোমেনীর একটি ফতোয়া বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের ও শরিয়তের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের আধ্যাত্মিক রাজধানী কোম থেকে প্রকাশিত হয়।[১৫]

৯. *হা'শিয়ে বার রেসা'লে এরস (حاشیه بر رساله ارث)*

হা'শিয়ে বার রেসা'লে এরস এ গ্রন্থটি ইমাম খোমেনীর ইসলামি শরিয়তের মিরাস বা উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে তিনি ইসলামি শরিয়তের মীরাস তথা উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ গ্রন্থটিতে মূলত তিনি ফারসি ভাষায় মোল্লা খোরাসানির লিখিত '*মুন্তাখাবুত তাওয়ারিখ*' গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন। এ গ্রন্থটি প্রকাশের সঠিক তারিখ জানা যায়নি, তবে ধারণা করা হয় যে, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের আধ্যাত্মিক রাজধানী কোম থেকে এটি প্রকাশিত হয়।[১৬]

১০. *হুকুমা'তে এসলা'মিয়ে ইয়া বেলা'য়াতে ফাকিহ (حکومات اسلامیه یا ولایت فقیه)*

এটি ইমাম খোমেনীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর ছেলে আহমাদ খোমেনী এ গ্রন্থের ব্যাপারে বলেন, '*হুকুমা'তে এসলা'মিয়ে ইয়া বেলা'য়াতে ফাকিহ* এমন একটি সংকলন গ্রন্থ- যা ইমাম ইরাকের নাজাফে অবস্থানকালীন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রদত্ত বিশটি ভাষণের সংকলন।' এ গ্রন্থটি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পূর্বে এবং পরে একাধিকবার ফারসি ও আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এটি সর্বপ্রথম ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পূর্বে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এবং সর্বশেষ ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পরে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১৭]

১১. *জেহা'দে আকবার ইয়া মোবারেযে বা' নাফস (جهاد اکبر یا مبارزه با نفس)*

এটি ইমাম খোমেনীর একটি নৈতিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি মূলত তাঁর ইরাকের নাজাফে অবস্থানকালীন আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর প্রদত্ত বক্তব্যের সংকলন। এতে তিনি নাফস তথা ক্বলবের পরিশুদ্ধতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও এতে সংক্ষিপ্তাকারে নৈতিকতা, প্রশিক্ষণ ও রাজনৈতিক বিষয়াবলির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। প্রথমদিকে এ গ্রন্থটি *হুকুমা'তে এসলা'মিয়ে ইয়া*

বেলা'য়াতে ফাকিহ গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে পরিগণিত হত। পরে এটি পৃথক একটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পূর্বে এবং পরে একাধিকবার প্রকাশিত হয়। এটি ভূমিকা ও ব্যাখ্যাসহ সর্বশেষ ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পরে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইমামের কীর্তি সংরক্ষণ ও প্রচার ফাউন্ডেশন কর্তৃক তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়।[১৮]

১২. *তাফসিরে সুরেয়ে হামদ (تفسیر سوره حمد)*

এটি ইমাম খোমেনীর একটি আধ্যাত্মিক তাফসির গ্রন্থ। তিনি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বছরে সুরা ফাতিহা তথা সুরা হামদ এর উপর কয়েকটি অনুষ্ঠানে যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, পর্যায়ক্রমে তা প্রকাশিত হয় এবং সুরা হামদ এর তাফসির হিসেবে সমাদৃত হয়।[১৯] সুরা ফাতিহা তথা সুরা হামদ এমন একটি সুরা-যার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের গূঢ় রহস্য, তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক রহস্যাবলি অনুধাবন করা যায়। এছাড়াও এতে আল্লাহর নাম, তাঁর প্রশংসা, সৃষ্টি জগতের মাঝে তাঁর নূরের বিকাশ, তাঁর সৃষ্টি রহস্য, ঈমানের মূলমন্ত্র, মানুষের অস্তিত্বের মূল সন্ধান, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক, জ্ঞানের স্তর, জ্ঞানের উপকারী ও অপকারী দিক, আল্লাহর নিকট দোআ করার দর্শন ও তাৎপর্য, কুরআনের মাহাত্ম, ভাষাগত মান, আধ্যাত্মিক সুউচ্চ স্তর প্রভৃতি বিষয় এ গ্রন্থে সম্যক আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল: কুরআন বুঝার জন্য কমপক্ষে যে তের প্রকার জ্ঞানের গভীর পাণ্ডিত্য প্রয়োজন তার বাস্তব ও সফল প্রয়োগ এতে পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাহিয়্যে ওয়া তানজিম আলি আসগর রব্বানী খেলখালি কর্তৃক কোম থেকে প্রকাশিত হয়।[২০]

১৩. *কাওসার (کوثر)*

এটি ইমাম খোমেনীর একটি সংকলনমূলক গ্রন্থ। এতে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তব্য, আদেশ ও চিঠি-পত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ১১২৬ টি বক্তব্য, ৪৭০ টি আদেশ, বিশ্ব নেতাদের কাছে লিখিত ৩৬৭ টি চিঠি-পত্র ও ইরানিদের কাছে লিখিত ৪২০ টি চিঠি-পত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। ৩২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এবং এটি ইমাম খোমেনীর একটি অমূল্য গ্রন্থ হিসেবে *কাওসার (کوثر)* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[২১]

১৪. *অসীয়ত নামেয়ে সিয়সিয়ে এলাহি (وصیتنامه سیاسی الهی)*

এটিও ইমাম খোমেনীর একটি সংকলনমূলক গ্রন্থ। এতে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের তথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রদত্ত বিভিন্ন উপদেশাবলি, ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ও ইরানের ইসলামি বিপ্লবোত্তর মজলিসে শুরার প্রথম বৈঠকের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের আমানত সম্পর্কে প্রদত্ত উপদেশাবলির সার-সংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়াও এতে ইসলামি শরিয়তের সঠিক আকিদা-বিশ্বাস, বর্তমান ও ভবিষৎ জাতির জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা, ইসলামি সমাজ ও সাধারণ সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ইসলামি রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের উদাত্ত আহবান, ভবিষৎ প্রজন্মের প্রতি ইসলামি জাগরণের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, সার্বিক সতর্কতা, কর্মে একনিষ্ঠতা, সর্বজনীন কাজে আত্মোৎসর্গ-মনোভাব, অন্যায়ের প্রতিরোধে চেতনা ও দৃঢ়তার প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থটি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পরে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মারকাজে চাপ ওয়া সাজেমানে তাবলিগাতে ইসলামি কর্তৃক তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়।[২২]

১৫. *সহিফেয়ে নূর (صحیفه نور)*

এটিও ইমাম খোমেনীর একটি সংকলনমূলক গ্রন্থ। এতে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তব্য স্থান লাভ করেছে। তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ হতে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে সকল আদেশ, উপদেশ, বক্তব্য ও সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সে সকল বিষয়াদি সংরক্ষণ

করে *সহিফেয়ে নূর* নামে ২২ খণ্ডে পুস্তাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ইমামের যুগোপযোগী বক্তৃতা-বিবৃতি, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশাবলির পাশাপাশি তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ভাষা ও সাহিত্যিক দক্ষতা ও শৈল্পিক নৈপুণ্যতা, বিচক্ষণতা ও নির্ভীকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে সকল খণ্ড একত্রিত করে *মেফতাহে সহিফে* নামে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পরে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মারকাজে মুদারাকে ফারহাঙ্গিয়ে এনকেলাবে ইসলামি কর্তৃক তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়।[২৩]

১৬. *বদেয়ে এশ্‌ক (باده عشق)*

বদেয়ে এশ্‌ক এটি ইমাম খোমেনীর একটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পরে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইমামের কীর্তি সংরক্ষণ ও প্রচার ফাউন্ডেশন কর্তৃক তেহরান থেকে তৃতীয় বারের মতো প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তাঁর আধ্যাত্মিক চিঠি-পত্র ও আধ্যাত্মিক কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। নিম্নে এ গ্রন্থের দু'টি কবিতা তুলে ধরা হল:

دستی به دامن بت مه طلعتی زنم

اکنون که حاصلم نشد از شیخ خرکه پوش

از قیل و قال مدرسه ام حاصلی نشد

جز حرف دلخراش، پس از آن همه خروش.[২৪]

'আমার জীবন খানকাতে বন্দী করে ফেললাম,
এখনো খেরকা পরিধানকারী শেইখের থেকে কিছুই অর্জিত হল না,
আমার পাঠশালার বিদ্যাবহর থেকে কিছুই অর্জিত হয়নি,
এতো সব হাঁক ডাক থেকে শুধু আক্ষেপই পেলাম।'

১৭. *এস্তেফতা'য়া'ত (استفتائات)*

এস্তেফতা'য়া'ত এটি ইমাম খোমেনীর একটি ফিকাহ তথা ইসলামি আইন শাস্ত্র বিষয়ক সংকলন গ্রন্থ। ইরানের সাধারণ মানুষ ইমামকে ইসলামি শরিয়ত বিষয়ক যে সকল প্রশ্ন করতেন, তিনি সেগুলোর ধারাবাহিক উত্তর দিতেন। পরবর্তীকালে তথা ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পরে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার কোম থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।[২৫]

১৮. *তাক্বরিরা'তে দুরুসে এমা'ম খোমেনী (تقريرات دروس امام خمینی)*

তাক্বরিরা'তে দুরুসে এমা'ম খোমেনী এটিও ইমাম খোমেনীর একটি ফিকাহ তথা ইসলামি আইন শাস্ত্র ও উসুল তথা হাদিসের জ্ঞান বিষয়ক সংকলন গ্রন্থ। তিনি স্বীয় ছাত্রদেরকে ক্লাসে যে সকল বিষয়ে দারস দিতেন, পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্ররা সেগুলোকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।[২৬]

১৯. *মানাসেকে হজ্জ (مناسک حج)*

মানাসেকে হজ্জ এটিও ইমাম খোমেনীর একটি ফিকাহ তথা ইসলামি বিধি-বিধান বিষয়ক গ্রন্থ। এতে হজ্জের সময়ে করণীয় বিভিন্ন আমল, ইসলামি শরিয়া সম্মত হজ্জের নিয়ম-কানুন ও হজ্জের সময় বর্জণীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে কোম থেকে প্রকাশিত হয়।[২৭]

২০. *হাশিয়ে বার আসফার (حاشیه براسفار)*

হাশিয়ে বার আসফার এটি মূলত ইমাম খোমেনীর একটি টীকা গ্রন্থ। ইমাম খোমেনী যখন ইরানের আধ্যাত্মিক রাজধানী কোমে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন তখন তিনি *আসফার বার বায়ে* নামক এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানা স্বীয় ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। পরে তিনি এ গ্রন্থের টীকা লিখেন যা *হাশিয়ে বার আসফার* নামে প্রকাশিত হয়।[২৮]

২১. *রেসালাতু ফি তায়াইনুল ফাজার ফি লায়া'লিল মোক্বাম্মারে*
(رسالة فی تعین الفجر فی اللیلی المقمره)

রেসালাতু ফি তায়াইনুল ফাজার ফি লায়া'লিল মোক্বাম্মারে এটিও ইমাম খোমেনীর একটি ফিকাহ তথা ইসলামি বিধি-বিধান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে জ্যোৎস্না তথা আলোকময় রাত্রে সুবহে সাদেক অর্থাৎ ফজরের শুরু কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থটি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইরানের আধ্যাত্মিক রাজধানী কোম থেকে প্রকাশিত হয়।[২৯]

২২. *তালিকাতু আলা ওয়াসিলাতুন নাজাহ (تعلیقه علی وسیله النجاه)*

তালিকাতু আলা ওয়াসিলাতুন নাজাহ এটিও ইমাম খোমেনীর একটি ফিকাহ তথা ইসলামি বিধি-বিধান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি মূলত আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আবু হাসান ইসফাহানির *ওয়াসাতুন নাজাহ* গ্রন্থের ব্যাখ্যা। এ গ্রন্থে পরকালীন মুক্তির ইসলামি শরিয়া সম্মত ওয়াসিলা বা মাধ্যম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।[৩০]

২৩. *মেসবাহুল হেদায়াহ ইলাল খেলাফাহ ওয়াল বেলায়াহ*
(مصباح الهدایه الی الخلافه والولایه)

মেসবাহুল হেদায়াহ ইলাল খেলাফাহ ওয়াল বেলায়াহ এটি ইমাম খোমেনীর একটি আধ্যাত্মিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৮ বছর বয়সে রচনা করেন। ওস্তাদ জালালুদ্দীন আশতিয়ানি এ গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দেন। ৩১৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি ইরানের ইসলামি বিপ্লবের পরে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তেহরান থেকে প্রকাশিত হয়।[৩১]

ইমাম খোমেনীর ফারসি সাহিত্যের মূল্যায়ন

ইমাম খোমেনী ছিলেন একজন আপাদমস্তক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্মতা, অভিনব তত্ত্ব ও রহস্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ। আর এ জন্য তাঁর রচনায় আধ্যাত্মিক ভাবধারা ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর রচনায় প্রিয়ার সাথে ফিসফিস করে মনের কথামালার সমষ্টি, আত্মিক রুহের উত্তেজনাকর অবস্থা, নিজের ব্যথিত হৃদয়ের গোপনীয়তাকে প্রিয়ার কাছে ব্যক্ত করার আকুতি, যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহর নিকট গোপনে উপস্থাপন ও তাঁর প্রেমে মত্ত হয়ে মিলনের আশা-আকাঙ্খা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার অতল গভীরে প্রবেশ করে নিজেকে আল্লাহর প্রেমিক হিসেবে আবিস্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি বলেন,

همچو پروانه، بسوزم بر شمعش همه عمر

محو چون می زده، در روی نکویش باشم[৩২]

'প্রজাপতির ন্যায় তাঁর প্রদীপেই দগ্ধ হব সারাজীবন
মদ্য পানে তাঁর সুন্দর চেহারার তরে হব বিলীন।'

ইমাম খোমেনীর রচনায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অদম্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অনন্য মাধ্যম হল নির্জন পরিবেশে তাঁকে আহবান করা এবং এ ক্ষেত্রে অন্তরায় হল তাঁর সাথে শিরক তথা অংশীদার স্থাপন করা। এ দু'টিই ইতিবাচক ও নীতিবাচক বিষয় তাঁর রচনায় ব্যাপক আকারে স্থান লাভ করেছে। তিনি তাঁর রচনায় শিরককে পরিহার করার উদাত্ত আহবান করেছেন। তিনি বলেন,

گرفتم ساغری، از دست مستی   تعالی الله! چه مستی و چه دستی؟

بشارت باد! خاصان حرم را   که قصد کعبه دارد، بت پرستی.[৩৩]

'মাতালের হাতের পানপাত্রে বন্দী হয়েছি,

আল্লাহ তাআলা! জানে কি মাতলামী আর কি মেকি?

বাতাসের সুসংবাদ! কাবা ঘরই নির্দিষ্ট আছে,

যাবতীয় বন্দেগী কাবার মালিকের ইচ্ছাধীনই হবে।'

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায় তিনি বলেন,

ای پیر! مرا به خانقه منزل ده   از یاد رخ دوست، مراد دل ده

حاصل نشد از مدرسه جز دوری یار   جانا! مددی به عمر بی حاصل ده.[৩৪]

'হে পীর! আমাকে খানকায় লক্ষ্যস্থল জানিয়ে দাও,

যাতে আমার হৃদয় বন্ধুর চেহারা স্মরণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

মাদ্রাসায় বন্ধুর বিচ্ছেদ ছাড়া কিছুই অর্জিত হয়নি,

হে প্রিয়তম! জীবনে যা অর্জন হয়নি তা পেতে সাহায্য কর।'

এছাড়াও তাঁর রচনায় জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ, পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ীত্ব, আত্মগঠন, আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন, একত্ববাদ, নবুয়াত, রেসালাত, ইমামত, বেলায়েত, ইনসানে কামেল তথা পূর্ণাঙ্গ মানুষের সকল পর্যায় ও ধাপের বিবরণ, আহলে বাইতের আলোচনা, সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদআত বর্জনের আহবান, কপট মানুষকে ঘৃণা, বাস্তব জীবনের সাথে অধ্যাত্মবাদের সমন্বয় সাধন, চরিত্র গঠন, ইসলামি দর্শনের সাথে অন্যান্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা, স্বদেশপ্রেম, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে সংগ্রাম, আল্লাহর প্রেম সংক্রান্ত রূপক শব্দের ব্যাপক ব্যবহার, অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড যেমন মদ্যপান, মাদক ব্যবসা, জুয়াখেলা, উলঙ্গপনা, পর্দাহীনতা, বেশ্যাবৃত্তি, পরনিন্দা-পরচর্চা প্রভৃতি বিষয়কে চূড়ান্ত হারাম হিসেবে ঘোষণা, সমাজে সাম্য ও মৈত্রী স্থাপন, সমাজের অবহেলিত জনসমষ্টির প্রতি বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান, শ্রমিকদের নায্য শ্রমমূল্য যথাসময়ে প্রদান, পুঁজিবাদকে নিরুৎসাহিতকরণ, শিশুদের প্রতি ভালবাসা, মানুষের সাথে নম্র আচরণ, বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য, সুষ্ঠু, রুচিশীল ও নির্মল সংস্কৃতির লালন ও প্রসার, আল্লাহদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি মানদণ্ড ও মূল্যবোধ রক্ষা প্রভৃতি বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ইমাম খোমেনী ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক সাধক, প্রতিথযশা দার্শনিক, আদর্শ শিক্ষক, বিখ্যাত ফকিহ ও সফল সুফী কবি ও সাহিত্যিক। যিনি তাঁর

সমগ্র জীবনকে অবহেলিত ও বঞ্চিত মানবতার প্রয়োজনে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত সাহিত্যকর্ম বিশ্ববাসীর নিকট কালের কীর্তি হয়ে অমর ও অক্ষয় থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১. আলি রেজা দেহকান, *চেহেল নুকতে আয সেয়ারেয়ে আমালিয়ে এমা'ম খোমেনী (র.)*, (তেহরান: নাশরে রুহ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৭৬-৭৭।

২. নূর হোসেন মজিদী (অনূ.) *ইরানের সমকালীন ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩০৪।

৩. দৈনিক মানব জমিন, ১৪ মার্চ ২০১৭।

৪. হামিদ আনসারি, *হাদিসে বিদারি (নেগাহী বে যেন্দেগিনামেয়ে আরমানি, এলমি ওয়া সিয়াসিয়ে এমা'ম খোমেনী)*, (তেহরান: মুআসসেসেয়ে তানযিম ওয়া নাশরে অসারে এমা'ম খোমেনী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২১৪-২৪১।

৫. মুস্তফা ভিজদানি, *সারগোজাশত্হায়ে ভিজে আয যেন্দেগিয়ে হযরত এমা'ম খোমেনী* (তেহরান: এন্তেশারাতে পায়ামে অযাদি, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৮-২০।

৬. *এমা'ম খোমেনী চেরাগে হেদায়াত, ওস্তাদ মুতাহ্হারি শাহিদ অসাহি* (তেহরান: এত্তেহাদিয়ে আঞ্জুমানহায়ে ফারহাঙ্গিয়ে তালাব, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩১-৪৩।

৭. রুহুল্লাহ মুসাভি এমা'ম খোমেনী, *দিভা'নে এমা'ম, মাজমুয়ে আশআরে এমা'ম খোমেনী*, আলি অকবর রেশাদ (সংকলিত), (তেহরান: মুআসসেসেয়ে তানযিম ওয়া নাশরে অসারে এমা'ম খোমেনী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২২।

৮. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৩৯।

৯. মুহাম্মদ হাদি মিফতাহ, *বাররাসিয়ে আবআদে এলমিয়ে শাখসিয়াতে হযরত ইমাম খোমেনী (র.)*, (তেহরান: এন্তেশারাতে সেদা ওয়া সিমায়ে জমহুরিয়ে ইসলামিয়ে ইরান, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১০।

১০. *হাদিসে বিদারি*, পৃ. ২২০-২২১।

১১. *এমা'ম খোমেনী চেরাগে হেদায়াত, ওস্তাদ মুতাহ্হারি শাহিদ অগাহি*, পৃ. ৩২।

১২. *প্রাগুপ্ত* পৃ. ৩৫।

১৩. মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন খান, *ইমাম খোমেনীর কবিতা* (ঢাকা: সহীফা প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৪৪-৪৫।

১৪. রুহুল্লাহ মুসাভি এমা'ম খোমেনী, *রেসা'লে লেকা'ইল্লাহ* (তেহরান: নাহযাতে যেনানে মুসলমান, খেয়া'বানে জমহুরিয়ে ইসলামি, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. হা।

১৫. *হাদিসে বিদারি*, পৃ. ২৩১।

১৬. *এমা'ম খোমেনী চেরাগে হেদায়াত, ওস্তাদ মুতাহ্হারি শাহিদ অগাহি*, পৃ. ৪২।

১৭. *Imam Khomeini (1900-1989) A Portrait* (Tehran: Headquarters for the 100th Birth Anniversary of Imam Khomeini (a.s), 1999), p.106.

১৮. রুহুল্লাহ মুসাভি এমা'ম খোমেনী, *জেহা'দে আকবার ইয়া মোবারেযে বা' নাফস* (তেহরান: মুআসসেসেয়ে তানযিম ওয়া নাশরে অসারে ইমাম খোমেনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৮।

১৯. *হাদিসে বিদারি*, পৃ. ২৩৭।

[২০]. রুহুল্লাহ মুসাভি এমা'ম খোমেনী, *তাফসিরে সূরেয়ে হামদ* (কোম: তাহিয়্যে ওয়া তানজিম আলি আসগর রব্বানি খেলখালি, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ২।

[২১]. *হাদিসে বিদারি*, পৃ. ২৪০।

[২২]. রুহুল্লাহ মুসাভি এমা'ম খোমেনী, *অসিয়ত নামেয়ে সিয়াসিয়ে এলাহিয়ে হযরত এমা'ম খোমেনী (র.)*, (তেহরান: মারকাজে চাপ ওয়া সাজেমানে তাবলিগাতে ইসলামি, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৬৩-৬৪।

[২৩]. *হাদিসে বিদারি*, পৃ. ২৪০।

[২৪]. রুহুল্লাহ মুসাভি এমা'ম খোমেনী, *বাদেয়ে এশ্ক* (তেহরান: মুআসসেসেয়ে তানযিম ওয়া নাশরে অসারে ইমাম খোমেনী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১১।

[২৫]. *হাদিসে বিদারি*, পৃ. ২৩৭।

[২৬]. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৩২।

[২৭]. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৩৩।

[২৮]. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২২৩।

[২৯]. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২২৯।

[৩০]. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৩১।

[৩১]. *Imam Khomeini (1900-1989) A Portrait,* p.103.

[৩২]. *দিভা'নে ইমাম, মাজমুয়ে আশআরে ইমাম খোমেনী*, পৃ. ১৪৬।

[৩৩]. *প্রাগুপ্ত* পৃ. ২৬২।

[৩৪]. *প্রাগুপ্ত* পৃ. ২১৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষার প্রভাব

ড. মো. নূরুল হুদা*

ড. রিজওয়ানা ইসলাম সাম্মী**

Abstract : Bengali Language is our mother tongue. The history of Bengali Language is very ancient. From the ancient period it comes of various changes and transform to modern language and literature. At present Bengali Language and Literature takes up celebrity. So when we discuss the history of Bengali Language, We see that, there are many words of various languages; as like Greece, Persian, Arabic, Turkey, Hindi, English, France, Portuguese, China, Barmies, Malay, Japanese, Olandas, Sindi, Gujrati, Marathi, Panjabi etc. But there are very influence of Persian Language and Literature; This influences are mainly infiltration of Persian word into Bengali Language and impact of Persian Poets and their literary works on the Bengali Poets and on their works. Without that there are many impacts in Bengali Language but in a short article we have no expedient discuss the all things. So we shortly brief the infiltration of Persian to Bengali Language and Literature.

ভূমিকা

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ বাংলা ভাষার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। এক হাজার বছর পূর্বে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন পাওয়া যায়। আদিকাল থেকে যুগ যুগ পেরিয়ে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বর্তমানে গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বাংলা ভাষার অঙ্গ পরিপুষ্ট করেছে এবং বিভিন্ন ভাষার বাগ বৈভব এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দগুলি আলোচনা করলে এতে বিভিন্ন ভাষার প্রভাব স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দাবলীকে তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী এ পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এতে দেখা যায় তিনটি ভাগই সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে সংস্কৃত ভাষার শব্দ। অন্য দিকে দেশী শব্দ কমই দেখাযায় এ ভাষায়। তবে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দও কম নয়। বিদেশী শব্দের মধ্যে যেমন- গ্রীক, ফারসি, আরবি, তুর্কি, হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগীজ, চৈনিক, বর্মি, মালয়, জাপানি, ওলন্দাজ, সিন্দি, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি রয়েছে। বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের মধ্যে ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ও ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। কেননা ১২০৩ মতান্তরে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় (বঙ্গদেশে) ফারসি ভাষা প্রবেশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন মুসলমান সুলতানদের দ্বারা দীর্ঘকাল এ দেশ শাসিত হয়েছে। বঙ্গদেশে ১২০৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ ভাষা ছিল ফারসি। এর ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে এবং বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব অধিক পরিমাণে বিস্তার লাভ করে। দীর্ঘ ছয়শত বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে ফারসি রাষ্ট্র ভাষা থাকায় বেশ কিছু ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং কিছু শব্দ পরিবর্তন হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়াও ফারসি সাহিত্যের কবিদের প্রভাবও বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য।

---

* প্রফেসর, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

** সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা ভাষায় ফারসির প্রভাবঃ

বাংলাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে; যেমন করেছে শব্দকোষ ও অঙ্গের পুষ্টি সাধনে, তেমনি করেছে ভাবধারায় ঐশ্চর্য বিধানে। মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পূর্বেই অবশ্য এদেশে কিছু আরবি শব্দ অনুপ্রবেশ করেছিল। তবে এগুলো ফারসি রাজভাষার মাধ্যমেই এসেছিল। আমাদের কথ্য ভাষায় অজস্র অপভ্রংশজাত আরবি ও ফারসি শব্দ রয়েছে। এগুলো যে, আরবি-ফারসি থেকে সমাগত, তা আপাত দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। কিন্তু ভাষা তত্ত্ববিদদের কাছে তা অবিদিত নয়। এছাড়াও ফারসি সাহিত্যের সূফিবাদ, অতিন্দ্রিয়বাদ ও রোমান্স-এর ছোঁয়া লেগে বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ফারসি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্য আরো বরণ করেছে বাক্যালংকার, কাব্যের পারিভাষিক নাম ও ছন্দরীতি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- বাংলা সাহিত্যের গযল, মর্সিয়া, মসনবী, রুবাই বা চতুষ্পদী কবিতা, ফারসি সাহিত্যের অবদান। এতে অনুমিত হয় যে, এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা ও মন মানসিকতায় ফারসির কতখানি প্রভাব রয়েছে।

বাংলা ভাষা ও বংগদেশীয় সংস্কৃতির উপর ফারসির প্রভাব বর্ণনা করে মরহুম এ.কে.ফজলুল হকের কন্যা রইসী বেগম বলেন:-

'ইংরেজ শাসনের পূর্বেও বংগদেশে হিন্দু, মুসলমান ও অপরাপর জাতি বাস করতো। সে সময় সরকারী ভাষা ছিল ফারসি। হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের লেকেরা আরবি ফারসি মেশানো উর্দু বা বাংলা ভাষায় কথা বলতো। ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় বঙ্গদেশের অধিবাসীদেরও সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল আরবি মেশানো ফারসি।[১] কেবল বাংলাদেশের নয়, গোটা বংগদেশের ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসই বহুলাংশে অনালোচিত ও অপ্রকাশিত রয়েছে। ফলে বহির্বিশ্বের, এমন কি এ দেশেরও অনেকের পক্ষে এটা ধারণা করা মুশকিল হয় যে, এককালে এখানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিল এবং ফারসি রাজভাষারূপে স্বীয় মর্যাদা হারাবার পরেও প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত এদেশের জনমনে এর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। শুধু তাই নয়, এখানকার ভাষা ও সাহিত্যের উপর এর গভীর প্রভাব বিরাজমান ছিল এবং এখনও রয়েছে।'[২]

বর্তমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ভাষার যে প্রভাব তা প্রধানত: দু'টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। প্রথমত: বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ফারসি শব্দগত প্রভাব। আর দ্বিতীয়ত: বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্যের কবি সাহিতিকদের সূফিবাদ, কাব্যশৈলী, কাব্যিক নাম, অতিন্দ্রীয়বাদ ও রোমান্স- এর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছে। যা নিম্নে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

প্রথমত: বাংলা ভাষা সংগঠনে ফারসি শব্দের প্রভাবঃ

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিজয়ে এবং বাংলায় দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম শাসন ও পারস্য থেকে আগত সুফি সাধকগণ এদেশে ইসলাম প্রচার করতে এসে ফারসি ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে তুর্কি, ইরানি, আফগান ও মোগল শাসকগণ ফারসিকে রাষ্ট্র ভাষা বা সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেনে। এভাবে ১২০৩ থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৩৩ বছর যাবৎ বাংলায় ফারসি ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং এ ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ফলে আমাদের বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার বহু শব্দ প্রবেশ করেছে এবং আমাদের বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত কিছু ফারসি শব্দ এখানে তুলে ধরা হলো:-

১) **মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধীয় কিছু শব্দঃ** চেহারা (چهره), সুরাত (صورت), যবান (زبان), পা (پا), কোমর (کمر) , সিনা (سينه), গরদান (گردان), পাঞ্জা (پنجه), দেল (دل), বাজু (بازو), রান (ران), যুলফ (زلف) ইত্যাদি।

২) **পরিবার সংক্রান্তঃ** বাবা (بابا), মা (ما), খালা (خاله), দাদা (دادا), নানা (نانا), বাচ্চা (بچه), দোস্ত (دوست), দাইয়ী (دائی) ইত্যাদি।

৩) **ধর্ম সংক্রান্তঃ** নামাজ (نماز), রোযা (روزه), হজ্জ (حج), যাকাত (زکواه), খোদা (خدا), পয়গম্বর (پیغمبر), ফেরেস্তা (فرشته), বেহেস্ত (بهشت), নেক্কার (نیک کار), বন্দেগী (بندگی), পরহেযগার (پرهیزگار), গুনাহ (گناه), জায়নামায (جای نماز) ইত্যাদি।

৪) **ভূমি সংক্রান্তঃ** যমিন (زمین), যমিদার (زمین دار) খাস (خاص), খাযনা (خزانه), দাগ (داغ), পরচা (پرچه), নকল (نقل) ইত্যাদি।

৫) **আইন আদালত সংক্রান্তঃ** আইন (آئین), আদালত (عدالت), কানুন (قانون), উকিল (وکیل), হাকিম (حاکم), হুকুম (حکم), ফরমান (فرمان), মুনশী (منشی), কয়েদ (قید), পেশকার (پیشکار), মক্কেল (موکل), পরওয়ানা (پروانه) ইত্যাদি।

৬) **খাদ্য সংক্রান্তঃ** পোলাউ (پلاو), গোশত (گوشت), কোফতা (کوفته), বাদাম (بادام), পেস্তে (پسته), সবজি (سبزی), বিরানী (بریانی), আনার (آنار), হালুয়া (حلوا), কাবাব (کباب) ইত্যাদি।

৭) **স্থান বিষয়ক ফারসি শব্দ যা বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছেঃ** যেমনঃ- এবাদত খানা (عبادت خانه), গোসল খানা (غسل خانه), হাম্মাম খানা (حمام خانه), মোসাফের খানা (مسافر خانه), শরাই খানা (شراب خانه), ইয়াতিম খানা (یاتیم خانه), পিল খানা (پیل خانه), কয়েদ খানা (قید خانه), বালা খানা (بلا خانه), গুলিস্তান (گلستان), নওয়াবপুর (نواب پور), রংপুর (رنگ پور), সিরাজগঞ্জ (سراج گنج), কারখানা (کارخانه), আজিম পুর (عظیم پور) ইত্যাদি।

৮) **মানুষের নামবাচক বেশ কিছু ফারসি শব্দ রয়েছে :** যেমনঃ- দেলরুবা (دلربا), দেলারা জামান (دلارا زمان), মেহরী (مهری), শাবনাম (شبنم), সোহরাব (سهراب), রুস্তম (رستم), যিনাত আরা (زینت آرا), নাজনিন (نازنین), মাহাতাব (ماه تاب), মুহাররম (محرم), নাবিল (نبیل) ইত্যাদি।

৯) **পশুপাখির নাম সংক্রান্তঃ** যেমন- তোতা (طوطی), বুলবুল (بلبل), কবুতর (کبوتر), খরগোশ (خرگوش), জানোয়ার (جانوار) ইত্যাদি।

এছাড়া ও বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বহু শব্দ ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয়ে আসছে এবং এদের প্রভাবেই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধিলাভ করেছে।

যেমনঃ বালিশ (بالش), বেয়াদব (بی ادب), নাম (نام), কম (کم), গরম (گرم), রোজ রোজ (روز روز), বদ (بد), হুশিয়ার (هشیار),সাবেক (سابق), বেহুশ (بی هوش), আদব (ادب), আরাম (آرام), আখলাক (اخلاق), শরম (شرم), আসমান (آسمان), দোস্ত (دوست), আওয়াজ (آواز), নম্বর (نمبر), খুব (خوب),

শুরু (شروع), খামুশ (خاموش), খোরাক (خوراک), খোর পোশ (خور و پوش), খুন (خون), খোশ (خوش), খারাপ (خراب), খবর (خبر), কাগজ (کاغذ), কলম (قلم) ইত্যাদি।

এমনি বহু শব্দ রয়েছে যা আমাদের বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে বাংলা ভাষাকে গতিময়, সুন্দর, ও শ্রুতি মধুর করে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত: বাংলা সাহিত্যে ফারসি কবি সাহিত্যিকদের কাব্য প্রভাব:
ফারসি পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রচীন ও সমৃদ্ধশালী ভাষা। এ ভাষার কেন্দ্রবিন্দু যদিও পারস্য কিন্তু এর পরিধি সুদুর প্রসারী। ইরান ছাড়াও তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইরাক ও পাকিস্তানে এক সময় ফারসি ভাষা বহুল প্রচলিত ছিল। যুগে যুগে ফারসি সাহিত্য জগতে বহু কবি সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আর্বিভাব ঘটেছে। তাঁদের রচিত কাব্যসাহিত্য ও তাঁদের জীবন দর্শন, নৈতিকতা, কাব্যশৈলী, কাব্যদর্শন, প্রভৃতি বিষয় বাংলা সাহিত্যে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের বিশেষ করে বাংলার মানুষের মধ্যে এর প্রভাব ব্যাপকভাবে বিরাজমান।

প্রথমেই ইরানের কবি শেখ সা'দীর- (১১৮৪-১২৯২ খ্রি:) প্রভাবের কথাই বলিনা কেন। শেখ সা'দীর গুলিস্তান ও বোস্তান কাব্যের প্রভাব খুবই বেশি। বাংলা ভাষা ভাষী কবি সাহিত্যিকগণসহ বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ সা'দীর নৈতিক গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। আবার অনেক কবি সাহিত্যিক তাঁর গ্রন্থাবলীকে পদ্যরীতিতে আবার অনেক গদ্যরীতিতে অনুবাদ করেছেন। অনেক কবি সাহিত্যিক সা'দীর গ্রন্থাবলীকে গদ্যরীতিতে আবার অনেকে পদ্য রীতিতে অনুবাদ করেছেন। যা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি দান করেছে। এছাড়া এদেশের আলেম সমাজ ওয়াজ ও মিলাদ মাহাফিলসমূহে শেখ সা'দীর নৈতিক গ্রন্থ গুলিস্তান ও বুস্তান হতে উদ্ধৃতি এবং কোন বয়েত (পংক্তি) অকপটে চারণ করে থাকেন। বিশেষ করে গুলিস্তান গ্রন্থের নিম্নোক্ত অমর পংক্তি দু'টি ছাড়া আজও যেন আমাদের ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল সম্পন্ন হয় না।[৩]

শেখ সাদীর গুলিস্তান গ্রন্থে ফারসির পাশাপাশি আরবি কবিতাও রয়েছে। এটি মূলত রাসুলের (স:) শানে রচিত আরবি ভাষায় রচিত কবিতা বাংলাদেশের মানুষ ওয়াজ নছিহত ও মিলাদ মাহফিলের সময় ব্যবহার করে থাকেন। কবিতাটি হলো-

بلغ العلى بكماله   كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله   صلوا عليه واله .[৪]

(তিনি (মহানবী স.) চারিত্রিক পরিপূর্ণতায় সম্মানের উচ্চাসনে পৌঁছেছেন
স্বভাব ও সৌন্দর্যের আলোক ছটায় অন্ধকার দূরিভুত করেছেন
তাঁর (মহানবীর স.) সকল অভ্যাস প্রশংসনীয় হয়েছে
সকলে তাঁর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি রহমত কামনা কর।)

বাংলা কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যে যিনি শেখ সা'দীর কাব্যের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪- ১৯০৭ খ্রি.)। তিনি বাংলাসাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি যিনি ফারসি ভাষার কবি হাফিজ শিরাযী ও কবি শেখ সা'দীর কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সা'দীকে গীতি কবিতার অনুসরণীয় ব্যক্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন।

যেমনটি শেখ সা'দী অপব্যয়ের কুফল সম্পর্কে বলেছেন-

ابلهی کاو روز روشن شمع کا فوری نهاد   زود بینی کسی بشب روغن نماند در چراغ.[৫]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তাঁর "অপব্যয়ের ফল' কবিতায় সা'দীর শে'রটির কাব্যানুবাদ করেছেন এভাবে-

যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি।
আশুগৃহে তার দেখিবেনা আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।[৬]

অনুরূপভাবে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সা'দীর নিন্দুক, নামক কবিতারও অনুবাদ করেছেন। যাহা বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ বাক্য হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। শেখ সা'দীর ভাষায়–

هرکه عیب دیگران را پیش تو آورد و شمارد   بگشا عیب تو پیش دیگران خواهد برد .[৭]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এ কবিতার অনুকরণে লিখেছেন

পরদোষ তোমার নিকট যে কয়,
বলে সে তোমার দোষ অপরে নিশ্চয়।[৮]

এটি থেকে বুঝা যায় শেখ সা'দীর উপরোক্ত কবিতার হুবহু বঙ্গানুবাদ। এছাড়াও নৈতিক কবি শেখ সা'দী গরীব ও দুঃখীর দুখে সমব্যথী হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে রচনা করেছিলেন-

تندر ستان را نباشد درد ریش   جز بهمدردی نگویم درد خویش

....

سوز من با دیگری نسبت مکن   نمک بر دست و من بر عضو ریش.[৯]

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও শেখ সা'দীর উপরোক্ত কবিতার অনুকরণে 'সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না' শীর্ষক কবিতা রচনা করেছেন। যা মূলত সা'দীর কবিতার ভাবানুবাদ মাত্র। কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদারের ভাষায় -

চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে,
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশী বিষে দংশেনি যারে?
যতদিন ভবে না হবে না হবে
তোমার অবস্থা আমার সম;
ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।[১০]

ফারসি ভাষার বিখ্যাত কবি শেখ সা'দী ছিলেন একজন নৈতিক কবি। যিনি পরের দু:খ কষ্ট দেখে নিজের দু:খ কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি গুলিস্তান গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। শেখ সা'দীর ভাষায়-

حکایت : هرگز از دور زمان نناليده ام و روى از گردش آسمان در هم نگشيده ام   .... حق به جاى آوردم و بر بى كفشى صبر كردم.[১১]

বাংলা সাহিত্যের কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার সা'দীর এই হেকায়াত বা বাহিনীকে বাংলা ভাষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন, এভাবে-

একদা ছিলনা জুতো চরণ যুগলে
দহিল হৃদয়বন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপিচুপি দু:খাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি তথা একজন পদ নাহি তার,
অমনি জুতোর খেদ ঘুচিল আমার।
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ?[১২]

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খ্রি:)। তিনিও শেখ সা'দীর কাব্যে প্রভাবিত হয়ে বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। শেখ সা'দী ভদ্রলোকের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে তাঁর বুস্তান গ্রন্থে হেকায়াত (গল্প) বর্ণনা করে রচনা রেছেন-

سگى پاى صحرا نشينى گزيد   به خشمى كه زهرش ز دندان چكيد

....

توان كرد با ناكسان بدرگى   وليكن نيايد ز مردم سگى.[১৩]

কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত শেখ সা'দীর গল্পটিকে 'উত্তম ও অধম' নামকরণ করে বাংলা ভাষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন। এ কবিতাটি আমাদের সকলেরই জানা। তবুও সতেন্দ্রনাথের ভাষায় তুলে ধরা হলো–

কুকুর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায়,
কামরের চোটে বিষদাঁত ফুটে
বিশ লেগে গেল তায়
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা
বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে হায়
জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে সে বলে ভর্ৎসনা ছলে
কপালে রাখিয়া হাত,

তুমি কেন বাবা ছেড়ে দিলে তারে?
তোমার কি নাই দাঁত?
কষ্টে হাসিয়া আর্তকহিল
‘তুইরে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায়
দংশি কেমন করে?
কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা’ বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়।[১৪]
(মনি-মঞ্জুষা)

বাংলা ভাষার কবি সাহিত্যিকগণ শেখ সা’দীর কাব্যের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছেন যে, বাংলা ভাষায় শেখ সা’দীর বহু জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। সা’দীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ গুলিস্তান ও বুস্তান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর নৈতিক হেকায়াত বা গল্পসমূহ হতে নির্বাচিত গল্প সংকলন গ্রন্থকারে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। যা বাংলা ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করেছে।

শেখ সা’দীর গুলিস্তান গ্রন্থের সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেন মোহাম্মদ মোবারক আলী। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের নাম *শায়খ সা’দী (রহ.) এর গুলিস্তাঁ।* যা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। শেখ সা’দীর অসৎসঙ্গ অবলম্বনের কুফল সম্পর্কে রচিত কবিতাটির বঙ্গানুবাদ দেখলেই মোবারক আলীর দক্ষতা ও সা’দীর প্রভাব অনুমেয় করা সম্ভব। শেখ সা’দীর কবিতাটি হলো-

ابر اگر آب زندگی بارد　　　　هرگز از شاخ بید بر نخوری
با فرو مایه روزگار مبر　　　　کزنی بوریا شکر نخوری. [১৫]

মোবারক আলী সা’দীর উপোরক্ত কবিতাটির কাব্যানুবাদ করছেন এভাবে-

মেঘ যদি অমৃত বারি করে বরিষণ।
ঝাউগাছে ফুল নাহি ধরিবে কখন।।
ইতর সংসর্গ সাদা করহ বর্জন।
নল খাগড়া হতে চিনি পাবে না কখন।।[১৬]

অনুরূপভাবে সা’দীর গুলিস্থান ও বুস্তান গ্রন্থের বিভিন্নজন অনুবাদ করেছেন এবং সা’দীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কবিতা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা বাংলা সাহিত্যের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের কাব্যিক ছন্দও ফারসি ভাষার কবিদের কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাঙ্গালী কবিগণ শেখ সা’দীকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারই শুধু শেখ সা’দীর ফারসি কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেছেন বা অনুবাদ করেছেন তা নয়; বরং আমরা যদি বাংলা সহিত্যের মধ্যযুগের কথা বলি তাহলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এ

শ্রেণীর কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। ফারসি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলিতে মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। রোমান্টিক কথা ও কাহিনীর অসাধারণ ভাণ্ডার আরবি- ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে এই ধারার সৃষ্টি।[১৭]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে পুথি ও প্রণয়োপাখ্যান মূলত ফারসি সাহিত্যের প্রভাব প্রসূত। সা'দী, হাফিজ, খৈয়াম, জামি, আত্তার এবং শাহনামার রচয়িতা ফেরদৌসীর সম্পর্কে জানা নেই এমন বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্য প্রেমীর সংখ্যা খুঁজে পাওয়া ভার। আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ফারসি কবি সাহিত্যিকদের অবদান অপরিসীম। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক কাব্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলো ফারসি কাব্যের প্রভাবেই রচিত হয়েছে। এ কথা সত্য যে বহু বাঙ্গালী লেখক ফারসি সাহিত্যের সেবক ছিলেন এবং ফারসি কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের পাশাপাশি হিন্দু বাংলা ভাষী কবিদের রচনায়ও ফারসি কাব্যের প্রভাব সামান্য বলে মনে হয়। বড়ু চন্ডি দাস (১৫ শতক), বিদ্যাপতি (১৫ শতক) এবং জয়ানন্দ (১৬ শতক) এর কাব্য রচনা নিয়ে বাংলা সমালোকদের মাঝে ফারসি কাব্যের প্রভাবের বিষয় কোন মন্তব্য পাওয়া যায় না। আবার বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাশ, যশোরাজ খান এবং ভারতচন্দ্র সম্পর্কে ও আমরা যথেষ্ট তথ্য পাই না। তবে তাদের কবিতায় ফারসি কবিতার প্রভাব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। বিশেষত হিন্দু কবি বড়ু চন্ডি দাশ সম্পর্কে একই মন্তব্য করা যেতে পারে। তিনি একজন সাধক কবি ছিলেন। তার রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের বড় নিদর্শন। তাঁর এ কাব্যে ফারসি শব্দের বহু ব্যবহার পাওয়া যায়। এ রচনায় রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রে মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) মাসনাবীর প্রভাব থাকা অমূলক নয়। এ সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য সমলোচকদরে একটি মন্তব্য হলো- "ইরানী সূফীতত্ত্বের প্রভাবেই ভারতে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ প্রসার লাভ করে।"[১৮]

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ তার চৈতন্য দেবের (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রিঃ) মাহত্ম্য প্রচার প্রসঙ্গে "জগাই মাধাই"[১৯] উদ্ধার সংবাদে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে,-

মাসনবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দু'জনে।[২০]

রূমীর মাসনবী সতত আবৃত্তি করতেন বলে জগাই-মাধাই বৈষ্ণব ইতিহাসে মহাপাপী বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। এছাড়াও বড়ু চণ্ডি দাশের রচিত পদাবলীতে মাসনবীর ছাপ বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বড়ু চণ্ডি দাশের পদাবলী উপস্থাপন করা হলো-

" কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে
কেনা বাঁশী বা এ বড়ায়ি গোঠ গোকুলে"
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শব্দে মোর আউলাইলো রান্ধন।।[২১]

মাওলানা রূমীর বাঁশীর সাথে আত্মার সম্পর্ক করে যে ভাবে মাসনাবী কাব্য রচনা করেছেন। মাসনাবীর প্রথম কয়টি শ্লোকের সাথে উল্লিখিত পদাবলীর হুবহু মিল থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে যে, সুফি কবিদের প্রভাব পরেছে এসব তথ্য বড় প্রমাণ বলে আমাদের বিশ্বাস।

মধ্যযুগে কয়েকজন বাঙ্গালী কবি ফারসি কাব্য ও কবিতায় প্রভাবিত হয়ে কয়েকটি রোমান্স ও ধর্ম বিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে এ কাব্যগুলো ফারসি কাব্যের সরাসরি অনুবাদ, না ভাবানুবাদ নাকি ফারসি

কাব্যানুকরণে রচিত এ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এ কাব্যগুলো ফারসি কাব্য প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালী কবিগণ রচনা করেছিলেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মধ্যযুগে রচিত এরূপ কয়েকটি কাব্যের আলোচনায় ফারসি কাব্য প্রভাবের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইউসুফ জোলেখা:

শাহ মুহাম্মদ সগীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্বেকালে (১৩৯৩-১৪০৯খ্রি:) ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনা করেন। শাহ মুহাম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা কাব্যে সুপ্রাচীন প্রণয়কাহিনী উপজীব্য করা হয়েছে। বাইবেল ও পবিত্র কোরআন শরীফে নৈতিক উপাখ্যান হিসেবে সংক্ষেপে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী (৯৩৫/৯৪১-১০২০/১০২৫ খ্রি:) এবং সূফী কবি জামী (১৪১৪-১৪৯২খ্রি:) মূল কাহিনী পল্লবিত করে ইউসুফ জোলেখা নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। ফেরদৌসীর কাব্যের রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শাহ মুহাম্মদ সগীরের কাব্যের সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

শাহ মুহাম্মদ সগীরের এ রচনাটি সম্পর্কে একাধিক উক্তি পাওয়া যায় যে, তিনি ফারসি *ইউসুফ ওয়া জুলইখা* কাব্যকে ভিত্তি করে এ কাব্যটি রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে বাংলা সাহিত্য সমালোচক মনসুর উদ্দীন বলেছেন-

“ইউসুফ জলিখার কহিনী কোরান শরীফে পাওয়া যায়। আবুল কাশেম ফেরদৌসী এবং মোল্লা নূরুদ্দীন জামী ফারসি ভাষায় ইউসুফ জলিখা গ্রন্থ রচনা করেন। ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনেই সগীবের গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।”[২২]

সতের শতকের শেষ এবং আঠার শতকের শুরুর দিকের অন্যতম বাঙ্গালী কবি আব্দুল হাকিম। তিনি ফারসি সাহিত্যের সর্বশেষ ক্লাসিক কবি আব্দুর রহমান জামীর *ইউসুফ ওয়া জুলাইখা* নামক কাব্যের অনুসরণে আনুমানিক ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইউসুফ জলিখা কাব্য বাংলা ভাষায় রচনা করেন।[২৩] ইউসুফ জলিখা কাব্য সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন-

‘মোল্লা জামীর কাব্য শিরেতে ধরিয়া,
আব্দুল হাকিমে কহে বাঙ্গালা রচিয়া।।
ইসুপ জলিখার কিস্‌সা হইল সমাপ্ত।
ফারসী কিতাব বাঙ্গালা পদন্ত।।’[২৪]

এ কাব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জামীর ফারসি কাব্য প্রভাবেই আব্দুল হাকীম বাংলা কাব্য ইউসুফ জলিখা রচনা করেছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই।

লায়লী মজনু :

কবি দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত *লায়লী মজনু* কাব্যটি ফারসি কবি জামীর (১৪১৪-১৪৯২খ্রি:) লায়লী ও মজনুন নামক কাব্যের ভাবানুবাদ। লায়লী ও মজনুর প্রেম কাহিনী সারা বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবী লোক গাঁথা। কাহিনীটি ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য বিবেচনা করা হয়।[২৫] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, আব্দুর রহমান জামীর পূর্বেও কবি নিযামী গানজুবী (১১৪০-১২০২ খ্রি:) প্রথম ফারসি ভাষায় লাইলী ওয়া মজনুন নামে এবং পরবর্তীতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত কবি আমির খসরু ১২৫৩-১৩২৪ খ্রি:) নিযামীর অনুকরণে *মজনুন ওয়া লাইলী* নামে একটি ফারসি কাব্য ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন।

সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল: বাংলা রেমান্টিক ভাব ধারার সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। দোনাগাজী চৌধুরী ও আলাওল, ইব্রাহীম ও মালে মুহম্মদ এই কাব্যের প্রেম কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কবি আলাওলের কাব্যই সমধিক পরিচিত।[২৫] একাব্যের কাহিনীর উৎস আলেফ লায়লা বা আরব্য উপন্যাস। কবি আলাওল ও দোনাগাজী আলেফ লায়লার ফারসি অনুবাদ অবলম্বন করেই এ কাব্য রচনা করেছিলেন।

সপ্তপয়কর: সপ্তপয়কর কাব্যটি পারস্য কবি নিযামী গানজুবীর (১১৪০-১২০২খ্রি:) হাফত পেইকার কাব্যের অনুবাদ। তবে আলাওলের অন্যান্য কাব্যের মতোই ভাবানুবাদ। আরাকান রাজ্যের সমর মন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে কবি নিযামী এ কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থোৎপত্তি সম্পর্কে কবি আলাওল লিখেছেন-

আরবী ফারসি ভাষা বয়েতের ছন্দ
বিশেষ নিজামী বাক্য সরল প্রবন্ধ।
এ গ্রন্থ মাঝে যত আছে ইতিহাস,
পয়ার প্রবন্ধে তার করহ প্রকাশ।[২৬]

এই উক্তি থেকে দেখা যায় কবি ফারসি ভাষার প্রভাবে এ কাব্যের ভাবানুবাদ করেছেন। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন- আলাওলের পদ্মাবতী ব্যতীত সকল গ্রন্থই ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ।[২৭] এতে প্রমাণিত হয় যে, আলাওল মধ্যযুগের ব্যতীক্রম ধর্মী ফারসি জানা কবি এবং ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই কাব্যগুলো অনুবাদ করেছিলেন বা অনুকরণে বাংলা কাব্য লিখে ছিলেন।

সেকান্দার নামা: মধ্যযুগীয় বাঙ্গালী কবি আলাওলের সেকান্দার নামা কাব্যটি পারস্য কবি নিযামী গানজুবীর (মৃ.১২০২ খ্রি:) ফারসি কাব্য এসকেন্দার নামা (اسکندر نامه) কাব্যের অনুবাদ। একাব্যের মূল বিষয় সেকান্দার বা আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয় কাহিনী।

তোহফা: এটিও আলাওল রচনা করেন। সূফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলাভীর *তোহফাতুন নেসায়েহ* নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ। আলাওল ফারসি মূল কাব্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে বলেছেন-

আরবী কিতাব হন্তে ফারসি ভাষাএ।
রচিলা বয়েত ছন্দে ইউসুফ গদাএ।।
ভক্তি ভাবে এক চিত্তে যে জনে পড়এ।
জ্ঞান বৃদ্ধি অতি হএ পাতক নাশএ।।[২৮]

কবি আলাওল একজন অনুবাদকই নন; ভাষাবিদও ছিলেন। তিনি মূল কাহিনী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যতটা স্বাধীন ছিলেন তার চেয়ে বেশি সংযত ছিলেন অনুবাদে। তাঁর অনুবাদ সম্পর্কে ড. এনামুল হক বলেছেন-

আলাওল যাহা করিলেন, তাহা ফারসির সুকুমার সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বিষয়, সুতরাং ইহা জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সকলের নিকট যে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার হপ্ত পয়কর, সেকান্দার নামা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, তোহফা প্রভৃতি কাব্য ফারসি সাহিত্যের সর্বজন প্রশংসিত উচ্চদরের সাহিত্য। এই কাব্যগুলি অনুবাদে বাংলা ভাষা সাত্যিই সম্পদশালিনী হইয়া উঠে।[২৯]

গুলেবকাওলী: বাংলা রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের ধারায় গুলে বকাওলী কাব্যটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলা গুলে বকাওলী কাব্যের রচয়িতা হিসেবে নওয়াজিস খান খ্যাতিমান। শেখ ইজ্জতুল্লাহ নামক

জনৈক বাঙ্গালী লেখক ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষায় গুলে বকাওলী গ্রন্থটি রচনা করেন।[৩০] মনে করা হয় এ কাব্যটিও ইজ্জতুল্লাহর ফারসি কাব্যের অনুকরনে বাংলা ভাষায় নওয়াজিস খান রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন।

মধ্যযুগে এমনি বহু কাব্য ও গ্রন্থ ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ, ভাবানুবাদ বা অনুকরণে লেখা হয়েছে। যাহা ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রচিত হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলার মরমী কবি ও সাধক লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯১খ্রিঃ) ও বিশ্ব কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) রচিত আধ্যাতিক কবিতাগুলোতে জালাল উদ্দিন রুমীর মাসনাবীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কবি গুরু **তার** পারস্যের যাত্রী গ্রন্থে ইরানীদের বিষয়ে উল্লেখ করেন-'এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তারপরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেছে যে, পারসিক মরমী কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য।'[৩১]

পরবর্তী সময়ে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পারস্য কবি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত ও হাফিজের দিওয়ান কাব্যের গযল কবিতারও অনুবাদ করেছেন। কবি নজরুল ও ফররুখ আহমদের কবিতায় অসংখ্য ফারসি সব্দের ব্যবহার রয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রায় সকল কবির কবিতায় ও লেখকদের লেখনিতে ফারসি শব্দের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। মোট কথা আমাদের বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার প্রভাব বিদ্যমান একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

উপসংহারঃ বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। উপরোক্ত আলোচনাই এর জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয়। তার পরেও যদি বলি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরাসরি ফারসি চর্চা করেননি, তবুও তাঁর রচনায় ফারসি শব্দ ও পরিভাষার অনুপম ব্যবহার প্রত্যক্ষ করি। আমরা তাঁর রচনায় পরওয়ানা, গুল, বুলবুল, শরার, সাকি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে আধ্যাত্মিক ভাব, আত্মদর্শন এবং মুসলিম সংস্কৃতি ঘিরে সাহিত্য চর্চা ফারসি সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আর এ প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন যুগের বাঙ্গালী কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁদের সাহিত্য সাধনাই বাংলা সাহিত্যকে করেছে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্য (উনবিংশ শতাব্দী)*, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩), পৃ. ১৭।

২. তদেব-পৃষ্ঠা. ১৭।

৩. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, *বরকতুল্লাহ রচনা বলী*, ১ম খন্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১ম প্রকাশ ১৯৯৮), পৃ. ১৫০।

৪. মোহাম্মদ আলী ফরুগী (সম্পাদিত), *কুল্লিয়াতে সা'দী* (তেহরানঃ এন্তেশারাতে রামীন, ১৩৬৭ হি.শা.), পৃ. ২৯।

৫. তদেব পৃ. ৪৯।

৬. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭) জীবনীগ্রন্থমালা*, ২১শ খন্ড (ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৮৯), পৃ. ৫৩।

৭. মোহাম্মদ আলী ফরগী, *কুলিয়াতে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।

৮. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭)*, *জীবনী গ্রন্থমালা*, ২১শ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

৯. মোহাম্মদ আলী ফরগী, *কুলিয়াতে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।

[১০]. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার, জীবনী গ্রন্থমালা*, ২১শ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৭৩।

[১১]. মির্যা আব্দুল আবীস খান গারীর গুরগানী (সম্মা.), *গুলিস্তানে সা'দী* (তেহরানঃ এন্তেশারাতে ইরান, মেহের ১৩৮০হি.শা.), পৃ. ১৭৭।

[১২]. সুশান্ত সরকার, *কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার, জীবনী গ্রন্থমালা*, ২১শ খন্ড পূর্বোক্ত, পৃ.৭৩।

[১৩]. গোলাম হোসেন ইউসুফী (সম্পাদিত), *বুস্তানে সা'দী* (তেহরানঃ এন্তেশারাতে খাওয়ারেজমী, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৯ হি.শা.), পৃ. ১২৩-১২৪।

[১৪]. ড. আলোক রায় (সম্পা), *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ* (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪), পৃ. ৫৪৭।

[১৫]. মোহাম্মদ আলী ফরূগী, *কুল্লিয়াতে সা'দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

[১৬]. মোহাম্মদ মোবারক আলী, *শায়খ সা'দী (রহঃ) এর গুলিস্তাঁ* (ঢাকাঃ ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ০৮।

[১৭]. মাহাবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকাঃ খান ব্রদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, প্যারিদাস রোড, ঢাকা দশম প্রকাশ ২০০০), পৃ. ২২১।

[১৮]. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙ্গালী গীতি-কবিতা* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮ খ্রিঃ), পৃ. ক।

[১৯]. জগাই-মাধাই" চৈতন্যদেব সমকালীন (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রিঃ) নবদ্বীপের কুখ্যাত অধর্মাচারী দুই ব্রাক্ষণ সতন্তান, পরে চৈতন্য প্রভাবে পরম বৈষ্ণব হন। এই তথাকথিত মহা পাপী নামক দস্যু ভ্রাদ্বিয়কে চৈতন্যদেব হরিনাম দিয়ে যে, উদ্ধার করেন তা বৈষ্ণব ইতিহাসে একটি সুবিক্ষাত ঘটনা ও সর্বজন স্বীকৃত। মনে হয়, রূমীর মাসনবী সত্ত আবৃত্তি করতেন বলে জগাই-মাধাই বৈষ্ণব ইতিহাসে মহাপাপী বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্যঃ মনির উদ্দন ইউসুফ (আনুদিতঃ), *রূমীর মসনবী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৩।)

[২০]. মনির উদ্দন ইউসুফ (অনুদিত), *রূমীর মসনবী* (ঢাকাঃ ওসমানিয়া বুক ডিপু, বাবু বাজার, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৩ বাংলা), পৃ. ০৩।

[২১]. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, ড. আহম্মদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্য যুগের বাঙ্গালী গীতিকবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

[২২]. মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত, *মুহাম্মদ মামুন উদ্দীন রচনাবলী*, ১ম খন্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪), পৃ. ৯৫।

[২৩]. রাজিয়া সুলতানা, *আব্দুল হাকিম কবি ও কাব্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী), ১৯৮৭খ্রিঃ) পৃ. ৪৮।

[২৪]. ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতি* (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ১৯।

[২৫]. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত পৃ. ২২৭।

[২৬]. *তদেব*-পৃ. ২৩১।

[২৭]. *তদেব*-পৃ. ২১৪।

[২৮]. *তদেব*-পৃ. ২১৫।

[২৯]. মনসুর মুসা সম্পাদিত, *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৯৪।

[৩০]. মাহাবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

[৩১]. মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন, *বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্য ও রূমী চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক* (ঢাকাঃ ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯), পৃ. ৮৬।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

কালিদাসের পার্বতী

মোছা: এলিনা আখতার পলি*

Abstract : *Kumarasambhavam* is an epic by Kalidasa. Itis widely regarded as one of the Kalidasa's finest works. It is a paradigmatic example of epic. The slyle of description of spring sets the standard for nature metaphors pervading many centuries of Indian literary tradition. *Kumarasambhavam* basically talks about the birth of Kumara (Kartikeya), the son of Shiva and Parvati. *Kumarasambhavam* literally means "Birth of Kumara". The epic of seventeen cantos contains sringara rasa (the sentiment of love), romance and eroticism songs, more than vira rasa (the rasa of heroism). Tarakasura a Rakshasa (demon) was blessed that he could be killed by none other than the son of Shiva. However Shiva had won over Kama the god of love, Parvati performed great tapas (or spiritual penance) to win the love of Shiva. Parvati is the heroine of *Kumarasambhavam*. She is the daughter of Himalaya. Her another name is Uma. In this epic Kalidasa has projected Uma as the heroine and she has been depicted in detail.

মহাকবি কালিদাস প্রণীত দুটি মহাকাব্যের একটি *কুমারসম্ভব*। কুমার কার্তিকেয়র জন্ম এই মহাকাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়, তাই এর নাম *কুমারসম্ভব*।[১] গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা অপরূপা পার্বতী। তারকাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবগণ ব্রহ্মার কাছে তাঁদের প্রতিকার প্রত্যাশা করলে ব্রহ্মা জানালেন পার্বতী এবং মহাদেবের পুত্রই তাঁদের এ থেকে পরিত্রাণ করতে পারবেন। কিন্তু বিবাহবিমুখ তপস্বীর মনবিবাহের অনুকুল করতে হবে। সেক্ষেত্রে অপরূপা পার্বতীর রূপ ছিল দেবগণের প্রধান উপকরণ। মহাদেবকে সে রূপে আকৃষ্ট করতে আয়োজনের ত্রুটি থাকলনা। কিন্তু পার্বতী ব্যর্থ হলেন। কারণ মহাদেব কোনো রূপের মোহে আকৃষ্ট হবেন তা কবি চাননি। তাই মহাকবি পার্বতীকে দিয়ে কঠোর তপস্যা করালেন। পার্বতী তপস্যার মাধ্যমে মহাদেবের হৃদয় জয় করলেন। অবশেষে মহাদেব পার্বতীকে বিবাহে সম্মত হলেন। এখানে সপ্তম সর্গের সমাপ্তি, পরবর্তী সর্গসমূহে সম্ভোগ এবং পুত্র কার্তিকেয়র জন্ম বর্ণিত হয়েছে।[২]

মহাকবি কালিদাসের সবকটি কাব্যেই প্রেমকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। তিনি সকল কাব্যেই কাম ও প্রেমের বিভেদ রেখার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। এ থেকে তিনি যে প্রেমের দর্শন গড়ে তুলেছেন তা ধর্ম ও সাধনার সাথে একসূত্রে গাঁথা। অনেক সমালোচক কালিদাসকে ভোগ-সম্ভোগের কবি বলে মনে করেন। কিন্তু তা ঠিক নয় কারণ, ভোগসর্বস্বতা তাঁর কব্যসমূহের বিষয়বস্তু নয়। তাঁর কাব্যে পার্বতী-মহেশ্বরের মিলন পরিলুপ্ত ধৈর্যের মধ্যে ঘটেনি।

এ কাব্যে কালিদাস যে বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হল, অন্ধ, অসংযত, বন্ধনহীন প্রেম জয়ী হতে পারে না; যে প্রেমের সাথে কল্যাণের কোন যোগসূত্র নেই তা নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রেমের এক নতুন দর্শন পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

মহাকবি কালিদাসের কাব্যে নিসর্গপ্রকৃতি শান্তরস আশ্রিত। প্রকৃতির কঠোর রূপ তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। *কুমারসম্ভবের* প্রথম সর্গে হিমালয়ের বর্ণনা, তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের বর্ণনা, ষষ্ঠ সর্গে ওষধিপ্রস্থের বর্ণনা এবং অষ্টম সর্গে গন্ধমাদন পর্বতের বর্ণনা করা হয়েছে। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে কবি ঐশ্বর্য ও মহত্তের প্রতীকস্বরূপ পৃথিবীর ভারসাম্যরক্ষাকারী গিরিরাজ হিমালয় পর্বতের তেজস্বী বর্ণনা দিয়ে কাব্যটি শুরু করেছেন-

---

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥[৩]

(উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতের স্থিতি; এই হিমালয় দেবতার প্রকৃতিসম্পন্ন। হিমালয় পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছে– যেন পৃথিবীর বিস্তার নির্ণয়ের একটি মানদণ্ড!)

হিমালয়[৪] মেরু পর্বতের সখা। মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি পিতৃগণের মানসীকন্যা মেনকাকে বিয়ে করলেন। মেনকা ছিলেন মুনিগণেরও সম্মানের পাত্রী এবং সর্বাংশে হিমালয়ের যোগ্য সহধর্মিণী।

অন্যদিকে প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, মহাদেবের পূর্বপত্নী সতী পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে অপমানে যোগানলে দেহত্যাগ করেছিলেন। সেই সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করার জন্য হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভস্থ হলেন।

যে শুভক্ষণে পার্বতীর জন্ম হলো সেদিন সকলের পক্ষে সুখকর হয়ে উঠল। দশদিক আনন্দে প্রসন্নতা লাভ করল, অবিরাম পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। নবমেঘের মন্দ্রধ্বনিতে পর্বতের প্রান্ত হতে উত্থিত রত্নশলাকার দীপ্তিতে যেমন সে স্থান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেরূপ জ্যোতির্ময়ী নবকুমারীর দেহলাবণ্যেও প্রসূতি মেনকাদেবী অতুল দীপ্তিতে শোভিত হলেন। চন্দ্র যেমন দিন দিন নব নব কলার সংযোগে অধিক সুন্দর দেখায়, তেমনি নবকুমারীর দেহও অধিকতর লাবণ্য বিকশিত করে বাড়তে লাগল।

পিতৃকুলের সেই প্রিয় কুমারীকে সকলে পার্বতী (পর্বতকন্যা) নামে ডাকতেন, তাঁর অন্য নাম উমা। পুত্র থাকার পরেও হিমালয় পার্বতীকেই অধিক স্নেহ করতেন।

বাল্যে কখনো মন্দাকিনীর তীরে বালুকায় বেদী নির্মাণ করে আবার কখনো পুতুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে খেলা করতেন। এভাবে ধীরে ধীরে তাঁর যৌবন দেখা দিল। নব যৌবনের আবির্ভাবে তাঁর দেহ নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত চিত্রের ন্যায়, সূর্যের কিরণে বিকশিত পদ্মের ন্যায় সৌন্দর্য সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠল।[৫] সৃষ্টিকর্তা জগতের যেখানে যেখানে যা কিছু সুন্দর বস্তু রয়েছে তাদের সব একটি স্থানে সঞ্চিত করে দেখার ইচ্ছা করলেন। যেসব শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে উপমা দেয়া যায়, তার সব উপকরণ একত্র সংগ্রহ করে তাদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে তিনি যে নারী সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই গিরিরাজ হিমালয় কন্যা পার্বতী বা উমা; যিনি অলৌকিক সৌন্দর্যের অধিকারী। মহাকবি যদি শুধু 'আর্ট ফর আর্টস সেক' মতবাদের পক্ষপাতী হতেন, তাহলে তিনি শুধু নায়িকার রূপরাশির বর্ণনা করেই তাঁর সৃজনশীলতার ভাণ্ডার শেষ করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, আর একটু অগ্রসর হয়ে কবি এই অপরূপা পার্বতীকে দিয়ে কঠোর তপশ্চর্যা করিয়েছেন।

হিমালয়ের শান্ত পরিবেশের মধ্যে শঙ্কর ধ্যানমগ্ন। প্রকৃতিও নিষ্পন্দ হয়ে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত। মদন সমভিব্যাহারে আকস্মিক অকাল বসন্তের আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে শাখা হতে শুরু করে পল্লবসমূহে কুসুম প্রস্ফুটিত হলো। আম্রতরুতে নবপল্লবের সাথে সাথে মুকুলের সমারোহ, স্বর্ণালি বর্ণের কর্ণিকার কুসুম তার অপরূপ শোভা প্রদর্শন করতে থাকল-

বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥[৬]

(বর্ণের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল কর্ণিকার[৭] কুসুম গন্ধহীন বলে মনকে পীড়িত করতে লাগল। গুণরাজির পূর্ণতা বিধানে বিশ্বস্রষ্টার প্রকৃতি প্রায়ই উদাসীন।)

মহাকবির দৃষ্টিতে বসন্ত ঋতু যেন এক সুন্দরী রমণী। তাই কবি বসন্তকে দেখলেন ভ্রমররূপ কাজল পরেছিল চোখে, পুষ্পিত তিলকফুল মুখে নতুন শোভা ছড়াল, নবোদিত সূর্যের বর্ণবিশিষ্ট পদ্মরাগের দ্বারা ওষ্ঠকে অলংকৃত করল-

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রং মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণকোমলেন চুতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার ॥[৮]

(বসন্তের সৌন্দর্য লক্ষ্মী ভ্রমররূপ কাজল পরেছিল তার চোখে, পুষ্পিত তিলক ফুল মুখে পত্রলেখা রচনা করেছে, নবোদিত সূর্যের বর্ণবিশিষ্ট পদ্মরাগের দ্বারা ওষ্ঠকে অলঙ্কৃত করেছেন- সেই ওষ্ঠ আবার চূতমুকুলের মতো।)

পিয়ালমঞ্জরীর পরাগের ছটা এসে পড়ায় হরিণগুলোর দৃষ্টি বিঘ্নিত হলো। নিজ প্রিয়াকে অনুসরণ করে ভ্রমর একই পুষ্পে মধুপান করতে লাগল। শুকনো পাতায় মর্মর শব্দতুলে তারা বাতাসের প্রতিকূলে ছুটাছুটি করতে লাগল। আম্রমুকুলের আস্বাদনে মধুর কণ্ঠে কোকিল কুজন করে মানিনী রমণীদের মান ভঙ্গে সক্ষম হলো। শীতের অবসানে কিন্নর কামিনীদের সজ্জাযুক্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

কৃষ্ণসার মৃগও শৃঙ্গের দ্বারা মৃগীকে কণ্ডূয়ন করতে লাগল। হস্তিনী প্রেমবশে পদ্মরাগে সুবাসিত জল গণ্ডুষ পরিমাণে হস্তীকে দিল। চক্রবাক অর্ধভুক্ত পদ্মের মৃণাল চক্রবাকীকে দিয়ে আদর করল।

লতাগুলি পুষ্পের ভারে আনত লতারূপিণী প্রিয়ার আরক্ত কম্পিত অধর সে তার প্রিয়জন তরুকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করল।[৯] দক্ষিণা সমীরণ প্রবাহিত হলো। অশোকতরু স্কন্ধ থেকে শুরু করে পল্লবসহ কুসুম প্রস্ফুটিত করল। আম্রতরুতে নতুন উদ্গত পল্লব আর কচি আম্রমুকুলে ভ্রমর পঙ্‌ক্তি নিবেশিত করল। পলাশফুল পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়নি বলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির ন্যায় কোরকগুলো দেখে মনে হয় নায়করূপী বসন্ত যেন তার প্রিয়া বনস্থলীর অঙ্গে সে সদ্য নখক্ষত চিহ্ন এঁকে দিয়েছে-

বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্ ॥[১০]

(পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়নি বলে অপরিণত চাঁদের মতো রক্তবর্ণ পলাশের কোরকগুলো দেখে মনে হলো যেন বসন্তের সঙ্গে সমাগতা বনস্থলীর অঙ্গে সদ্যঃকৃত নখক্ষত!)

দক্ষিণদিক হতে সদ্যপ্রস্ফুটিত অশোকের নবপল্লব স্পর্শ করে হাওয়া বইতে শুরু করল, ভ্রমরযুগল একই কুসুমে মধুপান করতে থাকল, হরিণ হরিণীর গা শৃঙ্গ দ্বারা ঘর্ষণ করতে লাগল।

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥[১১]

তপস্যার কঠিন বেষ্টনীর মাঝে হঠাৎ বসন্ত আশ্চর্যরূপে দেখা দিল। চারদিকে বসন্তের অজস্র সমারোহ। তার মধ্যে গিরিরাজনন্দিনী অপরূপ রূপে উপস্থিত হলেন। অঙ্গে বালারুণবর্ণের বসন, অশোক আর কর্ণিকার পুষ্পে অলংকৃতা, ভয়চঞ্চল লোচন, হস্তে লীলাপদ্ম সঞ্চালন করে যেন ভ্রমরদের নিবারণ করছিলেন।[১২]

অন্যদিকে বেদিকার ওপর ধূর্জটি ভুজঙ্গ-পাশ-বদ্ধ জটা এবং কৃষ্ণমৃগচর্ম ধারণ করে স্তিমিতলোচনে শঙ্কর নিজেকে নিরীক্ষণ করছেন। অকালবসন্তের আবির্ভাব ঘটিয়ে মদন এই বিসদৃশ দুজনের মাঝে মিলন সাধনে উদ্যত। কামদেবের সাহায্যে অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাবের মধ্যে গিরিরাজনন্দিনী তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে তপস্যারত মহাদেবের হৃদয় জয় করার জন্য উপস্থিত হলেন। ফল হলো বিপরীত, মহাদেবের রোষাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হলেন আর অপরূপা পার্বতী হলেন প্রত্যাখ্যাতা।[১৩]

স্বর্গের দেবরাজ কর্তৃক উৎসাহ প্রদানকারী যে মদন, তাকে কবি চরমভাবে পরাস্ত করলেন। পার্বতী স্বীয় রূপের ব্যর্থতা উপলব্ধি করলেন; নিজের রূপকে মনে মনে নিন্দা করলেন-

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥[১৪]

(পার্বতীর দৃষ্টির সম্মুখেই মদন ভস্মীভূত হলেন পিনাকীর রোষে; ভগ্নমনোরথ হয়ে পার্বতী মনে মনে নিজের রূপের নিন্দা করতে লাগলেন– কেননা, প্রিয়তমের অনুগ্রহেই তো রূপ সার্থকতা লাভ করে।)

কি করে লাভ করা যায় সেই প্রেম আর সেই পতি? সমাধির মাধ্যমেই তিনি তপস্যার শক্তিতে তার প্রেমকে জয় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন-

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥[১৫]

শুরু হলো মহাদেবকে পাবার জন্য কঠিনতম সাধনা। কিন্তু নিজেকে কি করে তিনি সফল করবেন? সাজসজ্জা, অলংকারের চেষ্টা তো ব্যর্থ। তাই তপস্যা দিয়েই শুরু হলো তাঁর সাধনা। তিনি সমাধি আশ্রয় করে তপস্যার শক্তিতে সফলতা লাভ করবেন- এই সঙ্কল্প করলেন। এবার তাঁর যে বক্ষে হারলতা স্থান পেত তার পরিবর্তে সেখানে স্থান পেল, নবোদিত সূর্যের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বল্কল। রক্তিম বসনের সজ্জা গ্রহণ করলেন না, কর্ণে নবকর্ণিকার পুষ্পের অলংকার পরলেননা, তপস্যার জন্য তিনি সেখানে তিন লহর মুঞ্জরচিত মেখলা ধারণ করলেন। পূর্বপ্রসিদ্ধ কেশপাশে তার মুখ যেমন মধুর দেখাত, জটাজালেও যেন সেরূপ মধূর মনে হতে লাগল; কেবল ভ্রমরপঙ্ক্তিতেই পদ্ম শোভা পায়না, শৈবালদলে জড়িত থাকলেও তো তাকে সুন্দর দেখায়-

যথা প্রসিদ্ধৈর্মধুরং শিরোরুহৈর্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্ ।
ন ষট্পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং সশৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে ॥[১৬]

যে হাতে তিনি তাঁর অধরও ওষ্ঠ বিভিন্নরাগে রঞ্জিত করতেন, সেই হাত এখন কুশাঙ্কুর সংগ্রহে ক্ষতবিক্ষত আর সকল সময় সেখানে অক্ষমালা বিরাজিত। মহামূল্যবান শয্যায় একদিন যিনি শয়ন করতেন, খোঁপা হতে বিচ্যুত পুষ্পের আঘাতেও যিনি ব্যাথা পেতেন, আজ তিনি নিজের বাহুলতায় মাথা রেখে যজ্ঞভূমিতেই শয়ন করেন অথবা উপবিষ্ট থাকেন। কিন্তু তাতেও যখন তিনি মনে মনে তুষ্ট হতে পারলেননা তখন তিনি নিজের দেহের কমনীয়তা তুচ্ছ করে আরো কঠোর তপস্যা শুরু করলেন।[১৭]

যে পার্বতী কন্দুক[১৮] নিয়ে খেলতে গিয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তিনি মুনিগণের আচরিত সাধনায় মগ্ন হলেন। মনে হয় তাঁর দেহ স্বর্ণপদ্মে নির্মিত; প্রকৃতির দিক দিয়ে মৃদু কিন্তু সারাংশের দিক দিয়ে দৃঢ় হয়ে উঠল-

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥[১৯]

(পবিত্রা, হাস্যমুখী, অনন্য সুন্দরী পার্বতী গ্রীষ্মকালে চারদিকে চারপ্রকার অগ্নি জ্বেলে তাদের মধ্যে থেকে চোখ ঝলসানো জ্যোতি উপেক্ষা করে স্থির দৃষ্টিতে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতেন।)

বৃক্ষের ন্যায় অতিরিক্ত কোনো খাদ্য উপকরণ পার্বতী গ্রহণ করতেন না। আকাশচারী আদিত্যরূপ অগ্নি এবং কাষ্ঠসমিদ্ধ বিবিধ অগ্নির তাপে (যজ্ঞীয় অগ্নি চারটি এবং সূর্য–সব মিলে পঞ্চবিধ অগ্নি) তপ্ত হয়ে গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষার জলে সিক্ত হয়ে যেন ঊর্ধগামী তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন–গ্রীষ্মের অবসানে তপ্ত পৃথিবী থেকেও একটি তাপের ভাপ ওপরে ওঠে, সেই শিখরে অবিচ্ছিন্ন শীতল বাতাসের সাথে বৃষ্টির ধারা– তার মধ্যে তিনি শিলার ওপরে শয়ন করে থাকতেন।

স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ পয়োধরোৎসেধনিপাত চূর্ণিতাঃ।
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ॥[২০]

(বর্ষার প্রথম জলবিন্দু তাঁর চক্ষুর রোমে কিছুকাল থেকে অধরে পড়তো তাতে অধর আহত হতো। তারপর সেই বিন্দুগুলি তাঁর স্তনের উপরে পড়েই একেবারে চূর্ণ হয়ে যেতো তারপর সেই চূর্ণ বিন্দুগুলি গড়িয়ে পড়তো পার্বতীর উদররেখায় এইভাবে নাভিরন্ধ্রে পৌঁছাতে বিন্দুগুলির কিছু দেরী হতো।)

শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিসু।
ব্যালোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈমহাতপঃ সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ॥[২১]

(সেই গৌরীশিখরে অবিচ্ছিন্ন শীতল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ধারা! তারই মধ্যে তিনি অনাবৃত শিলার উপরে শয়ন করে থাকতেন। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিত হতো যেন তাঁর মহতী তপস্যার সাক্ষীরূপে আছেন যে অন্ধকার রজনী তিনি তাকে বিদ্যুতের নয়নে লক্ষ্য করছেন।)

পৌষমাসে শীতল বাতাসের সাথে অবিচ্ছিন্ন তুষারপাত। সেই রাত্রিগুলিতে তিনি জলে যেখানে তুষার বর্ষণে পদ্ম ক্ষুণ্ন হয়েছে সে জলে তাঁর পদ্মের ন্যয় কম্পিত অধরে বসে তপস্যা করতেন। স্বয়ংচ্যুত শীর্ণপত্রের রসপান করে তিনি জীবন ধারণ করতেন।[২২]

এরূপ কঠোর ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে যখন পার্বতীর মৃণালকোমল দেহটি শীর্ণপ্রায়, তখন কঠিন সাধনায় তপস্বিগণ যে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন, তাকেও পার্বতীর তপস্যার কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। একদিন এক জটাধারী তপস্বী সেই তপোবনে প্রবেশ করলেন–

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাগ্জ্বলন্নিব ব্রহ্মনয়নে তেজসা।
বিবেশ কশ্চিৎ জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো মথা।[২৩]

(তারপর একদিন এক জটাধারী তপস্বী তপোবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরিধানে মৃগচর্ম, হাতে পলাশদণ্ড; তিনি বাকপটু, ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত– দেখে মনে হয়, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মূর্ত বিগ্রহ।)

বর্ণনার কৌশলে অদ্ভুত এক নাটকীয়তার সৃষ্টি হলো। কে জানত যে ইনিই সেই চন্দ্রশেখর, পার্বতীর কঠিন তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ধরা দিতে এসেছেন। ছদ্মবেশী অতিথিরূপধারী চন্দ্রশেখর পার্বতীর প্রেম পরীক্ষা করতে পার্বতীর প্রশংসা করে তাঁর নিকট শিবনিন্দা শুরু করলেন-

দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভুময়ঃ
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা ন রত্নমন্বিষতি মৃগ্যতে হি তৎ॥[২৪]

(যদি তুমি স্বর্গ প্রার্থনা করে থাক তা হলে এই পরিশ্রম ব্যর্থ, কেননা তোমার পিতৃগৃহই তো দেবভূমি। যদি পতির কামনা থাকে তাহলেও সমাধির কোনো প্রয়োজন নেই। রত্ন নিজে কারো সন্ধান করেনা– রত্নকেই লোকে সন্ধান করে নেয়।)

হিরণ্যগর্ভের কুলে তোমার জন্ম; ত্রিলোকের সৌন্দর্য একত্রে সন্নিবেশ করে তোমার দেহ নির্মিত; কোনো ঐশ্বর্য সুখই তোমার অপ্রাপ্য নয়–সর্বোপরি এই নবীন বয়স। অসহনীয় দুঃখ থেকেই মনস্বিনীদের এরূপ তপস্যার প্রবৃত্তি হয়ে থাকে; তোমার ক্ষেত্রে এরূপ কোনো দুঃখের সম্ভাবনাও নেই।[২৫]

তোমার যে আকৃতি তাতে শোকের তাপ লেগেছে বলেও মনে হয়না। কোন কারণে তুমি অলঙ্কার ত্যাগ করে বল্কল ধারণ করেছ–

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্ ।

বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে ॥[২৬]

(কোন কারণে তুমি যৌবনে অলঙ্কার ত্যাগ করে বল্কল ধারণ করেছ, যা একমাত্র বার্ধ্যক্যেই শোভা পায়? সন্ধ্যায় চন্দ্র-তারকায় শোভিতা রাত্রি যদি প্রভাতসূর্যের ধ্যান করে তাহলে কি হয় বলো!)

তোমার প্রার্থিত যুবকের হৃদয় নিশ্চয় অতি কঠিন। ব্রত পালনের ফলে তুমি অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে পড়েছ। তোমার অলঙ্কার ধারণের স্থানগুলি বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। দিনের আলোকে চন্দ্র যেমন কৃশ ও পাণ্ডুর তুমিও তারই মতো।[২৭]

ব্রহ্মচারী আরো বললেন, মহেশ্বরকে আমি জানি, নানারকম কুক্রিয়ায় তার আসক্তি। তুমি তুচ্ছ বস্তুতে আগ্রহশীলা, তোমার এই হস্ত যখন বিবাহসূত্রে শোভিত হবে, তখন সর্পবেষ্টিত শম্ভুর হস্ত কিভাবে গ্রহণ করবে? তোমার বিবাহের কলহংসচিত্রিত পট্টবস্ত্র আর মহেশ্বরের রক্তবিন্দুবর্ষী গজচর্ম– এ দুয়ের মধ্যে যোগ কোথায়? তুমি গজরাজের বহনযোগ্য, অথচ বিবাহের পর তোমাকে বৃদ্ধ ষাঁড়ের পিঠে যেতে দেখে সজ্জনরা নিশ্চই উপহাসের হাসি হাসবেন। যার অঙ্গে তিনটি নয়ন, জন্মের কোনো স্থিরতা নেই (যাঁর জন্ম দুর্জ্ঞেয়), যিনি দিগম্বর, তাতেই বুঝা যায় তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাণ কিরূপ–

"নিবর্তয়াস্মাদসদীপ্সিতান্মনঃ ক্ব তদ্বিধস্ত্বং ক্ব চ পুণ্যলক্ষণা ।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী শ্মশানশূলস্য ন যূপসৎক্রিয়া ॥[২৮]

(শ্মশানের শূল আর বেদবিহিত পশুবন্ধনের যূপ একই সম্মান দাবি করতে পারেনা। শ্মশানের শূলকে যজ্ঞীয় যূপের মতো অর্চনা যেমন সম্ভব নয়–ত্রিলোচনের পক্ষেও তুমি তেমনি অসম্ভব।)

পার্বতীর মন যাতে ত্রিলোচনের সাধনা থেকে নিবৃত্ত হয়– সেজন্য ব্রহ্মচারী যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন-

'এই অসৎ ইচ্ছা থেকে মনকে নিবৃত্ত করো। তার মতো ব্যক্তিই বা কোথায়– তোমার মতো পুণ্যলক্ষণা কন্যাই বা কোথায়? সৎপুরুষশ্মশানের শূলকে বেদবিহিত পশুবন্ধনের যূপের মতো অর্চনা করেন না।'

একজন বরের যে বিষয়াবলি মানুষ কামনা করে, তার একটিও কি পৃথকভাবে ত্রিলোচনের আছে? তাই এই ইচ্ছা থেকে মনকে নিবৃত্ত করো।

পার্বতী বললেন, 'আপনি শিবের সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানেন না, তাই আমাকে এভাবে বলছেন। যারা অজ্ঞ তারাই আলোকসামান্য মহাত্মাদের অচিন্তনীয় চরিত্রের নিন্দা করে থাকে।' অবিচলিত পার্বতী দৃঢ়কণ্ঠে আরো বললেন-

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥[২৯]

(বাদানুবাদে প্রয়োজন নেই। আপনি যেমন তাঁর সম্পর্কে শুনেছেন তিনি সর্বাংশে সেইরূপই হোন– তাঁর অনুরাগে আমার মন স্থির। স্বেচ্ছাব্যবহারী কখনও নিন্দায় বিচলিত হয় না।)

তিনি দরিদ্র হলেও সকল সম্পদের তিনিই উৎস। তিনি শ্মশানবাসী হলেও ত্রিলোকের অধীশ্বর, রূপ যেমনই হোক তিনি শিবরূপেই বর্ণিত–

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্যতে ন সন্তি যথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥[৩০]

যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে যখন পার্বতী চলে যেতে উদ্যত, ঠিক তখনই ব্রহ্মচারিরূপী চন্দ্রশেখর স্বরূপে প্রকাশিত হলেন। বৃষধ্বজ স্মিতমুখে তাঁকে দুহস্তে গ্রহণ করলেন। এতদিন ধরে যাঁকে প্রার্থনা করেছেন, যাঁর জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যস গ্রহণ করেছেন, সেই কাঙ্ক্ষিত মহাদেবকে দেখে উমা আবেগে কাঁপতে লাগলেন– ক্ষীণদেহ তাঁর ঘর্মজলে সিক্ত হয়ে উঠল। নিক্ষেপ করার জন্য উত্থিত চরণ উর্ধ্বেই থেকে গেল। পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত জলের ধারা যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে, সামনে পেছনে কোনোদিকে যেতে পারেনা সেরূপ উমাও নিষ্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন–

তং বীক্ষ্য বেপুথমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥[৩১]

(তাঁকে দেখে উমা কাঁপতে লাগলেন– তাঁর ক্ষীণদেহ ঘর্মজলে সিক্ত হয়ে উঠল। নিক্ষেপ করার জন্য তিনি যে চরণ উর্ধ্বে তুলেছিলেন তা উর্ধ্বেই রয়ে গেল। জলের ধারা পথের কোনো পর্বতে বাধা পেলে যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে, অগ্রসর হতে পারেনা, পেছনেও যেতে পারেনা- সেরূপ পর্বতরাজতনয়া উমাও সামনে যেতে পারলেননা, পেছনেও যেতে পারলেননা- তিনি নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।)

যে শঙ্কর পুষ্পাভরণে সজ্জিতা, অপরূপা যৌবনময়ী উমাকে প্রত্যাখান করেছেন, সে শঙ্কর তপস্বিনী জটাধারিণী উমার কাছে ধরা দিলেন।[৩২] যাঁর জন্য এতদিন ধরে এত সাধনা, এত দুঃখভোগ, সেই ইপ্সিত চন্দ্রশেখর পার্বতীর সম্মুখে উপস্থিত। মহাকবি মদনকে পরাজিত করে এমন এক পার্বতীকে জয়ী করলেন যাঁর আজ সজ্জা নেই, সহায় নেই; যা আছে তা তপস্যায় কৃশ, দুঃখে মলিন। স্বর্গের দেবগণ যা কল্পনাও করেননি। অনুরাগ, আনন্দ আর লজ্জায় পার্বতী অভিভূত; চরণ তুলেছেন যাবার জন্য, কিন্তু সে চরণ যেনো নিথর হয়ে রইল। পর্বতগাত্রে প্রবাহিত স্রোতধারা প্রস্তরখণ্ডে প্রতিহত- সামনেও অগ্রসর হতে পারছেনা, পেছনেও যাওয়া যাচ্ছে না।

চন্দ্রশেখর বললেন–

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে ॥[৩৩]

(ওগো অবনতাঙ্গি! তুমি তোমার তপস্যার বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করেছ–আমি তোমার দাস। চন্দ্রশেখরের এই কথা শুনে তপস্বিনী পার্বতী তাঁর তপস্যার সকল ক্লেশ ভুলে গেলেন। ফললাভের পর ক্লেশও নতুন শক্তি সঞ্চয় করে।)

প্রার্থিত বস্তু লাভের পর আর দুঃখ থাকেনা। যাঁর জন্য পার্বতীর এতো কঠোর তপস্যা, সেই চন্দ্রশেখর আজ তাঁর কাছে ধরা দিলেন। নিজের মুখে তিনি বললেন–

'তবাস্মি দাসঃ।'
(আজ হতে আমি তোমার ভৃত্য।)

এর থেকে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে! পার্বতী পেয়ে গেলেন তাঁর এতদিনের তপস্যাপূত ধন। পার্বতী সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ ভুলে নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সফলতার পর আর ক্লেশ কোথায়? 'সফলঃ ক্লেশো ন ক্লেশো এব'।[৩৪]

এর পর ষষ্ঠ এবং সপ্তম সর্গে শিব পার্বতীর বিবাহ বর্ণনা করা হয়। *কুমারসম্ভবে* বিবাহবর্ণনায় দেখা যায় শিবের সাথে পার্বতীর বিয়ে স্থির করতে দেবর্ষিরা পার্বতীর পিত্রালয় ওষধিপ্রস্থে যাচ্ছেন। এখানে ঋষিপত্নী অরুন্ধতীরও ছিল সক্রিয় অংশগ্রহণ, কারণ এ জাতীয় কাজে মাতৃতুল্য মেয়েদের কথায় বেশি কাজ হয় –

আর্য্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্তুমর্হতি।
প্রায়েণৈবংবিধে কার্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা ॥[৩৫]

(সেই বিবাহ ব্যাপারে মাননীয়া অরুন্ধতী দেবীও সাহায্য করতে পারেন; এই জাতীয় কাজে গৃহিণীদের নৈপুণ্য সকলেই জানেন।)

বিয়ের প্রস্তাব করা হলো। সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিতা স্বাধীন হলেও তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন, কারণ মেয়ের বিয়েতে কন্যার মায়ের সম্মতি প্রদানও প্রয়োজন ।[৩৬]

পতিব্রতা রমণীরা কখনো পতির ইচ্ছার বিরোধিতা করেন না। তাই মা কন্যার স্নেহে অশ্রুজলে সিক্ত হয়েও বিবাহে সম্মত হলেন। ঋষিগণের সম্মতিতে তিনদিন পর শুক্লপক্ষের জামিত্র গুণযুক্ত তিথিতে বিবাহ স্থির করা হয়। ঘরে ঘরে গিন্নিদের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সন্তানক গাছের ফুলে ঢাকা সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের পতাকাসজ্জিত রাজপথে সুবর্ণতোরণ নির্মাণ করে তার উজ্জ্বলতায় স্বর্গের দীপ্তির ন্যায় মনে হতে থাকল। মৈত্র মুহূর্তে (সূর্যোদয় মুহূর্ত থেকে তৃতীয় মুহূর্তে; মুহূর্ত = ৪৮ মিনিট) উত্তরকণ্ডলী নক্ষত্র চন্দ্রের সাথে যুক্ত হলে কুলরমণীরা কন্যা সাজাতে বসলেন। শ্বেতসর্ষপ যুক্ত নবীন দুর্বাঙ্কুরে তাঁর সিঁথি সাজিয়ে, নাভিদেশ আবৃত্ত করে কৌশেয় বস্ত্র পরিয়ে, লোধ্রফুলের (লাল বা সাদা রঙের ফুল, এর রেণু সাদা) শ্বেত পরাগে উমার দেহের নিম্বতেল মুছে কানেয় (গন্ধদ্রব্য বিশেষ কালো চন্দন) নামক গন্ধদ্রব্যে অঙ্গরাগ সম্পন্ন হলে পার্বতীকে শাড়ি পরিয়ে চারস্তম্ভযুক্ত স্নানগৃহে নেওয়া হলো।[৩৭]

সেখানে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়ে শুভসূচনার পর তাঁকে স্বর্ণঘটের জল দিয়ে স্নান করিয়ে একটি মণ্ডপের প্রসাধন বেদীতে পূর্বমুখী করে বসানো হলো তখন তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল যেন মেঘবর্ষণের পর প্রফুল্ল কাশফুলে সজ্জিতা পৃথিবীর ন্যায়। পুরললনাগণ তারপর তাকে নিয়ে বসালেন চন্দ্রাতপ সজ্জিত মণ্ডপের মধ্যবর্তী প্রসাধন বেদীর উপরে। পূর্বমুখী করে বসিয়ে ধূপের ধোঁয়ায় তাঁর কুঞ্চিত কেশের আর্দ্রতা দূর করে দুর্বাযুক্ত বন্ধুকফুলের মালা জড়িয়ে, কপোলে লোধ্রপরাগের লেপনে ছিল শ্বেতবর্ণ সেখানে যুক্ত হলো কার্ণে অর্পিত শ্যামল যবাঙ্কুরের ন্যায় মনে হলো। নির্মল ঠোঁটে মধুর প্রলেপ, পায়ে আলতারঞ্জিত, চোখে কাজল এবং ক্ষৌমবস্ত্র পরানো শেষ হলে মা এসে হরিতাল ও লালরঙ্গের মন:শিলা দিয়ে কপালে বিবাহকালোচিত তিলক পরালেন, হাতে উর্ণাময় মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিলেন, মেয়েকে দিয়ে গৃহদেবতার প্রণাম ও সতীসাধ্বীদের পাদবন্দনা করালেন, তাঁরপর সম্প্রদান সভায় চন্দ্রশেখরের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ওদিকে কৈলাশ পর্বতেও বিবাহোৎসবের সমারোহ। অনুরূপ সজ্জা ও অলঙ্কার সকল মঙ্গল্দ্রব্য ও প্রসাধন শঙ্করের সামনে রাখলে তিনি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক একবার স্পর্শ করলেন। তাঁর নরকপাল, হস্তিচর্ম, তৃতীয় নয়ন ফণাধরসাপ সবই থাকল। তিনি কোনরূপ সজ্জা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করলেন না, নিজের প্রভাবে বিবাহকালোচিত অলঙ্কার ও বেশভূষার সৃষ্টি করলেন তিনি। ষাঁড়ের পিঠে বাঘছাল চাপিয়ে বরবেশে মহেশ্বর যাত্রা করলেন–

স গোপতিং নন্দিভুজাবলম্বী শার্দূলচর্মান্তিরিতোরুপৃষ্ঠম্ ।
তভ্ক্তিসংক্ষিপ্তবৃহৎ প্রমাণমারুহ্য কৈলাসমিব প্রতস্থে ॥[৩৮]

(নন্দীর বাহু আশ্রয় করে মহেশ্বর বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন–বৃষপৃষ্ঠ ব্যঘ্রচর্মে আবৃত। মহেশ্বরের প্রতি ভক্তি হেতু বৃষ তার বিশাল দেহ সঙ্কুচিত করল, মনে হলো কৈলাসনাথ তার প্রিয় কৈলাশপর্বতে আরোহণ করলেন। এরপর মহেশ্বর যাত্রা করলেন।)

বর হিমালয়ে পৌঁছালে পুরসুন্দরীগণ নিজেদের যাবতীয় কাজ অসম্পূর্ণ রেখে জানালায় জানালায় দাঁড়ালেন। মহাদেবকে বর রূপে দেখার জন্য ভীড় যেন উপচে পড়ছিল তখন প্রতিটি বাড়ির জানালায়।[৩৯]

তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতুহলানাম্ ।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন ॥[৪০]

(গবাক্ষগুলি ভরে গেল পুরসুন্দরীদের মুখের সারিতে। সেই মুখগুলি মদের গন্ধে মধুর। মনে হলো জানলাগুলি পদ্মের শ্রেণীতে অলঙ্কৃত হয়েছে, তাদের চঞ্চল নয়নগুলি যেন ভ্রমরের সারি।)

সকলের উপস্থিতিতে, সকলের সম্মতিতে, সম্পন্ন হলো মহাদেব এবং পার্বতীর আশীর্বাদপুষ্ট মঙ্গলময় আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ।

মহাকবি কালিদাসের এ কাব্যে কামসর্বস্ব দেহবিলাস লাঞ্ছিত হয়েছে, জয়ী হয়েছে তপস্যাপূত নির্মল প্রেম। সব দুঃখের দহনে পরীক্ষা করে প্রেমকে করেছেন জ্যোতির্ময়। সে প্রেম বাস্তব কিন্তু আধ্যাত্মিক, ত্যাগের সৌন্দর্যে মহিমান্বিত, সকলের কল্যাণ কামনায় পবিত্র।[৪১] ধর্মই মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভিমুখে ধাবিত করল এবং ধর্মের দ্বারাই তাপস-তপস্বিনীর মিলন সাধিত হলো।[৪২]

বাহ্য সৌন্দর্য এখানে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু শঙ্কর প্রেমের দৃষ্টি, মঙ্গলের দৃষ্টি দিয়ে যে সৌন্দর্য দেখলেন, তা তপস্যায় কৃশ ও আভরণশূন্য এক সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্যই শেষে জয়ী হলো। কারণ সে জয় পেতে তাঁকে নিজের মন সহায়তা করেছে, মনের কর্তৃত্ব তাতে নষ্ট হয়নি।[৪৩]

ধর্ম যখন তাদের মিলন সাধন করলো তখন এ প্রেম লোক-লোকান্তরে ব্যপ্ত হলো। সমস্ত বিশ্ব এই শুভ মিলনের নিমন্ত্রণে প্রসন্ন মুখে যোগদান করে তা সুসম্পন্ন করে দিল। শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নয়। কালিদাস তাঁর কাব্যে সেই প্রবাহকে স্বর্গমর্তব্যাপী সর্বাঙ্গসম্পন্ন শান্তির মাঝে মিলন করে তাকে মহান পরিণাম দান করেছেন। মাঝে তাকে একবার বিক্ষুব্ধ করেছেন কেবল এই সৌন্দর্যকে প্রশান্তি দান করে গাঢ় করার জন্য, স্থির, শুভ্র মঙ্গলমূর্তির বিচিত্রবেশী উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্যের তুলনায় উজ্জ্বল করে তোলার জন্য।[৪৪]

অনায়াসেই যে প্রেম লাভ করা যায় তা শেষ পর্যন্ত মিলনের মাধুর্য আনতে পারেনা। দুঃখের অনলে পুড়েই পাওয়া যায় সত্যিকারের সুখ। মহাকবি কালিদাসের কাব্য–নাটকে এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত। জীবনের যাবতীয় উপাচার, সৌন্দর্য, মাধুর্য, সম্ভোগ, প্রেম সকল কিছুর মাঝেই কবি এই তাপ ও তপস্যার প্রয়োজন দেখেছেন। আর তাই বলেই তিনি জীবনের সমগ্রতার দ্রষ্টা। সেজন্যই তিনি তাঁর এ কাব্যে পার্বতীর জীবনের খণ্ড অংশ বর্ণনা করেননি। তিনি তাঁর প্রধান নায়িকা পার্বতীকে দিয়ে মোহযুক্ত প্রেমকে তপস্যার মাধ্যমে খাঁটি করে নায়ক–নায়িকার মিলন সাধন করেছেন। সেজন্যই মহাকবিকালিদাসের পার্বতী ব্যতিক্রম, স্বতন্ত্র, এক অনবদ্যও পবিত্র চরিত্র।

তথ্যনির্দেশ

১. দেবকুমার দাস, *সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*, (কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৪), পৃ. ১০৬।

২. পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, (কলিকাতাঃ জয়দূর্গা লাইব্রেরী, ১৯৯৫), পৃ. ১৯৬।

৩. Kalidasa’s *Kumara Sambhaba*, 1/1, P.V. Kulkarni & V.R. Nerurkar Edt. (Bombay; Narendra Pustkalaya, 1923), P.1.

[৪]. ধারণা করা হয় সে যুগে এজন রাজা ছিলেন যিনি শৌর্যে, বীর্যে এবং মহানুভতায় হিমালয়ের সঙ্গে তুলনীয়। হিমালয় পর্বতের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তাই তাঁর নাম ছিল হিমালয়।

[৫]. কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার-২য় খণ্ড (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৭৮)*, পৃ.২২১-২২২।

[৬]. *তদেব*, ৩/২৮,পৃ. ২৯০।

[৭]. কর্ণিকার ফুলের রং হলুদ, উজ্জ্বল হলুদ এই ফুল স্বর্ণকে হার মানায়। কর্ণিকার ফুল মেয়েরা কানের অলঙ্কার হিসেবে পরতো।

[৮]. কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৩/৩০, শ্রীমল্লিনাথসুরী সম্পা. (কলিকাতা; সংস্কৃত যন্ত্র, ১৯১৯), পৃ.৭৫।

[৯]. কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৩/২৯, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার-২য় খণ্ড,প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯১।

[১০]. *তদেব*, ২, ৩/২৯, পৃ.২৯০।

[১১]. *তদেব*, ৩/৩৬, পৃ.২৯১।

[১২]. *প্রাচীন সাহিত্য, প্রাগুক্ত*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (কলিকাতা: বিশ্বভারতীগ্রহণ বিভাগ, ১৩১৪), পৃ.২১।

[১৩]. কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, অনিল চন্দ্র বসু সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩), পৃ.৩৩।

[১৪]. কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৫/১, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভা-২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭।

[১৫]. *তদেব*, ৫/২, পৃ.২৯৭।

[১৬]. তদেব, ৫/৯, পৃ.২৯৭।

[১৭]. *তদেব*,, পৃ. ২৩৯।

[১৮]. [কন্দুক ক্রীড়া: কন্দুক ক্রীড়া সম্পর্কে অনুমান করা যায় এ খেলা বেশ হালকা ধরণের; কেননা এই এখানে বলা হয়েছে কন্দুকক্রীড়াতেও যিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন সেই পার্বতী কঠিন মুনিব্রত গ্রহণ করলেন। উপমার ভাষায় লক্ষ্য করা যায়–পার্বতীর দেহ 'কাঞ্চন-পদ্ম নির্মিতম্'। যা সারাংশে দৃঢ় হলেও মৃদু স্বভাবের। সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে মনে হয় এই ক্রীড়া রমণীদের বেশ প্রিয় ছিল। দণ্ডী তাঁর দশকুমারচরিতে এ ক্রীড়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। *স্বপ্নবাসবদত্তম্* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কেও কন্দুকক্রীড়ার উল্লেখ রয়েছে। অভিধানে অর্থদেওয়া আছে, কন্দুকক্রীড়া-বলখেলা; কিন্তু কি ধরণের খেলা তা বলা হয়নি।]

[১৯]. *তদেব*, ৫/২০ পৃ.২৯৮।

[২০]. *তদেব*, ৫/২৪ পৃ.২৯৮।

[২১]. *তদেব*, ৫/২৫ পৃ.২৯৮।

[২২]. *তদেব*, পৃ. ২৩৯-২৪০।

[২৩]. *তদেব*, ৫/৩০, পৃ. ২৯৯।

[২৪]. *তদেব*, ৫/৪৫, পৃ.৩০০।

[২৫]. কুলে প্রসূতিঃ প্রথমস্য বেধসস্ত্রিলোকসৌন্দর্যমিবোদিতং বপুঃ।
অমৃগ্যমৈশ্বর্যসুখং নবং বয়স্তপঃফলং স্যাৎ কিমতঃপরং বদ ॥ *তদেব*, ৫/৪১, পৃ.২৯৯।

[২৬]. *তদেব*, ৫/৪৪, পৃ.২৯৯।

[২৭]. মুনিব্রতৈস্ত্বামতিমাত্রকর্শিতাং দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদাম্ ।
শশাঙ্কলেখামিব পশ্যতো দিবা সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে ॥*তদেব*, ৫/৪৮, পৃ. ৩০০।

[২৮]. *তদেব*, ৫/৭৩, পৃ.৩০১।

[২৯]. *তদেব*, ৫/৮২, পৃ.৩০২।

[৩০]. *তদেব*, ৫/৭৭, পৃ.৩০২।

[৩১]. *তদেব*, ৫/৮৫, পৃ.৩০২।

[৩২]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫।

[৩৩]. *তদেব*, ৫/৮৬,পৃ.৩০২।

[৩৪]. *তদেব*, পৃ.২৭৪।

[৩৫]. *তদেব*, ৬/৩২, পৃ. ৩০৫।

[৩৬]. শৈলঃ সম্পূর্ণকামোহ্পি মেনামুখমুদৈক্ষত।
প্রায়েণ গৃহিণীঃ নেত্রা কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ॥ *তদেব*, ৬/৮৫, পৃ.৩০৮।

[৩৭]. তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলামশ্যানকালেয়কৃতাঙ্গরাগাম্।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং নার্য্যশ্চতুষ্কাভিমুখং বানৈষুঃ॥ *তদেব*, ৭/৯, পৃ. ৩০৯।)।

[৩৮]. কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৭/৩৭, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার-২য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১১।

[৩৯]. করুণাসিন্ধু দাস, *সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৩৫।

[৪০]. কালিদাস, *কুমারসম্ভবম্*, ৭/৬২, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার-২য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৩।

[৪১]. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, *মেঘদূত পরিচয়* (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৯), পৃ.২৩।

[৪২]. কালিদাস, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, অনিল চন্দ্র বসু সম্পা. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩।

[৪৩]. *তদেব*, পৃ.২৬।

[৪৪]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭।

গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৬তম সংখ্যা, ডিসেম্বর-২০১৮, ISSN 1813-0402

ভবভূতির মালতীমাধব একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকরণ

ড. শেখ মো. নূরুজ্জামান*

Abstract : In this article entitled an attempt has been taken to show the poetic genius of Bhavabhuti who is recognized by the circles of the elite in the land of his birth as next only to Kalidasa in his gift of poetic power and genius while some go still further and seat him on one of the two glory smitten summits of the poetic mountain with Kalidasa as "his compeer not rival." Malatimadhava written by Bhavabhuti derives its central incident and its episodes from the katha literature. Malatimadhava plays an exceptional role in Sanskrit literature. Bhavabhuti attracts all froms and things to himself, into the unity of his own ideal. Thus in the Malatimadhava the poet flings a defiant challenge to the world and appeals to some kindred spirit, yet unborn for a proper reception of his work. The subject matter as a whole maybe taken as the poet's invention. The author has drawn the minor characters with skill. Minor characters are not negligible for their minor roles. The may stand in the equal row side by side with the main characters.The plot of the Malati-madhava is based on the time worn theme of love triumphant over many obstacles, but we turn pleasantly from royal courts to a more plebeian atmosphere and find greater individuality of presentation. But even granting that the coincidences are not accidental, it should be recognized that evolving of the plot as whole in ten acts by a dexterous combination of varied motifs and situations is apparently the poet's own.The central interest is made to rest, not upon one love story, but upon two parallel love stories, skilfully blended together and crowded with such exciting and unexpected turn of incidents as is not normally found in such stories.The main plot moves round the love of Madhava young student and Malati, daughter of a cabinet minister; it is thwarted by the interposition of a powerful suitor in Nandana, nominated by the king, but it ends with achievements of success, partiy through accidents and partiy through the diplomacy of a shrewd, resourceful and kind hearted Buddhist nun, Kamandaki, a friend and class mate of the fathers of Madhava and Malati. In arrangement of plots, representation of characters and heroic achievements of lovers for the valiant rescue of Malati from the clutches of a Kapalika and Madayantika from the claws of a tiger are really instances invented by the dramatist and exceptional in characteristics.

ভবভূতির পরিচয় ও আবির্ভাবকাল: ভবভূতি কালিদাসোত্তর যুগের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। প্রাচীন সংস্কৃত কবি ও নাট্যকারদের অধিকাংশের সম্পর্কে লিখিত তথ্যাদি না থাকায় তাঁদের ব্যক্তিপরিচয় তমসাবৃত। তবে ভবভূতি তাঁর রচিত দৃশ্যকাব্যত্রয়ের ('*মালতীমাধবম্*' '*মহাবীরচরিতম্*' ও '*উত্তররামচরিতম্*') প্রস্তাবনায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। কবির জন্মস্থান, বংশপরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা সব বিষয়ই এই তিন নাটকের প্রস্তাবনায়[১] বর্ণিত হয়েছে। প্রস্তাবনা তিনটি পর্যালোচনা করে জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভনগরের অন্তর্গত পদ্মপুর নামক নগরে তৈত্তিরীয় বেদ শাখার অন্তর্গত কাশ্যপগোত্রীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে কবিসহ তাঁর পূর্বপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভবভূতির পিতামহ ছিলেন ভট্টগোপাল, পিতা নীলকণ্ঠ এবং মাতা জাতুকর্ণী। অশেষ শাস্ত্রবিশারদ, যথার্থনামা জ্ঞাননিধি ছিলেন ভবভূতির গুরু। ভবভূতি বেদ-উপনিষদ্, সাংখ্য-যোগদর্শনাদি এবং ছন্দ-জ্যোতিষাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন বলে স্বয়ং উল্লেখ করেছেন।[২] ভবভূতি তাঁর ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পরিচয় বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করলেও নিজের আবির্ভাবকাল বিষয়ে নীরব ছিলেন। *উত্তররামচরিতের* ঘটনাবলীতে কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* প্রভাব সুস্পষ্ট। কালিদাস খ্রিস্টীয় ৪র্থ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শতকের কবি হলে ভবভূতি পরবর্তী যেকোন সময়ে আবিভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের কবি বাণভট্ট, ভাস কালিদাস ইত্যাদি পূর্বসূরীদের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু ভবভূতি বা তাঁর নাট্যকৃতির উল্লেখ করেননি। এ থেকে অনুমিত হয় ভবভূতি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরবর্তী সময়ের কবি ছিলেন। আচার্য বামন *'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'* গ্রন্থে ভবভূতি বিরচিত দুটি শ্লোক[৩] উদ্ধৃত করেছেন। আলঙ্কারিক বামন ৮০০ খ্রিস্টাব্দের সমসাময়িক। ভবভূতি বামনের পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক। পরবর্তীতে রাজশেখর, আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্ত প্রমুখ আলঙ্কারিক ভবভূতির রচনা উদ্ধৃত করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরীয় ঐতিহাসিক কবি কল্হণ *'রাজতরঙ্গিণী'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন প্রাকৃতভাষায় রচিত *'গউড়বহ'* কাব্যের প্রণেতা বাক্পতিরাজ সঙ্গে ভবভূতিও কাণ্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মণের সভাকবি ছিলেন।[৪] বাক্পতিরাজ *'গউড়বহ'* কাব্যে (শ্লোক ৭১৯) স্বয়ং ভবভূতির রচনার প্রশংসা করেছেন। *রাজতরঙ্গিণী* থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যশোবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন।[৫] ললিতাদিত্য ৭২৪ থেকে ৭৬০ অথবা ৭৩১ থেকে ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। যশোবর্মার পরাজয় ৭২৪ অথবা ৭৩১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী। *গৌড়বহ* মহাকাব্যে এক সূর্যগ্রহণের উল্লেখ পওয়া যায়। ইয়োকবির মতে ঐ সূর্যগ্রহণ ৭৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই আগষ্ট সংঘটিত হয়েছিল। *গৌড়বহো* ঐ সময়ের পরবর্তীকালের রচনা। গৌড়বহো খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদের রচনা হলে ভবভূতি বাক্পতিরাজের কিছু পূর্ববর্তী অর্থাৎ খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম পাদের হতে পারেন। এবিষয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায় ভবভূতি কালিদাস পরবর্তী এবং রাজশেখর ও বামনের পূর্ববর্তী। কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইতিহাসনির্ভর তথ্যই নির্ভরযোগ্য। ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্যে ভবভূতির উল্লেখ থাকায় সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের মত ভবভূতির কাল নির্ণয়ে জটিলতার সুযোগ নেই।

বিষয়বস্তু: প্রকরণ সংস্কৃত রূপকের অন্যতম ভেদ। নাট্যকার যেখানে আত্মশক্তি অর্থাৎ নিজের কল্পনা দিয়ে বস্তুশরীর ও নায়ককে সৃষ্টি করেন তখন রূপক হয়ে ওঠে প্রকরণ। প্রকরণের বিষয়বস্তু লৌকিক ও কবিকল্পিত।[৬] এর অঙ্গীরস শৃঙ্গার, নায়ক কোন ব্রাহ্মণ, অমাত্য অথবা বণিক। আভিজাত্য, রাজতন্ত্রের বদ্ধদুয়ার উন্মোচিত করে প্রকরণে আপামর জনমানসের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়ে থাকে। ভবভূতি বিরচিত *মালতীমাধবম্* একটি প্রকরণ। এর কাহিনী কবি কল্পিত। গুণাঢ্য বিরচিত বৃহৎকথা এ জাতীয় একটি গল্পের কাঠামো এই কাহিনীর উৎস বলে ধারণা করা হয়। ভবভূতি দশ অঙ্কে বিস্তৃত এই প্রকরণে পাশাপাশি দু'টি কাহিনীকে যুক্ত করে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের ভাবাবেগ সঙ্কুল সমস্যা অবলম্বনে প্রকরণটি বিরচিত। এই প্রকরণের নায়ক মাধব ধীরপ্রশান্ত লক্ষণযুক্ত নিজে অমাত্য না হলেও অমাত্যপুত্র। নায়িকা উচ্চবংশসম্ভূতা। প্রধান রস শৃঙ্গার। অঙ্গরস বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুত কাহিনীকে প্রাঞ্জল করে তুলেছে। পদ্মাবতীনগরের রাজমন্ত্রী ভূরিবসুর একমাত্র কন্যা মালতী, আর বিদর্ভরাজ্যের অমাত্য দেবরাতের পুত্র মাধব। এদের পরস্পরের প্রণয় ও মিলনের কাহিনী নিয়ে রচিত সামাজিক রূপক *মালতীমাধব*। পদ্মাবতীশ্বরের নর্মসুহৃদ নন্দন রাজার কাছে মালতীকে প্রার্থনা করলেন। রাজা তাই ভূরিবসুকে তাঁর কন্যা মালতীকে নন্দনের হাতে সমর্পণের নির্দেশ দিলেন। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন ভিক্ষুণী কামন্দকী। কামন্দকী ও সৌদামিনী দুই যোগিনী তাঁদের শিষ্যদের নিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। এই মূল কাহিনীর সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাহিনীরূপে জুড়ে দেয়া হয়েছে মাধবের বন্ধু মকরন্দ ও মালতীর প্রিয় সখী মদয়ন্তিকার প্রেমকাহিনী। আবার মালতী ও মাধবের প্রেমবিকাশে আরও দু'টি অপ্রধান চরিত্র মালতীগৃহের পরিচারিকা মন্দারিকা ও মাধবের অনুচর কলহংসক। নাট্যকার তিনটি কাহিনীকে একত্র করে কাহিনী বিস্তৃত করেছেন। মদনোদ্যানে মাধব ও মালতীর মিলন হয় অবলোকিতার মাধ্যমে। মাধব জানতে পারেন মালতী অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা। মাধবের গাঁথা বকুলমালা নিয়ে মালতীর সখী লবঙ্গিকা ফিরে এল মালতীর কাছে। এমন সময় ভিক্ষুণী কামন্দকী মালতীর পিতা মালতীকে নন্দনের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এ সংবাদ জানিয়ে গেলেন। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে শিবমন্দিরে মালতী পৌঁছালেন। সেখানে উপস্থিত

মাধব। এমন সময় খবর এল নন্দনের বোন মদয়ন্তিকা বাঘের কবলে পড়েছে। মকরন্দ বীরবিক্রমে বাঘকে হত্যা করলেন। মকরন্দের বীরত্বে মুগ্ধ মদয়ন্তিকা। রাণীমার আদেশের মাধ্যমে কামন্দকী মালতীকে কৌশলে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কামন্দকী মাধবকে অন্তরালে জানিয়ে গেলেন যেভাবেই হোক দু'টি প্রাণের মিলন ঘটাবেন তিনি। মকরন্দকেও মদয়ন্তিকার সঙ্গে মিলনের বিষয়ে আশ্বস্ত করা হল।

ইতোমধ্যে এক কুমারী কন্যাকে বলি দিয়ে গুরু অঘোরঘণ্টের সাধনা সিদ্ধ করার প্রয়াসে কপালকুণ্ডলা মালতীকে প্রাসাদ থেকে তুলে আনে শ্মশানের মন্দিরে। শ্মশানে মাধব উপস্থিত হয়ে কাপালিকের করালগ্রাস থেকে মালতীকে উদ্ধার করে পাঠিয়ে দিলেন অমাত্যভবনে। মাধবের হাতে অঘোরঘণ্টের মৃত্যু হয়। নন্দনের সঙ্গে বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলে কামন্দকীর পরিকল্পনায় নগরদেবতার মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে পূঁজা দিতে লবঙ্গিকাকে সঙ্গে করে মালতীকে নিয়ে আসেন। কামন্দকী সেখানে মাধব আর মালতীর হাত একত্র করলেন এবং মন্দিরের পিছনে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার অপেক্ষায় থাকতে বললেন। মকরন্দ মালতীর বিয়ের সাজে সজ্জিত হয়ে নন্দনের বধূ হলেন। নকল মালতীর সাথে নন্দনের বিয়ে হল। বাসর রাতে নন্দনের ভবনে মালতীর সাথে মাধবের সাক্ষাৎ হল। নববধূর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নন্দন গৃহত্যাগী হলেন। বোন মদয়ন্তিকা মকরন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিশীথ রাতে বৌদ্ধমঠের দিকে অগ্রসর হলেন। ইতোমধ্যে মকরন্দের প্রতারণার বিষয়টি রাজবাড়িতে জানতে পারায় নগররক্ষীরা মকরন্দকে আক্রমণ করে। মাধব তা জানতে পেরে মকরন্দকে সাহায্য করার জন্য রওনা হন। সেই সুযোগে মালতীকে একা পেয়ে কপালকুণ্ডলা তাঁকে অপহরণ করে। এমন সময় মালতীকে হারিয়ে মাধব মৃতপ্রায়। কামন্দকীর সাবেক শিষ্যা সৌদামিনী মালতীকে উদ্ধার করেন। মালতী বেঁচে আছে, বকুলফুলের মালা মাধবের কাছে দিয়ে তিনি তার প্রমাণ দেন। পরে তাকে আত্মীয়-সজনদের কাছে ফিরিয়ে দেন। রাজাও মালতী ও মাধবের প্রেম জেনে নেন। পাশাপাশি রাজা মাধবের প্রিয়সখা মকরন্দের হাতে তুলে দিলেন মদয়ন্তিকাকে। এর মধ্য দিয়ে মাধব ও মালতী, মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মিলন সংঘটিত হয় প্রকরণটিতে।

মালতীমাধব প্রকরণের চরিত্রসমূহ:

মালতীমাধব প্রকরণটি ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত একটি প্রকরণ তথা সামাজিক রূপক। নানা চরিত্র ও নানা ঘটনা পরম্পরা কবির সুনিপুণ তুলিতে চিত্রায়তি হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

মাধব: মাধব *মালতীমাধব* প্রকরণের নায়ক। তিনি কুলীন, রূপবান, গুণবান, বিদ্বান, তরুণ, সাহসী, বন্ধুপ্রীতিশীল কৃতজ্ঞচিত্ত এবং সর্বোপরি একজন আদর্শ প্রেমিক। মাধব সুদর্শন, মদনদেবের মত তাঁর দেহকান্তি। প্রকরণের দ্বিতীয় অঙ্কে ভগবতী কামন্দকী তাঁর পিতৃপরিচয় দিয়েছেন। নিজে অমাত্য না হলেও অমাত্যপুত্র, বিদর্ভরাজের অমাত্য দেবরাতের পুত্র। রূপের সাথে সাথে মাধব বিদ্যারও শিরোমণি। তাই বিদ্যানুরাগী বলেই নিজ জন্মভূমিতে বিদ্যার্জন শেষে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পদ্মাবতীনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রকরণের প্রথম অঙ্কে তাঁর শিল্পপ্রতিভার ও কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মালতীর নিজ হাতে আঁকা ছবির পাশে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের ছবি এঁকেছেন এবং ঐ ছবির নিচে যা লিখেছেন-

"জগতি জয়িনস্তে তে ভাবা নবেন্দুকলাদয়ঃ
প্রকৃতিমধুরাঃ সন্ত্যেবান্যে মনো মদয়ন্তি যে।
মম তু যদিয়ং যাতা লোকে বিলোচনচন্দ্রিকা
নয়নবিষয়ং জন্মন্যেকঃ স এব মহোৎসবঃ ॥"[৭]

অর্থাৎ জগতে বিজয়া নূতন চাঁদের কলা প্রভৃতি স্বভাবত মধুর অন্য নানা পদার্থই আছে যারা মনকে মাতিয়ে তোলে, কিন্তু ভুবনে নেত্রজ্যোৎস্নাস্বরূপা এই রমণী যে আমার দৃষ্টিপথে এসেছেন তাই আমার জীবনের

একমাত্র মহা আনন্দের ব্যাপার। সুতরাং প্রকরণে স্বহস্তে নিজের ছবি অঙ্কন ও শ্লোক রচনার মাধ্যমে শিল্পদক্ষতা সহ মাধবের কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

মাধব একজন অকূতোভয় বীর পুরুষ। *মালতীমাধবম্* প্রকরণের 'শার্দূলবিদ্রাবণ' নামক তৃতীয় অঙ্কে তাঁর সে সাহসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। যখন ব্যাঘ্রকর্তৃক মদয়ন্তিকা আক্রান্ত হন মাধব বীরদর্পে তখনই অগ্রসর হন। আবার 'শ্মশানবর্ণন' নামক পঞ্চম অঙ্কে মাধব বামাচারী কাপালিক অঘোরঘণ্টের হাত থেকে মালতীকে উদ্ধার করেন। এতে অঘোরঘণ্টের সাথে মাধবের যুদ্ধ হয় এবং মাধবের হাতে অঘোরঘণ্ট নিহত হন। এছাড়াও প্রকরণের অষ্টম অঙ্কে মাধবের বীরত্বের বর্ণনা দিয়ে কলহংস বলেছেন: 'প্রভু মাধবের ভয়ঙ্কর বজ্রবাহুর কঠিন আঘাতে প্রতিপক্ষ সৈন্যদের বক্ষাস্থি চূর্ণ হয়ে গেল; কেউ কেউ আহত হয়ে পালাতে লাগলেন, তাঁদেরই কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্রের আঘাতে বাকি সৈন্যদের মৃত্যু হল। এভাবে রাজপথ আস্তে আস্তে শত্রুসৈন্যমুক্ত হয়ে গেল'।[৮]

মাধব বন্ধুবৎসল ও একজন আদর্শ প্রেমিক। প্রিয়সুহৃদ মকরন্দের জন্য তার অগাধ প্রীতি। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে একজন অন্যজনের সাথী। এই বন্ধুত্বকে মাধব কখনও ছোট করে দেখেন নি। মালতীর প্রতি মাধব-হৃদয়ের প্রেমানুরাগ যথেষ্ট গভীর। এই প্রকরণের নায়িকা মালতীকে প্রথম সন্দর্শনেই ভালোবেসেছেন নায়ক মাধব। 'মাধবের হৃদয়ে মালতী যেন প্রতিবিম্বত, যেন ক্ষোদিত, যেন বজ্রলেপ দিয়ে সংযোজিত হয়েছে'।[৯] মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* এর দুষ্যন্ত ও *বিক্রমোর্বশীয়ের* পুরুরবা এর সঙ্গে তুলনা করলে মাধব একজন আদর্শ প্রেমিক।[১০] মাধব বহু নারীতে আসক্ত ছিলেন না। মালতীর বিরহে তিনি হয়েছেন শ্মশানচারী আবার মালতীর প্রেমেই পুনরায় সংসারজীবনে প্রবেশের প্রবৃত্তি জেগেছে তাঁর মনে। কাপালিক অঘোর ঘন্টের হাত থেকে মালতীকে উদ্ধারকালে সংসারজীবনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করে মাধব বলেছেন: 'কেন তুমি সংসারকে সারহীন, জগৎকে রত্নহীন, মানুষকে আলোকহীন করতে প্রবৃত্ত হয়েছে? কেন তুমি বন্ধুহৃদয়কে মারতে চলেছ? কেন তুমি কন্দর্পকে দর্পহীন এবং লোকের নয়নমণিকে নিষ্ফল করে জগতকে জীর্ণ উদ্যানে পরিণত করতে চাইছ'?[১১] সংক্ষেপে বলা যায় মালতীমাধবের মাধব ত্যাগী, কৃতী, কুলীন, বুদ্ধিমান, শ্রীমান, রূপযৌবনোৎসাহী, দক্ষ, লোকপ্রিয়, বিদ্বান এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। মাধব প্রসঙ্গে M. R. Kale মহোদয় যথার্থই মন্তব্য করেছেন: "He falls a helpless victim to love at the very first right of Malati. He is not able to resist its influence at all even for a moment, though his extreme youth is some justification for this ....The only redeeming trait in his character is his deep love for Malati. It is the rich exhuberance of his passion, which continues to the last, that continues our sympathy for him."[১২]

মকরন্দ: *মালতীমাধবম্* প্রকরণের প্রধান নায়ক মাধবের আবাল্যসহচর। মকরন্দ এই প্রকরণের পার্শ্বনায়ক হলেও প্রকরণের অগ্রগতিতে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ। তৃতীয় অঙ্কে নগররক্ষীদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়লাভ, অষ্টম অঙ্কে হিংস্র বাঘের কবল থেকে মদয়ন্তিকাকে রক্ষা করা এসবই তাঁর শৌর্য ও সাহসের অকৃত্রিম নিদর্শন। শৈশবে, কৈশোরে ও তারুণ্যে মাধব ও মকরন্দ এক ও অভিন্ন হৃদয়। প্রকরণের প্রথম অঙ্কে বকুলবীথিতে মকরন্দ মাধবের কাছে মালতীকে দর্শনের পর মাধবের অনুভূতি কেমন জানতে চাইলে মাধব অনেকটা বিব্রতবোধ করেন। তাঁর জীবনের প্রথম প্রেমের অনুভূতির আস্বাদ শুরুতে বলতে পারছিলেন না। একটা পর্যায়ে সমস্ত জড়তাকে দূর করে, মাধব তাই মকরন্দের কাছেই নিজের প্রেমের অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন। মকরন্দের অনুরোধেই মালতীর আঁকা ছবির পাশে মাধব নিজ হাতে নিজের ছবি এঁকেছেন। নগরদেবতার মন্দিরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মকরন্দ বন্ধুত্বের প্রতিদান দিতে নকল মালতী সেজে মালতী ও মাধবকে নগরদেবতার মন্দির থেকে পালাতে সাহায্য করেছেন, নগররক্ষী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বীরদর্পে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। মালতীর অপহরণের পর বিরহে কাতর প্রিয়বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।[১৩]

মাধবের মৃত্যু অনিবার্য জেনে পরজন্মে একে অপরের সহচর হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মকরন্দ।[১৪] মাধবের অচেতন অবস্থায় মকরন্দ বিলাপ করে বলেছেন: 'তুমি ছিলে যেন আমার অঙ্গের চন্দনরস, যেন নয়নের শরচ্চন্দ্র ও হৃদয়ের আনন্দ- সেই আমারই প্রাণের তুল্য, নিয়তিশয় কমনীয় তোমাকে অকালেই হরণ করে যম আমাকেও নিহত করল'।[১৫] M. R. Kale তাই এই দুর্লভ বন্ধুপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ চরিত্রটির যথাযথ মূল্যায়ন করে মন্তব্য করেছেন: "He is thus a type of sincer friendly affection and chivalrous enterprising"[১৬]

মালতী: পদ্মাবতী নগরের অধিপতির অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা মালতী *মালতীমাধবম্* প্রকরণের প্রধান নায়িকা। রূপে, গুণে, বংশমর্যাদায়, সখ্যতায়, বিশুদ্ধপ্রেমে, আত্মসংযমে, সর্বোপরি সমাজসচেতনায় তিনি শীর্ষস্থানীয়া। অভিজাত বংশীয়া এই রমণী *রামায়ণের* সীতা ও *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* শকুন্তলার কাছে চরিত্রগরিমায় ও তুলনায় ম্লান। ভবভূতির মালতী চরিত্রচিত্রণে প্রকৃত উদ্দেশ্য আলোচ্য উদ্বৃটি থেকেই স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়: "His object was simply to depict her as a maiden in whom passion is just enkindled but which is restrained by a charming reserve and sweetend by girlish innonance to unite in one ideal picture purity of heart and intensity of passion, a high sense of family honour and diginty of manners."[১৭] সুদর্শনা মালতীকে বিধাতা সৌন্দর্যবিভূষিতা করে সৃষ্টি করেছেন।[১৮] রূপের সঙ্গে যোগ হয়েছে মালতীর গুণ। নিজ গৃহের সামনে দিয়ে গমনাগমনকারী মাধবকে দূর থেকে দেখে নিজের হাতে তিনি তাঁর ছবি এঁকেছেন, যা চিত্রশিল্পের প্রতি মালতীর দক্ষতা প্রমাণ করে। মালতী সাহিত্যরসিক, শিল্পকলায় পারদর্শী এবং বিদুষী সখী লবঙ্গিকার প্রতি সহানুভূতিশীল, অভিন্ন হৃদয়। ভগবতী কামন্দকীর কাছে তিনি শকুন্তা-প্রভৃতির গল্প শোনেন। গল্পগুলির ভাবার্থ তিনি উপলব্ধি করেন, আবার কখনও কখনও গল্পের সঙ্গে নিজের চিন্তাকে মিশিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকেন। মালতী একনিষ্ঠ প্রেমে বিশ্বাসী হলেও সামাজিক কর্তব্যচ্যুত নন, বরং সামাজিক কর্তব্যেই অধিক বলিয়ান। মালতী মাধবের সাথে মিলনে প্রত্যাশী হলেও তা সামাজিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে নয়। এছাড়াও প্রেমিক মাধবের গলায় নিজের অজান্তে মালা পরিয়ে দেয়ার বিষয়টি স্বজনেরা সানন্দে স্বীকারের জন্য অনুরোধ করলেও মালতী কন্যা পক্ষের এ ধরণের প্রস্তাব অশোভন ও অসঙ্গত বলে মনে করেছেন।[১৯] কামবাণে জর্জরিত হয়েও পিতামাতার অনুমতি ছাড়া প্রণয় পরিণয়ে সে সম্মত নয়। তাই মালতী বলেছেন: 'সখি দয়িতমালতীজীবিতে সাহসোপন্যাসিনি অপেহি'।[২০] সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন বলেই মালতী মাধবের সঙ্গে পালিয়ে যাননি। সত্যিই মালতী চরিত্র ভবভূতির এক অনুপম সৃষ্টি। প্রকরণটির শেষ চারটি অঙ্কে জীবনের বিপর্যয়ের সময়টিতেই চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[২১]

মদয়ন্তিকা: মদয়ন্তিকা পদ্মাবতীশ্বরের নর্মসচিব নন্দনের ভগিনী, নায়িকা মালতীর আবাল্যসহচরী মাধবের বন্ধু মকরন্দের প্রণয়িনী। নায়ক-নায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে অপূর্ব কৌশলে মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে দু'টি প্রেমের কাহিনী। 'শার্দূলবিদ্রাবণ' শীর্ষক তৃতীয় অঙ্কে নেপথ্যে কোলাহল থেকে জানা যায় এক বাঘ খাঁচা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। আর নন্দনের বোন মদয়ন্তিকা সে ভয়াল বাঘের কবলে পড়েছেন। বুদ্ধরক্ষিতা তাই বলে চলেছেন: 'আমত্যনন্দনের বোন মদয়ন্তিকা দুষ্ট বাঘের কবলে পড়েছে। তাঁকে রক্ষা রক্ষা করুণ'।[২২] মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে রক্ষা করলেন। আহত মকরন্দ এলিয়ে পড়লেন মদয়ন্তিকার গায়ে। মকরন্দ মদয়ন্তিকার স্পর্শসুখে রোমাঞ্চিত হলেন এবং প্রেমানুভূতি প্রগাঢ় হল। আকস্মিক এই সাক্ষাতে ভীত, সন্ত্রস্ত মদয়ন্তিকার আলিঙ্গন মকরন্দকেও আকুল করে তোলে, দৃঢ় প্রণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় দু'টি হৃদয়। মদয়ন্তিকা লবঙ্গিকাকে বলেছেন: 'যমে যখন তাঁর প্রাণ নিতে উদ্যত তখন মকরন্দই তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে এনে পরম উপকার করেছেন। তাঁর কথা মনে পড়লে তাঁর সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। সেই মহানুভব কেবলমাত্র মদয়ন্তিকার জন্যই তাঁর অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন'।[২৩] অতএব মদয়ন্তিকা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। মদয়ন্তিকা প্রিয়সখী লবঙ্গিকার কাছে অকপটে স্বীকার

করেছেন: 'মকরন্দকে পাওয়ার আশা ত্যাগ করা মাত্রই মৃত্যুতে শান্তিলাভই তাঁর একমাত্র কামনা ছিল। কিন্তু বুদ্ধরক্ষিতার দেয়া আশ্বাস তাঁর মনে ভাবাবেগ বাড়িয়ে দেয়ায় তাঁর চিত্ত এখন দোদুল্যমান। তিনি এখন জীবনের একটা পরিবর্তন অনুভব করছেন'।[২৪]

মদয়ন্তিকা মকরন্দের জন্য ঐকান্তিক অনুরাগ, প্রাণরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ, প্রিয়সখী মালতীর জন্য ভালবাসাসত্ত্বেও ভ্রাতৃবধূ হিসেবে ও পত্নীরূপে স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ সম্পর্কে তাঁকে সদুপদেশ দেয়া, মকরন্দকে নিয়ে মধুর কৌতুকালাপ, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার কাছে গোপন প্রণয়াসক্তির স্বীকারোক্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যকলাপের মধ্যেই মদয়ন্তিকার ব্যক্তিত্ব ও নারীসুলভ প্রণয়িনীর চরিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। মালতীর পাশে মদয়ন্তিকা তাই কেবল সখী নয়, ভগিনীরূপেই চিত্রিতা। মালতী তাঁর প্রেমপ্রকাশে সঙ্কুচিতা, পরিজন, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন পক্ষান্তরে প্রিয়সখী হয়েও মদয়ন্তিকার আচার, প্রকাশভঙ্গীও প্রেমানুভূতি ভিন্ন ধরণের, বিচিত্র আঙ্গিকে প্রতিফলিত।

কামন্দকী: *মালতীমাধব* প্রকরণে পদ্মাবতীনগরে অবস্থিত বৌদ্ধমঠের প্রধান অধ্যক্ষা ভগবতী কামন্দকী। সন্ন্যাসিনী বিদুষী এই নারী উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েও রাজানুগত্যে কোন পদমর্যাদার অভিলাষী নন। অমাত্য ভূরিবসুর প্রতিধি, একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর মতই কামন্দকী এই প্রকরণে কাহিনীর সূত্র ধারণ করেছেন। ভূরিবসুও দেবরাতের পুত্রকন্যার হিতসাধনে কামন্দকী সদাতৎপর। বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী হলেও নরনারীর স্বাভাবিক প্রেম ও ভালোবাসার প্রতি তাঁর ছিল সহমর্মিতা ও বাস্তববোধ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিবিদের মতই কামন্দকী সমগ্র দৃশ্যপটের চিত্রাঙ্কন করেছেন। তাঁর নিজের মুখেই তাই শুনি 'অত্যুদারপ্রকৃতির্মালতী বিধাতুর্ব্যাপারঃ ফলতু চ মনোজ্ঞশ্চ ভবতু'।[২৫] জ্ঞান অর্জনের প্রতি কামন্দকীর রয়েছে বিশেষ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়। দেবরাত ও ভূরিবসু ছিলেন কামন্দকীর সহপাঠী। উপযুক্ত যোগ্যতা বলে দেবরাত বিদর্ভরাজ্যের এবং ভূরিবসু পদ্মাবতীনগরের অমাত্য পদে আসীন হয়েছেন। কামন্দকীর শাস্ত্রের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি এবং শাস্ত্রচর্চার ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্রনীতির জটিল বিষয়, অথবা খলচরিত্রের কুটনীতির প্রয়োগ তিনি নিতান্ত স্বাভাবিক ও সহজে বুঝতে পারেন। তিনি বহু গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাজ-আধিকারিকের পদ অলংকৃত না করে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি নিষ্ঠাশীলা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী কামন্দকী বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কামন্দকী মালতীর মাতৃতুল্য। মকরন্দ তাই যথার্থই বলেছেন: 'মালতী মালতীতি মোদতে ভগবতী কামন্দকী'।[২৬] বৌদ্ধমঠের পরিব্রাজিকা হয়েও নর-নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সংসারধর্মের, সুখ ও জীবনের প্রতি অকৃত্রিম আর্কষণ বোধ কামন্দকীর কাছ থেকেই দর্শকশ্রোতা শিক্ষালাভ করেন।

নন্দন: পদ্মাবতীশ্বরের নর্মসহচর নন্দন। 'স্যান্নর্মসচিবঃ সোয়ং কুপিতস্ত্রী প্রসাধকঃ'।[২৭] নন্দন অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা মালতীর প্রতি অনুরক্ত। তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য ভূরিবসুকে নন্দনের হাতে মালতীকে সম্প্রদানের জন্য রাজার প্রস্তাবে ভূরিবসু সম্মতি দিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে মাধবের প্রতি মালতী অনুরক্তা অথচ অবলোকিতা কামন্দকীকে মন্ত্রী ভূরিবসু নিজে কেন মালতীকে মাধবের হাতে অর্পণ করছেন না। আর কেন-ই বা কামন্দকীকে দিয়ে গোপন বিবাহ ঘটাতে অনুরাগ করছেন এই প্রশ্ন করলে উত্তরে কামন্দকী জানান রাজার নর্মসুহৃৎ নন্দন রাজাকে দিয়ে মালতীকে প্রার্থনা করেছেন। সরাসরি প্রত্যাখ্যান অসন্তোষের কারণ হবে তাই এই উপায় অবলম্বন করা।[২৮] মালতীকে নন্দনের হাতে সম্প্রদান করতে রাজী হওয়ায় সকলে অমাত্যের নিন্দা করেছেন। মন্ত্রীকন্যার সম্মতি বা অনুরাগের অপেক্ষা না করেই নন্দন বিবাহে উৎসুক। নন্দনের কামার্ত চরিত্রই এখানে প্রতিফলিত। ষষ্ঠ অঙ্কের শেষে মকরন্দ মালতী সেজে মাধবকে আলিঙ্গন করেন ও বলেন: 'বয়স্য মালতী হয়েছি'।[২৯] মাধবও পরিহাসচ্ছলে বলেছেন: 'এই মালতীকে যে পাবে সে নন্দন সত্যিই পুণ্যবান'।[৩০] নন্দন নবপরিণীতা বধূর পায়ে পড়ে তার অভিলাষপূরণের প্রার্থনা জানিয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এক পর্যায়ে দুঃখে উন্মত্ত হয়ে কুমারী অবস্থাতেই তুমি অসতী হয়েছে, তাই এখন আর তোমাতে আমার প্রয়োজন নেই বলে তিরস্কার করে বাসভবন থেকে বাইরে চলে যান।[৩১] নন্দনের

হাতে পিতা মালতীকে সমর্পণে ইচ্ছুক জেনে মালতী যথার্থই বলেছেন: 'বাবা আমাকে রাজার হাতে উপহার করে তুলে দিলেন? মালতীর চেয়ে রাজাকে তুষ্ট করাই বাবার কাছে বড় হল। সবদিক থেকে ভোগলালসারই জয় হল'।[৩২] নন্দনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে ভবভূতি নাটকীয় কাহিনীকে অন্যভাবে উপস্থাপিত করে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস নিয়েছেন। তাই নন্দন সত্যিই দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তাকর্ষক।

কলহংসক: *মালতীমাধব* প্রকরণের নায়ক মাধবের পরিচালক কলহংসক। কলহংসক মাধবের মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন নিশ্চয়ই কেউ একে খুবই টেনেছেন। তিনি কি তবে মালতী? মকরন্দকে মাধবের প্রতিকৃতি অঙ্কিত চিত্রফলক দেখিয়েছেন। মকরন্দের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: 'যিনি মাধবের হৃদয় হরণ করেছেন তিনিই প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন।' মন্দারিকার কাছে সে চিত্রফলক পেয়েছেন। 'কলহংসকের উৎকণ্ঠা বিনোদনের জন্যই প্রয়োজন'[৩৩] এই উক্তি থেকেও কলহংসকের বাস্তববুদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে। ষষ্ঠ অঙ্কে বিষ্কম্ভকের শেষে কলহংসের পদার্পণ। মালতীর বিয়ের আনুষ্ঠানিক মঙ্গল আচরণ ও বিঘ্ন শান্তির জন্য মালতী নগরদেবতার মন্দিরের দিকে যাত্রা করেছেন এ খবর প্রভুকে দেয়ার জন্য সে উৎফুল্ল। কলহংসক তাই বলছেন: 'আজ্ঞপ্তোস্মি নগরদবেতাগর্ভগৃহ স্থিতেন মকরন্দেন নাথমাধবেন যথা জানীহি তাবদ্যাত্রাভিমুখং প্রবৃত্তা মালতী ন বেতি। তদাবদেনমানন্দয়িষ্যামি'।[৩৪] মালতীর যাত্রাপথের এক অনবদ্য কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন কলহংসক। যেমন কলহংসক বলেছেন: 'দেখা যাচ্ছে রমণীদের যাদের সোনার কিঙ্কিনীগুলো বেজে উঠে ঝনঝন শব্দে ঝঙ্কার তুলছে- তাদের উপরে বসে আছে বারাঙ্গনার দল'।[৩৫] মাধব ও মালতীর পরস্পরের অনুরাগ প্রকাশের সময় লবঙ্গিকার উক্তিতে কলহংসক বলেছেন: 'আহা মরি! কী সরস আর রমণীয় ঘটনাপরম্পরা'।[৩৬] মালতীগৃহের পরিচারিকা মন্দারিকার সঙ্গে কলহংসক প্রেমপাশে আবদ্ধ। মাধব মালতীর মিলনের কল্যাণের আভাসে কলহংসক উৎফুল্ল হয়ে বলেছেন: 'কী সৌভাগ্য এটাও তবে আমাদের হবে'।[৩৭] কলহংসক প্রভুর সৌভাগ্যে আনন্দিত। কলহংসক হাস্যরসিক ও প্রেমানুরাগী। মন্দারিকা কলহংসককে মালতীর ছবি আঁকা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করলে কলহংসক প্রণয়িনী মন্দারিকাকে উপহাসচ্ছলে মালতীর ছবি মাধব এঁকেছেন বলে জানায়। মালতীর প্রতি মাধবের প্রগাঢ় প্রণয়াসক্তি যাতে মিলনান্তক হয় সে-বিষয়ে কলহংসক অত্যন্ত সতর্ক। পরিচারক হয়েও যথাসময়ে যথাবিহিত পদক্ষেপগ্রহণে তিনি ছিলেন নিপুণ।

অঘোরঘণ্ট: বামাচারী কাপালিক। প্রথম অংকে অবলোকিতা নামে কামন্দকীর শিষ্যার কাছ থেকে প্রথম জানা যায় অঘোরঘণ্ট নামে এক কাপালিক সাধক শ্রীপর্বত থেকে এসে শ্মশানের কাছেই বনে বাস করেন। তন্ত্রসাধনায় নরবলিদানেও এই কাপালিক কুণ্ঠিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের '*কপালকুণ্ডলা*' উপন্যাসের কাপালিকের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক সাদৃশ্য রয়েছে। সাধনায় সিদ্ধির জন্য তিনি শিষ্যা কপালকুণ্ডলাকে কুমারীকন্যা সংগ্রহে পাঠান। পঞ্চম অঙ্কে 'করালা'র মন্দিরে দেবতার পূজায় ব্যাঘ্র কপালকুণ্ডলা ও অঘোরঘণ্টের সঙ্গে বধ্যের সাজে মালতীকে দেখেন মাধব। আর অঘোরঘণ্ট দেবী চামুণ্ডার বন্দনা করেন এবং অভীষ্টসিদ্ধির জন্য খড়্গ উত্তোলন করে মালতীকে হত্যা করতে উদ্যত হন ও বলেন: 'যা হয় হোক, মন্ত্রসাধনের প্রারম্ভে যা দেবো বলে সংকল্প করেছিলাম, সেই পূজো নিয়ে এসেছি, তুমি গ্রহণ করো'।[৩৮] এমন সময়ে মাধব উপস্থিত হয়ে 'কাপালিকাধম', তোমারই মরণ উপস্থিত বলে সে স্থলে উত্তেজিত হলে অঘোরঘণ্ট চীৎকার করে বলতে থাকেন 'ওরে বামুনের ছেলে তোকে দিয়েই আমি জগৎজননীকে সন্তুষ্ট করব'।[৩৯] ইতোমধ্যে মালতীর অন্বেষণে সেনারা উপস্থিত হয়ে 'করালা'র মন্দিরের দিকে আসছে দেখে মাধব এদের সামনেই কাপালিককে হত্যা করবেন বলে স্থির করেন। সেনাদের দেখে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তান্ত্রিকসাধনায় বলীয়ান অঘোরঘণ্ট বলে উঠেছেন: 'এখনি পৌরুষ প্রকাশের বিশেষ অবসর'।[৪০] নারীহত্যায়ও কুণ্ঠাবোধ করে না অঘোরঘণ্ট। মাধব এসে মালতীকে উদ্ধার না করলে অঘোরঘণ্টের হাতেই প্রাণ যেত মালতীর। অঘোরঘণ্টের আধ্যাত্মিক শক্তির জন্যই কপালকুণ্ডলার অগাধ ভক্তি গুরুর প্রতি। তান্ত্রিক অঘোরঘণ্ট নাট্যকারের এক নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির চিত্রায়ণ।

দেবরাত: বিদর্ভরাজের মন্ত্রী। প্রকরণের নায়ক মাধবের পিতা। প্রকরণটির প্রস্তাবনা অংশের পর পরই ভিক্ষুব্রতধারিণীর কামন্দকীর মুখে অমাত্য দেবরাতের সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর ভাষ্য অনুসারে দেবরাত, ভূরিবসু ও কামন্দকী সতীর্থ। বিদ্যালাভের জন্যই তাঁরা একত্র হয়েছিলেন। মাধবকে লবঙ্গিকার প্রশ্নের উত্তরে কামন্দকী বলেছেন: 'দেবরাত নামে বিদর্ভরাজের এক অমাত্য আছেন। সেরা সেরা সব মন্ত্রীর তিনি চূড়ামণি, সমগ্র ভুবনে বরণীয় পূণ্যমহিমামণ্ডিত পিতার তিনি সতীর্থ। এদের মত পুরুষ জগতে খুব অল্পই জন্মে থাকে'।[৪১] কামন্দকী শিষ্যা সৌদামিনীর সামনে অমাত্য ভূরিবসু ও দেবরাত উভয়ের সন্তানদের পরস্পরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করেন।[৪২] দেবরাত ও ভূরিবসু বিদ্যালাভের জন্য একত্র হয়েছেন, এ থেকে বোঝা যায় তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং সম্ভ্রান্তবংশজাত ছিলেন। দেবরাত ন্যায়শাস্ত্র পাঠের জন্য পুত্রকে পদ্মাবতীনগরে পাঠিয়েছিলেন। পঞ্চম অঙ্কে মাধব শ্মশানের ভৌতিক দৃশ্যে ভীত হয়ে পিতার কথা স্মরণ করে বলেছেন: 'হায় নিষ্করুণ পিতা ! যাকে দিয়ে আপনি রাজার মন তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন সে তো এখন মরতে বসেছে'।[৪৩]

ভূরিবসু: পদ্মাবতীশ্বরের মন্ত্রী। মালতীর পিতা। প্রকরণের দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয়া চেটীর মুখে পদ্মাবতীশ্বর নর্মসচিব নন্দনের অভিলাষ পূরণের জন্য ভর্তৃদারিকাকে প্রার্থনা করেছেন। এই মর্মে অমাত্য তাঁকে জানিয়েছেন। ভগবতী কামন্দকীর কথায় দেবরাত, ভূরিবসু ও কামন্দকী বিদ্যা- শিক্ষার্থে একত্র হয়েছিলেন একথা জানা যায়। লবঙ্গিকা মালতীর ধাত্রীকন্যা। তিনি মালতীর পিতা ভূরিবসুর কন্যাকে নন্দনের হাতে সমর্পণের সিদ্ধান্তেও মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণের বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন।[৪৪] মালতী পিতাকে উদ্দেশ্যে করে বলেছে বাবার নিষ্করুণ ব্যবহার প্রমাণ করেছে যে তাঁর স্বভাব কাপালিকের মত। এছাড়াও পিতাকে উদ্দেশ্য করে খেদোক্তিও করেছেন: 'এ কীরকম হল? বাবা আমাকে রাজার হাতে উপহার করে তুলে দিলেন।[৪৫] মালতী সংজ্ঞাহীন জেনে মন্ত্রী ভূরিবসু, নন্দনের সঙ্গে রাজা তাঁর পায়ে নত হলেও তাঁদের উপেক্ষা করে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছিলেন, পরবর্তীতে তা থেকে নিবৃত্ত হন। মালতীও চৈতন্যলাভ করে পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: 'হায় পিতা ! আপনি বিরত হোন। আমি আপনার মুখপদ্ম দেখার জন্য সুমুৎসুক। আপনি আমার জন্য দেহবিসর্জন করছেন। হীন আমি আপনাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করেছিলাম।[৪৬] কন্যার সুখ, বন্ধুকে দেয়া প্রতিশ্রুতির দিকে দৃক্‌পাত না করে ভূরিবসু রাজসন্তোষে আত্মসুখ বিসর্জন করেছেন। কন্যার প্রতি মমত্ববোধে পরবর্তীতে প্রাণত্যাগের উদ্যোগেও দ্বিধাবোধ করেননি।

দ্বারপাল: দ্বারপাল-এরা দ্বারের অতন্দ্রপ্রহরী, প্রভূর আত্মরক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে নাটকে কাজ করে থাকে। ভগবতী কামন্দকীর নির্দেশমত অমাত্য ভূরিবসুর পত্নী আদেশ করেছিলেন মালতীর বিয়ের আভরণাদি নিয়ে অনুচরেরা না আসা পর্যন্ত সকলকেই নগরদেবতার মন্দিরে অপেক্ষা করতে হবে। ইত্যবসরে কপালকুণ্ডলা মালতীর বিয়ের কাজে ব্যস্ত দ্বারপালের দলের কাছ থেকে অন্যত্র সরে গিয়ে মালতীকে অপহরণের চেষ্টা করবে বলে ঠিক করে। এই দ্বারপালের দল উজ্জ্বল সোনা আর রূপোর পাতে মোড়া নক্সা কাটা বেতের লাঠি নিচু করে রেখা টেনে জায়গা ঘিরে দিয়ে পরিজনদের অপেক্ষা করতে বলে।

কপালকুণ্ডলা: তান্ত্রিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা। পঞ্চম অঙ্কের শুরুতেই কপালকুণ্ডলার প্রবেশ। প্রথমেই কপালকুণ্ডলা শক্তিনাথের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়েছেন। প্রাণায়াম করায় নাড়িসমূহ বায়ুপূরণের ফলে পঞ্চ মহাভূতকে আকর্ষণ করে আকাশে উঠতে কপালকুণ্ডলা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। শ্মশানভূমিতে করালাদেবীর মন্দিরে গুরু অঘোরঘণ্টের কাছে উপস্থিত হয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করে দেবীর সম্মুখে বলি দিতে হবে। এরপর মাধবকে দেখে মাধবের দেহাবয়বের প্রশংসা করে নিজের কাজে মনোনিবেশ করে কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলার মুখে সায়ংসন্ধ্যার বর্ণনাও অনুপম। কপালকুণ্ডলার সান্ধ্যকালীন অন্ধকারের ও রাত্রির বর্ণনা থেকে তাকে বর্ণনা নিপুণ বললে অত্যুক্তি হয় না। 'রাশি রাশি তমালের স্তবকের মত তরল অন্ধকার লতার মত হয়ে আকাশের প্রান্তদেশ ঢেকে ফেলেছে, ধরিত্রী তার প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ

যেন এক অভিনব জলে ডুবে যাচ্ছে'।[৪৭] ক্রুদ্ধ হয়ে গুরুহত্যার প্রতিশোধ নিতে কপালকুণ্ডলা নিজেই বলেন গুরুতর আঘাত করলেও নারী বলে আমাকে অবহেলা করার শাস্তি মাধব পাবেন। 'সাপের সঙ্গে যার শত্রুতা তার শান্তি কোথায়'?[৪৮] কপালকুণ্ডলা নারী হয়েও নারীহননে সাহায্যকারী। তান্ত্রিক অঘোরঘণ্টের প্রতি তাঁর অগাধশ্রদ্ধা। মাধব অঘোরঘণ্টের হত্যাকারী তাই গুরুভক্তিতে কপালকুণ্ডলা প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মাদ। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যা কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক অঘোরঘণ্টের মতই নাট্যকারের প্রতিহিংসার প্রতিমূর্তি এক অদ্ভূত চরিত্রায়ণ।

লবঙ্গিকা: মালতীর ধাত্রীকন্যা, আবাল্যসহচরী। প্রাসাদের জানালা দিয়ে মালতী মাধবকে দেখতে পান। মনের উৎকণ্ঠা নিরসনে মালতী মাধবের প্রতিকৃতি আঁকেন। 'লবঙ্গিকার সকলকে আশ্বাস দেয়াই অভ্যাস, মালতী' নিজেই এই উক্তি করেন।[৪৯] চিত্রফলকটি প্রথমে লবঙ্গিকাই মন্দারিকাকে দেয়। মন্দারিকা দেয় তার প্রিয়পাত্র কলহংসককে। মাধব ও মালতীর অনুরাগের সূচনা হয় এই চিত্রফলকের মাধ্যমে। সজ্জনসমাগম দর্শন সময়ে সুখ দেয় কিন্তু অদর্শনে দুঃখ অসহ্য হয়ে ওঠে[৫০] লবঙ্গিকার এই উক্তি তাঁর বাক্চাতুর্যের ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। লবঙ্গিকা মালতীকে অঙ্গরাগ আর ফুলমালা দিয়ে বিয়ের সাজে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। মাধবকে মঙ্গলসূত্রবাধা হাতখানি গ্রহণে অনুরোধ করেছেন। মালতী লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করে বলেছেন: 'প্রিয়সখী! লবঙ্গিকা, তুমিই আমার প্রকৃত ভগিনী। তোমার প্রিয়সখী এই আমি এখন অনাথা ও মরণে উদ্যতা- জন্ম থেকে আরম্ভ করে তুমি একটানা আমার উপকার করে চলেছ'।[৫১] দশম অঙ্কে কপালকুণ্ডলা মালতীকে অপহরণের পর যখন তার সন্ধান না পেয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন কামন্দকী বলেছেন: 'লবঙ্গিকা জন্ম থেকেই তোমার ভালোবাসার পাত্রী, সে প্রাণত্যাগ করতে চলেছে, সে বেচারার উপর তোমার দয়া হয় না'।[৫২] আবাল্যসহচরী মন্ত্রিকন্যার বিরহে ধাত্রীকন্যার আত্মত্যাগের সিদ্ধান্ত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় আবাল্য সাহচর্য, অকৃত্রিম অনুরাগের বশেই লবঙ্গিকা প্রকরণটির প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান।

অবলোকিতা: ভগবতী কামন্দকীর শিষ্যা, পরিচারিকা, সৌদামিনীর প্রিয়সখী। প্রকরণটির প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধার কামন্দকী সাজে ও নট অবলোকিতা সাজে চরিত্রের খসড়া অভিনয় করে। এরপর রক্তবর্ণ পরিচ্ছেদে কামন্দকী ও অবলোকিতার পুনঃপ্রবেশ। কামন্দকীর নির্দেশমত মাধবকে ভূরিবসুর বাড়ির কাছে রাজপথে চলাফেরা করতে, মদনমহোৎসবে যোগ দিতে প্রেরণা জাগান এই অবলোকিতা। সৌদামিনীর মন্ত্রসিদ্ধিলাভ করে শ্রীপর্বতে কাপালিকের ব্রত ধারণ করার সংবাদও জানায় অবলোকিতা। মাধবের বন্ধু মকরন্দ নন্দনের বোন মদয়ন্তিকাকে বিবাহ করলে সেটিও মাধবকে আনন্দ দেয়ার মত একটি উদ্যোগ এ উপলব্ধিও অবলোকিতার। অঘোরঘণ্ট এবং কপালকুণ্ডলার গতিবিধিও জানা ছিল অবলোকিতার। অবলোকিতা মালতীকে মাধবের জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্ত হলেও স্বয়ং এগিয়ে না যাওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেন। মাধব তাই যথার্থই বলেছেন: 'ভগবতীর প্রধান শিষ্যার (অবলোকিতার) নিপুণতা সর্বতোমুখী আর সুভাষিতের রত্নভাণ্ডারও অক্ষয়'।[৫৩] অবলোকিতা কামন্দকীর শিষ্যা তাই তাঁর পরিকল্পনামতই মাধব ও মালতীর মিলনে সর্বান্তঃকরণে সক্রিয় ভূমিকাপালনে তৎপর থেকে নাট্যকাহিনীর মূল উদ্দেশ্যসাধনে গৌণ হয়েও মুখ্যভূমিকা পালন করেছেন।

মন্দারিকা: কলহংসকের প্রণয়িনী। বৌদ্ধমঠের সেবিকা। প্রথম মন্দারিকার প্রবেশ। মাধবের পরিচারক কলহংসকের কাছে মাধবের ছবি আঁকা চিত্রফলকটি প্রার্থনা করেন। কলহংসকের দেয়া চিত্রফলকটি দেখে মাধবের পাশে মালতীর ছবি কে এঁকেছে বিস্মিত হয়ে মন্দারিকা এ প্রশ্ন করেন। মাধবই সে ছবি এঁকেছেন জেনে মন্দারিকা বলেন প্রজাপতির অলৌকিক জ্ঞান তার ফল দেখিয়েছে।[৫৪] মালতী মাধবকে জানালা দিয়ে দেখেই তাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছেন বলে মকরন্দকে জানান ও সম্মতি নিয়ে সে স্থল ত্যাগ করেন।

বুদ্ধরক্ষিতাঃ কামন্দকীর শিষ্যা মালতীর সখী। তৃতীয় অঙ্কে বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ। বুদ্ধরক্ষিতা সর্বতোভাবে মালতী, মাধব, মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার প্রেমকাহিনীকে পূর্ণাঙ্গতা দানে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কার্যকলাপে ধৈর্য, স্থৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটেছে। বুদ্ধরক্ষিতা তাই প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি।

সৌদামিনীঃ কামন্দকীশিষ্যা, অদৃশ্য যোগিনী, যৌগিক ক্রিয়ায় পারদর্শিনী। কামন্দকীর মত সৌদামিনীও দেবরাত ও ভূরিবসুর সতীর্থ ছিলেন। শ্রীপর্বত থেকে উড়ে পদ্মাবতীনগরে অবস্থান করছেন। পদ্মাবতীনগরের সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন সৌদামিনী। সৌদামিনীর বর্ণনায় সিন্ধু, পারা ও লবণানদী, সুবর্ণ বিন্দু চিত্রায়িত হয়েছে।[৫৫] পদ্মাবতীনগরের অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনা থেকেই সৌদামিনীর কাব্যিক সত্তা পরিস্ফুট হয়েছে। মাধব সংজ্ঞাহীন মালতী বিহনে। মাধবের দুঃসহ অবস্থা দেখে বন্ধুপ্রবর মকরন্দ পাটলা নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত। এসময়েই সৌদামিনীর প্রবেশ। সৌদামিনী মকরন্দের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন আমি এক যোগিনী মালতীর অভিজ্ঞান নিয়ে এসেছি বলে বকুলমালা দেখান ও মকরন্দকে অত্মহননে নিবৃত্ত করেন। মালতী জীবিত এ সম্পর্কে সৌদামিনীর কাছেই মকরন্দ জানতে পারেন। মাধব সংজ্ঞাহীন জেনে মাধবের অঞ্জলিতে বকুলমালা নিক্ষেপ করেন সৌদামিনী। গুরুহত্যার প্রতিশোধে মালতীকে যখন কপালকুণ্ডলা অপহরণ করে হত্যা করতে উদ্যত সে দু:সময়ে সৌদামিনী মালতীকে উদ্ধার করেন এবং শ্রীপর্বতে তুলে নিয়ে যান সৌদামিনী। সৌদামিনী পদ্মাবতীশ্বরের পত্র কামন্দকীর হাতে তুলে দিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। সার্বিক বিবেচনায় সৌদামিনী বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী হয়েও গুরু কামন্দকীর প্রতি ভক্তিনম্রচিত্তে তাঁর পরিকল্পনাকে সফল করতে আত্মনিয়োগ করেছেন।

প্রতীহারীঃ *মলতীমাধব* প্রকরণের দ্বারপালিকা। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রতীহারীর প্রথম প্রবেশ। প্রতীহারী ভগবতী কামন্দকী ভর্তৃদারিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় এসেছেন এই সংবাদ জানান। প্রতীহারী অন্ত:পুরে বিচরণ করতেন। যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজা বা অন্ত:পুরচারিণীদের নিবেদন করায় নাটকীয় ফলপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটত না। ষষ্ঠ অঙ্কে এই প্রতীহারী মালতীর বিয়ের সাজের উপকরণ নিয়ে এসে কামন্দকীর হাতে তুলে দেন এবং বলেন অমাত্য ঠিক কথাই বলেছেন: 'মহারাজের পাঠানো এই বিবাহ-বেশে মালতীকে সাজাতে হবে'।[৫৬] স্থানটি মঙ্গলকাজের উপযুক্তই বটে। কামন্দকীও প্রত্যুত্তরে সন্তোষ প্রকাশ করে এই কথাই বলেছেন।

চেটীঃ চেটীর লক্ষণ নিয়ে ভরত বলেছেন: 'চেট হবে কলহপ্রিয়, কুৎসিত, দাসরূপে সেবাকারী, সম্মাননীয় ও অসম্মাননীয় ব্যক্তির মধ্যে প্রভেদজ্ঞ'।[৫৭] এই বৈশিষ্ট্যসমন্বিতা নারী চরিত্রই চেটী। প্রকরণের দ্বিতীয় অঙ্কে দুজন চেটীর প্রবেশ। প্রথমা চেটী কাছ থেকে জানা যায়- মালতী নিশ্চয়ই মহানুভব মাধবের চিন্তায় মগ্ন রয়েছেন। দ্বিতীয়া চেটীর মুখেই জানা যায়- নন্দনের জন্য মহারাজ ভর্তৃদারিকাকে প্রার্থনা করলে অমাত্য 'মহারাজ নিজ কন্যাদের প্রভু'[৫৮] এই কথা জানান। মাধবের প্রতি মালতীর অনুরাগ, লবঙ্গিকাকে মালতীর আনন্দবেদনার অংশীদার করা, অমাত্য ভূরিবসুর ভর্তৃদারিকাকে নন্দনের হাতে সমর্পণ ব্যাপারে মহারাজকে কন্যাদের প্রভু বলে মতপ্রকাশ করায় তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। সামান্য পরিচারিকা হয়েও নারী হিসেবে অন্য নারীর জন্য মমত্ববোধ, নারীর সম্মানবোধ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তারা।

ব্যতিক্রমধর্মীতার মূল্যায়নঃ স্বকল্পিত কাহিনী অবলম্বনে ভবভূতির রচিত *মালতীমাধব* প্রকরণটি নানা দিক থেকেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এই প্রকরণের অঙ্গবৃদ্ধি করতে গিয়ে ভবভূতি কাহিনীকে একটু বেশি বিস্তৃত করেছেন বলে অনেকের ধারণা। উপকাহিনীর সাহায্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে মূল কাহিনীর মূল্যবৃদ্ধিতে তিনি সচেতন ছিলেন। পরিমিতি বোধের অভাবে নাটকটি দীর্ঘায়িত হয়েছে। অষ্টম অঙ্কেই নাটকের সার্থক পরিণতি দেখানো যেত সেখানে অনর্থক আরো দু'টি অঙ্ক যোজনা করা হয়েছে। নাটকের আরও একটি ত্রুটি লক্ষনীয়। নাট্যকার মাঝে মাঝে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন যে নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ন করে

কবিপ্রকৃতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নাটকীয় গতি ও যথাযুক্ততার অভাব সত্ত্বেও মালতীমাধব সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র ও খাঁটি কবিত্বের নিদর্শন হিসেবে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। মূল কাহিনীতে নায়ক-নায়িকার চরিত্র অনেকটা গতানুগতিক হলেও মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার চরিত্রচিত্রণে কবি তাঁদের কল্যাণময় রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। *মালতীমাধবের* শেষ অঙ্কে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী কামন্দকী বলেছেন: 'অস্তি বা কুতশ্চিদেবংভূতমদ্ভুতং বিচিত্ররমণীয়োজ্জ্বলং প্রকরণম্'[৫৯] অর্থাৎ এত অদ্ভুত, বিচিত্র ও রমণীয় প্রকরণ আর আছে কি? এতে মনে হয় প্রকরণকার নিজের রচনা সম্পর্কে নিজের অভিমতই এখানে ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকরণটি সত্যই বিস্ময়কর, বিচিত্র ঘটনার পরিকল্পিত সমাবেশ এবং নানা রসের পরিবেশন সমগ্র প্রকরণকে রমণীয় করে তুলেছে। প্রকরণের চরিত্রগুলোও ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে নেয়া হয়েছে। একদিকে রাজা ও তার নর্মসুহৃদ নন্দন, রাজমন্ত্রী, মন্ত্রিপুত্র-মন্ত্রিকন্যা, মন্ত্রিপুত্রের সহচর, ধাত্রীকন্যা, অনুচর-অনুচরী অন্যদিকে রয়েছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরাও রয়েছে। এই প্রকরণে প্রেমের কাহিনীতে বৈচিত্র্য এনেছে চিত্রফলক আর বকুলমালা। নায়কনায়িকার প্রেম বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ দু'টির ভূমিকা অপূর্ব ও বিচিত্র। লবঙ্গিকা কামন্দকীকে এ দু'টি সম্পর্কে যথার্থই বলেছে- "কণ্ঠাবলম্বিদা বউল মালা 'সংজীবণং পিঅসহীত্র'ত্তি"[৬০] এভাবে প্রথম অঙ্কেই যে বকুলমালা গাঁথার অবসরে মালতীর সঙ্গে মাধবের অনুরাগের উন্মেষ নাটকের শেষ পর্যন্ত সে বকুলমালা রোমান্সের সৃষ্টি করে দর্শক মনে ঔৎসুক্য অব্যাহত রেখেছে। ষষ্ঠ অঙ্কে চোরিকাবিবাহের দৃশ্যটি নিখুঁত সুন্দর। উচ্চস্তরের নাট্যকৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন। সমস্ত ব্যাপারটিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক করে দেখানো হয়েছে। এই অঙ্কে মালতী ও মাধবের গোপন মিলন ব্যাপার দেখে কলহংসকের উক্তি 'অহো সরসরমণী অদো সংবিহাণ্স' অর্থাৎ 'আহা মরি! কি সরস আর রমণীয় ঘটনাপরম্পরা'।[৬১] এ উক্তি সমগ্র প্রকরণটির পক্ষেও প্রযোজ্য। নাট্যকার এই প্রকরণে একাধিক রসের পরিবেশন করেছেন। এর মধ্যে শৃঙ্গার, করুণ এবং বীর রস যেমন রয়েছে তেমনই নাট্যকারের প্রতিভা বিকশিত হয়েছে রৌদ্র, ভয়ঙ্কর, ও বীভৎস রস পরিবেশনে। তৃতীয় অঙ্কের 'শার্দূল-বিদ্রাবন' অর্থাৎ শার্দূলের আক্রমণ থেকে মকরন্দের মদয়ন্তিকারকে উদ্ধার ও পঞ্চম অঙ্কে মহাশ্মশানে দুঃসাহসী মাধবের মহামাংস বিক্রয়ার্থে অভিযান এবং করালমন্দিরে কাপালিক অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলার মালতীবধোদ্যোগের দৃশ্য যুগপৎ হৃদয়কে ভয়ে, বিস্ময়ে, ঘৃণায় ও উৎসাহে পরিপূর্ণ করে তোলে। মহাশ্মশানের বর্ণনা বীভৎস ও ভয়াবহ–মাংসাহুতি দিয়ে প্রজ্বলিত চিতাবহ্নি, চিতাধূমের উৎকৃষ্ট গন্ধ, শবাহারী শিবা, ভূতপ্রেত, বেতালভৈরবের সমাগম ও চিৎকার অতি ভীষণ। প্রেত পিশাচের ভোজন উল্লাস বীভৎসতার চরম দৃষ্টান্ত। বিচিত্র ঘটনাকে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত করে ভবভূতি নাটকের গতিকে অব্যাহত রেখেছেন। সংলাপে দীর্ঘায়িত সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ হয়েছে যা নাটকীয় সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে। অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও মাত্রাজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র নবম অঙ্ক জুড়েই মাত্রাহীনতা পরিলক্ষিত হয়। সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ নাটকীয় সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে। প্রকরণটিতে পঞ্চসন্ধি রয়েছে। প্রথম দু'টি অঙ্কে মুখ, ৩য় ও ৪র্থ অঙ্কে প্রতিমুখ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অঙ্কে গর্ভ, ৮ম ও ৯ম অঙ্কে বিমর্ষ এবং ১০ম অঙ্কে নির্বহণ সন্ধি রয়েছে। প্রকরণটির আরেকটি ত্রুটি ভাবাতিশয্য। লেখক মাঝে মাঝে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন যে নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ন করে তাঁর কবিপ্রকৃতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই বল হয়েছে: "Some of the passages are highly poetical and picturesque; but they indicate an expansiveness and lack of moderation which are fatal to dramatic movement and propriety."[৬২] কিন্তু নাটকীয় গতিও যথাযুক্ততার অভাবসত্ত্বেও *মালতীমাধব* সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র ও খাঁটি কবিত্বের নিদর্শন হিসেবে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। মূল কাহিনীর নায়ক নয়িকার চরিত্র অনেকটা গতানুগতিক হলেও মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার চরিত্র সৃষ্টিতে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। ভবভূতি তাঁর রচনায় সংস্কৃত কবিদের গতানুগতিক কাব্যভাব প্রকাশের বিষয়গুলো বর্জন করে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। কবি প্রসিদ্ধি তাঁর কাব্যে নেই। শব্দের ধ্বনিগুণকে তিনি অর্থদ্যোতনায় অন্যতম

উপকরণ রূপে গ্রহণ করেছেন- এ বিষয়েও তিনি সকল কবি অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি আড়ম্বরপ্রিয়তা ত্যাগ করেননি। সাধারণ অশিক্ষিত পাত্রপাত্রীর প্রাকৃত ভাষার বাগ্‌ব্যবহারেও ভবভূতি সংস্কৃত রীতির অনুসরণে দীর্ঘ সমাসবহুল শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রাকৃতে যা অস্বাভাবিক। ভাষা ব্যবহার নিয়ে তিনি তাঁর নিজের বিশ্বাসের কথা বলেছেন- 'চিত্রা কথা বাচি বিদগ্ধতা চ'-চিত্রাত্মক কথা এবং বাক্‌প্রৌঢ়ি বা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপই নাটকে থাকা বাঞ্ছনীয়। S. K. De যথার্থই বলেছেন: "It is natural therefore that in Indian estimation Bhavabhuti should rank next to Kalidasa as a poet, if not as a dramatist. To be judged by this lofty standard is itself a virtual acknowledgement of high merit and it is not altogether unjust praise. Bhavabhuti's shortcomings are those of an exuberant poetic mind, lacking the much desired restraint of an artist and they are manifest on the surface, but he has excellences."[৬৩] পরিশেষে বলা যায়, *মালতীমাধব* অতি বিস্তৃত কাহিনীসমৃদ্ধ একটি প্রকরণ। এ ধরণের বিচিত্র, সুন্দর, রমণীয় প্রকরণ আর কোথাও নেই। বিচিত্র এই প্রকরণ, বিস্ময়কর এর কাহিনী; বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ আর নানা রসের পরিবেশন সমগ্র প্রকণটিকে ভবভূতি রমণীয় করে তুলেছেন এবং প্রকরণের গতিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন। সত্যিই মালতীমাধব একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকরণ। প্রকরণটির সমীক্ষায় বলা যায়- "If Kalidasa is the Shakespeare of India, then Bhavabhuti may fittingly be compared to Milton, and what is said of the two English poets applies more or less to the Indian poets as well."[৬৪]

তথ্যনির্দেশ

১. মহাবীরচরিত নাটকের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে–

"অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়াঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিন উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি।

তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়িনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতির্নাম জতুকর্ণীপুত্রঃ কবির্মিত্রধেয়মস্মাকমিতি ভবন্তো বিদাঙ্কুর্বন্তু।

"শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহর্ষীণাং যথাঙ্গিরাঃ।

যথার্থনামা ভগবন্ যস্য জ্ঞাননিদিগুরুঃ॥"

অনুরূপভাবে উত্তররামচরিত নাটকের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে–

"অস্তি খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতির্নাম জতুকর্ণীপুত্রঃ"। 'যং ব্রহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্বশ্যেবান্ববর্ততে।'

আবার মালতীমাধব প্রকরণের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে–

"অস্তি দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিন ব্রহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি স্ম ।

"তে শ্রোত্রিয়স্তত্ত্ববিনিশ্চয়ায় ভূরি শ্রুতং শাশ্বমাদ্রিয়ন্তে।

ইষ্টায় পূর্তায় চ কর্মণের্থান্ দারানপত্যায় তপোর্থমায়ুঃ॥"

তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতিনামা জতুকর্ণীপুত্রঃ কবির্নিসর্গসৌহৃদেন ভরতেষু স্বকৃতিমেবংপ্রায়গুণভূয়সীমস্মাকমর্পিতবান্"।

২. "তে শ্রোত্রিয়াস্তত্ত্ববিনিশ্চয়ায় ভূরিশ্রুতং শাশ্বতমাদ্রিয়তে।
ইষ্টায় পূর্তায় চ কর্মণের্থান্ দারানপত্যায় তপোর্থমায়ুঃ ॥" Bhavabhuti, *Malatimadhavam*, M. R. kale, ed. (Bombay: Gopal Narayan and Co. 2nd edtn, 1928), 1/5, p. 7.

৩. "ইয়ং গেহে রক্ষীরিয়মমৃতবর্তির্নয়নয়ো রসাবস্যাঃস্পর্শো বপুষি বহুশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং বাহুঃ কণ্ঠে শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ॥"– ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পা. (নকীপুরঃ হরিচরণচতুস্পাঠী, ১৮৪৩ খ্রি.), ১/৩৮, পৃ. ৩৭।

৪. "দোর্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দণ্ডাবভঙ্গোদ্যতষ্টকারধ্বনিরার্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।
দ্রাক্‌পর্যস্তকপালসম্পুটমিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরভ্রাম্যৎপণ্ডিতচণ্ডিমা কথমহো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥"– বামন, *কাব্যলংকারসূত্রবৃত্তি*, গঙ্গানাথ ঝাঁ সম্পা. (পুণাঃ ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ২য় সংস্করণ, ১৯২৮ খ্রি.), ১/২/৩, পৃ. ৩৪।

৫. "কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্ ॥"– কল্‌হণ, *রাজতরঙ্গিণী*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৪র্থ খণ্ড, গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পা. (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৭৮), ৪র্থ তরঙ্গ, পৃ. ১৪২ ।

৬. "ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্।
শৃঙ্গারোঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রোমাত্যোথবা বণিক্ ॥
সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরঃ প্রশান্তকঃ।
নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং কচিৎ ॥
তেন ভেদাস্ত্রয়স্তস্য তত্রভেদস্তৃতীয়কঃ।
কিতবদ্যূতকারাদিবিটচেটকসংকুলঃ॥"– বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পা. (সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), ৬/২২৪-২৬, পৃ. ৪৪৬।

৭. ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য সম্পা. (কলিকাতাঃ সিদ্ধান্তবিদ্যালয়, ১৮৫৮ শকাব্দ), ১/৩৬।

৮. "ভীষণভুজবজ্রজর্জরিত-পঞ্জরাপমৃতসুভট-হস্তাবলুপ্ত-বিবিধায়ুধ নিবহঘাতিতাশেষ-রিপুসৈন্যম্ হতবিকট- দর্পসার-পদাতি-শূন্যমার্গসঞ্চারনিবর্তিতবিষম-সমরসাহসং নাথমাধবস্য।"–*তদেব*, ৮ম অঙ্ক, পৃ. ৪৬১।

৯. "পশ্যামি তামিব ইতঃ পুরতস্য পশ্চাদন্তর্বহিঃ পরিত এব বিবর্তমানাম।
উদ্বুদ্ধ-মুগ্ধ-কনকাব্জনিভং বহন্তীমাসক্তিতির্যগপবর্তিতদৃষ্টি বক্ত্রম্॥"–তদেব, ১/৪০।

১০. "Another point which rebounds to the credit of our poet is that his heroes know of one love only. Madhava and Makaranda are in this respect superiour to Dushyanta, Pururavas, Vatsyaraja or Udayana and others. For this reason the usual love intrigues and the clever but often unsuccessful subterfuges employed by heroes find no place in Bhavabhutis plays." Bhavabhuti, *Malatimadhavam*, M. R. Kale, ed. (Bombay: Messrs. Gopal Narayen & Co. Second. Edition, 1928.) Introduction, p. 29.

১১. "অসারং সংসারং পরিমুষিতরত্নং ত্রিভুবনং
নিরালোকং লোকং মরণশরণং বান্ধবজনম্।
অদর্পং কন্দর্পং জননয়ননির্মাণনমফলং
জগজ্জীর্ণারণ্যং কথমসি বিধাতুং ব্যবসিতঃ ॥" Bhavabhuti, *Malatimadhavam*, M. R. Kale, ed., op.cit. 5/30, P. 115.

১২. *Ibid.*, Introduction, P. 37-38.

১৩. "Makaranda, the play-mate of Madhava from childhood and the hero of the pataka, is an inseparable associate of his friend in all that he does and stands by him in weal or woe. After he had elicited from Madhava, a confession of his love for Malati, he interested himself in his behalf and even ran the risk of personating himself as Malati in the sham marriage arranged by Kamandaki with Nandana, only to make his friend happy." *Ibid.*, Introduction, P. 39.

১৪. "প্রিয়স্য সুহৃদো যত্র মম তত্রৈব সম্ভবঃ।
ভূয়াদমুষ্য ভূয়োপি ভুয়াসমনুসঞ্চরঃ ॥" *Ibid.*, 9/41, P. 196.

১৫. "গাত্রেষু চন্দনরসো দৃশি শরদেন্দুরানন্দ এব হৃদয়ে মম যস্ত্বমাসীঃ।
তং ত্বাং নিকাসকমনীয়মকাণ্ড এব কালেন জীবিতমিবোদ্বহতা হতোস্মি ॥" *Ibid.*, 5/22, P. 186.

১৬. *Ibid.*, Introduction, P. 39.

১৭. *Ibid.*, Introduction, P. 38.

১৮. "সা রামণীয়কনিধেরধিদেবতা বা সৌন্দর্যসারসমুদায়নিকেতনং বা।
তস্যাঃ সখে নিয়তমিন্দুসুধামৃণালজ্যোৎস্নাদি কারণমভূন্মদনশ্চ বেধাঃ ॥" *Ibid.*, 1/21, P.26.

১৯. *Ibid.*, P. 51.

২০. "হা ধিক্! কন্যকাজনবিরুদ্ধং কিমপুৎপন্যস্যতি।" *Ibid.*, 6th act. p.134.

২১. "Twice in imminent risk of life she excites our sympthy which deepens as the plot progresses and all interest centers round her as the situation grows more tragic in the last four Acts." *Ibid.*, Introduciton, P.39.

২২. "পরিত্রায়ধ্বং পরিত্রায়ধ্বম্। এষা নঃ প্রিয়সখ্যমাত্যনন্দনস্য ভগিনী মদয়ন্তিকৈতেন দুষ্টশার্দূলেন বিনিহতবিদ্রা-বিতাশেষপরিজনাভিভূয়তে।" *Ibid.*, 3rd act. p.79.

২৩. "সখি স্মর স্মর যেন তস্মিন্দিবসে বিকটদুষ্টশ্বাপদাপদেশকালগোচরং গতাশরণা তৎকালসন্নিহিতেন জীবিত-প্রদায়িনা ....পরিরক্ষিতাস্মি।" *Ibid.*, 7th act. p.149.

২৪. "......প্রত্যাশাবিমোক্ষমাত্রসুলভমৃত্যুর্বাণপ্রতিকূলবুদ্ধরক্ষিতাবচন বিবর্ধিতাবেগব্যতিকরবিসংষ্টুলেমং জীবলোক পরিবর্তনমনুভবামি।" *Ibid.*, 7th act. p.152.

২৫. Bhavabhuti, *Malatimadhavam*, M. R. Kale, ed., op.cit., 1/18, P. 20.

২৬. *Ibid.*, P. 36.

২৭. "এতেন আনন্দজনকত্বাদন্তঃপুরসচিবতা যুক্তেতি নামতাৎপর্যম্।" *Ibid.*, p. 15.

২৮. "তাং যাচতে নরপতেন্নর্মসুহৃন্নন্দনো নৃপমুখেন।
তৎসাক্ষাৎপ্রতিষেধঃ কোপায় শিবস্তুয়মুপায়ঃ ॥" *Ibid.*, 1/11, p. 15.

২৯. "বয়স্য! মালত্যস্মি।" *Ibid.*, p. 138.

৩০. "ভগবতি কৃতপুণ্য এব নন্দনো যঃ প্রিয়ামীদৃশং কাময়িষ্যতে।" *Ibid.*, p. 138.

৩১. "ন মে সাম্প্রতং ত্বয়া কৌমারবন্ধক্যা প্রয়োজনমিতি সশপথং প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা বাসভবনান্নির্গতঃ।" *Ibid.*, 7th act, p. 141.

৩২. "কথমুপহারীকৃতাস্মি রাজ্ঞস্তাতেন। রাজারাধনং খলু তাতস্য গুরুকং ন পুনর্মালতী। (সাস্রম্)– হা তাত, ত্বমপি নাম মমৈবমিতি সর্বথা জিতং ভোগতৃষ্ণয়া।" *Ibid.*, 2nd act, 61.

৩৩. "উৎকণ্ঠাবিনোদ ইতি।" *Ibid.*, 1st act, p. 37.

৩৪. *Ibid.*, 6th act, p. 120.

৩৫. "প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব, ইমাঃ........... উৎকণৎকেনকঙ্কিণীজালঝণঝণঙ্কারিণ্যঃ করিণ্যঃ।" *Ibid.*, p. 122.

৩৬. "অহো সরসরমণীয়তা সংবিধানস্য।" *Ibid.*, p. 134.

৩৭. "দিষ্ট্যা এবমপি নো ভবিষ্যতি।" *Ibid.*, 6th p. 139.

৩৮. "যদস্তু তদস্তু ব্যাপাদয়ামি। চামুণ্ডে ভগবতি মন্ত্রসাধনাদাবুদ্দিষ্টামুপনিহিতাং ভজস্ব পূজাম্।" *Ibid.*, 5/25, p. 112.

৩৯. "রে.রে ব্রাক্ষণ ডিম্ব..................................

.... ।

সোহং প্রাগ্‌ভবতৈব ভূতজননী মৃধ্নোমি খড়্গাহতি

-চ্ছিন্নস্কন্ধকবন্ধরন্ধরুধিরপ্রাগ্‌ভারনিঃ স্যন্দিনা ॥" *Ibid.*, 5/29, p. 124.

৪০. "সম্প্রতি বিশেষতঃ পৌরুষস্যাবসরঃ।" *Ibid.*, 5th act, p. 117.

৪১. "অয়ি কিং ব, বেৎসি যদেকত্র নো বিদ্যাপরিগ্রহায় নানাদিগন্তবাসিনাং সাহচর্যমাসীৎ। তদৈব চাস্মৎসৌদামিনী-সমক্ষমনয়োর্ভূরিবসুদেবরাতয়োর্বৃত্তেয়ং প্রতিজ্ঞাবশ্যমাবাভ্যামপত্যসম্বন্ধঃ কর্তব্য ইতি।" *Ibid.*, 1st act, p. 14.

৪২. "শ্রূয়তাম্। অস্তি বিদর্ভাধিপতেরমাত্যঃ সমগ্রধুর্যপুরচ্ছপ্রকাণ্ডচূড়ামণিদেবরাতো নাম যমশেষভুবনমহনীয়পুণ্য মহিমান-মাত্মনঃ সতীর্থ্যং পিতৈব তে জানাতি যোসৌ যাদৃশশ্চেতি।" "কথমপি ভুবনেস্মিংস্তাদৃশাঃ সংভবন্তি।" *Ibid.*, 2nd act, p. 61.

৪৩. "হা তাত নিষ্করুণ এষ ইদানীং তে নরেন্দ্রচিত্তারাধনোপকরণং জনো বিদ্যতে।" *Ibid.*, 5th act, p. 107-108.

৪৪. "অস্ত্যেতন্নরেন্দ্রবচনানুরোধিতেনামাত্যেন নন্দনস্য, প্রতিপন্না মালতীতি সকলো জন্যেমাত্যং জুগুপ্সতে।" *Ibid.*, 2nd act, p. 55.

৪৫. "কথমুপহারীকৃতাস্মি রাজ্ঞস্তাতেন।" *Ibid.*, 2nd act, p. 55.

৪৬. "হা তাত বিরম বিরম দর্শনোৎসুকাস্মি তে বদনকমলস্য।" "প্রসীদ সংভাবয় মাম্।...............ময়া পুনরনার্যয়া নিরনুক্রোশা যূয়মিতি সংভাবিতমাসীৎ।" *Ibid.*, 10th act, p. 210.

৪৭. "ব্যোচ্ছাপিচ্ছগুচ্ছাবলিভিরিব তমোবল্লরীভির্ব্রিয়ন্তে

পর্যন্তাঃ প্রান্তবৃত্যা পয়সি বসুমতি নূতনে মজ্জতীব।

....

প্রারম্ভেহপি ত্রিযামা তরুণয়তি নিজং নীলিমানং বনেষু ॥" *Ibid.*, 5/6, p. 98.

৪৮. "আঃ দুরাত্মন্ মালতীনিমিত্তং ব্যাপাদিতাস্মদ্গুরো মাধবহতক অহং ত্বয়া তস্মিন্নবসরে নিদয়ং নিঘ্নত্যপি স্ত্রীত্যবজ্ঞাতা। (সক্রোধদম্) তদবশ্যমনুভবিষ্যসি কপালকুণ্ডলাকোপস্য বিজৃম্ভিতম্।"

"শান্তিঃ কুতস্তস্য ভুজঙ্গশত্রোর্যস্মিন্নমুক্তানুশয়া সদৈব।

জাগর্তি দংশায় নিশাতদ্রংষ্টাকোটির্বিষোদ্গারগুরুচর্ভুজঙ্গী ॥" *Ibid.*, 6/1, p. 119.

৪৯. "প্রিয়সখি লবঙ্গিকে সর্বস্যাশ্বাসনশীলাসি।" *Ibid.*, 2nd act, p. 46.

৫০. "এবমেব প্রত্যক্ষসৌখ্যদায়িনঃ পরোক্ষদুঃখদুঃসহাঃ সজ্জনসমাগমা ভবন্তি।" *Ibid.*, 2nd act, p. 50.

৫১. "পরমার্থভগিনি প্রিয়সখি লবঙ্গিকে এবেদানীং তে প্রিয়সখ্যনাথা মরণে বর্তমানগর্ভনির্গমনিরন্তরো- পকারোপরূঢ়বিস্রম্ভসদৃশং পরিষ্বজ্য তাং প্রার্থয়॥" *Ibid.*, 6th act, p. 127.

৫২. "বৎসে মালতি জন্মনঃ প্রভৃতি বল্লভো মে লবঙ্গিকা। তৎ কিমেনামুজ্জিহানজীবিতাং বরাকীং নানুকম্পতে।" *Ibid.*, 10th act, p. 205.

৫৩. "অহো ভগবতীপ্রধানান্তেবাসিন্যাঃ সর্বতোমুখং বৈদগ্ধ্যমক্ষয়শ্চ সুভাষিতরত্নকোষঃ।" *Ibid.*, 8th act, 163.

৫৪. "দিষ্ট্যা দর্শিতফলমিদানীং বিজ্ঞানং প্রজাপতেঃ।" *Ibid.*, 1st act, p. 40.

৫৫. "এষাস্মি সৌদামিনী ভগবতঃ শ্রীপর্বতাদুৎপত্য পদ্মাবতীমুপাশ্রিতা।

....॥

সৈষা বিভাতি লবণাললিতোর্মিপঙ্কিরভ্রাগমে জনপদপ্রমদায় যস্যাঃ।

গোগর্ভিণীপ্রিয়নবোলপমালভারিসেব্যোপকণ্ঠবিপিনাবলোপয়োর্ভবন্তি ॥" *Ibid.*, 9/2, p. 176.

৫৬. “ভগবতি অমাত্যো ভণতি এতেন নরেন্দ্রানুপ্রেষিতেন বিবাহনেপথ্যেন দেবতাপুরতোলং কর্তব্যা মালতীতি।” *Ibid.,* 6th act, P. 125.

৫৭. “কলহপ্রিয়ো বহুকথো বিরূপো বন্ধুসেবকঃ।

মান্যামান্যবিশেষজ্ঞশ্চেটো হ্যেবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥”–ভরত, *নাট্যশাস্ত্রম্*, সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.), *প্রাগুক্ত*, ৩৫/৮০ পৃ. ২৩৩।

৫৮. “প্রভবতি নিজস্য কন্যকাজনস্য মহারাজ ইতি।” Bhavabhuti, *Malatimadhavam*, M. R. Kale, ed., op.cit., 2nd act, p. 45.

৫৯. *Ibid.,* 10th act, p. 216.

৬০. *Ibid*., 3rd act, p. 43.

৬১. *Ibid*., 6th act, p. 75.

৬২. S. N. Dasgupta and S. K. De, A History of Sanskrit Literature (Univ. of Calcutta, 2nd edition, 1977), p.297

৬৩. *Ibid.,* p. 295.

৬৪. Bhavabhuti, *Malatimadhavam*, C. R. Bevadhar ed. (Poona: Ganesh Printing Press, 1935), Introduction, Page 11.